বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

চতুর্দশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৬৪ – আষাঢ় ১৩৬৫

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্দশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৭৯ শক

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জয় জয় জয় হে, জয় জ্যোতির্ময় !
মোহকলুষঘন কর' ক্ষয়, কর' ক্ষয় ॥
অগ্নিপরশ তব কর' কর' দান,
কর' নির্মল মম তনুমন প্রাণ—
বন্ধনশৃঙ্খল নাহি সয়, নাহি সয় ॥

গূঢ় বিঘ্ন যত কর' উৎপাটিত।
অমৃতদ্বার তব কর' উদ্‌ঘাটিত।
যাচি যাত্রিদল, হে কর্ণধার,
সুপ্তিসাগর কর' কর' পার—
স্বপ্নের সঞ্চয় হোক লয়, হোক লয় ॥

[আশ্বিন ১৩৩৬]

'তপতী' নাটকের জন্য রচিত অপ্রচারিত গান
শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রসদনের দপ্তর হইতে সন্ধান করিয়া দিয়াছেন।

মৃত্যুশোক শ্রীঅমল হোমকে লিখিত পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

যৌবনের মাঝখান থেকে আমরা যখন মৃত্যুকে দেখি তখন তাকে এত বেশি অবাস্তব বলে বোধ হয় যে সমস্তর মাঝখানে তাকে প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্য বলেই মনে করি— তার বিরুদ্ধে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাকে কী বলে যে স্বীকার করব ভেবে পাইনে। আমি মৃত্যুকে দেখ্‌ছি সত্তর বছরের কাছে এসে— তার অনতিদূরবর্তী সুনিশ্চিত রূপ— তাকে সহজ বলেই অনুভব করি। এর সম্বন্ধে আর কিছু অত্যুক্তি করতে প্রবৃত্তি হয় না। যেমন জানি রাত্রি-বেলা বাইরে দেখতে দিনের বিপরীত, কিন্তু অন্তরে তাকে সমর্থন করে, মৃত্যুও তেমনি প্রাণকে সমর্থন করে।

এ সম্বন্ধে সব চেয়ে বড়ো কথা আছে উপনিষদে :—

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ, যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

সেই বেদনীয় পুরুষকে অনুভব করো যাতে করে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দেয়। আমার মধ্যে এই যে পুরুষ (Person) আছে এ'কে আমি কোনো তর্ক না করে একান্তভাবে নিজের মধ্যে অনুভব করি— এ বেদনীয়, তর্কে এর বিশ্লেষণ চলে না। আমার মধ্যেকার এই পুরুষ সত্য হয়েচে যে পরম পুরুষের মধ্যে তিনিও বেদনীয়, তাঁকে বোধ করো, তাঁকে তর্কে পাবে না। যদি উপলব্ধি করি তাঁর মধ্যে আমার প্রতিষ্ঠা, যদি তাঁকে পরম সত্যরূপে বোধ করি, তাহলে মৃত্যুকে অনস্তিত্ব বলে আর ভয় থাকে না। তখন মৃত্যুকে জানি প্রাণের সঙ্গে সুর-মেলানো সত্য।

তা হোক্‌, তবু বিচ্ছেদের দুঃখ আছে, সে কম দুঃখ নয়। তাকে মেনে নিতেই হবে। আমার মনে আছে, প্রথম যে মৃত্যুবিচ্ছেদ অল্প বয়সে আমাকে কঠোর আঘাত করেছিল তার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা আমার মনে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল— আমার মন আমাকে বলেছিল— তুমিও বেঁচে থাক্‌বে না। অর্থাৎ আমার জীবনের সঙ্গে আর এই মৃত্যুর একান্ত অনৈক্য নেই। সমুখের তরঙ্গের সঙ্গে পিছনের তরঙ্গের সম্পূর্ণ মিল আছে। যে গেল আর যে রইল সত্তার সঙ্গীতে তারা একই তালের অন্তর্গত। আমার স্পষ্ট মনে আছে এই চিন্তায় আমার শোকের শিকলটা গেল ছিঁড়ে— বিশেষ একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করলুম। বেদনা ছিল না তা নয়, কিন্তু সে বেদনা আমাকে বদ্ধ করলে না আমাকে বেদনার পারের দিকে বহন করে নিয়ে গেল।

শোকের দিনে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। জীবনে শোকের কার্য্য আছে। আত্মীয় বিচ্ছেদকে তার শেষ অর্ঘ্য দিতেই হবে। এই দানের মুহূর্ত্তে জীবনের প্রতি অন্ধ আসক্তির বন্ধন শিথিল হয়। এই আসক্তি ক্ষীণ হলে জীবনের কর্ত্তব্য বিশুদ্ধ হয়। জীবনের মধ্যে মৃত্যুর যে পরম অর্থ আছে সেটা বুঝিনে বলেই এত মারামারি কাড়াকাড়ি, এত ক্ষুদ্রতা, এত হিংসা দ্বেষ। মৃত আত্মার যথার্থ শ্রাদ্ধ হচ্ছে জীবিত

সংসারের প্রতি আপন সম্বন্ধকে বিশুদ্ধ করা। যিনি চলে যান তিনি যদি এই শিক্ষা না দিয়ে যেতে পারেন তাহলে তাঁর মৃত্যু আমাদের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন ক্ষতি। ইতি ১৪ শ্রাবণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গগনচন্দ্র হোমের পরলোকগমনে

২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

অমল, সেদিন এখান থেকে যাবার আগে তোমার অকারণ উদ্বেগচাঞ্চল্য আমার মনকেও নাড়া দিয়েছিল। অলক্ষ্য মনের তার বহন করে এনেছিল আসন্ন বিচ্ছেদবার্ত্তা। তা পাঠাবার শক্তি ছিল বুলার।

এ মৃত্যুর বেদনা কত তীব্র হয়ে বেজেচে তোমার আমি জানি। মর্ত্ত্যবন্ধনমুক্ত যোগ নিত্য করে রাখুক তোমাদের সখ্য। ইতি ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুলার শ্রাদ্ধসভার জন্য এটি পাঠালুম। শিশিরকে চিঠি লিখেচি।

"বীণার তার হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে গান যদি অকালে স্তব্ধ হয়ে যায় তবে তার অন্তঃপ্রবাহ শ্রোতার মনে নীরবে সমাপ্তির মুখে চলতে থাকে; উমার অসম্পূর্ণ জীবন তেমনি করে অকালমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার প্রিয়জনদের মনের মধ্যে একটি অন্তরতর গতি লাভ করেচে। সংসারে স্নেহ দেবার এবং স্নেহ পাবার ইচ্ছা তার জীবনে সব চেয়ে একান্ত ছিল। ফুল যেমন আলো চায় এবং গন্ধ দেয়, সে তার অল্পায়ু জীবলীলায় তেম্‌নি করেই প্রীতি দিয়েচে এবং নিয়েচে। সেই দেওয়া নেওয়ার অবসান হোলো এমন কথা মনে করে যেন বিলাপ না করি। জীবিতকালেই সে অনুভব করেছিল যে, তার স্পর্শশক্তি মৃত্যুর অন্তরাল অতিক্রম করেচে; আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে যেন মনে করি যে তার আত্মিক শক্তি ইহলোক পরলোকের মাঝখানে আত্মীয়তার সেতু রচনা করে আছে এবং আত্মীয় বন্ধুদের কাছ থেকে শোকস্মৃতির অর্ঘ্য গ্রহণ করে এই মুহূর্ত্তেই তার হৃদয় স্নিগ্ধ হোলো। তার আত্মা শান্তিলাভ করুক, তৃপ্তিলাভ করুক, মর্ত্ত্য জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা থেকে মুক্তিলাভ করুক, এই কামনা করি।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা, 'বাতায়ন'-এর কবি উমা দেবীর পরলোকগমনে।
শিশির—শ্রীশিশিরকুমার গুপ্ত, উমা দেবীর স্বামী।

রবীন্দ্রস্মৃতি সাহিত্য

শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

যেমন গান ও নাটকের বিষয় তেমনি রবীন্দ্রসাহিত্যস্মৃতিও আমাদের ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ করতে হয়। ছোটবেলা থেকেই রবিকাকা আমাদের ইংরেজি থেকে বাংলা তর্জমা করতে দিতেন মনে পড়ে। এক কথায় বলতে গেলে এসব বিষয়ে তিনি আমাদের পরামর্শদাতা ও উৎসাহদাতা ছিলেন। আমার যখন আন্দাজ ন'বছর বয়স তখন থেকেই অক্ষয় চৌধুরীকে কবিতায় চিঠি লিখতুম, সেগুলি এখন থাকলে কৌতুকের বিষয় হত। আমাদের একটি পারিবারিক খাতা ছিল যেটি পূর্বোক্ত ভবানীপুরের বাড়িতে সিঁড়ির উপরে একটি উঁচু ডেস্কের উপর শেকল দিয়ে বাঁধা থাকত। যার যখন ইচ্ছে তাতে নিজের বক্তব্য লিখে রাখত। তার মধ্যে রবিকাকার নিজের হাতে কতগুলি নিয়ম লেখা ছিল, যেমন তার কোনো রচনা বাইরে প্রকাশিত হবে না ইত্যাদি। এরকম দুখানি খাতা পরপর ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিতীয়টির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। প্রথমটি রথীর পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে তাকে উপহার দিই, এখন সেটি সযত্নে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। রবিকাকার স্বহস্তে লিখিত নিয়মাবলীর মধ্যে ছাপার নিষেধটি পরে অবশ্য রক্ষিত হয় নি। আর প্রকাশ করে ভালোই হয়েছে কারণ হাতের অক্ষরের চেয়ে ছাপার অক্ষর অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। তা ছাড়া এ লেখার সবগুলির না হোক অনেকগুলির ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য আছে। আমাদের আত্মীয়বন্ধু অনেকে অনেক ছেলেমানুষি লেখা এতে লিখে গেছেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমি এতে কখনও কিছু লিখি নি।

রবিকাকা আমাকে উদ্দেশ করে কবিতায় যেসব পত্র লিখেছিলেন 'কড়ি ও কোমলে'র প্রথম সংস্করণে (১২৯৩) সেগুলি বেরিয়েছিল। তার তিনটি এখনো কড়ি ও কোমলে ছাপা হয়। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মনে হয় এই তিনটিই কাব্যরত্ন-বিশেষ আর আমার সঙ্গে তার যোগ স্মরণ করে বিশেষ গৌরব অনুভব করি। আমার জন্মদিনে একটি সুন্দর পিয়ানোর মতো গড়নের দোয়াতদানি উপহার দিয়ে তার সঙ্গে যে কয়েক ছত্র লিখেছিলেন সেও তাঁর হাতের স্পর্শে উজ্জ্বল, এটিও কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণে ছিল।

স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত
চোখে যদি দেখা যেত রে,
বাজারে-জিনিস কিনে নিয়ে এসে
বল্ দেখি দিত কে তোরে।...

প্রভাতসঙ্গীত (১২৯০) আমাকে 'স্নেহ উপহার' দিয়ে উৎসর্গপত্রে আমার উদ্দেশে একটি কবিতা লিখেছিলেন, প্রথম সংস্করণের বইতে সেটি আছে।

আমি আর একটু বড় হলে আমাকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি সাহিত্যস্মৃতির একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। 'ছিন্নপত্র' নামে সেগুলি তাঁর গদ্য-সাহিত্যে স্থায়ী আসন অর্জন করেছে। এই চিঠিগুলির উপলক্ষ হওয়া ছাড়া আমার এই সামান্য কৃতিত্বটুকু আছে যে সেই অল্পবয়সেই তার মর্যাদা বুঝে তার সাহিত্যিক অংশগুলি সাধারণ পারিবারিক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি খাতায় তারিখসমেত লিখে

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রেখেছিলুম, পরে সেই খাতা তাঁকেই দিয়েছিলুম। সেই খাতা থেকেই রথী আর নগেন্দ্র ছিন্নপত্র বইখানি ছাপান।

রবিকাকার কতকগুলি বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে ছিল— ভগ্নহৃদয়, নলিনী ইত্যাদি। সেগুলি এখন রবীন্দ্রসদনেই আছে। গত শতাব্দীর শেষ শতকে বিলেতে যাবার সময় ও প্রবাসকালে যে ডায়েরি লিখেছিলেন, তারও নিজের হাতে পেনসিলে লেখা খাতা আমার কাছে ছিল। সেটিও যথারীতি রবীন্দ্রসদনে দিয়েছি। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারির খসড়া' নামে সেটি বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৫৬-৫৭) মুদ্রিত হয়েছে। এই খসড়ারই সংশোধিত রূপ য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি দ্বিতীয় খণ্ড (১৩০০) নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

ছেলেবেলায় আমি আর সুরেন রবিকাকার একটি বিশেষ জন্মদিনে একটি খাতায় আমাদের প্রিয় ইংরেজ কবিদের বিখ্যাত কবিতাগুলি নকল করে তাঁকে উপহার দিয়েছিলাম। তার নকলের অংশটা আমার হাতের লেখা কিন্তু প্রত্যেক পৃষ্ঠায় যে সেয়াইকলমের নকশা করা আছে সেটি আমার দাদার হাতের কারিগরি। তাঁর প্রতি আমাদের ভাইবোনের ভক্তি ও ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে এই খাতাটি কৌতূহলী যাঁরা তাঁরা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে দেখতে পারেন। সেযুগের ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তখন আমাদের নিষ্ঠা, আর শিক্ষাদানের ব্যাপারে রবিকাকার প্রবল উৎসাহের পরিচয় এতে পাওয়া যাবে, কারণ রবীন্দ্রসদনে পৌঁছবার বহু আগে খাতাখানি যখন তাঁর কাছে ছিল তখন তিনি রথীকে দিয়ে আমাদের সংকলনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য পরবর্তী কবিদের রচনা তাতে নকল করাতে আরম্ভ করেছিলেন। বস্তুত তাঁর সাহচর্য ও সান্নিধ্যের ফলে আমরা বাড়িতে সর্বদাই একটি সাহিত্যের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি। সুরেনের এক জন্মদিনে তিনি হার্বার্ট স্পেনসারের সমগ্র রচনাবলী তাকে উপহার দিয়েছিলেন। আমি লরেটো ইস্কুলে ফরাসি শিখতুম বলে, একবার আমার জন্মদিনে ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি টেবিলের উপর তখনকার দিনের বিখ্যাত ফরাসি কবি কপ্পে, মেরিমে, ল্য কঁৎদ্‌লীল্, লা ফঁতেন্ প্রভৃতির রচনাবলী সুন্দর করে বাঁধিয়ে সোনার জলে তাদের নাম ও আমার নামে লিখিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন। দেখে যে কত আনন্দ হয়েছিল বলা যায় না। এখনো সেই বইগুলি শান্তিনিকেতনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধন করছে।

জীবনে অনেক ভালো জিনিস পেয়েছি যা রাখতে পারি নি। তাই বিশেষ করে এটুকু বলে যেতে চাই যে, একমাত্র বইয়ের ক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। ওঁর সমস্ত ফরাসি গ্রন্থ কাশী বিশ্ববিদ্যালয়কে, আর ক্রমশ সমস্ত সংস্কৃত বাংলা ইংরেজি বই বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে দান করা হয়। পরে শুনেছি সে বইগুলি শান্তিনিকেতনে পৌঁছলে রবিকাকা নাকি খুব খুশি হয়ে অনেকদিন নিজের ঘরে রেখেছিলেন।

ছেলেবেলায়ও আমাদের তিনি সে বয়সের উপযুক্ত ইংরেজি বই জুগিয়েছেন। *Hellen's Babies* (রচয়িতা বিস্মৃত) নামের একটি ছোটদের বই নিজে পড়ে শোনাতেন। Lewis Caroll-এর *Alice in Wonderland* আর *Through the Looking Glass*-এর মতো অপূর্ব ছোটদের বই আজ পর্যন্ত আমার হাতে আসে নি। সেজন্যই বলি আজকাল যে নিচু ক্লাসে ইংরেজি ভাষা বাতিল করে দেবার প্রস্তাব উঠেছে সেটা কাজে পরিণত হলে আমাদের শিশুদের আমি 'কৃপাপাত্র অতিদীন' বলে মনে করব।

আর একটু বড় হলে আমরা গুরুজনদের সঙ্গে সাধারণভাবে অনেকগুলি ইংরেজ লেখকের বই সমানে পড়ে উপভোগ করেছি। Marie Bashkirtscheff -এর জার্নাল আর এমিয়েলের জার্নাল বোধ হয় তার

মধ্যে ছিল। উপন্যাসের মধ্যে মারি করেলি, Onida, জর্জ এলিয়েটও আমাদের পঠনীয় পুস্তকের তালিকায় ছিল। ডিকেন্স, থ্যাকারে, স্কট অবশ্য লাইব্রেরি সাজানোর কাজ করেছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে এঁদের দুই-একটা বই ছাড়া বেশি পড়েছি বলে মনে পড়ে না। এডগার এলেন পো'র সঙ্গে রবিকাকাই আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর বইয়ের একটি মোটা সংস্করণের চেহারা এখনও পরিষ্কার মনে পড়ে। তাঁর গদ্যপদ্যের বিশেষত্ব এখনো মনে লেগে রয়েছে। তাঁর গল্পের মধ্যে কি একটা রহস্যময়তা ছিল! বিশেষত তাঁর THE RAVEN নামের অপূর্ব কবিতাটি ছন্দ মিল ও ভাবের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও স্মৃতির দুয়োরে মাঝে মাঝে আঘাত করে—

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
''Tis some visitor,' I muttered, 'tapping at my chamber door—
Only this, and nothing more.'
Ah, distinctly I remember it was in the bleak December,
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.

এর পর একটি দীর্ঘ কবিতার প্রত্যেক কলিতে ভাষার দিক থেকে অজস্র মিল সুর ও ছন্দের নকশাটি অব্যাহত রেখে আর ভাবের দিক থেকে সেই নির্জন শীতের রাত্রে একটি কালো পাখির আচমকা আবির্ভাবের সঙ্গে তাঁর প্রণয়িনী লেনোরের স্মৃতি জড়িত করে কি সুন্দর রহস্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করে কবি এই কথা-কটি দিয়ে শেষ করেছেন—

And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door ;
And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming,
And the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor ;
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted— nevermore !

আমার অবশ্য তখন থেকেই মাতৃ-অধিকার-সূত্রে লব্ধ একটু দুর্বলতা ছিল। তাই উইল্‌কি কলিন্সের 'হোয়াইট ওম্যান' পর্যন্ত আমার লোভনীয় মনে হত। জর্জ এলিয়ট পড়া নিয়ে একটু সামান্য ঘটনা বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বোম্বাই প্রদেশ বাবার কর্মক্ষেত্র ছিল বলে আমরা প্রত্যেক ছুটিতে তাঁর কাছে যেতুম। সেরকম একটি সফরের পথে সরোজিনী নাইডুর বাবা অঘোর চট্টোপাধ্যায় আমাদের গাড়িতে এসে ওঠেন। এখনও তাঁর সেই লম্বা সাদা চাপকান আর পাগড়ি -পরা হায়দরাবাদী ঢঙের বেশ, লম্বা দাড়ি আর দীর্ঘ চেহারা মনে পড়ছে। আমার তখন বছর-বারো আন্দাজ বয়স হবে। বোম্বাইযাত্রার দীর্ঘপথে সময় কাটাবার জন্য বই পড়াই আমার একটি প্রধান অবলম্বন ছিল। সুরেন জানলায় মুখ বের করে চোখে কয়লা ঢোকা সত্ত্বেও বাইরের দৃশ্য দেখতে ভালোবাসতেন। অঘোরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন কি পড়ছি। আমি জর্জ এলিয়টের 'মিল অন্ দি ফ্লস্' বইখানির নাম করতে তিনি কিছু বললেন না, কিন্তু

তাঁর ভাব দেখে মনে হল যেন আমার বয়সে তার মর্মগ্রহণ করতে পারার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান, যেমন কেউ কেউ উলটো করে বই ধরে বোঝাতে চায় যে সে পড়ছে। তার পরে তিনি তাঁর বাক্স খুলে পুঁতির লাঠি প্রভৃতি হায়দরাবাদের কারুকাজ-করা অনেকগুলি খেলনা দুই ভাইবোনকে দিলেন। আর আমাদের কাছে গল্প করলেন যে আমার বয়সী তাঁর একটি মেয়ে বিলেতে আছে, সে খুব লেখাপড়া ভালোবাসে বলে নিজাম তাকে বৃত্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন। এর পরে অনেক পরে সরোজিনীর সঙ্গে ওঁর বিলেতে দেখা হয়। কিন্তু এহ বাহ্য।

রবিকাকার কাব্যের সঙ্গে পরিচয় অবশ্য পূর্বোক্ত নাটকগুলি বাদ দিলে অনেক পরে আরম্ভ হয়। আমার শ্বশুরপরিবারের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় এবং পরে কুটুম্বিতা আর ঘনিষ্ঠতার কথা অন্যত্র বলেছি। শুনেছি 'কড়ি ও কোমলে'র প্রকাশের বিষয়ে পরামর্শ তিনি বড়ঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে করতেন। তাঁর প্রথম রচিত কবিতাবলীর সঙ্গে যে আমাদের পরিচয় ছিল না, তা বলতে পারি নে। তার প্রমাণ পরে আমি একটি খাতায় তাঁর কবিতার মধ্যে আমার প্রিয় কবিতাগুলির একটি সঞ্চয়িতা লিখে রেখেছি। আমার মনে হয়, 'কড়ি ও কোমল' থেকেই তাঁর কবিপ্রতিভার মর্ম সত্যিই বুঝতে আরম্ভ করেছি। ক্রমে মানসী, সোনার তরী, চিত্রা প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত বইগুলির সঙ্গেই যেন বেশি ঘনিষ্ঠতা অনুভব করেছি। বিংশ শতাব্দী থেকেই যেন জীবনে একটা বড় ছেদ পড়ে যায়। আমারও বিয়ে হয়ে যায় আর রবিকাকাও শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করায় একটু দূরে সরে যান।

সংগীত ও নাট্যস্মৃতির মতো এ ক্ষেত্রেও আশেপাশের লোকের স্মৃতি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে। কারণ যদিও আমাদের শাস্ত্রমতে মানুষ একাই সংসারে আসে একাই যায়, কিন্তু ইতিমধ্যে যতদিন সে সংসারে বাস করে ততদিন আর পাঁচজনকে নিয়েই তার জীবনের জাল গ্রথিত হয়। অক্ষয় চৌধুরী দম্পতির স্মৃতি অন্যত্র শরৎকুমারী চৌধুরানীর গ্রন্থাবলীর আলোচনায় কিছু কিছু লিখেছি। সেই অতি অল্প বয়সেও অক্ষয়বাবু আমার মতো ছেলেমানুষকে যত্ন করে গোল্ডেন ট্রেজারি থেকে কবিতা পড়ে আমায় বুঝিয়ে দিতেন। বিশেষত THE BRIDGE OF SIGHS কবিতাটির প্রথম লাইন One more unfortunate তখন বুঝতে পারি নি এবং এখন ভাবতে গেলে মনে হয় সে বয়সে সে-কবিতার সবটাই আমি বুঝতে অক্ষম ছিলুম। টমাস হুড-এর SONG OF THE SHIRT-ও মনে পড়ে। এমনকি গোল্ডেন ট্রেজারির সেই বিশেষ সংস্করণের প্রতিও মায়া পড়ে গেছে। মানুষের ছেলেবেলার স্মৃতির আশ্চর্য প্রভাব, সকলেই নিশ্চয়ই তা স্বীকার করবেন। অক্ষয়বাবু সুরেন ও আমাকে আমাদের বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত ওথেলো পড়াতে পড়াতে নিজেই কিরকম কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন সে কথাও অন্যত্র বলেছি। এই দুই অসমবয়স্ক বাল্যবন্ধুর প্রতি আমার শেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করে গেলুম।

এখানে বাবা-মা'র প্রভাবের কথা উল্লেখ করা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয় এই কারণে যে তাঁরাও শুধু সাধারণভাবে ইস্কুলের পড়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বাবা-মায়ের কর্তব্য পালন শেষ করেন নি, পরন্তু জন্মাবধি সাহিত্যে আমাদের উৎসাহ ও রুচির গোড়াপত্তন করে দিয়েছেন। এখনও মনে পড়ে বানিয়নের ***Pilgrim's Progress***, ***Arabian Nights***, Grimms আর Hans Anderson -এর রূপকথা, Cervantes-এর ***Don Quixote***-এর কি সুন্দর রাজ-সংস্করণ বাবা আমাদের পড়তে দিয়েছিলেন।

বিলেত থেকে ফিরে আসার পর মা আমাদের নিয়ে বছরখানেক সিমলে পাহাড়ে ছিলেন। তখন আমার বোধ হয় সাত বছর বয়স। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে— মনে করে নিজেই আশ্চর্য হই, সেই বয়সেই মা আমাদের শেলির SENSITIVE PLANT আর THE CLOUD, টেনিসনের MAY QUEEN আর THE BROOK পড়াতেন কারণ এই কবিতাগুলি তিনি ভালোবাসতেন। তার মর্ম কি বুঝতাম ভগবানই জানেন। কিন্তু নিশ্চয়ই অজ্ঞাতসারে সে সুন্দর ছন্দোবন্ধের মাধুর্য শিশু মনে প্রবেশ করেছিল, আনন্দ দিয়েছিল। শিক্ষাসম্বন্ধে মায়ের নিজস্ব কতকগুলি মত ছিল, তাই তিনি বাংলায় অক্ষরপরিচয় না করিয়েই কোলে বসিয়ে একেবারেই ভারতী পত্রিকা থেকে পড়িয়ে যেতেন। আর আঁকাবাঁকা অক্ষরে আমারই সমবয়সী উষাদিদি সুপ্রভাদিদি প্রভৃতি বোনেদের চিঠি লেখাতেন। তার নীচে লেখা থাকত 'তুমি আমার চুমু নিও।' এখনও আমার নাতিনাতনীরা যখন 'Home They Brought Her Warrior Dead' চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে, তখন স্মৃতির শততন্ত্রীর একটি ক্ষুদ্র তারে অনুরণন ওঠে। আর নিজেকে এইজন্যে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি যে ছোটবেলায় কিছুকাল বিলেতে থাকার ফলে ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণে বন্ধুর পথ তাদের মতো কষ্ট করে অতিক্রম করতে হয় নি।

আর একটি অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত কবি অর্থাৎ টমাস মুরের লেখা 'লাল্লা রুক' কাব্য মায়ের এবং সেই কারণে আমাদের খুব প্রিয় ছিল। তাঁর PARADISE AND THE PERI প্রভৃতি কবিতা আমাদের সেকালে আনন্দ দিয়েছে, তার সাক্ষী এখানে দিয়ে গেলুম। এখনও ইচ্ছা আছে Lallah Rookh-এর সুন্দর গল্পটি মূক অভিনয় করাতে। কিন্তু পূর্বোক্ত সেই 'হায় রে দুরাশা'র পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু করার নেই। রবিকাকাদের আমলে তাঁদের উপরে টমাস মুরের গান ও কবিতার প্রভাবের কথা অন্যত্র বলেছি। মুরের এই দুটি লাইন—

> The young May moon is beaming, Love!
> The glowworm's lamp is gleaming, Love!

তাঁরা এইভাবে অনুবাদ করেছিলেন—

> জ্যোৎস্না ফুটফুট, প্রিয়ে!
> জোনাকি মিট্‌মিট্‌, প্রিয়ে।

এডুইন আর্নল্ডের *Light of Asia*ও আমাদের খুব প্রিয় ছিল। এঁরা সেই দলের ইংরেজের মধ্যে, যাঁরা কেবলমাত্র বিজেতার রূপে গর্বে উদ্ধত না হয়ে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও সভ্যতার প্রতি ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন। আমাদের ছেলেবেলায় Col. Meadows Taylor নামে একজন লেখকের রচিত *Tara* এবং *Sita* উপন্যাস দুটি খুব পড়তুম। স্লিমান সাহেব নামে আর-একজন সৈনিক ঠকের দল সম্বন্ধে কিছু বই লিখেছিলেন। সেগুলো এক সময় আমাদের পাঠ্য ছিল। জানি না এখনকার ছেলেরা সেই গলায় ফাঁস দিয়ে মানুষ-মারা দলের নামের সঙ্গে পরিচিত কি না। কেন জানি নে, সেনাবিভাগের একাধিক ইংরেজ কর্তা আমাদের দেশের সংগীত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করে গেছেন। বোধ হয় শান্তির সময় তাঁদের জীবনের নিত্যকর্মের অভাববশত নিজ নিজ প্রবণতা অনুসারে যে দেশে বাস করছেন তার সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার চর্চা করবার সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি

এই ভবনে ও এই পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ছোট গল্প ও কবিতা, ছিন্নপত্র ও পঞ্চভূতের অনেক অংশ রচিত হইয়াছিল। পূর্ব-পাকিস্তান সরকার এই ভবন জাতীয় সম্পদ রূপে সুসংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে

শিলাইদহের প্রজাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ
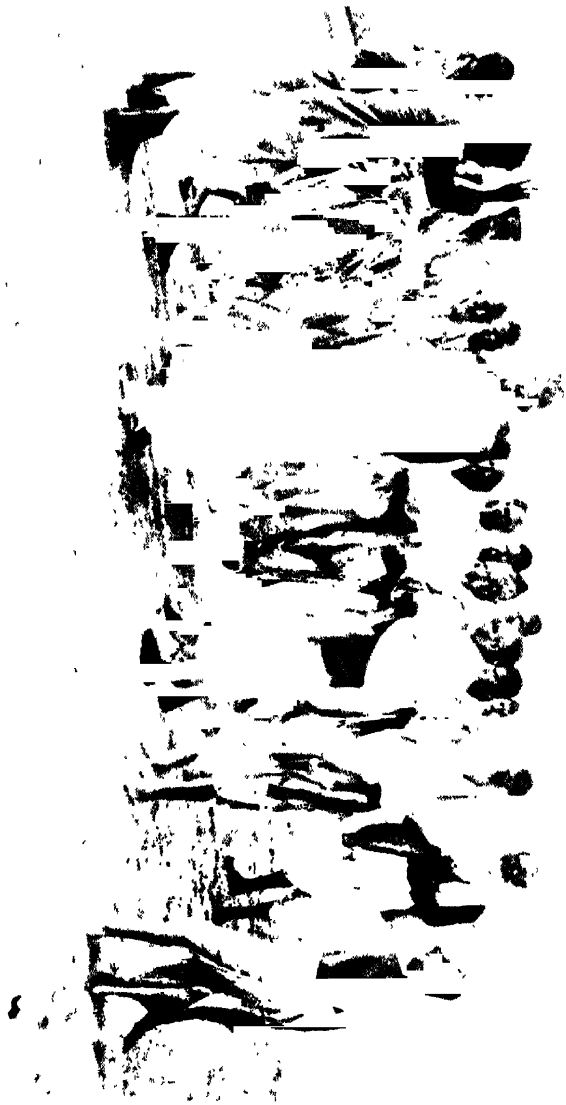
যদিও সিমলা পাহাড়ের উল্লিখিত পর্বের সঙ্গে রবিকাকার বিশেষ যোগ ছিল না তবু বাপ-মায়ের অপরিমিত স্নেহযত্ন স্মরণার্থে এইটুকু লিখলুম।

সিমলা থেকে নেমে এলে সেই যে বছর আষ্টেক বয়সের পর কলকাতার স্কুলে ভর্তি হলুম তখন থেকে প্রায় তাঁর জীবনান্ত পর্যন্ত রবিকাকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আমাদের সাহিত্যজীবনকে গড়ে তুলেছিল, এ কথা অবশ্যস্বীকার্য। সে ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত আমরা যা কিছু করেছি, হয়েছি, এমনকি ভেবেছি পর্যন্ত তা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আচ্ছন্ন। ছেলেবেলায় বিলেত যাওয়া আর ইংরেজি স্কুলে পড়ার দরুন, সত্যিকথা বলতে গেলে, আমার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান অতি কাঁচাই থেকে যেত যদি না তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার সংস্পর্শ পেতুম।

সবুজপত্রের যুগ আমার বিয়ের পরবর্তীকালের হলেও রবিকাকার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। সবুজপত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সম্পাদক তাঁর 'আত্মকথা'য় বলেছেন,

> আমি আর মণিলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহে পদ্মানদীর উপর তাঁর বোটে একবার কিছুদিন থাকতে যাই। এই বোটেই মণিলালের কাছে শুনি যে রবীন্দ্রনাথ বলেন আর লিখবেন না। তিনি ঢের লিখেছেন।· ·তিনি বলেন যে, প্রমথ যদি একটা কাগজ বের করে তাহলে আমি তাতে লিখতে রাজি আছি। আমি বল্লুম— আপনি যদি লেখেন তো আমিও কাগজ বার করতে রাজি আছি। তিনি বল্লেন— অন্য কোন কাগজে আমি লিখব না।
>
> মণিলালের একটি কাগজ ছিল। কথা ঠিক হয় যে সেই কাগজই সবুজপত্র নামে ছাপান হবে। এই নতুন নাম আমিই দিয়েছিলুম। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে ১৩২১ সালের বৈশাখে সবুজপত্র প্রথম বেরয়।

সবুজ সভার সভ্যগণ হপ্তায় একদিন করে আমাদের কাছে বিকেলে আসতেন। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর কখনো সাহিত্যালোচনা কখনো সংগীতচর্চা হত। শুনতে পাই যে, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এস্রাজ বাজাতেন, কিন্তু আমি তাঁর এস্রাজ কখনও শুনিনি। মন্টু যখন আসত, সে গান করত। বাড়ির মেয়েরাও কখনো কখনো করত। আমরা বাড়ির মেয়েরা বলা বাহুল্য সাধারণত রবিকাকার গানই করতুম। রমার মুখে 'এই যে কালো মাটির বাসা', আর 'আমার একটি কথা বাঁশি জানে', অপুর মুখে 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' আর 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে' গানগুলি শুনতে লোকের খুবই ভালো লাগত। নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ এই রকম এক আসরে 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে' গানটি শুনে বলেছিলেন, 'রবিবাবু গীতাঞ্জলির জন্য একবার নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, এই গানটির জন্য তাঁকে আর-একবার প্রাইজ দেওয়া উচিত।' রবিকাকা যখন কলকাতায় আসতেন, তখন মাঝে মাঝে এই আসরে উপস্থিত থাকতেন। সবুজপত্র-সম্পাদক আরো বলেছেন—

> রবীন্দ্রনাথ বোটে আমাদের যে কথা দিয়েছিলেন সে কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাঁর লেখা অঙ্গীকার না করে সবুজপত্রের কোনো সংখ্যাই বেরয় নি। এবং তাঁর এই সাহচর্য না পেলে যে আমি ছয় মাসও সবুজপত্র চালাতে পারতুম না, সে কথা বলাই বাহুল্য। মণিলাল রবীন্দ্রনাথকে বলেন যে, "আপনার সবুজপত্রের লেখার সঙ্গে অন্য লেখার এত তফাৎ যে অন্য কোনো কাগজে আপনার লেখা দিলে তার তেমন সমাদর হবে না।" রবীন্দ্রনাথ এ কথা সমর্থন করেন।

আমার কেবল মনে হয় যে রবিকাকার মতো লেখকের দুর্লভ সাহায্য পেয়ে তবু যে উনি আরো কিছু দিন কাগজটা চালাতে পারলেন না, সে অনেকটা বৈষয়িক সুপরিচালনার অভাবে। যে কারণেই হোক অত শীঘ্র বন্ধ হয়ে যাওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয়। তবে এই মাত্র সান্ত্বনা যে যতদিন চলেছিল, সুনাম রেখে গেছে, যার সৌরভ ও গৌরব একাল পর্যন্ত চলে এসেছে। আমার দিক থেকে বলবার আছে যে আমার যেটুকু রচনাশৈলীর শিক্ষা হয়েছে সে ঐ সবুজ পত্রেরই দৌলতে। ১৯০২ সালের রানী ভিক্টোরিয়ার

মৃত্যুঘটিত কাঠখোট্টা রচনার পর এই দশ-বারো বছরে সঙ্গগুণে বা যে কারণেই হোক, আমার লেখার যে উন্নতি হয়েছিল তার ফলে আমার সবুজপত্রে লেখা প্রবন্ধসংগ্রহ সবেধন নীলমণি 'নারীর উক্তি' বইখানি তখনকার কালে অনেকের ভালো লেগেছিল।

আমার সাহিত্যস্মৃতি সম্পূর্ণ করতে হলে রবিকাকার রচনার ইংরেজি অনুবাদের উল্লেখও করতে হয়। তাঁর গুটিকতক কবিতা ও গান আমি তর্জমা করেছি, যা পড়ে তিনি খুশি হয়েছিলেন। মনে আছে, সংক্ষেপ করার জন্য জনগণমনের দুটি স্তবক বাদ দেওয়ায় তিনি আপত্তি করেছিলেন। গদ্যের মধ্যে জাপানযাত্রী আর কয়েকটি গল্প আমি অনুবাদ করেছি। সুরেনও এবিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এমনকি আত্মীয়স্বজনের অসন্তোষসত্ত্বেও তিনি এবিষয়ে তাঁর কর্তব্যসম্পাদনে ত্রুটি করেন নি।

কাব্যের সঙ্গে শিল্প স্বভাবতই জড়িত। কিন্তু রবিকাকা অনেক বয়সে শিল্পলক্ষ্মীর আরাধনা শুরু করেছেন, কাজেই আমার সেবিষয়ে ছেলেবেলাকার বিশেষ কোনো স্মৃতি নেই। তবে তাঁর যে আঁকবার হাত আছে তার পরিচয় আমরা ছেলেবেলা থেকেই পেয়েছি। জ্যোতিকাকামশায়ের মতো পেনসিলে প্রতিকৃতি আঁকায় পারদর্শী না হলেও আর অত খ্যাতি অর্জন না করলেও তিনি পেনসিলে কারো কারো ছবি এঁকেছেন বলে মনে পড়ে। ১৮৯২ সালে আমরা কিছু দীর্ঘ দিন ধরে সিমলে পাহাড়ে থাকি। সেই সময় কলকাতার ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলির বাড়ির সঙ্গে সিমলের উডফিল্ড বাড়ির যে হেঁয়ালিচিত্র-বিনিময় চলত তার নমুনা এখনো রবীন্দ্রসদনে আছে। তাতে জোড়াসাঁকোর পক্ষে ছিলেন রবিকাকা, গগনদাদা, অবনদাদা প্রভৃতি মহারথীরা। আর পাহাড়ীপক্ষে ছিলেন জ্যোতিকাকা আর সুরেনদাদা। সেই অল্পবয়স থেকেই তাঁদের অতি সাধারণ জিনিস আঁকবারও কী সুন্দর কায়দা ছিল। রবিকাকার হাতেরও কতগুলি হেঁয়ালিচিত্র এতে আছে। হেঁয়ালিরচনাতেও তাঁর স্বাভাবিক মৌলিকতা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি এইসব পেনসিলে আঁকা ছবিতেও তাঁর ভবিষ্যৎ চিত্রকলাসাধনার সংকেত ধরা পড়ে।

আমি আগে বোধ হয় বলেছি যে জোড়াসাঁকোর ৫ নম্বর আর ৬ নম্বরের দুই বাড়ি সরস্বতীর চিত্রকলা আর সংগীতকলার দুইদিক ভাগ করে নিয়েছিলেন। ৬নং বাড়িতে যেমন প্রতি ছেলেমেয়ে হারমোনিয়ম বাজিয়ে একটা গান গাইতে পারতেন না তা নয়, তেমনি ৫নং-এও প্রত্যেকেই ছোটবেলা থেকে রেখার আঁচড় আর রঙের পোঁচ দিতে পারতেন। তবে সেই সীমারেখা এমন দুর্লঙ্ঘ্য ছিল না যে এপাশ থেকে ওপাশে একেবারে যাওয়া চলত না। যেমন সত্যদাদাও কিছু কিছু ছবি আঁকতেন আর অবনদাদাও কিছু কিছু গানবাজনা করতেন। রবিকাকা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে ; তাঁর চিত্রকলার সাধনা অবশ্য কিছু দেরিতে প্রকাশ পেয়েছে।

উষাদিদি। দ্বিজেন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে
রমা। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা
মন্টু। শ্রীদিলীপকুমার রায়
নগেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সুপ্রভাদিদি। শরৎকুমারীর মেজো মেয়ে
অপু। ডাক্তার সুহৃৎ চৌধুরীর মেজো মেয়ে
সত্যদাদা। মহর্ষির দৌহিত্র সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
বড়ঠাকুর। আশুতোষ চৌধুরী

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১

শ্রীবিনয় ঘোষ

সামাজিক ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর তাঁর মানবমুখীন জীবনাদর্শের সবচেয়ে কঠোর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে অন্তত তাঁর বিশ্বাস ছিল না যে পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য হবেন। তাই হয়েছে, তাঁর আদর্শের সামাজিক পরীক্ষা অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। সমাজের মুখের দিকে চেয়ে এই ব্যর্থতার জন্য আমরা বেদনাবোধ করতে পারি, কিন্তু তবু বাস্তব সত্যের দিক থেকে এই আংশিক ব্যর্থতাকে অন্তত অস্বীকার করতে পারি না। ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ তাঁর নিজের যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, বা তাঁর সহকর্মীদের যে সম্মিলিত শক্তির আঘাতে যে-সব সামাজিক ইন্‌স্টিটিউশন তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন, সেই সব ইন্‌স্টিটিউশন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়মূল ও শক্তিশালী। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন গ্র্যানিট পাহাড়ের কোলে, ফুলে-ফেঁপে গর্জন করে, আছড়ে পড়ে ফিরে যায়, রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাংলার সংস্কার-আন্দোলনের তরঙ্গও তেমনি সমাজমানসের প্রস্তরমূলে প্রতিহত হয়ে কতকটা ভেঙে গেছে। কিন্তু একেবারে ভেঙে যায় নি।

ব্যক্তিগত জীবনের সামান্য সব অভ্যাসকর্ম মানুষ সারাজীবনের চেষ্টাতেও অনেক সময় বদলাতে পারে না। তার স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে সেগুলি জট পাকিয়ে যায়। ব্যক্তিগত জীবনের অভ্যাস বদলানোই যদি এত কঠিন হয়, তাহলে সামাজিক অভ্যাসকর্মের সংস্কার বা পরিবর্তন যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সমাজবিজ্ঞানীরা এই অভ্যাসকর্মগুলিকে "social mores" বলেছেন। বাংলায় সামাজিক 'নোঙর' বলা যায় এই অর্থে যে, সাধারণ মানুষের জীবনতরী এই নোঙরে বাঁধা থাকে, তার শৃঙ্খলের সীমানার মধ্যে বদ্ধস্রোতেই তাকে ভেসে থাকতে হয়। নোঙর ছিঁড়ে দূরে ভেসে যাবার বা এগিয়ে যাবার তার উপায় নেই। কারণ এরকম একটি নোঙরে নয়, অনেক নোঙরে মানুষের সমাজ-জীবন বাঁধা থাকে। একটি যদি কোনো কারণে ছিঁড়েও যায়, তাহলে হঠাৎ খানিকটা ভেসে যাওয়া তার জন্য সম্ভব হলেও, বাকি নোঙরের টানে আবার তাকে পূর্বের গণ্ডির মধ্যে ফিরে আসতে হয়। ব্যক্তির জীবনে এরকম এগিয়ে-যাওয়া ও ফিরে-আসা, অহরহ আমরা দেখতে পাই। যৌবনের ঘোর নিরীশ্বরবাদী, প্রৌঢ়ত্বে নির্বিবাদে 'তেত্রিশ কোটি' দেবতার সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়েন। কারণ— ঐ নোঙরের টান। বাড়ন্ত জীবনের খরস্রোতে দু-একটি নোঙর ছিঁড়ে যায় যখন, তখন মনে হয় সেই ছিন্ন নোঙরের মুক্ত সীমানা বুঝি আদিগন্ত। তারপর পড়ন্ত জীবনে বাকি নোঙরের টান পড়ে যখন, তখন জীবনতরী আবার তার বাঁধা ঘাটের গণ্ডির মধ্যে ফিরে আসে। সমাজের জীবনেও তাই ঘটে। সমাজের বুকে নানাবিধ শক্তির আঘাতে ও আকর্ষণে যখন খরস্রোত বইতে আরম্ভ করে, তখন সেই নূতন শক্তির প্রতিভূ যাঁরা, তাঁরা দৃঢ়মূল সব সামাজিক প্রথার নোঙর ধরে টান দেন, চেষ্টা করেন সেগুলি ছিন্ন করে সমাজ-জীবনকে স্রোতের মুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে। দুচারটি নোঙর ছিন্নও তাঁরা করেন, খানিকটা এগিয়েও যায় সমাজ। কিন্তু সেই অগ্রগতি খানিকটা বা কিছু দূর পর্যন্ত সম্ভব হয়। তার তরঙ্গ ও খরস্রোতও সমাজের একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীসীমানা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, বিস্তৃত জনসমাজের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তা পৌঁছয় না। যে

সামাজিক শ্রেণী এই স্রোতের বা গতিবেগের সঞ্চার করেন, প্রধানতঃ সেই শ্রেণীর সীমানার মধ্যেই সামাজিক অগ্রগতি সীমাবদ্ধ থাকে। তার বাইরে বৃহত্তর সমাজের জীবন পুরণো নোঙরেই বাঁধা থাকে বলে, ঘুরে-ফিরে সমগ্র সমাজে তার পশ্চাৎ-টান অনুভব করা যায়। সমাজের বিকাশের কাল থেকে এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক অগ্রগতি এই ধারাতেই সম্ভব হয়েছে। এই অর্থে সামাজিক প্রগতি কোনো কালে বা কোনো দেশে সর্বাঙ্গীণ বা 'total' নয়, সর্বত্রই partial বা আংশিক। প্রগতি একটা বিশেষ সামাজিক স্তরের বা শ্রেণীর প্রগতি, সমগ্র সমাজের নয়। সমগ্র সমাজে তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া অবশ্য হয়, সাধারণত রাষ্ট্রিক নিয়মকানুনের জন্য। যেমন আধুনিক সমাজে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রও ঐ সামাজিক স্তরের বা শ্রেণীর আয়ত্তে থাকে। তার বিধিবিধান সাধারণের পালনীয়, কিন্তু সমাজের অদৃশ্য ও অলিখিত প্রথানুগত বিধান তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। সেখানে সমাজের ও মানুষের মন বাঁধা থাকে। আইনের জোরে মানুষের মন বদলানো যায় না। রাষ্ট্রের কাছে যা আইনসম্মত, সমাজের কাছে তা দীর্ঘকাল 'বেআইনী' বলে গণ্য হতে পারে। যেমন, বিধবা-বিবাহ রাষ্ট্রীয় আইনের চোখে সংগত, কিন্তু সামাজিক 'আইনে' আজও সংগত নয়। এই সামাজিক আইনই 'নোঙর' বা প্রথা, 'more' বা 'custom' এবং প্রথার পরমায়ু, রাষ্ট্রীয় আইনের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ। সুতরাং সামাজিক প্রগতি, পরিবর্তন বা সংস্কার-সাধনের সার্থকতা সব সময় বিশেষ স্তরগত ও শ্রেণীগত, এবং আংশিক। এইদিক দিয়ে তার ব্যর্থতা। কিন্তু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আর-একদিক দিয়ে তার ঐতিহাসিক সার্থকতাও আছে। সামাজিক প্রথা ও বিধিব্যবস্থার অচলায়তনে এই শ্রেণীগত নির্দিষ্ট শক্তি নিয়ে মধ্যে মধ্যে যদি আঘাত না করা যেত তাহলে সমাজ-জীবনের সচলতা থাকত না। বদ্ধ অচলতায় সমাজের অপমৃত্যু ঘটত। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সামাজিক সংস্কারকর্মের ব্যর্থতা ও সার্থকতা, দুইই এই দিক দিয়ে বিচার্য। ব্যর্থতার প্রমাণ প্রচুর আছে, সমাজের ভিতরে-বাইরে আজও তার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু তার সার্থকতার যুক্তি কোথায়, এবং কি কারণেই বা তা ঐতিহাসিক ?

বিদ্যাসাগরের সামাজিক আদর্শের ব্যর্থতার একটা বড় প্রমাণ হল তাঁর জীবনচরিতগুলি। তাঁর সহোদর শম্ভুচন্দ্রও তাঁর সামাজিক আদর্শের মর্ম উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। বিহারীলাল সরকার ও সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর সামাজিক সংস্কারকর্মকে কতকটা 'অপকর্ম' বলে মনে করেছেন বললেও ভুল হয় না। অথচ বিদ্যাসাগরের প্রতি বিহারীলালের ভক্তি অসীম। সেই ভক্তির প্রেরণাতেই তিনি বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত লিখতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর মনের মতন বিদ্যাসাগরের চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে। সে-বিদ্যাসাগর দয়ালু, মহানুভব ও সুপণ্ডিত। শাস্ত্রবিরোধী সংস্কারের চেষ্টা তিনি এই মহানুভবতার জন্যই করেছিলেন। কাজটা অন্যায়, কিন্তু 'সজ্ঞানে' অন্যায় মনে করে তিনি করেন নি। বিদ্যাসাগরের মতন অকপট-চরিত্রের মানুষ তা করতে পারেন না। এই হল বিহারীলালের বিদ্যাসাগর। সুবলচন্দ্র এরই প্রতিধ্বনি করেছেন তাঁর ইংরেজি জীবনীতে। চণ্ডীচরণ অবশ্য বিদ্যাসাগরের সামাজিক আদর্শ সমর্থন করেছেন, কিন্তু তার সপক্ষে যেসব যুক্তি দিয়েছেন তা ভাবাবেগসর্বস্ব। বালবৈধব্যের এত কষ্ট, বহুবিবাহের এত কুফল, অতএব বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে নীরব থাকতে পারেন নি। অর্থাৎ 'মহানুভবতাই' তাঁর সংস্কারকর্মের মূল উৎস, এই হল তাঁর চরিতকারদের বক্তব্য।

এঁদের এই বক্তব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাসাগর-চরিতের' একটি কথা মনে হয়— "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব"। ১৩২৯ সনের বিদ্যাসাগর স্মরণসভায় আরও পরিষ্কার ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন[১]: "আমাদের দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে থাকতে পারেন নি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন। এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় যে তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন, বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড় যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে। বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এই জন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক। যারা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথিস্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যটিই সবচেয়ে বড় হয়ে লেগেছে।"

রবীন্দ্রনাথের মনে যে সত্যটি সবচেয়ে বড় হয়ে লেগেছে, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সেইটাই আসল সত্য। রবীন্দ্রনাথের মতন এই সত্যের দ্রষ্টা তিনিই হতে পারেন, যাঁর মন বিদ্যাসাগরের মতন কুসংস্কারের মালিন্য-মুক্ত। এই সত্যটাকে কেবল তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা আজ পর্যন্ত ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। যে মহত্ত্বগুণে বিদ্যাসাগর দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সে-গুণ বিশ্লেষণ করে বোঝবার বা বোঝাবার চেষ্টা করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে 'বহমান কালগঙ্গার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল' বলে তাঁকে 'আধুনিক' বলা যায়, সেই কালগঙ্গার ধারা বিচার করা প্রয়োজন। তার আগে, যে-গঙ্গা মরে গেছে এবং বহমান গঙ্গা যার থেকে সরে এসেছে, সেই মরা-গঙ্গার কথাও জানা দরকার। তা না জানলে, বিদ্যাসাগরের সামাজিক আদর্শের বা সংস্কারকর্মের সার্থকতা বোঝা সম্ভব নয়, তার ব্যর্থতার কথাই কেবল মনে হওয়া সম্ভব।

যে-সমাজের আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর আপসহীন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, সেই সমাজের চেহারা কি ছিল? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে-গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে। মরা-হাজা নদীর খাত দেখলেই তা বোঝা যায়। মধ্যে মধ্যে তার বদ্ধ জলের ডোবা বিষাক্ত বীজাণু ছড়িয়ে পরিবেশকে কলুষিত করে তোলে। বাংলাদেশের সমাজের অবস্থা ঠিক এই মরা নদীর খাতের মতন হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের জন্মের অনেক আগে থেকেই হতে আরম্ভ হয়েছিল। সেকালের গ্রাম্য-সমাজের গড়নটাই ছিল চলৎশক্তিহীন। নড়াচড়ার সুযোগ ছিল না তার মধ্যে। সব ব্যবস্থাই তার অচল অটল, কোনোটাই সচল বা গতিশীল নয়। স্তরিত পিরামিডের মতন সামাজিক শ্রেণীর গড়ন, উপর থেকে তলা পর্যন্ত থাকে-থাকে সাজানো, কোনো থাক বা স্তরের পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই, কারণ

১ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৯

স্বোপার্জিত বিত্ত বা বিদ্যার সঙ্গে স্তরোন্নতির সম্পর্ক নেই, পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি জমিদারী ও বংশমর্যাদার ভিত্তির উপর তা সুপ্রতিষ্ঠিত। বাণিজ্য, পেশা, আচার, ধর্মকর্ম সব কুলগত ঐতিহ্যাধীন, ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীন নয়। গ্রাম্যসমাজের এই অচলতা ও স্থিরতার সঙ্গে আধুনিক নাগরিক সমাজের গতিশীলতার তুলনা করে তাই বিখ্যাত সমাজবিদ্ সরোকিন্ বলেছেন[২] :

যে গ্রাম্যসমাজের 'typical trait'-ই হল স্থিতিশীলতা, তার স্বয়ংক্রিয় চলৎশক্তি যদি মন্থর হয়ে আসে ঐতিহাসিক কারণে, তাহলে তার যান্ত্রিক স্পন্দনটুকুও ক্রমে স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন বদ্ধ ডোবার সঙ্গে ছাড়া আর কিছুর সঙ্গে তার তুলনা করা যায় না।

হিন্দুযুগের শেষ পর্ব থেকে বাংলার গ্রাম্যসমাজে এই মন্থরতার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেনরাজাদের সামাজিক বিধিবিধান প্রণয়ন থেকে তা বোঝা যায়। কৌলীন্যপ্রথা তার মধ্যে অন্যতম। নূতন করে বিধির বন্ধন তখনই প্রয়োজন হয়, যখন সমাজের নিজস্ব বদ্ধতা ভাঙতে থাকে। সেনরাজাদের বা কল্পিত আদিশূরের আমলের অনেক আগে থেকেই ব্রাহ্মণরা বাংলাদেশে বাস করছিলেন, তাঁদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল সমাজে, কিন্তু কনৌজ বা অন্য কোনো স্থান থেকে খাঁটি ব্রাহ্মণ এনে তাঁদের বেদবিদ্যা বা আচার শিক্ষা দিতে হয় নি। অথবা কৌলীন্যের খুঁটি তৈরি করতে হয়নি তাঁদের মর্যাদা রক্ষার জন্য। ব্যাপারটা ভাববার মতন। বাংলার বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ এনে হঠাৎ এদেশের আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদের সদাচার শিক্ষা দেবার প্রয়োজন হল কেন? এদেশের ব্রাহ্মণরা আচারভ্রষ্ট হলেনই বা কেন? এই সব প্রশ্নের জন্য মনে হয়, এ দেশে ব্রাহ্মণ আমদানির নানারকমের কাহিনী ও কিংবদন্তীর মধ্যে একটা বড় সামাজিক সত্য লুকিয়ে আছে। সেই সত্যের আনুমানিক আভাস দেওয়া যায় এইভাবে: সামাজিক সম্পদ সৃষ্টির দিক থেকে ব্রাহ্মণদের নিষ্ক্রিয়তা-জনিত অবনতি ও দুর্গতি হিন্দুযুগের শেষ দিকে চরমে পৌঁছেছিল। অধ্যাপনা, শাস্ত্র-বিদ্যাচর্চা, রাজমন্ত্রণা, গুরুতা প্রভৃতি কুলগত বৃত্তি ছেড়ে, ক্রমেই দারিদ্র্যের চাপে, তাঁরা পৌরোহিত্যের দিকে ঝুঁকছিলেন এবং সেখানেও কোনো বাছবিচার রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছিল না। অর্থাৎ কেবল ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর নয়, লৌকিক দেবদেবীর পূজার পুরোহিতও তাঁরা হচ্ছিলেন। এ-ছাড়া. ভিন্ন কুলের বা জাতির বৃত্তিও, জীবিকার জন্য, তাঁদের গ্রহণ করতে হচ্ছিল। এই কুলবৃত্তিচ্যুত ভাঙনোন্মুখ ব্রাহ্মণসমাজকে স্বশ্রেণীমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল কৌলীন্যপ্রথা উদ্ভাবনের। কিন্তু নূতন প্রথার জোরে ভিতরের ভাঙন রোধ করা যায় না। তার প্রমাণ, ক্রমাগত কুলভঙ্গ ও ভঙ্গকুলীনের সমস্যার মধ্যে পাওয়া যায়, বারংবার 'সমীকরণেও' বা 'periodical classification'এও যে-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হচ্ছিল না। ভাঙন তাই ক্রমেই ব্যাপক হতে লাগল এবং কৌলীন্যেরও চরম বিকৃতি ঘটল। স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভিচারে পরিণত হল কৌলীন্যের অধিকার। মুসলমান অভিযানের বিশৃঙ্খলার মধ্যে এই ভাঙনের পথ আরও পিচ্ছিল হল, প্রধানতঃ দুটি কারণে। একদিকে ইসলামধর্মের 'চ্যালেঞ্জ' আর-একদিকে নূতন রাজাদের পোষকতার আকর্ষণ। আর্থিক কারণেই ব্রাহ্মণরা মুসলমান-দরবারে নানা রাজকার্যে যোগ দিতে লাগলেন, কুলবৃত্তি উচ্ছন্নে যেতে লাগল। তার উপর ধর্মীয় ও সামাজিক সংকটও নানাভাবে প্রকট হয়ে উঠল।

---

২ Sorokin and Zimmerman: *Principles of Rural-Urban Sociology* (N.Y. 1929): p. 44.

"The rural community is similar to calm water in a pail, and the urban community to boiling water in a kettle...Stability is the typical trait of one; mobility is typical for the other."

বাংলার সমাজের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য সমাজের এই ভাঙনের ছবি বৈষ্ণবসাহিত্যে, চৈতন্যচরিত-সাহিত্যে, মঙ্গলকাব্যে, সর্বত্র পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাবের ও সম্প্রীতির সম্পর্ক অবশ্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। কিন্তু—

গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা,
দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা।
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা,
সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।—

শ্রীচৈতন্যের প্রতি কাজীর এই উক্তি যতই প্রীতিগন্ধী হোক, ব্রাহ্মণ 'নানা' ও ব্রাহ্মণ 'চাচা'-দের কুলমর্যাদা বাঁচানো সত্যিই তখন দায় হয়ে উঠেছিল। জয়ানন্দের 'ভবিষ্যদ্বাণী' ক্রমেই সত্যে পরিণত হচ্ছিল—

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে,
মোজা পায়ে নড়ি হাথে কামান ধরিবে।

চৈতন্যের যুগেই ব্রাহ্মণসন্তান 'জগাই-মাধাই' হয়েছিল। কেবল দৃষ্টান্ত হিসেবে নয়, ব্রাহ্মণ্যের পরিণতির 'symbol' হিসেবেও জগাই-মাধাই দুই ভাই উল্লেখযোগ্য। সামাজিক ঘটনার এই আবর্তের মধ্যে কেবল কৌলীন্যপ্রথার জোরে কুলরক্ষা করা সম্ভব হচ্ছিল না।

কুলের ভাঙাগড়ার মধ্যে নূতন নূতন কুল উপ-কুল ও মেলের রজ্জুবন্ধনে ক্রমেই ব্রাহ্মণসমাজের শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে ব্রাহ্মণদের এই কুল-মেল-বৈচিত্র্যের চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায়—

কুলে শীলে নহে নিন্দ্য মুখটি চাটতি বন্দ্য
কাঞ্জিলাল ঘোষাল গাঙ্গুলী।
পুতিতুণ্ড বৈসে গুড় রাই গাঁই কেশরী হড়
ঘণ্টেশ্বরী বৈসে কুলাকুলী।
পারিহাই পীতিতুণ্ডী ঝিকরাড়ি মালখণ্ডী
ঘোষালী বড়াল কুলমাল।
চোটখণ্ডী পলসাঁই দীর্ঘাড়ী কুসুমগ্রাঁই
সাঁই সাঁই কুলভি পড়্যাল।—ইত্যাদি

কুলের অন্ত নেই, দোষেরও অন্ত নেই। 'এরিথমেটিক্যাল' গতিতে কুলবন্ধনের ফলে কতকটা যেন 'জিওমেট্রিক্যাল' গতিতে দোষবৃদ্ধি হতে থাকে। কলুদোষ, কোচদোষ, হলান্তক দোষ, হেড়া দোষ, রজক দোষ, বেড়ুয়া হাড়িদোষ, যবনদোষ, বিপর্যয় দোষ, বলাৎকার দোষ, ত্যাজ্যপুত্র দোষ, অন্যপূর্বা দোষ, কন্যাবহির্গমদোষ ইত্যাদি সামাজিক দোষের তালিকা যা কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়, তা থেকে সামাজিক ভাঙনের চিত্র চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘটকদের মধ্যে স্পষ্টবাদী ছিলেন বিখ্যাত হুলো পঞ্চানন। তিনি তার একটি বিখ্যাত কারিকায় এই কুলবন্ধনের কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। কারিকাটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

চোয়ে ছোঁড়া বড় দুষ্ট নিমে তার নাম।
রঘো ব্যাটা মোটা বুদ্ধি ঘটে করে থাম।
কানা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ।
মিথিলায় পক্ষ ধরে যে করিল মাত।

তিনজনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
স্থায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য হইল নিঃশেষ।
কাণার সিদ্ধান্তে স্থায় গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত।
শচী ছেলে নিমে ব্যাটা নষ্টমতি বড়।
মাতা পত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়।
এই কালে রাঢ়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধুম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধুম।
কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে।
সেই ছোঁড়া মনে ক'রে কুলে করে ভাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ।
দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় সার।
হাত ঘুরাইয়া বলে মুলো, আ-মরি এই কি তোমার কুল।
ছিল ঢেঁকি হল তুল আরও পরে হবে যে নির্মূল॥

তখনকার সামাজিক অবস্থার এক অপূর্ব চিত্র মুলো পঞ্চাননের এই কারিকায় ফুটে উঠেছে।

দেখতে দেখতে আবার সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মঘ-পর্তুগীজ দস্যুদের রীতিমত উপদ্রব আরম্ভ হল। কন্যাহরণও তারা করতে লাগল এবং বাংলার ব্রাহ্মণকন্যারাও রেহাই পেলেন না। কুলীন ব্রাহ্মণসমাজে এক নূতন সমস্যা দেখা দিল, তার নাম 'মঘদোষ'। বহু কুলপঞ্জীতে—'অমুকস্য কন্যা মঘেন নীতা', 'ফিরাঙ্গি অপবাদঃ', 'ফারাঙ্গিতে নীতা মঘসংপর্কঃ' ইত্যাদি উক্তির মধ্যে ঘটকরা অজ্ঞাতসারে তার প্রমাণ রেখে গেছেন। চারিদিকের এই দুর্যোগের মধ্যে ব্রাহ্মণসমাজের সংকট ক্রমে গভীরতর হওয়াই স্বাভাবিক, অর্থনৈতিক দুর্গতিও। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতে রামেশ্বর ভট্টাচার্য কুলীন ব্রাহ্মণের এই দুর্গতির চিত্র এঁকেছেন এইভাবে—

কুলীনের পো-কে অন্য কি বলিব আমি,
কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা করো তুমি।
আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেটভরি ভাত—

আর ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জয়ানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী—'ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে'— অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ভালোভাবে ফলতে আরম্ভ করেছিল। নবাব-সরকারের চাকরি করে 'মুখ' 'বন্দ্য' প্রভৃতিরা মজুমদার সরখেল শিকদার সরকার হাজরা খাঁন ইত্যাদি উপাধি ধারণ করছিলেন। অতএব, শাস্ত্রের বজ্র-আঁটুনি যে ক্রমেই ঐতিহাসিক অবস্থার আঘাতে শিথিল হয়ে যাচ্ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই শৈথিল্যজনিত ভ্রষ্টাচারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত 'কুলপঞ্জী' থেকেই উল্লেখ করছি। প্রধানতঃ কুলপঞ্জী থেকে উদ্ধৃত করার কারণ, সামাজিক ইতিহাসবিদ্‌রা বলেন যে পারিবারিক ইতিহাসই সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপকরণ এবং এই দিক দিয়ে বিচার করলে, বহু মিথ্যা অতিভাষণ কল্পনা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও, আমাদের কুলগ্রন্থের মধ্যে যাচাই করে গ্রহণ করতে পারলে, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিচিত্র

উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। কুলগ্রন্থের সামাজিক তথ্যের কথা বলি। "গন্ধর্ববিবাহের" রহস্য নিয়ে ঘটকরা মনোহর কারিকা রচনা করেছিলেন অনেক। যেমন—

মহাদেবের কন্যা সে ক্ষেমা তার নাম।
গন্ধর্ব বিভা করে বন্দ্য দেবীরাম।...
রামনাথ বলে শুন অরে ভাই ক্ষেমা।
বাহির হইলে এবার রক্ষা নাই আমা॥
কৃষ্ণপ্রসাদ পুত্র ধনঞ্জয় নাম।
'রাজা রামচন্দ্র' করে ক্ষেমা ভগ্নী দান॥
পাটলি সমাজের লোক করে কানাকানি।
এক মেয়ের দুই বিভা কোথায় না শুনি॥

রাজা রামচন্দ্র নবদ্বীপাধিপতি রুদ্র রায়ের পুত্র, তাঁর রাজত্বকাল ১৬৮৭-১৬৯০ সাল। এই সময় ঘটনাটি ঘটে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে॥

"বাল্যবিবাহের" বহু ভয়াবহ নিদর্শন কুলপঞ্জীতে আছে। ফুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন বিষ্ণুঠাকুরের পৌত্র সীতারামের বিবরণে পাওয়া যায়:

"সীতারামস্ত উচিত...বং রামানন্দ গ্রহণাৎ। অত্র প্রবন্ধেন ত্রয়োদশ দিবসীয়া কন্যা পণস্য মুদ্রা সহিত দদে, সীতারাম বলাৎকার ভয়েন স্বীকৃতং"।

অর্থাৎ সীতারাম বলাৎকারের ভয়ে বন্দ্যবংশীয় রামানন্দের তেরদিনের কন্যাকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হন। ঘটক তাই নিয়ে কারিকা রচনা করেন:

সমানে সমান কুল ধরাধরি তায়।
লোকে বলে সীতারাম তিনশ টাকা পায়॥
দিবসে আঁধার হল পথ বেয়াল চেয়ে।
সীতারাম বিহা করেন তের দিনের মেয়ে॥

এও প্রায় ১৭০০ সনের বা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের ঘটনা।

'অন্যপূর্বা' বিবাহেরও প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কুলপঞ্জীতে। একটির বর্ণনা দিচ্ছি। ফুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন নীলকণ্ঠ ঠাকুরের পুত্র রামেশ্বর ঠাকুরের বিবরণে পাওয়া যায়:

'রামেশ্বর ঠাকুরস্য লভ্য বং রামচন্দ্র...রামচন্দ্রস্য দৌহিত্রী নিমুনাম্নী কন্যা আর্তিপর্যায়েন শ্রীমন্তচট্টেন দস্যুতয়া গঙ্গাতীরসমীপাৎ অম্বিকাগ্রামাৎ বলাৎকারেন নীতা, রাঢ়দেশে নলাই পরগণায়াং বচ্চন্দ্রগ্রামে গুড়াপ সমীপে স্বীয়বাট্যাং স্থাপিতা। অতো বলাৎ রজনীকরী ভবানন্দমিশ্রীদোষাণাং সম্ভবঃ। পশ্চাৎ রামেশ্বর ঠাকুরো বর্ধমানং গত্বা রাজানং নিবেদ্য নানাচেষ্টয়া তাং কন্যামানীয় সাগরদিয়া পৌত্রপর্যায় রুদ্ররাম চক্রবর্তীসুত গোবিন্দরামায় দদৌ।'

এ দেবভাষার মাতৃভাষান্তর নিষ্প্রয়োজন। ধনরত্নের মতন রমণী লুণ্ঠনের বা হরণের কাহিনী শোনা যায়। কিন্তু সামজিক প্রতিষ্ঠার জন্য এরকম দস্যুবৃত্তির কাহিনী শোনা যায় না। এও প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের ঘটনা।

'বিমাতা-বিবাহের' কুখ্যাতি কুলীনসমাজে অনেক আগে থেকেই ছিল। বহু কুলপঞ্জীতে ও ঘটকের সরস কারিকায় তার বর্ণনা আছে। যেমন "হরি-বন্দ্যো বলে কন্যা দিল পার্বতী, হরিসুত রামদাস বিমাতার পতি' ইত্যাদি। বীভৎস আচারের আরও ভয়াবহ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'মৃতকন্যাবিবাহের' মধ্যে।

ফুলিয়া মেলের কুলীন রামচন্দ্রের বিবরণে আছে: "রামচন্দ্রস্যাদৌ পিতৃবরেণ বং কামদেবস্য মৃতকন্যাগ্রহণং ইত্যাশ্চর্য্যং"। ইত্যাশ্চর্য্যং-ই বটে! এও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের ঘটনা। স্বয়ং বিদ্যাসাগরও মনে হয় এমন আশ্চর্য তথ্যের সন্ধান পাননি। বিস্ময়কর হল, বিরলতা সত্ত্বেও, কুলপঞ্জীতেও 'বিধবাবিবাহের' উল্লেখ আছে। রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণবংশে এই ঘটনার উল্লেখ পেলে বিদ্যাসাগর শাস্ত্র-অনুসন্ধানকালে নিশ্চয়ই বিস্মিত ও উৎসাহিত হতেন। গয়ঘড় বন্দ্যবংশীয় ফুলিয়া মেলের কুলীন মথুরেশের একমাত্র পুত্র রাজারাম সম্বন্ধে লিখিত আছে: "রাজারামস্য বিধবাবিবাহঃ চং রামজীবন রায়স্য কন্যা।" এও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের ঘটনা॥[৩]

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সামাজিক জীবনের এরকম অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনার বর্ণনা দেওয়া যায় এবং তা থেকে বোঝা যায়, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাঙালী সমাজের কি শোচনীয় বিকৃতি ও অবনতি ঘটেছিল, জাতিগত ও কুলগত দৃঢ়বন্ধনের জন্য। সামাজিক কুলগ্রন্থে পারিবারিক কলঙ্কের কথা থাকা উচিত নয়। সুতরাং কুলগ্রন্থে, তা সত্ত্বেও যে সব কাহিনী ও ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সামাজিক জীবনে তা যে আরও কত ব্যাপকভাবে ঘটেছিল, তা অনুমান করা যায়। কুলাচার শেষকালে স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচারের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলার কুলীনসমাজে। তার সঙ্গে আর্থিক দুর্গতিও, স্বভাবতঃই, ক্রমে চরম সীমায় পৌঁছেছিল। আর্থিক সংকট যত গভীর হচ্ছিল, সামাজিক দুর্নীতি ও ব্যভিচারও তত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সমাজ-জীবনের নিয়মই তাই, এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রম ইতিহাসে কখনো হয়েছে বলে জানা নেই। আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনে তার পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত আমরা চারিদিকে দেখিতে পাই।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, বাংলাদেশের সাধারণ আর্থিক অবনতি ও গ্রাম্যসমাজের অতিদ্রুত ভাঙনের মধ্যে পরাশ্রিত ও উৎপাদনবৃত্তিহীন ব্রাহ্মণসমাজের দুর্গতির আর সীমা ছিল না। একমুঠো অন্নের জন্য তাঁরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন, অনেক সময় অনাহার ও অপমানের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সপরিবারে মৃত্যুবরণও করেছেন। খ্রীষ্টান মিশনারিদের জার্নালে, রোজনাম্চায় ও রিপোর্টে তার অনেক মর্মান্তিক কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই অবস্থায় কৌলীন্যের সামাজিক অধিকারকে তাঁরা ক্রমেই আর্থিক সংকট-সমাধানের কাজে লাগিয়েছেন। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যই সামাজিক প্রথাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছেন। 'বহুবিবাহের' কল্পনাতীত বিস্তার তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত॥

অনুলোমপ্রথা বা hypergamy-র জন্য কুলীনসমাজে বহুবিবাহ আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু প্রথমে দু-চারজন স্ত্রীর মধ্যেই তা সাধারণত সীমাবদ্ধ ছিল। পরে যত মেলবন্ধন হয়েছে, তত সংকুচিত মেলের গণ্ডীর জন্য একস্বামীর বিবাহিত স্ত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে। তার পর ধীরে ধীরে বিবাহটা কুলীন-ব্রাহ্মণের জাত-ব্যবসায়ে পরিণত হতে দেরি হয় নি, আথিক কারণে। তখন শতাধিক

৩ পরলোকগত পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছ থেকে 'কুলপঞ্জীর' এই সামাজিক উপকরণগুলি আমি সংগ্রহ করেছি। এছাড়াও আরও প্রচুর উপকরণ তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি যা সেকালের বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় অপরিহার্য ও অমূল্য সম্পদতুল্য বলা চলে। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে 'কুলগ্রন্থের' বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণে দীনেশচন্দ্র একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কেবল অপ্রকাশিত 'কুলগ্রন্থের' পাণ্ডুলিপি থেকে তিনি বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ আহরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর হঠাৎ-মৃত্যুর জন্য তা অসমাপ্ত থেকে গেল।—লেখক

বিবাহ পর্যন্ত হতেও বাধা রইল না। ১৮৭১ সালে 'বহুবিবাহ' বিষয়ে প্রথম প্রস্তাব রচনার সময় বিদ্যাসাগর একটি জেলা ও একটি গ্রাম সার্ভে করে যে তথ্যসংগ্রহ করেছিলেন, তাতে দেখা যায় যে তখনও হুগলী জেলাতে ৮০টি স্ত্রীর কুলীন স্বামী ছিলেন। হুগলী জেলার জনাই গ্রাম থেকেই কেবল তিনি ৬৪ জন কুলীন ব্রাহ্মণের নাম সংগ্রহ করেছিলেন, যাঁরা একাধিক স্ত্রীর স্বামী। তিনি লিখেছেন :

"পূর্ব্বে অধিক টাকা না পাইলে, কুলানেরা কুলভঙ্গে সম্মত ও প্রবৃত্ত হইতেন না। অধিক টাকা দিয়া, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দেন, এরূপ ব্যক্তিও অধিক ছিলেন না। এ কারণে স্বকৃতভঙ্গের সংখ্যা তখন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প ছিল। কিন্তু অধুনাতন কুলীনেরা, অল্প লাভে সন্তুষ্ট হইয়া, কুলভঙ্গ করিয়া থাকেন। আর, কুলভঙ্গ করিয়া, কন্যার বিবাহ দিবার লোকের সংখ্যাও এক্ষণে অধিক হইয়াছে।...মূল্যও অল্প, গ্রাহকের সংখ্যাও অধিক, এজন্য কুলভঙ্গ ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।"

বিদ্যাসাগরের নিজের রচনার মধ্যেই বহুবিবাহের অর্থনৈতিক কারণের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিদ্যাসাগরের সহায় হয়েছেন বা তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এরকম কুলীন ব্রাহ্মণ কয়েকজন তাঁদের জীবনবৃত্তান্তে এই মর্মান্তিক সত্যকে আরও করুণভাবে উদ্‌ঘাটিত করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে বিক্রমপুর-তারপাশার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁর জীবনবৃত্তান্তে তিনি লিখেছেন[৪] :

চেষ্টা করলে, এরকম স্বীকারোক্তি তখনকার আরও অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে 'রেকর্ড' করে রাখা যেত। যা আছে, তাও আমাদের প্রতিপাদ্য প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট।

বহুবিবাহের বিস্তারের corollary বা প্রতিফল হল বালবিধবার সংখ্যাবৃদ্ধি। কুলীনের স্ত্রী পিতৃগৃহবাসী, এমনিতেই সে অর্থনৈতিক বোঝা। তার উপর বৈধব্যের যন্ত্রণা তার জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলল। তখন সহমরণের শৌর্যবীর্যের আদর্শও বিকৃত হয়ে দায়মুক্তির অপকৌশলে পরিণত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে সহমরণের সংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কোনো শাস্ত্রীয় বা আদর্শগত যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না। আর ক্রমবর্ধমান বালবিধবাদের মাতৃত্ব-হীনতার জন্য ক্রমেই যে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণসমাজের, বিলুপ্তিও যে কিভাবে ঘনিয়ে আসছিল, তাও ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার নেই। বহুবিবাহ ও বাল্য-বৈধব্য দুইই বাঙালী হিন্দুসমাজের উপরের অংশের সংখ্যাগত অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছিল। বাঙালী হিন্দুসমাজের সংখ্যাল্পতার ঐতিহাসিক কারণ এই সময়কার সামাজিক কুপ্রথার প্রতিপত্তির মধ্যে কতটা নিহিত আছে, তাও ভাববার বিষয়।

উনিশ শতকে, সেকালের বাঙালী সমাজের সংকট ও অবনতির এই চিত্র মনে রাখলে, সমাজ-সংস্কারের

---

৪ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত : কলিকাতা, ১৮৮১ : ৪-৫ পৃষ্ঠা

"৺পিতাঠাকুর মহাশয়, আমাকে অতি শৈশবাবস্থায় রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তখন পিতৃব্য শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার অভিভাবক ছিলেন—দরিদ্রতাবশতঃ আমাকে অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি ৮টি বিবাহ করান। আমি বাল্যকাল হইতেই বহুবিবাহের প্রতি বিদ্বেষী ছিলাম, সুতরাং সম্বন্ধ নিয়া ঘটক আসিলেই নানাস্থানে পলাইয়া যাইতাম। বহুবিবাহে সম্মতি থাকিলে বোধ হয় আমাকে শতাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হইত। অভিভাবক মহাশয়, প্রতিকূলমতি দেখিয়া, প্রায় তিনশত টাকা ঋণভার অর্পণপূর্বক আমাকে পৃথগন্ন করিয়া দেন। তখন আমার বিদ্যাবুদ্ধি অথবা এরূপ কোন ক্ষমতা ছিল না যে ঐ ঋণ পরিশোধ বা পরিজন সকলের ভরণপোষণ করিতে পারি। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া আরও ছয়টি পরিণয় স্বীকার করিতে হইল, তাহাতে আমার ঋণ পরিশোধ ও পরিবারবর্গের কিঞ্চিৎকালের ভরণপোষণের সংস্থান হইলে, আমি সাধারণরূপে যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গালা লেখা শিক্ষা করিয়া পরগণে হুশেনসাহীর জমিদারদিগের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তহশীলদারি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম।"

ঐতিহাসিক আবশ্যকতা বোঝা সহজ হয়। বিদ্যাসাগর এই ঐতিহাসিক আবশ্যকতাবোধ থেকেই সংস্কারকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে তিনি ব্রাহ্মণ্য অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, কেবল সমাজের সর্বজনের কল্যাণের স্বার্থে নয়, ব্রাহ্মণের স্বার্থেও। শ্রেণীগতভাবে বাংলার ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পেয়ে যেত, কুলগত বৃত্তি ছেড়ে তাঁরা ক্রমে ভিক্ষাজীবী নিঃস্বশ্রেণীতে পরিণত হতেন, কৌলীন্য বা অনুরূপ কোনো প্রথার তৃণখণ্ড ধরে তাঁরা নিশ্চিত স্বখাতসলিল-সমাধি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন না, যদি ব্রাহ্মণ-পরিবার থেকেই রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতন মানুষ তাঁদের মুক্তির পথের সন্ধান না দিতেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সামাজিক আদর্শের এই হল ঐতিহাসিক তাৎপর্য। নবযুগের নূতন সামাজিক পরিবেশে এই সংকট-মুক্তির যেসব ঐতিহাসিক সুযোগ এসেছিল, তা তাঁরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন এবং কূপমণ্ডুক সমাজকে সেই সুযোগ ও পন্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান করেছিলেন॥ ধ্বংসোন্মুখ ব্রাহ্মণশ্রেণীর মুক্তির জন্য, সমগ্র বাঙালী সমাজ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন। এই আদর্শের সংগ্রাম বিদ্যাসাগরের জন্মের পূর্ব থেকেই অর্থাৎ ১৮২০ সালের আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। বাল্যজীবনে কৈশোরে ও যৌবনে বিদ্যাসাগর এই সংগ্রামমুখর পরিবেশে তাঁর মানসিক প্রস্তুতির অবকাশ পেয়েছিলেন। বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি কোনো সামাজিক সমস্যাই তাঁর নিজের উদ্ভাবিত নয় এবং কোনো সংস্কার-সংগ্রামের প্রেরণা তিনি নিজে হঠাৎ পেয়ে উৎসাহিত হন নি॥ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই তাঁর জীবনধারার মিলন হয়েছিল। এইজন্যই তিনি ছিলেন আধুনিক। যে নূতন ঐতিহাসিক খাতে, গতি-বদল করে, সমাজের জীবন-নদীর খরস্রোত বইতে আরম্ভ করেছিল, তার বিপুল প্রসারের সম্ভাবনা তিনিও তাঁর পূর্বগামীদের মতন উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদেরই নির্দেশিত পথে, ইতিহাসের গতিমুখে চলেছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর প্রগতিশীল। তাঁর সংস্কার-কর্মের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্যেরই স্বীকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। সেই সত্য যদি পরবর্তীকালে বিকৃত হয়ে থাকে, অথবা উজানমুখীরা সাময়িকভাবে জয়ী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে বলা যায় না। যে নূতন সামাজিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর মুখপাত্র এবং যে ঐতিহাসিক শক্তির প্রতিভূ ছিলেন বিদ্যাসাগর, পরবর্তীকালের বহু ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে ইতিহাসে সেই শ্রেণীর ও শক্তিরই আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছে ক্রমে। সমগ্র বাঙালী সমাজ সেই শক্তির টানে এবং সেই শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। এই অগ্রগতিতেই বিদ্যাসাগরের সংস্কার-সংগ্রামের সার্থকতা। তার অপূর্ণতার ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার জন্য তাকে 'ব্যর্থ' বলা যায় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত বিদ্যাসাগর-বক্তৃতাবলীর (১৩ - ১৭ শ্রাবণ ১৩৬৪) চতুর্থ বক্তৃতা

ধর্মরাজ অশোক ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

আধুনিক কালে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস আলোচনার অন্যতম প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অশোকতত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ ও অশোকচরিত্রের মহত্ত্ব স্বীকার। কিছুকাল যাবৎ অশোকতত্ত্ব আলোচনায় যেন নূতন উদ্যম দেখা দিয়েছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তথাপি এখনও এ বিষয়ে নানা দিক্ থেকে আরও আলোকপাতের অবকাশ রয়েছে বলে মনে করি। বর্তমান প্রবন্ধে এরকম একটি দিক্ থেকে কিছু আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

১

বুদ্ধদেবের মহিমা কীর্তন উপলক্ষে কবি বলেছেন,

> অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ।

বস্তুতঃ গন্ধার থেকে সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ অশোকের কীর্তিতেই ছেয়ে আছে; অশোক ও ভারতবর্ষ এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে আছে যে, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে বোঝবার উপায় নেই। সমগ্র জম্বুদ্বীপের উপর যাঁর এরকম কালজয়ী প্রভাব, ভারতীয় সাহিত্যে তাঁর ঐতিহ্যের ও উত্তরাধিকারের সন্ধান করতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। দেখা যায়, অশোকমহিমা কীর্তনে বৌদ্ধসাহিত্য যেমন অতিমুখরিত ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে তেমনি অতিনীরব; এক দিকে বৌদ্ধসমাজ অশোকের বৌদ্ধত্ব তথা তাঁর কীর্তিকে অতিরঞ্জিত করে জনচিত্তে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর, আর অপর দিকে ব্রাহ্মণ্যসমাজ যে-কোনো উপায়ে, প্রধানতঃ নীরবতার দ্বারা, সে প্রয়াসকে প্রতিহত করতে নিত্যসচেষ্ট।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দুই বিপরীত দিক্ থেকে অশোকচরিত্রের মহিমাকে খর্ব করেছে। একদিকে, সিংহল থেকে মঙ্গোলিয়া এবং তিব্বত থেকে শ্যামদেশ পর্যন্ত সমগ্র বৌদ্ধ জগতে অশোকের মহিমা অতিকৃত হয়ে বহু বিচিত্র ও অপ্রাকৃত কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে। পরবর্তী কালের ভারতীয় কিংবদন্তীতে ও আরব্য উপন্যাসে বিক্রমাদিত্য ও হারুন-অল রসিদের যে স্থান, বৌদ্ধ কিংবদন্তী ও সাহিত্যে ধর্মাশোকেরও সেরূপ অতিমহিমান্বিত স্থান। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ্য সমাজের বৌদ্ধবিদ্বেষ অশোকের মহিমাকে ভারতীয় স্মৃতি থেকে চিরকালের জন্য অবলুপ্ত করবার প্রয়াসে নিরন্তর প্রবৃত্ত ছিল।

এই প্রয়াস প্রকাশ পেয়েছে দুই ভাবে। এক দিকে সম্পূর্ণ নীরবতা ও অপর দিকে একজন প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো, এই দুই উপায়েই ব্রাহ্মণ্যসমাজ অশোকমহিমাকে নিরস্ত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। আর এক উপায় হচ্ছে কুৎসাপ্রচার। আধুনিক কালেও রাজনৈতিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পক্ষ বিপক্ষকে নিরস্ত করবার প্রয়াসে এই ত্রিবিধ উপায়ের আশ্রয় নেয়। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ধর্মনৈতিক মতবিরোধ আধুনিক কালের চেয়ে কম তীব্র ছিল না। তখনও এই ত্রিবিধ উপায়েরই আশ্রয় নেওয়া হত। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধদের সম্বন্ধে কুৎসা রচনার বহু নিদর্শন আছে ভারতীয় সাহিত্যে। তবে অশোক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কুৎসা রটনার দৃষ্টান্ত প্রায় নেই বললেই চলে। তাঁকে নিরস্ত করবার অন্যতম প্রধান অস্ত্র ছিল মৌনাবলম্বন।

এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি স্মরণীয়। অশোক সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অতি গভীর। তাঁর একটি অভিমত এই—

একজন রামচন্দ্র শত শত অগ্নিবর্ণের পরে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডাশোকত্ব অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান ; ধর্মাশোকত্ব অতি অল্পসংখ্যক।
—বর্তমান ভারত (উদ্‌বোধন, ১৮৯৯), পৃ ৩

এ হেন যে ধর্মাশোক, তাঁর সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য এত উদাসীন ও নীরব কেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাও দেখিয়েছেন অতি কঠোর ভাষায়।—

মানববলের কেন্দ্রীভূত রাজাও পুরোহিতবর্গের অনুগ্রহপ্রার্থী। তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টিই যথেষ্ট সাহায্য ; তাঁহাদের আশীর্বাদ সর্বশ্রেষ্ঠ কর ; কখন বিভীষিকাসংকুল আদেশ, কখন সহৃদয় মন্ত্রণা, কখনও কৌশলময় নীতিজালবিস্তার, রাজশক্তিকে অনেক সময়ই পুরোহিত-কুলের নির্দেশবর্তী করিয়াছে। সকলের উপরে ভয়— পিতৃপুরুষগণের নাম, নিজের যশোলিপি পুরোহিতের লেখনীর অধীন। মহাতেজস্বী, জীবদ্দশায় অতি কীর্তিমান্, প্রজাবর্গের পিতৃমাতৃস্থানীয় হউন না কেন, মহাসমুদ্রে শিশিরবিন্দুপাতের ন্যায় কালসমুদ্রে তাঁহার যশঃসূর্য চিরদিন অস্তমিত ; কেবল মহাসত্রানুষ্ঠায়ী, অশ্বমেধযাজী, বর্ষার বারিদের ন্যায় পুরোহিতগণের উপর অজস্রধনবর্ষণকারী রাজগণের নামই পুরোহিতপ্রসাদে জাজ্বল্যমান। দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী ধর্মাশোক ব্রাহ্মণ্যজগতে নামমাত্র শেষ। পরীক্ষিৎ জনমেজয় আবালবৃদ্ধবনিতার চিরপরিচিত।
—বর্তমান ভারত, পৃ ১-২

অশোকের 'যশোলিপি'ও 'পুরোহিতের লেখনীর অধীন' ছিল। কিন্তু তিনি পরীক্ষিৎ বা জনমেজয়ের ন্যায় মহাসত্রানুষ্ঠায়ী বা অশ্বমেধযাজী ছিলেন না। তা তো ছিলেনই না, বরং তিনি তাঁর প্রথম অনুশাসনের প্রথমেই ঘোষণা করলেন, আমার রাজ্যে পশুবধ করে যাগযজ্ঞ করা চলবে না। তাই তিনি 'ব্রাহ্মণ্যজগতে নামমাত্রশেষ' হয়েই রইলেন এবং তাঁর যশঃসূর্যও ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে কালসমুদ্রে অস্তমিত হয়ে গেল, যদিও বৌদ্ধজগতে তাঁর যশঃসূর্য চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে।

ব্রাহ্মণপুরোহিতরা যে একমাত্র নীরবতা ও উদাসীনতার দ্বারাই অশোকের মহিমাসূর্যকে অস্তমিত করেছিলেন তা নয়। তাঁরা তার চেয়ে প্রবলতর সক্রিয় উপায়ও উদ্‌ভাবন করেছিলেন। কোনো বিশেষ আদর্শ বা ব্যক্তিকে নিরস্ত বা পরাস্ত করবার সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ উপায় হচ্ছে একটি পালটা আদর্শ বা প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো। প্রথমে একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের উপসংহারে বলেছেন—

যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন, তিনি অন্ততঃ Rhys Davids শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে তাহাই বলিবেন—'the Wisest and Greatest of the Hindus'।
—কৃষ্ণচরিত্র। সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ। পৃ ৩১৭

এই উক্তির পরোক্ষ ফল কৃষ্ণের আদর্শের দ্বারা বুদ্ধের আদর্শকে নিরস্ত করা। শুধু আধুনিক কালে নয়, প্রাচীন কালেও ব্রাহ্মণ্যসমাজ কৃষ্ণকে খাড়া করেছিলেন বুদ্ধের প্রতিপক্ষ রূপে, আর ভাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ণব) ধর্মকে দাঁড় করিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের পালটা আদর্শ রূপে, এ কথা মনে করবার যথেষ্ট হেতু আছে।

অনুরূপভাবে ব্রাহ্মণ্যসমাজ রাজা অশোকের প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড় করিয়েছিলেন রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরকে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের গোড়াতেই (পৃ ৪) ভারতবর্ষের আদর্শ রাজাদের নাম করতে গিয়ে বলেছেন, 'হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর'। প্রাচীন কালে বৌদ্ধরা আঁকড়ে থাকল ধর্মাশোক নামটিকে, তাদের কাছে অশোকই আদর্শ রাজা ; আর ব্রাহ্মণ্যসমাজ উর্ধ্বে তুলে ধরল রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের আদর্শকে। তদবধি ভারতীয় ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে দুই বিভিন্ন খাতে।

২

অশোকের খ্যাতির প্রভাবকে প্রতিহত করবার কাজে ব্রাহ্মণ্যসমাজ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করল রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই মহাগ্রন্থকে।

রামায়ণের আদিরূপের রচনাকাল যখনই হোক-না কেন, তার বর্তমানরূপ যে অশোকের পরবর্তী তাতে সন্দেহ নেই। রামায়ণের উত্তরকাণ্ড যে উত্তরকালের রচনা এবং আদিকাণ্ডও যে তাই, এ বিষয়ে সব পণ্ডিতই একমত। তা ছাড়া অন্যান্য কাণ্ডেও পরবর্তী কালের হাত লেগেছে, তাতেও সন্দেহ নেই। আদিকাণ্ডের ন্যায় কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেও যবন ও শকদের উল্লেখ আছে; আর যবন ও শকরা যে অশোকের পরবর্তী কালে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে উত্তরভারতে উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল সে কথা তো সুবিদিত। যা হোক, উত্তরকাণ্ডেই রামচন্দ্র আদর্শ রাজা সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষকরূপে চিত্রিত হয়েছেন। আদর্শ রাজারূপে তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি শূদ্রতপস্বী শম্বুকের নিধন এবং অশ্বমেধ অনুষ্ঠান। তদুপরি রাম স্বীকৃত হলেন বিষ্ণুর অবতার বলে। অতএব ব্রাহ্মণ্যসমাজের পক্ষে বৌদ্ধ নৃপতি অশোককে আদর্শ রাজা বলে মানবার কোনো প্রয়োজনই রইল না। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রামায়ণে এক স্থানে বুদ্ধ তথাগতকে চোর বলে গালাগালি করা হয়েছে।—

> যথাহি চৌরঃ স তথাহি বুদ্ধ
> স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি। —অযোধ্যাকাণ্ড ১০৯।৩৪

এই উক্তিটি পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ, এ কথা স্বীকার্য। কিন্তু এটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রামায়ণে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে, কেউ এটিকে বাদ দিতে অগ্রসর হন নি। তার দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় প্রক্ষেপকর্তা, লিপিকর ও পাঠকসম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ্যসমাজভুক্ত এই ত্রিবিধ রামভক্তরা যুগ যুগ ধরে বুদ্ধদেবের প্রতি কি রকম মনোভাব পোষণ করে এসেছেন। তাঁরা যে ভারতবর্ষের মনোজগতে অশোকরাজ্যের পরিবর্তে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিলেন, তা অপ্রত্যাশিত নয়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডরচয়িতার পরে কালিদাস থেকে তুলসীদাস পর্যন্ত কত কবি যে রামরাজ্যের প্রশস্তি রচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধীও রামরাজ্যের আদর্শই দেশের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন; অশোকরাজ্যের আদর্শ তাঁর চিন্তা ও অনুভূতির সীমার মধ্যে প্রবেশের সুযোগ পায় নি। পক্ষান্তরে ইতিহাসসচেতন পণ্ডিত জওহরলালের চিত্তে রামরাজ্যের আদর্শ যে স্থান ছেড়ে দিয়েছে অশোকরাজ্যের আদর্শের কাছে, তার প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক।

৩

রামচন্দ্রের চেয়েও রাজা অশোকের প্রবলতর প্রতিপক্ষ ছিলেন যুধিষ্ঠির। আর রামায়ণের চেয়ে জনপ্রিয়তর ও পঞ্চমবেদস্থানীয় মহাভারত ছিল তাঁর সহায়। রামায়ণ কাব্য; কিন্তু মহাভারত একাধারে ইতিহাস ও ধর্মশাস্ত্র, অতএব অশোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে অধিকতর ফলপ্রসূ। কে না জানে কোনো ঐতিহাসিক সত্যকে আচ্ছন্ন ও প্রতিহত করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পালটা ইতিহাস রচনা করা। এই উপায়কে বিশেষভাবে আধুনিক বলে মনে করলে ভুল করা হবে। প্রাচীন ভারতেও যে এ উপায় অজানা ছিল না, তা মনে করবার কারণ আছে।

রামায়ণের মতো মহাভারতেরও আদিরূপ অশোকের পূর্ববর্তী হতে পারে। কিন্তু তার বর্তমানরূপ যে অশোকোত্তর কালের রচনা সে বিষয়ে পণ্ডিতসমাজে মতদ্বৈধ নেই। এ প্রসঙ্গে ইংরেজি প্রমাণের উল্লেখ করার আবশ্যকতা নেই। বাংলা আলোচনার উল্লেখ করাই যথেষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী এই দুই মনস্বী লেখক এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী 'মহাভারত ও গীতা' প্রবন্ধে (প্রবন্ধসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড) দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, সভাপর্ব থেকে স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত দশ পর্বই মূল মহাভারত— সর্বতোভাবে নয়, মোটামুটি ভাবে; বাদবাকি আট পর্ব (গোড়ার দিকে আদিপর্ব এবং শেষের দিকে শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ প্রভৃতি সাত পর্ব) উত্তরকালের যোজনা। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, নবম-একাদশ পরিচ্ছেদ) এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে মহাভারতে বিভিন্ন সময়ে রচিত তিনটি স্তর দেখা যায় এবং তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত এই—

> শান্তি ও অনুশাসনিক পর্বের অধিকাংশ, ভীষ্মপর্বের ভগবদ্গীতা[1]-পর্বাধ্যায়, বনপর্বের মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্বধ্যায়, উদ্যোগপর্বের প্রজাগর-পর্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর সঙ্কয়কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে আদিপর্বের শকুন্তলোপাখ্যানের পূর্বের যে অংশ এবং বনপর্বের তীর্থযাত্রা-পর্বাধ্যায় প্রভৃতি অপকৃষ্ট অংশও এই স্তরগত। —কৃষ্ণচরিত্র (সাহিত্যপরিষৎ সং), পৃ ৪৬

মহাভারতের অনেক অংশই যে অশোকোত্তর কালে রচিত তার কিছু প্রমাণ দিচ্ছি। মহাভারতে দুই জায়গায় অশোকের নাম পাওয়া যায়।—

> অশোকো নাম রাজাভূন্ মহাবীর্যোঽ পরাজিতঃ। —আদিপর্ব ৬৭।১৪

এই রাজা যে মৌর্যবংশীয় অশোক তার প্রমাণ অন্যত্র (ধর্মবিজয়ী অশোক, পৃ ৮৮) উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় উল্লেখ আছে শান্তিপর্বে (৪।৭) কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ংবরসভার বর্ণনা উপলক্ষে। ওই সভায় উপস্থিত রাজগণের মধ্যে অশোক ও শতধন্বার নাম আছে, 'অশোকঃ শতধন্বা চ ভোজো বীরশ্চ নামতঃ'। পুরাণে মৌর্যবংশীয় রাজগণের তালিকায় অশোকের উত্তরপুরুষগণের মধ্যে শতধন্বা নামটিও পাওয়া যায়। অতএব এই অশোক মৌর্যবংশীয় বলেই ধরে নেওয়া যায়।

বনপর্বের মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্বাধ্যায়ে কলিযুগের ম্লেচ্ছ রাজাদের বর্ণনা উপলক্ষে শকযবনাদির উল্লেখ আছে।—

> আন্ধ্রাঃ শকাঃ পুলিন্দাশ্চ যবনাশ্চ নরাধিপাঃ।
> কাম্বোজা বাহ্লিকাঃ শূরাস্তথাভীরা নরোত্তম। —বনপর্ব ১৮৮।৩৫-৩৬

শান্তিপর্বেও (৬৫।১৩-১৪) যবন, চীন, শক, পহ্লব, পুলিন্দ, কাম্বোজ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অন্যত্র আছে 'যৌনকাম্বোজগান্ধারাঃ' (শান্তি ২০৭।৪৩)। অশোকের পঞ্চম শিলালিপিতেও অবিকল এইভাবেই আছে—'যোনকংবোজগংধারানং'। শুধু তাই নয়, মহাভারতে রোমক এবং হূণদের উল্লেখও আছে (সভাপর্ব ৫১।১৭, ২৪)।[2] সুতরাং মহাভারতের বহু অংশই অশোকের পরবর্তী তাতে সন্দেহ করা চলে না।

---

১ গীতা যে অশোকের পরবর্তী কালের রচনা তা দেখাতে চেষ্টা করেছি আমার 'ধর্মবিজয়ী অশোক' ও 'ধম্মপদ-পরিচয়' গ্রন্থে।

২ ভীষ্মপর্বে আছে, 'যবনাশ্চীন কাম্বোজাঃ· ·হূণাঃ পারসিকৈঃ সহ· ·শূদ্রাভীরাশ্চ' (৯।৬৫-৬৭)।

৪

এখন দেখা যাক মহাভারতের সহায়তায় ব্রাহ্মণসমাজ কিভাবে অশোকের মাহাত্ম্যকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টিত হয়েছিল।

অশোকের ধর্মানুরাগ কত গভীর ছিল তার পরিচয় আছে তাঁর প্রত্যেকটি অনুশাসনেই, বিশেষ করে আছে তাঁর সপ্তম স্তম্ভানুশাসনে। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত ধর্মানুরাগেই তিনি তৃপ্ত ছিলেন না, রাজ্যের সর্বত্র প্রজাদের মধ্যে যাতে 'ধর্মবৃদ্ধি' হয় তাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি যে-সকল উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা তাঁর বিভিন্ন অনুশাসনে পুনঃপুনঃ বর্ণিত হয়েছে এবং তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে সপ্তম স্তম্ভানুশাসনে। অমূল্যচন্দ্র সেন অশোকের অবলম্বিত উপায়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে—

তাঁহার কাছে ধর্ম কেবলমাত্র কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ড বা বহিরাচার ছিল না এবং তাঁহার ধর্মধারণা অতি ব্যাপক ও গভীর ছিল, যথা— চিরাচরিত ধর্মোৎসবের ভেরীঘোষের পরিবর্তে তাঁহার শিক্ষার ধর্মঘোষ; অন্যান্য মহামাত্রদের মত ধর্মমহামাত্র নিয়োগ; অন্যান্য রাজাদের বিহারযাত্রার পরিবর্তে তাঁহার ধর্মযাত্রা; সাধারণ লোকের আচরিত মাঙ্গলিক কর্মের পরিবর্তে ধর্মমাঙ্গলিক; সাধারণ রাজাজ্ঞা ঘোষণার পরিবর্তে ধর্মঘোষণা; সাধারণ স্তম্ভের মত ধর্মস্তম্ভ স্থাপন; সাধারণ দানাদির পরিবর্তে ধর্মদান; সাধারণ রাজ্যজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়; এবং অন্য রাজাদের রাজ্যবিজয়াদি-স্বগরিমা-বিঘোষক শিলালিপির পরিবর্তে ধর্মলিপি ও ধর্মানুশাস্তি প্রকাশ। —অশোকলিপি, পৃ ৩৯

এই তালিকাও সম্পূর্ণ নয়। তবু এর থেকেই অনায়াসে বোঝা যাবে ধর্মচিন্তা ও প্রজাদের মধ্যে ধর্মবৃদ্ধি-সাধন ছাড়া অশোকের অন্য চিন্তাও ছিল না, অন্য কর্মও ছিল না। সুতরাং তাঁকে যথার্থতঃই ধর্মাত্মা আখ্যা দেওয়া যায়। এইজন্যই তাঁকে পরবর্তী কালে ভারতীয় ও সিংহলীয় বৌদ্ধ সাহিত্যে (দিব্যাবদানে ও মহাবংশে) 'ধর্মাশোক' নাম দেওয়া হয়েছে। গোবিন্দচন্দ্রের সারনাথলিপিতেও তাঁকে 'ধর্মাশোকনরাধিপ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁকে আরও একটি সার্থক নাম দেওয়া হয়েছে, সেটি হল 'ধর্মরাজ'।[৩] যিনি প্রজাদের মধ্যে ধর্মবৃদ্ধির দ্বারা স্বরাজ্যকে ধর্মরাজ্যে পরিণত করবার জন্য জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন তাঁকে এই আখ্যা দেওয়া খুবই সমীচীন হয়েছে সন্দেহ নেই।

তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি—
'এক-ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি'।

এই উক্তি যদি যথার্থতঃ কোনো রাজার প্রতি প্রযোজ্য হয় তবে তিনি অশোক, শিবাজি নন। সুতরাং দিব্যাবদান এবং বুদ্ধঘোষের সুমঙ্গলবিলাসিনী ও সমন্তপাসাদিকা[৪] প্রভৃতি গ্রন্থে যে অশোককে 'ধর্মরাজ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা অসার্থক নয়। এইজন্য অশোকনির্মিত স্তূপও 'ধর্মরাজিকা' নামে পরিচিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দিব্যাবদান থেকে দু-একটি উক্তি উদ্‌ধৃত করছি।—

---

৩ অমূল্যচন্দ্র সেন, *Asoka's Edicts* (১৯৪৬), পৃ ১০।

৪ বেণীমাধব বড়ুয়া, *Asoka and His Inscriptions* (১৯৪৬), পৃ ৯ পাদটীকা ৬, এবং পৃ ১১ পাদটীকা ৩।

আত্মাপুত্রং গৃহং দারান্ পৃথিবীকোশমেব চ।
ন কিঞ্চিদপরিত্যক্তং 'ধর্মরাজস্য' শাসনে।[৫]
যদা রাজ্ঞাশোকেন ভগবচ্ছাসনে শ্রদ্ধা প্রতিলব্ধা
তেন চতুরশীতি-'ধর্মরাজিকা'-সহস্রং প্রতিষ্ঠাপিতম্।[৬]

দ্বাদশ শিলানুশাসন থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, অশোক সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্, সর্বধর্মের সারবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট এবং সর্বসম্প্রদায়েরই পরিপোষক ছিলেন। অতএব তাঁকে যথার্থতঃই 'সর্বধর্মভৃৎ' আখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু মজার কথা এই যে, এই আখ্যাটি মহাভারতে একাধিকবার প্রযুক্ত হয়েছে যুধিষ্ঠিরের প্রতি। যথা—

অনুগৃহ্নন্ প্রজাঃ সর্বাঃ 'সর্বধর্মভৃতাংবরঃ'।
অবিশেষেণ সর্বেষাং হিতং চক্রে যুধিষ্ঠিরঃ। —সভাপর্ব ১৩।৭

বলা বাহুল্য এই শ্লোকটি অশোকের প্রতিই সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। শান্তিপর্বেও (১২।১) আছে 'সর্বধর্মভৃতাং বরম্'। যা হোক, আসল মজার কথা এই যে, মহাভারতের প্রায় সব পর্বেই যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় নাম হচ্ছে 'ধর্মরাজ'। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করছি।—

ততঃ প্রত্যর্চিতঃ সদ্ভির্ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রতিপেদে মহদ্‌রাজ্যং সুহৃদ্ভিঃ সহ ভারত। —শান্তিপর্ব ৪০।২৪

মোট কথা, কালক্রমে বৌদ্ধ জগতের ধর্মরাজ অশোকের প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়ালেন ব্রাহ্মণ্য জগতের ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। ভারতীয় মনোরাজ্যে এই দুই ধর্মরাজের দীর্ঘকালব্যাপী অহিংস সংগ্রামের পরিণামে ধর্মরাজ অশোকেরই পরাভব ও তিরোভাব ঘটল। এই দুই বিরুদ্ধ চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করে ভারতীয় ইতিহাসের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব বলে মনে করি। ধর্মরাজ অশোকের সঙ্গে মহাভারতের ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাদৃশ্য ও বৈষম্যের বিষয় আলোচনা করলে চমৎকৃত হতে হয়। সময়ান্তরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রইল। এখানে সংক্ষেপে দু-একটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

৫

সোরেনসেনের মহাভারতের নামসূচী গ্রন্থে যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

Yudhishtheira Pandava, *also named Ajatasatru and Dharmaraja,* eldest son of Pandu and Kunti (begotten by Dharma). —*An Index to the Names in the Mahabharata* (১৯০৪), পৃ ৭৭৭

মহাভারতের সভাপর্বে বলা হয়েছে যে, যুধিষ্ঠিরের কোনো বিদ্বেষ্টা ছিল না বলেই তিনি অজাতশত্রু।—

ন তস্য বিদ্যতে দ্বেষ্টা ততোঽস্যাজাতশত্রুতা। —সভাপর্ব ১৩।৯

যে যুধিষ্ঠিরকে বাল্যাবধি দুর্যোধনাদির শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের রক্তসমুদ্র

৫ নলিনাক্ষ দত্ত, *Early Monastic Buddhism,* দ্বিতীয় খণ্ড, (১৯৪৫), পৃ ২৪৫ পাদটীকা ১।

৬ ঐ, পৃ ২৪৯ পাদটীকা ৩; ভিনসেন্ট স্মিথ, *Asoka* (তৃতীয় সং, ১৯২০), পৃ ১০৭ পাদটীকা ১০; অমূল্যচন্দ্র সেন—*Asoka's Edicts,* পৃ ৩৯।

পার হয়ে সিংহাসন পেতে হয়েছিল তার এই অজাতশত্রু নাম ও তার ব্যাখ্যা সত্যই বিস্ময়কর। তার চেয়ে এই আখ্যা অশোকের প্রতি অধিকতর প্রযোজ্য। কেননা, কলিঙ্গযুদ্ধের পর যিনি চিরকালের জন্য যুদ্ধ ও রাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে তৎকালজ্ঞাত বিশ্বজনের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁকে এই আখ্যা দেবার সমীচীনতা সকলেই স্বীকার করবেন। তথাপি বৌদ্ধজগৎ তাঁকে এই আখ্যা দেয় নি। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যজগৎ যুধিষ্ঠিরকে অজাতশত্রু বলতে দ্বিধা করে নি। কারণ তিনি যে ধর্মপুত্র, ধর্মাত্মা, ধর্মজ্ঞ, ধর্মরাজ।

যা হোক, যুধিষ্ঠিরের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে হলে শান্তি, অনুশাসন ও অশ্বমেধ মহাভারতের এই তিনটি উত্তর পর্বের তাৎপর্য বিশেষ করে অনুধাবন করা চাই। যুধিষ্ঠির অশোকের মতোই ধর্মজ্ঞ, ধর্মাত্মা ও ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের বিজেতা হয়েও কলিঙ্গবিজেতা অশোকের মতোই শোকব্যাকুলচেতন হয়ে নিজেকেই ধিক্‌কার দিলেন।—

> ধিগস্তু ক্ষাত্রমাচারং ধিগস্তু বলপৌরুষম্।· ·
> ন মমার্থোঽস্তি রাজ্যেন ভোগৈর্বা কুরুনন্দন। —শান্তিপর্ব ৭।৫, ৪৩

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জয়ের পরে যুধিষ্ঠিরকে অনুশোচনা করাবার কি দরকার ছিল? আমার বিশ্বাস অশোকের যুদ্ধপরিহারনীতির প্রতিবাদ ও ব্রাহ্মণসমাজের তিরস্কারের উপলক্ষ্য হিসাবেই এই কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে।[৭] এই প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে নানা জনের দ্বারা যে তিরস্কার করানো হয়েছে তার মধ্যেই বাস্তব ইতিহাসের প্রতিধ্বনি রয়েছে। যথা—

> ন ক্লীবো বসুধাং ভুঙ্‌ক্তে ন ক্লীবো ধনমশ্নুতে।· ·
> নাদণ্ডঃ ক্ষত্রিয়ো ভাতি নাদণ্ডো ভূমিমশ্নুতে।
> নাদণ্ডস্য প্রজা রাজ্ঞঃ সুখং বিন্দতি ভারত।· ·
> জম্বুদ্বীপো মহারাজ নানাজনপদৈর্যুতঃ।
> ত্বয়া পুরুষশার্দূল দণ্ডেন মৃদিতঃ প্রভো। —শান্তিপর্ব ১৪।১৩, ১৪, ২১

এই উক্তি যে পরোক্ষে অশোকের নীতিরই প্রতিবাদ তার পক্ষে যুক্তি এই। পালি দীঘনিকায়ের চক্কবত্তি-সীহনাদ সুত্তন্তে বুদ্ধদেবের জবানিতে আদর্শ চক্রবর্তী রাজার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে আছে—

> ইমং পঠবিং সাগরপরিয়ন্তং অদণ্ডেন অসত্থেন ধম্মেন অভিবিজিয়।

অর্থাৎ উক্ত আদর্শ রাজা দণ্ড ও শস্ত্র বিনা শুধু ধর্মের দ্বারাই সাগরপর্যন্ত পৃথিবী জয় করেছিলেন।

অঙ্গুত্তরনিকায়ের অব্যাকতবগ্গেও আদর্শ রাজার বর্ণনা উপলক্ষে বলা হয়েছে—

> চক্কবত্তী অহুং রাজা জম্বুসণ্ডস্স ইস্সরো।
> মুদ্ধাভিসিত্তো খত্তিয়ো মনুস্সাধিপতী অহুং
> অদণ্ডেন অসত্থেন বিজেয্য পঠবিং ইমং
> অসাহসেন ধম্মেন সমেনামুসাসিয়া
> ধম্মেন রজ্জং কারেত্বা অস্মিং পঠবিমণ্ডলে।· ·

---

৭ অশোকের যুদ্ধপরিহারনীতির প্রতিবাদ ভগবদ্গীতাতেও প্রচ্ছন্নভাবে ধ্বনিত হয়েছে বলে মনে করবার হেতু আছে। দ্রষ্টব্য লেখকের 'ধর্মবিজয়ী অশোক' এবং 'ধম্মপদ-পরিচয়' গ্রন্থ।

এই যে জম্বুখণ্ডের[৮] অধীশ্বর চক্রবর্তী ক্ষত্রিয় রাজা, তিনিও অদণ্ড ও অশস্ত্রের দ্বারা পৃথিবী জয় করে ধর্মের দ্বারাই রাজত্ব করেছিলেন। দীঘনিকায় ও অঙ্গুত্তরনিকায়ের এই আদর্শ রাজার বর্ণনায় জম্বুদ্বীপপতি ধর্মরাজ অশোকের ইতিহাসের ছায়া পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মহাভারতের শান্তিপর্বে জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করবার উপলক্ষ্যে অশোকের আদর্শকেই তিরস্কার করা হয়েছে। একেই বলে ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো। বস্তুতঃ এই তিরস্কারের লক্ষ্য যে অশোক তার আরও প্রমাণ আছে ওই শান্তিপর্বেই।—

বেদবাদাপবিদ্ধাংস্তু তান্ বিদ্ধি ভৃশ নাস্তিকান্।· ·
বদ্ধা ত্বাং নাস্তিকৈঃ সার্ধং প্রশাসেয়ুর্বসুন্ধরাম্। —শান্তিপর্ব ১২।৫ এবং ১৪।৩৩

'যারা বেদোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করে তারাই নাস্তিক।···তোমাকে নাস্তিকদের সঙ্গে বদ্ধ করে পৃথিবী শাসন করা উচিত।' ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে বৌদ্ধরাই যে নাস্তিক সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। যুদ্ধ জয় করবার পরেও 'শোকপরিপ্লুত' যুধিষ্ঠিরকে নাস্তিকদের সঙ্গে বদ্ধ করে রাখবার প্রস্তাবের মধ্যে অশোকের প্রতি বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন আছে এ কথা মনে করা বোধ করি অযৌক্তিক নয়। নতুবা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নাস্তিকদের সঙ্গে বাঁধবার কোনো মানে হয় না।

বিনষ্টায়াং দণ্ডনীত্যাং রাজধর্মে নিরাকৃতে।
সম্প্রমুহ্যন্তি ভূতানি রাজদৌরাত্ম্যতোঽনঘ॥
অসংখ্যাতা ভবিষ্যন্তি ভিক্ষবো লিঙ্গিনস্তথা।
আশ্রমাণাং বিকল্পাশ্চ নিবৃত্তেঽস্মিন্ কৃতে যুগে॥· ·
যদা নিবর্ত্যতে পাপো দণ্ডনীত্যা মহাত্মভিঃ।
তদা ধর্মো ন চলতে সদ্ভূতঃ শাশ্বতঃ পরঃ॥ —শান্তিপর্ব ৬৫।২৪-২৫, ২৭

অর্থাৎ, 'রাজদৌরাত্ম্যহেতু রাজধর্ম নিরাকৃত ও দণ্ডনীতি বিনষ্ট হলে প্রজাসাধারণ আনন্দিত হয়। সত্যযুগের অবসানে অসংখ্য ভিক্ষুর আবির্ভাব হবে এবং আশ্রমধর্মের বিপর্যয় ঘটবে। পক্ষান্তরে মহাত্মা রাজারা যখন দণ্ডনীতির দ্বারা পাপ নিবৃত্ত করেন তখন শাশ্বত ধর্ম বিচলিত হয় না।'

বলা বাহুল্য শাশ্বত ধর্ম মানে সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। এখানেও অদণ্ডের দ্বারা রাজ্যশাসনের নিন্দা সুস্পষ্ট। কিন্তু সব চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে রাজদৌরাত্ম্যবশতঃ আশ্রমধর্মের বিপর্যয় ও অসংখ্য ভিক্ষুর আবির্ভাবের কথা। এসব উক্তির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত অদণ্ডনীতির প্রবর্তক ও বর্ণাশ্রমধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন অশোকের রাজত্বকালের প্রতি, একথা মনে করলে বোধ করি খুব অসংগত হয় না। এই মত যদি সত্য হয় তাহলে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, অশোকের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের রাজধর্মই লঙ্ঘিত হয়েছিল এই ছিল তৎকালীন ব্রাহ্মণসমাজের অভিযোগ।

ব্রাহ্মণ্যমতে রাজধর্মের মূলকথা কি এবার তাই দেখা যাক। এ প্রসঙ্গে চার্বাকবধের কাহিনীটি স্মরণীয়। যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে মহাসমারোহে রাজধানী হাস্তিনপুরে (হস্তিনাপুর নয়) প্রবেশ করলেন। তখন আশীর্বাদবিবক্ষু ব্রাহ্মণেরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন, আর তিনি তারাপরিবৃত বিমলচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করলেন।—

---

৮ জম্বুখণ্ড বা জম্বুদ্বীপ মানে সমগ্র ভারতবর্ষ। মৌর্যযুগে ভারতবর্ষ এই নামেই পরিচিত ছিল।

স সংবৃতস্তদা বিপ্রৈরাশীর্বাদবিবক্ষুভিঃ।
শুশুভে বিমলশ্চন্দ্রস্তারাগণবৃতো যথা। —শান্তিপর্ব ৩৮।১৬

আশীর্বাদের আসল উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হতেও বিলম্ব হল না। যুধিষ্ঠিরও যথাবিধি তাঁদের ভূরিপরিমাণ মোদক, রত্ন, হিরণ্য, গো এবং যে যেরকম চায় সেরকম বিবিধ বস্ত্র দান করে ব্রাহ্মণদের তৃপ্তি বিধান করলেন। ব্রাহ্মণরাও রাজার জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। এমন সময় অত্যন্ত অকারণে ও অপ্রত্যাশিতভাবে ভিক্ষুবেশী (ভিক্ষুরূপেণ সংবৃতঃ) চার্বাক এসে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "মহারাজ, এই ব্রাহ্মণরা আপনাকে জ্ঞাতিঘাতী কুনৃপতি বলে ধিক্কার দিয়েছেন"। ব্রাহ্মণরা প্রথমে এই কথায় পরম লজ্জিত ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন; কিন্তু একটু পরেই তার সমস্ত কথা অস্বীকার করে ব্রাহ্মণরা সমবেতভাবে হুংকার দিয়ে সেই পরিব্রাজকবেশী (পরিব্রাজকরূপেণ) চার্বাককে ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ করে নিহত করলেন। চার্বাকের এই ভিক্ষুরূপ বা পরিব্রাজকরূপ এবং এই রূপের প্রতি ব্রাহ্মণগণের দুর্বিষহ ক্রোধ, এসব তাৎপর্যহীন নয়। পূর্বেই দেখেছি, যে 'দুরাত্মা' রাজার প্রভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম বিপর্যস্ত হয় ও 'অসংখ্য ভিক্ষুর' আবির্ভাব ঘটে সেই রাজধর্মলঙ্ঘকের প্রতি ব্রাহ্মণের মনোভাব কি কঠোর।

যা হোক, চার্বাকবধের পরে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে প্রসন্ন করে বিদায় দিলেন। এমন সময় স্বয়ং সর্বদর্শী জনার্দন বাসুদেব অত্যন্ত অহেতুকভাবে ব্রাহ্মণের প্রশস্তি রচনা করে চার্বাকের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন।—

ব্রাহ্মণাস্তাত লোকেঽস্মিন্নর্চনীয়াঃ সদা মম।
এতে ভূমিচরা দেবা বাগ্‌বিষাঃ সুপ্রসাদকাঃ। —শান্তিপর্ব ৩৯।২

অর্থাৎ, 'ব্রাহ্মণরা আমারও নিত্য অর্চনীয়। এঁরা ভূতলচারী দেবতা, এঁদের বাক্যে বিষ আর এঁরা প্রসন্নও হন সহজেই।' স্বয়ং বাসুদেবের দেওয়া এই 'বাগ্‌বিষাঃ' বিশেষণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অতঃপর বাসুদেব তাঁদের আর-একটি বিশেষণ দিয়েছেন, 'বাগ্‌বলাঃ'। এই দুই বিশেষণেই তৎকালীন ব্রাহ্মণচরিত্র সুপরিস্ফুট হয়েছে। যা হোক, যুধিষ্ঠিরের প্রতি বাসুদেবের শেষ উপদেশ এই।—

শত্রূন্ জহি প্রজা রক্ষ দ্বিজাংশ্চ পরিপূজয়। —শান্তিপর্ব ৩৯।১৩

এই একটি বাক্যেই সমগ্র মহাভারতে বর্ণিত ও ব্রাহ্মণানুমোদিত রাজধর্মের সারকথা ব্যক্ত হয়েছে। আর যুধিষ্ঠিরকে এই রাজধর্মেরই ধারকরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কিন্তু অশোকের রাজধর্ম ছিল অন্যরকম। উক্ত ত্রিনীতির প্রথম ও তৃতীয় নীতির প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না, বিশেষতঃ তিনি সর্বদাই ব্রাহ্মণ ও শ্রমণকে একপর্যায়ে স্থাপন করতেন। ফলে তাঁকে যে 'বাগ্‌বিষাঃ' ও 'বাগ্‌বলাঃ' ব্রাহ্মণদের অপ্রসন্নতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

৬

অশোকের জীবনকালের চেয়ে তাঁর মৃত্যুর পরে উত্তরকালেই ব্রাহ্মণদের এই বিরোধিতা ক্রমশঃ প্রবলতর হয়ে উঠেছিল, একথা মনে করবার হেতু আছে। উত্তরকালে বৌদ্ধরা যখন অশোকের প্রকৃত স্বরূপের কথা ভুলে গিয়ে ও তাঁকে ধর্মরাজ বানিয়ে তাঁর বৌদ্ধত্বকে ও বৌদ্ধপক্ষপাতকে অতিরঞ্জিত করে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে লাগলেন, তখন ব্রাহ্মণরাও যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজরূপে খাড়া করে ও তাঁর ব্রাহ্মণানুগত্যকে অতিমাত্র গুরুত্ব দিয়ে অশোক-ঐতিহ্যের প্রতিপত্তিকে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হল। ফলে ব্রাহ্মণ্য জগৎ থেকে

বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে অশোকের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত বিলীন হয়ে গেল। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণের বাগ্‌বলে পরাহত ও বাগ্‌বিষে জর্জরিত হয়েই তাঁকে ব্রাহ্মণ্য জগৎ থেকে বিদায় নিতে হল। পক্ষান্তরে অশোক বৌদ্ধজগতে অতিরঞ্জিত ও অবাস্তব রূপকথার মহিমা নিয়ে আজও বিরাজমান আছেন। ইতিহাসের সত্য অশোকের পক্ষে এই অপ্রাকৃত মহিমার মধ্যে বিলয়প্রাপ্তিও কম শোচনীয় নয়।

যুধিষ্ঠিরের পক্ষেও এ কথা অনেকাংশে খাটে। এ কথা কে না অনুভব করেছেন যে, সমগ্র মহাভারত-কাহিনীর মধ্যে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কিংবা ভীম ও অর্জুনের তুলনায় যুধিষ্ঠিরকে একান্তই নির্বীর্য প্রাণহীন ও অবাস্তব মনে হয়। অথচ যুধিষ্ঠির নামেই প্রকাশ যে, মূলমহাভারতে (যার আসল নাম ছিল 'জয়:'[১]) তিনি ছিলেন মহাবীর্যবান্ পুরুষ, সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও নায়ক। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁকে ধর্মরাজ অশোকের প্রতিপক্ষ ধর্মরাজ হিসাবে রূপান্তরিত করবার ফলেই তাঁর চরিত্রে এই প্রাণহীনতা ও কৃত্রিমতা ঘটেছে। তিনি বীরভ্রাতাদের এমন কি বীরপত্নী দ্রৌপদীর দৃষ্টিতেও কাপুরুষ বলেই প্রতিভাত হয়েছেন।

বলা বাহুল্য বৌদ্ধ দৃষ্টিতে ধর্মরাজ মানে বৌদ্ধধর্মভৃৎ, তেমনি ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতেও ধর্মরাজ মানে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মভৃৎ। উত্তরকালের বৌদ্ধ কল্পনায় সর্বধর্মভৃৎ অশোক বৌদ্ধধর্মভৃৎ অশোকে অর্থাৎ ধর্মরাজে রূপান্তরিত হবার ফলে ইতিহাসের সত্য ধর্মরাজ্য তার বাস্তবতা হারিয়ে স্বপ্নময় অলীকতায় পর্যবসিত হল। এই কল্পিত বৌদ্ধ ধর্মরাজ্য বস্তুতঃ খ্রীস্টান জগতের হোলি রোমান এম্পায়ারের সঙ্গে প্রায় এক পর্যায়ভুক্ত। মূলে কিছু ঐতিহাসিক সত্য থাকলেও এই উভয়ই অনেকাংশে স্বপ্নময় মায়ামাত্র। হোলি রোমান এম্পায়ার সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলেছেন, ওটা বস্তুতঃ হোলিও নয়, রোমানও নয়, এম্পায়ারও নয়, ও হচ্ছে আসলে খ্রীস্টান জগতের মুগ্ধ ইচ্ছাপ্রসূত কল্পনামাত্র। এ কথা বৌদ্ধ ধর্মরাজ্য বা খ্রীস্টীয় পবিত্র রোমরাজ্য সম্বন্ধে যতটা খাটে, ব্রাহ্মণ্য জগতের পবিত্র রামরাজ্য তথা যুধিষ্ঠিরের ধর্মরাজ্য সম্বন্ধে তার চেয়ে অনেক বেশি খাটে। প্রধানতঃ মায়াময় হলেও পবিত্র রোমরাজ্যের মূলে কিছু বাস্তব সত্য আছে; পবিত্র রামরাজ্যের তথা মহাভারতীয় ধর্মরাজ্যের মূলে তাও নেই, ও দুই ধর্মরাজ্য সর্বতোভাবেই মায়াময়। কিন্তু মায়ার প্রভাব বাস্তবের চেয়ে প্রবলতর। পবিত্র রোমরাজ্যের মায়া কাটাতে ইউরোপের লেগেছিল এক হাজার বছর; আর ভারতবর্ষ দুই হাজার বছরেও কল্পনাময় রামরাজ্যের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারে নি। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ ধর্মরাজ্যের মায়াবরণ ভেদ করে অশোকের বাস্তব ধর্মরাজ্য প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে আজ উজ্জ্বলতর হয়েই আত্মপ্রকাশ করছে। এটা অশোক-রাজত্বের অন্যতম গৌরবের বিষয়। স্বপ্নের চেয়েও বাস্তব মহত্তর হতে পারে, অশোক-ইতিহাস আজ তাই প্রমাণ করছে।

৭

বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণের এই বহুযুগব্যাপী প্রতিযোগিতার ফলে যখন এক দিকে অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কার এবং অপর দিকে অন্ধ বিদ্বেষ ও প্রতিরোধ স্পৃহা অশোকচরিত্রকে বিকৃতি ও বিস্মৃতির দিকে ঠেলে দিচ্ছিল তখনও অশোকের সমগ্রভারতব্যাপী লিপিমালা এই নিরর্থক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূক সাক্ষী হয়ে বিরাজমান ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল, ভারতবর্ষের ভাগ্যচক্র পুনঃপুনঃ আবর্তিত হতে থাকল, কিন্তু কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও ওই লিপিমালার নীরব বাণী কারও হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারল না। তথাপি প্রিয়দর্শী অশোকের প্রতীক্ষা

---

১ 'জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা'— আদিপর্ব ৬২।২০।

ব্যর্থ হয় নি। অশোক একাধিক লিপিতে[১০] জানিয়েছেন যে, শিলাপৃষ্ঠে স্তম্ভগাত্রে তিনি এসব ধর্মলিপি খোদাই করিয়ে গেলেন যেন এগুলি 'চিরস্থিতিক' হয়। অর্থাৎ নিরবধিকালে কোনো-না-কোনোদিন তাঁর ধর্মলিপির বাণী মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করবেই ও সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করবেই এই ছিল তাঁর আশা। প্রায় আড়াই হাজার বছরের সুদীর্ঘ ব্যবধানকে অতিক্রম করে ওই বাণী আজ সহসা মুখরিত হয়ে উঠে সমস্ত জগৎকে চমৎকৃত করে দিয়েছে। সুদীর্ঘকালের অন্ধ শ্রদ্ধা ও অন্ধ বিদ্বেষের নিশীথতমসার অবসানে এবং ওই বাণীময় ইতিহাসসত্যের আবির্ভাবে আজ যখন অশোকচরিত্র স্বমহিমায় দিগন্ত উদ্‌ভাসিত করে বিশ্বজগতে অভ্যুদিত হল, তখন ব্রাহ্মণজগতের রামরাজ্যমায়া ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মহিমাময় মরীচিকা অলীক স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেল। আর বৌদ্ধ জগতের ধর্মরাজ অশোকের অপ্রাকৃত মহিমা-কুহেলিকাও প্রিয়দর্শী অশোকের প্রাকৃতবাণীর সত্যকিরণসম্পাতে অন্তর্হিত হবার উপক্রম ঘটেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই যে অশোকসত্যের আবির্ভাব, এ অত্যন্ত ইদানীন্তন কালের কথা। আজ যে অশোকচক্রকে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকায় সগৌরবে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং অশোকস্তম্ভের যে সিংহচূড়াকে আজ ভারতরাষ্ট্রের প্রতীকরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তা ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সারনাথের পুণ্যক্ষেত্রে লজ্জিত ভারতের মাটির তলায় মুখ লুকিয়ে ছিল। ১৯০৫ সালে নবভারতের অভ্যুত্থানের সঙ্গেই ভারত-ইতিহাসে ওই অশোকচক্রযুক্ত স্তম্ভশীর্ষের পুনরাবির্ভাব ঘটে, এই আকস্মিকতা যেমন বিস্ময়কর তেমনি প্রীতিদায়ক। ওই অশোকচক্রলাঞ্ছিত ভারতপতাকাকে উপলক্ষ্য করে কবির ভাষায় বলা যায়—

> ··বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
> যাহার পতাকা
> অম্বর আচ্ছন্ন করে এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে
> কোথা ছিল ঢাকা।

এই প্রশ্নের উত্তরও রয়েছে কবির বাণীতেই—

> মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
> বিস্মৃতির তলে—
> নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
> আঘাতে না টলে।

এ কথা শুধু অশোকস্তম্ভ সম্বন্ধে নয়, অশোকলিপি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, বরং অধিকতর প্রযোজ্য। অশোকলিপি যে বাণীময় হয়ে উঠে বিশ্বজনের মুগ্ধ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে শুরু করেছে, সে অতি অল্প কালের কথা। বঙ্কিমচন্দ্রও (১৮৩৮-৯৪) অশোকবাণীর মর্ম উপলব্ধি করে যেতে পারেন নি। আজও যে অশোকবাণীর সত্য সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। জেম্‌স্‌ প্রিন্‌সেপের (১৭৯৯-১৮৪০) সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কত গবেষক যে অশোকচর্চায় নিরত হয়েছেন তার হিসেব নেই। তবু আরও চর্চা আরও আলোচনার প্রচুর অবকাশ রয়েছে বলে মনে করি। মহাভারতের, বিশেষতঃ শান্তি অনুশাসন ও অশ্বমেধ পর্বের, বহু উক্তির সঙ্গে মিলিয়ে অশোকলিপির আলোচনা করলে বহু অপ্রত্যাশিত সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। এ কথার আভাসমাত্র দেওয়া হল এ প্রবন্ধে।

---

১০ পঞ্চম শিলানুশাসন ও সপ্তম স্তম্ভানুশাসন।

মনে রাখা দরকার যে, অশোকলিপির আলোচনা নেহাতই প্রত্নতত্ত্বের চর্চা অর্থাৎ মৃত-ইতিহাসের চর্চা নয়। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, ভারত-ইতিহাসের অশোকপর্ব আজ আমাদের পক্ষে যতখানি প্রাণবন্ত ও প্রাণপ্রদ আর কোনো পর্বই তা নয়। অতীতকালেও ভারতবর্ষ অশোকপর্বে যতখানি প্রাণবন্ত ছিল তেমন আর কোনো পর্বেই নয়। তাই আজ স্বাধীন ভারতে যখন নূতন প্রাণের স্পন্দন জেগেছে তখন অশোকাদর্শ ও অশোকবাণীর উৎস থেকেই তাকে প্রেরণা সংগ্রহ করতে হচ্ছে। তাই অশোকপ্রতীক আজ ভারতপ্রতীক এবং অশোকের 'সমবায়'-নীতি আধুনিক 'পঞ্চশীল'-নীতি রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বস্তুতঃ ভারতচিত্তের যে আকৃতি আজ নিঃশব্দে উৎসারিত হচ্ছে, কবির ভাষায় (ঈষৎ পরিবর্তিত) তা এই।—

মগধের[১১] প্রান্ত হতে একদিন তুমি ধর্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে
রাজা ব'লে জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে।..
সেদিন শুনিনি কথা— আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।

---

১১ মূল: 'মারাঠার'

আকাশসঙ্গম

শ্রী নন্দলাল বসু

যোরুবা দেশে ৪ ইফে
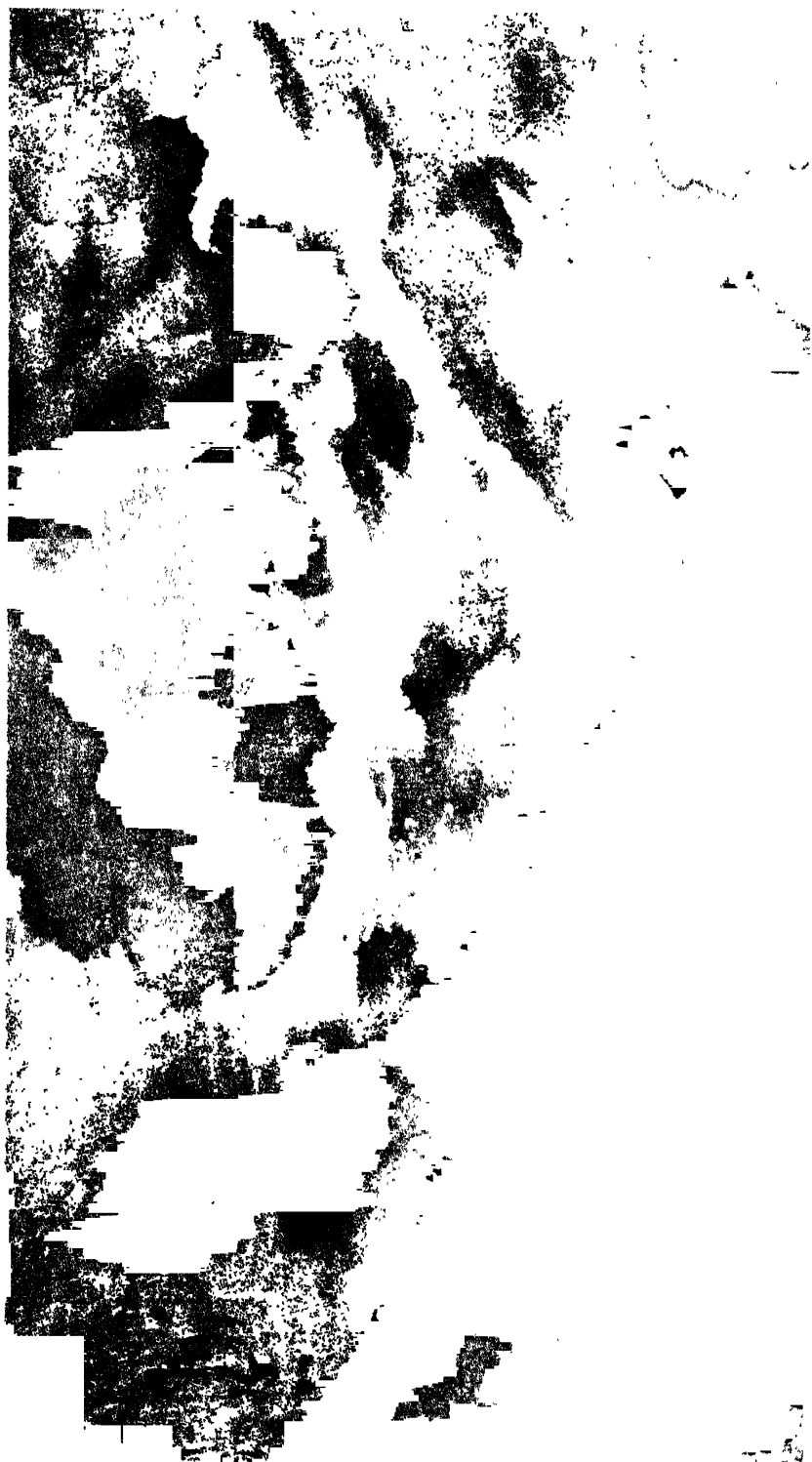
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৭ই আগস্ট ১৯৫৪। আজকের দিনে কতকগুলি নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল— যোরুবাদের ধর্ম আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু নতুন জ্ঞান লাভ করা গেল। সকালবেলা সাড়ে-সাতটার সময় উঠে তৈরি হ'য়ে নিয়ে কর্নেল ব্রেট ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রাতরাশ শেষ করা গেল— তার পরে ওনির সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলুম। চেলারামের গাড়ি রাত্তিরে ইফেতেই ছিল, ড্রাইভার উইলিয়াম আমাকে তাতে ক'রেই ওনির প্রাসাদে নিয়ে এল। যাবার আগে আমার জিনিস-পত্র গাড়িতে তুলে নেওয়া গেল। আমার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশিত হিন্দুধর্ম আর সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু বই ছিল, তার মধ্য থেকে স্বামী জগদীশ্বরানন্দের *Universal Prayers*— মূল সংস্কৃত আর ইংরিজি অনুবাদ— একখণ্ড কর্নেল ব্রেটকে উপহার দিলুম, তিনি আগ্রহ ক'রে তাতে আমার স্বাক্ষর করিয়ে' নিলেন।

ওনির প্রাসাদে যখন উপস্থিত হ'লুম তখন শুনলুম তিনি তাঁর কতকগুলি প্রজার জমি-সংক্রান্ত নালিশের ফয়সালা ক'রছেন। আমাকে একটি বড়ো ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল, সেখানে ওনি সপারিষদ রয়েছেন, চেয়ার ছেড়ে তিনি দাঁড়িয়ে কথা কইছেন— প্রজার দল বিশেষ সম্ভ্রমের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে আছে— প্রায় সকলেই যোরুবা পোশাক ঢিলা আলখাল্লা প'রে আছে, কালো নীল আর সাদা রঙের। নালিশ ছিল ক্ষেতের সীমানা নিয়ে। যারা ওনির দরবারে প্রথম এসে হাজির হ'চ্ছে তারা সকলেই মাটিতে ধুলো না মেনে সটান উবুড় হ'য়ে প'ড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রছে। এই হচ্ছে এদের রাজাকে সম্মান দেখাবার এক সাধারণ রীতি। আমাদের দেখে ওনি একটা নালিশের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ক'রে চট্‌পট্ বিচার শেষ ক'রে ফেললেন। আমি ওনিকে ব'ললুম যে গত কাল আমরা দেবতার উপবন দেখে এসেছি, আজ ইফা (Ifa) দেবতার মন্দিরে কীভাবে পুজো হয় তা দেখতে চাই। একথা শুনে ওনি তখনই ইফার পুরোহিতদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ওনি এদিকে খ্রীষ্টান হ'লেও আবার যোরুবা ধর্মের নেতা আর ধর্মগুরু, তাঁর অধীনস্থ রাজ্যের সমস্ত মন্দিরের পুরোহিত-নিয়োগের ক্ষমতা তাঁরই, আর পুরোহিতরাও তাঁকে ধর্মগুরুর সম্মান দিয়ে থাকে। ইফা দেবতা হ'চ্ছেন ভবিষ্যৎ-বাণীর দেবতা, যোরুবা দেশের লোকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু জানতে হ'লে এই দেবতার পুরোহিতদের শরণাপন্ন হয়। এই পুরোহিতদের বিশেষ নাম আছে— এদের বাবালোয়ো (Babalowo) বলে, আর বাবালোয়োদের যিনি প্রধান তাঁর পদবী হ'চ্ছে আরাবা (Araba)। এঁদের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন ক'রতে হয়, আর এঁরা সাদা কাপড়ের আলখাল্লা প'রে থাকেন। ওনি একটি অল্পবয়সী যোরুবা ভদ্রলোককে আরাবা-পদে নিযুক্ত ক'রেছেন— অদ্ভুত লাগ্‌ল যে ইফা-দেবের প্রধান পুরোহিত এই আরাবার একটি খ্রীষ্টান নামও আছে, আর সম্ভবতঃ স্থান বুঝে এই নামের জোরে তিনি নিজেকে খ্রীষ্টান ব'লেও পরিচিত করেন, তাতে বাধা নেই। এই বাবালোয়ো তাঁর গুরু বা প্রভু ওনির তলব পেয়ে হুজুরে হাজির হ'লেন, অন্য প্রজাসাধারণের মতো তিনিও মাটির উপর শুয়ে প'ড়ে ওনিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রলেন— একবার নয়, তিন তিন বার। এঁর নাম হ'চ্ছে জেম্‌স্ আয়োসপে, (James Awosope)। ওনির অনুগ্রহেই এঁর এই

পদপ্রাপ্তি। সম্ভবতঃ ইনি যোগ্য লোকও হবেন। আরাবাকে তিনি হুকুম দিলেন যে আমাকে তাঁর বাড়ির ঠাকুরঘরে বা মন্দিরে নিয়ে গিয়ে কী ক'রে ইফার সামনে ভবিষ্যৎ গণা হয় তা দেখাতে। মনে হ'ল আরাবা খুব আগ্রহের সঙ্গে এই হুকুম গ্রহণ ক'রলেন না, তবে উপায় নেই। তিনি ইংরিজি জানেন না, সে কথা জানিয়ে দিলেন। তাতে ওনি তাঁর আর একজন প্রজাকে ডাকিয়ে' পাঠালেন, এ ভদ্রলোকের নাম রুফস্ আরোজোডু, (Mr. Rufus Awojodu), এবং ইনি ইংরেজি জানেন আর বেশ ব'লতেও পারেন। ইনি একটু বয়স্ক ব্যক্তি, রোগা পাতলা চেহারা, আর পুরো য়ুরোপীয় সাজে এলেন, ঐ গরমে কালো কাপড়ের কোট, প্যাণ্ট, টাই, কলার আর টুপি প'রে। ইনিও ভুঁয়ে ধুলোর উপর শুয়ে ওনিকে প্রণাম ক'রলেন। এই ভদ্রলোক কিছুকাল পূর্বে আমেরিকায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত নৃতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক Bascom ব্যাস্‌কম্-এর সঙ্গে কাজ করেন। ব্যাস্‌কম্ ইফে নগরে এসে এক বছরেরও বেশি দিন থেকে য়োরুবা ধর্মের চর্চা করেন, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখেন, এবং তাঁকে দোভাষীরূপে সব বুঝিয়ে দিতেন এই শ্রীযুক্ত আরোজোডু। ওনি এঁকে ব'লে দিলেন, আমার সঙ্গে ইফার মন্দিরে গিয়ে সব কিছু বুঝিয়ে দিতে। তার পরে ওনি নিজেই আমি তাঁকে হিন্দুধর্ম আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে বই দেবো ব'লোছলুম তা চাইলেন। আমি তাঁকে ক্রিস্টফার আইশারউড ও স্বামী প্রভবানন্দের অনুবাদ ইংরিজি গীতা একখানি দিলুম, আর স্বামী বিবেকানন্দের কিছু বক্তৃতা আর উপদেশের একখানি বই। তার পরে আমি ওনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীযুক্ত আরোজোডুর সঙ্গে আরাবার গৃহে যাবার জন্য তৈরি হ'চ্ছি— আরাবা ইতিপূর্বেই সব বন্দোবস্ত করবার জন্য আগেই চলে গিয়েছেন— এমন সময় কর্নেল ব্রেট সেখানে এলেন। গতকাল ইনি আমাকে আমার ভারতীয় পোশাকে দেখেছিলেন— ধুতি পাঞ্জাবী (আর পরে আচকান) আর টুপিতে। আজ তিনি তাঁর নিজের আইরিশ জাতির প্রাচীন পোশাক প'রে এলেন। এই পোশাক স্কটলাণ্ডের হাইলাণ্ডারদের মতন, কোমর-ঘেরা হাঁটু পর্যন্ত Kilt বা ঘাগরার মতন পরিধেয়, সামনে কোমর থেকে Sporran বা থলি ঝুলছে, তবে হাইলাণ্ডারদের কিণ্টের কাপড়ে যে নানা রঙচঙে' ছকের নকশা থাকে, আইরিশ কিণ্টে সে-রকম নকশা থাকে না, এটা চকোলেট রঙের পশমি কাপড়ে তৈরি, আর সামনের থলিটিও সেই কাপড়ের। আর তা ছাড়া হাইলাণ্ডাররা যে একটি ছক-কাটা Tartan বা নকশাওয়ালা কাপড়ের উত্তরীয় বা চাদর গায়ে জড়ায়, আইরিশ পোশাকে সেটা দেখলুম না। কিণ্টের উপরে কর্নেল ব্রেট সাদা হাতকাটা শার্ট প'রে এসেছিলেন। পায়ে আইরিশ জুতো আর হাঁটু পর্যান্ত পশমের মোজা। এঁর এই পোশাক প'রে আসায় বুঝতে পারা গেল যে এঁর মনে আইরিশ জাতীয়তার ভাব একটু আছে ; আর আমার কাছে এটা মন্দ লাগ্‌ল না। তাঁর এই পোশাক সম্বন্ধে আমি একটু জিজ্ঞাসা-বাদ ক'রতে কর্নেল ব্রেট একটু খুশিই হলেন, আর আমায় ব'ললেন যে তাঁর এই আইরিশ কিল্ট তৈরির খরচ পনেরো গিনি। দুঃখের বিষয়, এই পোশাকে এঁর একটা ফোটো তোলা গেল না।

তার পরে ওনির সঙ্গে করমর্দন করে বিদায়ের পালা। ভদ্রলোক একজন ভারতবাসী তাঁর শহরে এসে, তাঁর জাতির প্রাচীন কীর্তি ব্রঞ্জের মূর্তি আর তাঁর ধর্ম আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়েছেন, এতে সত্যি-সত্যি তিনি খুশি। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ আর সৌজন্যের অবতার এই আফ্রিকান অভিজাত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়া বাস্তবিকই একটা সৌভাগ্যের কথা।

তার পরে কর্নেল ব্রেট আর আমি, আর আমাদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত আরোজোডু আর কর্নেল ব্রেটের যুবক আর্দালি Gabriel Adewoyen গেব্রিয়েল আদেৱোয়েন্, আমরা একত্র চ'ললুম। আরাবার বাড়ি কাছেই, সেখানে গিয়ে আমরা পৌঁছলুম। বাড়িখানার দেয়াল মাটির, ছাদ পাতায় ছাওয়া। সমস্তটা চক-মেলানো নয়, ঘরের সমাবেশ এক সমান রেখা ধ'রে না হয়ে, আঁকাবাঁকা ভাবে— এখানে একখানা ঘর, ওখানে একখানা ঘর, এইভাবে। আমরা একটি দরজা দিয়ে ঢুকে, আঁকাবাঁকা পথ ধ'রে দু-একটি আঙিনা পার হ'য়ে তাঁর প্রধান দালান-ঘরে গিয়ে পৌঁছলুম, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের ভিতরে যেতে হ'ল। এই ঘরটি বেশ লম্বা-চওড়া, চৌরস, আর ঘরের এক দিকে একটি ভিতরের ছোট কুঠরি আছে, সেইখানে দেবতার মূর্তি আর পুজোর জিনিসপত্র থাকে। আমি এই কুঠরির ভিতরে গিয়ে দেখতে পারি কি না জিজ্ঞেস করলুম। আরাবা আর তাঁর সহকারী কতকগুলি বাবালোৱো আর অল্পবয়সী চেলা বা শিষ্য জনকতক ঘরে ছিল। তা ছাড়া কৌতূহলের বশে আরও কতকগুলি মেয়ে পুরুষ আর ছেলেমেয়ে এসে জমা হ'ল। আরাবা অন্য পুরোহিতদের সঙ্গে আপসে একটু পরামর্শ ক'রে নিলেন, তার পরে শ্রীযুক্ত আরোজোডুকে দিয়ে আমাদের জানালেন যে মন্দিরের ভিতরে বা গর্ভগৃহে আমাদের যেতে দিতে তাঁদের আপত্তি আছে। কিন্তু ইফা দেবতার নাম নিয়ে যে-ভাবে ভাগ্যগণনা বা ভবিষ্যৎ-গণনা করা হয়, সে অনুষ্ঠানটি দেখাবেন। ইতিমধ্যে কর্নেল ব্রেট আর আমার জন্যে আর মিস্টার আরোজোডুর জন্যে তিনখানা চেয়ার এনে হাজির ক'রলে, আমাদের সেই চেয়ারে ব'সতে হ'ল। তখন দালানঘরের মাঝখানে আরাবা আর তাঁর সহকারীরা গণনার জিনিসপত্র সাজাতে লাগ্‌লেন। একটা পুরোনো ছেঁড়া আসনে আরাবা ব'সলেন, আর তার পরে ব'ললেন যে আমি আমার জিজ্ঞাস্য, একটি শিলিং মুদ্রা নিয়ে সেইটি ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুপিচুপি যেন বলি। এই গণনার অনুষ্ঠানের প্রধান জিনিস হ'চ্ছে একটি কাঠের বারকোষ-জাতীয় পাত্র, প্রায় এক হাত এর ব্যাস হবে। এই পাত্র গোলও হ'তে পারে— আবার চৌকোও হ'তে পারে— এ ক্ষেত্রে গোল পাত্র ছিল ; আর পাত্রের চার ধারে নকশা কাটা থাকে, কখনও কখনও নরনারীর বা দেবদেবীর বা নানাবিধ পশুপক্ষীর আর সর্পের চিত্রও খোদা থাকে। আরাবা বারকোষটি সামনে রেখে আমাদের মতো 'খাটনমালা' হ'য়ে ব'সলেন, তাঁর পরনে সাদা আলখাল্লা, আর তাঁর দুধারে গুটিকতক চেলা, ৫।৬ জন হবে, ভুঁয়ের উপরে ব'সল। অন্য ৪।৫ জন লোক— পুরোহিত হবে— পাশে দাঁড়িয়ে রইল'। আর আমাদের পিছনে আর আশেপাশে ভিড় ক'রে দর্শকবৃন্দ। ঐ ঘরের মধ্যে লক্ষ্য ক'রে দেখলুম, ছাতের এক কাঠের খুঁটি বা থামে একটি ভেড়া বাঁধা আছে— এটি হ'চ্ছে দেবতার উদ্দেশ্যে মানতের পশু, মুসলমানী কায়দায় জবাই ক'রে একে বলি দেওয়া হবে। পুরোহিতের পাশে ছিল একটি ঝুলি, তার ভিতর তাঁর পুজোর অনেক সরঞ্জাম। তিনি কি একটি সাদা গুঁড়ো নিয়ে বারকোষের উপরে বেশ পুরু ক'রে ছড়িয়ে দিলেন, তার পরে ষোলোটি তেল-সুপুরি গাছের ফলের বীচি হাতে নিলেন। এর পরে তিনি তাঁর পরনের সাদা আলখাল্লাটি খুলে ফেললেন, তার পরে তিনি বিড় বিড় ক'রে কোনো প্রার্থনা বা দেবতা-আবাহনের মন্ত্র প'ড়তে লাগ্‌লেন। য়োরুবাদের এবং পশ্চিম-আফ্রিকার অন্য সব জাতির মধ্যে বিভিন্ন দেবতা পূজায় ঐ অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার প্রয়োগ হ'য়ে থাকে। যে দেবতা যে জাতির মধ্যে বেশি জনপ্রিয় বা প্রবল, সেই জাতির ভাষার মন্ত্র অন্য অঞ্চলের পুরোহিতরাও ব্যবহার করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ভাষা আলাদা হ'লেও এদের মধ্যে ধর্ম আর সংস্কৃতি বিষয়ে একটা সাম্য বা একতা আছে। ইফা দেবতা

য়োরুবা ছাড়া Ewhe এভে Fon ফোঁ প্রভৃতি অন্য নানা জাতির ও উপাস্য এখানে ইনি কী ভাষায় ব'ললেন তা আমার জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। আরাবা তার পরে ঐ ষোলোটি তেল-সুপুরি দু হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে লাগ্‌লেন, দশ-পঁচিশ খেলায় কড়ি নিয়ে আমরা যেমন মুঠোর মধ্যে রেখে নাড়ি, সেইভাবে। তার পরে বহুবার ধ'রে তিনি সেগুলি হাতের তেলোয় নিজেই যে-ভাবে পড়ে, সে-ভাবে রাখেন, আর সেগুলির প্রতি নজর ক'রে, সামনের বারকোষের উপরে যে সাদা গুঁড়ো লাগানো আছে, আঙুল দিয়ে তার উপরে নানা দাগ করেন। এইভাবে তিনি দশ মিনিট ধ'রে তেল-সুপুরির বীচি দু হাতের মধ্যে রেখে সেগুলিকে নাড়েন, আর ডান হাতে রেখে বারকোষের উপর রেখাপাত ক'রে যান, আর পরে সেগুলি মুছে ফেলেন। তার পরে তাঁর অনুচর বা চেলাদের একজন ইফা দেবতার মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে, ঐ রেখাপাতের বিচারের ফলে ভবিষ্যৎ-বাণী করবার জন্যে প্রস্তুত হয়। শ্রীযুক্ত আরোজোডু ইংরিজি ভাষায় এই চেলা বা অনুচরটির বক্তব্য ব'ললেন। চেলা যে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রলে তা এই ধরণের— আমি আমার দেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তবে আমার জানানো উচিত যে আমার প্রশ্নটা ভালো কি মন্দ, অর্থাৎ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কোনো লোকের মন্দ করা কি না। আমি ব'ললুম আমি কারও মন্দ কামনা ক'রে প্রশ্ন করি নি। তখন এই চেলাটি ব'ললে যে, কোনো ভূসম্পত্তি পেয়েছি সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন, দেবতাদের কাছে বেশ মোটা রকমের পুজো দিলে আমি সেই ভূসম্পত্তি পেতে পারবো। আরাবা আর তার দলের সকলে আমার মুখের দিকে উৎসুকভাবে তাকালে, এই গণনা ঠিক কি না। এই গণনা একেবারে ভুল, তারা আমার প্রশ্ন ধ'রতেই পারে নি। তখন অন্য দিক্ থেকে আর একজন চেলা যেন ইফা দেবতার নির্দেশেই ব'লতে আরম্ভ ক'রলে— শ্রীযুক্ত আরোজোডু তার কথাও অনুবাদ ক'রে গেলেন। এ বললে যে, আমি আমার দেশের একজন মস্তবড়ো দূত এবং আমি আরও বড়ো একজন দূত হবো এবং আমার নিজের স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার, আর তা ছাড়া দেবতাদেরও নিয়মিতভাবে বলিপুজো দেওয়া চাই। এও হ'ল না শুনে আরাবা নিজে বললেন যে, সময় বেশি নেই, তিনি খালি দুটো কথা ব'লবেন। আমি শীঘ্রই আমার আকাঙ্ক্ষিত কোনো বস্তু লাভ ক'রবো। তার পরে তিনি কতকগুলি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ব'ললেন— দেবতাদের পুজো দিয়ে বা দেবতাদের নামে মানত ক'রে কত লোক ইচ্ছানুরূপ ফল পেয়েছে। এ কথাও দেখলুম বাজে, আর আমি যে কথা মনে করেছিলুম সে কথার ধারে-কাছেও এরা পৌঁছল' না। তখন আরাবা ব'ললেন যে, ইফা দেবতা আকাশে আছেন। তিনি সমস্তই দেখ্‌ছেন, আর আমার মনস্কামনা তিনি পূর্ণ ক'রবেনই।

কর্নেল ব্রেট আমার সঙ্গে ব'সে নিবিষ্টচিত্তে সব দেখছিলেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর কাছেও নোতুন। হয়তো আরও খানিকক্ষণ এখানে থাকতে পারলে, অন্ততঃ thought-reading বা মনের কথা ধ'রে ফেলার প্রক্রিয়ায় আমার মনোগত উদ্দেশ্য এরা পুরোপুরি ব'লতে পারত। কারণ সকলেই ব'ললে যে ইফার পুরোহিতদের গণনা সাধারণতঃ কিছুটা ঠিক হয়ই, এবং কখনও-কখনও পুরোটাই ঠিক হয়। এতদিন ধ'রে এই গণনা খালি য়োরুবাদের মধ্যে নয়, আশপাশের অন্য কতকগুলো আফ্রিকান জাতির মধ্যে মজ্জাগত হ'য়ে আছে, আর আমাদের দেশের জ্যোতিষের মতো এদের এই ভাগ্যগণনাতে এদেশের উচ্চশিক্ষিত লোকেদেরও অনেকে আস্থা পোষণ করে। যাই হোক, এইভাবে পশ্চিম-আফ্রিকার এই বিশিষ্ট অনুষ্ঠান ভবিষ্যদ্-গণনা দেখবার সুযোগ হ'ল। দক্ষিণা হিসাবে আরাবাকে পাঁচ শিলিং দিলুম, কর্নেল ব্রেটের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে।

আরাবা খুশি হয়ে আমাদের সঙ্গে তাঁর বাড়ির দরজা পর্য্যন্ত এলেন। শ্রীযুক্ত আরোজোডুকেও পাঁচ শিলিং দিলুম, ভদ্রলোক মনে হ'ল খুবই খুশি হ'লেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কতটুকুই বা দেখবো আর বুঝবো? যদি অধ্যাপক ব্যাস্কমের মতো বেশিদিন থাকা যেত, তা হ'লে এদের ধর্মের ভিতরকার কথা কিছু হয় তো বোঝা যেত এদের ভাবরাজি বা চিন্তাধারা, এদের আদর্শ আর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে তার কতটা সমাধান এরা ক'রতে পেরেছে। যে-সমস্ত আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্ একটু গভীরভাবে এদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি আলোচনা করেছেন, তাঁরা একে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। শিকাগোর অধ্যাপক ব্যাস্কমের সঙ্গে আমি পরে পত্রব্যবহার করি, আর তিনি আমার চিঠি পেয়ে আমাকে জানান যে, নৃতত্ত্ববিদ্ সম্পূর্ণ পৃথক্-ভাবে, নির্ব্যৈক্তিকভাবে য়োরুবাদের মতো কোনো অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতির ধর্মচিন্তা আলোচনা ক'রতে ব'সলে, শেষটায় তাদের হ'য়ে ওকালতি ক'রতে বা তাদের পক্ষ নিয়ে দু কথা ব'লতে তারা বাধ্য হন, কারণ তার আভ্যন্তর বিচারধারার একটা কোনো সার্থকতা তাঁদের স্বীকার ক'রতেই হয়।

তার পরে কর্নেল ব্রেটের সঙ্গে তাঁর আপিসে গেলুম, আর ভদ্রলোক বিশেষ সৌজন্য ক'রে আমাকে বিদায় দিলেন। ইফে শহরটা একটু ঘুরিয়ে' দেখাবার জন্যে তাঁর আর্দালি দ্বিতীয় শ্রেণীর পাহারাওয়ালা যুবক গেব্রিয়েল আদেরোয়েন্‌কে সঙ্গে দিলেন। ছোকরা বেশ লম্বা ছিপ্‌ছিপে চেহারার, ইংরিজিতে যাকে বলে smart, সেপাহি কায়দায় চলাফেরা, আর ইংরিজি বেশ ব'লতে পারে। ইফে শহর মানে একটি বড়ো রাস্তা, তার দুধারে দোকানপাট, আর ভিতরের দিকে সরু গলিপথের ধারে গরিবের কুঁড়ে আর বড়োলোকের বিরাট হাতার মধ্যে পাতা-ছাওয়া মাটির দেয়ালের অনেকগুলি ক'রে ঘর-ওয়ালা বাড়ি বা প্রাসাদ। বড়ো রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তাগুলি আমাদের দেশের গেঁয়ো রাস্তার মতো— আঁকাবাঁকা, উঁচুনিচু, ভাঙাচোরা। অবশ্য ইফে নগরীতে ভালো রাস্তাও কতকগুলি আছে। জিনিসপত্র যা বিক্রি হ'চ্ছে সবই বিদেশী। স্থানীয় শিল্প ব'লতে তাঁতে-বোনা সরু সরু কাপড়, কালো বা নীল রঙের বা সাদা রঙের ডোরা কাটা। ভারী ভারী কাঠের বারকোষ, আর অর্ডার দিলে বসবার কেদারা পাওয়া যায়। গেব্রিয়েল আমাকে আগ্রহ ক'রে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল— তাদের family compound বা বিরাট পারিবারিক ভিটা। একটা মাটির ফটকের মতো, তার ভিতর দিয়ে যেন একটা ছোট গ্রামে প্রবেশ ক'রলুম, এখানে ওখানে সেখানে আলাদা আলাদা মাটির কুঁড়ে, বা তিন-চার খানা ঘর নিয়ে মাঝারি বা বড়ো আকারের বাড়ি। এই হাতার মধ্যে গেব্রিয়েলের বাবা, তার খুড়ো-জেঠারা আর তাদের পরিবারবর্গ একত্র বাস করে। এদের কর্তাব্যক্তিদের প্রত্যেকেরই একাধিক ক'রে সংসার। তার নিজের গুটি পাঁচেক সৎমা আর সতাত ভাইবোন। প্রত্যেক সৎমার জন্য আলাদা আলাদা কুঁড়ে, আর তার লাগাও অন্য ঘর। তার খুড়ো-জেঠাদের বেলাও তাই। আমার গাড়ি ফটক দিয়ে এই পরিবারের ভিটেয় প্রবেশ ক'রতেই, চার দিক্ থেকে গেব্রিয়েলের আত্মীয়েরা— কতকগুলি বয়স্ক ব্যক্তি, আর বেশির ভাগ ছেলে আর মেয়ে, এসে জড়ো হ'ল। এই বিরাট্ হাতার মধ্যে জায়গা যথেষ্ট আছে। বংশের মধ্যে কোনো ছেলে বিয়ে ক'রলে তার নববধূর জন্যে একটি মাটির কুঁড়ে তৈরি হবে। পরে আবার বিয়ে ক'রলেও সতিনদের সেইরকম আলাদা আলাদা কুঁড়ে তৈরি হয়। এদের দেশে বহুবিবাহ নানা কারণে খুবই প্রচলিত, আর মেয়েদেরও তাতে আপত্তি নেই। গেব্রিয়েল ব'ললে যে তাদের অনেক জমি আছে, সেই জমিতে এদেশের সাধারণ খাদ্য yam অর্থাৎ মানকচু-জাতীয় কন্দমূল আর অন্য ফসল হয়। বৌয়েরা আর মেয়েরা ক্ষেতে কাজ করে, সুতরাং বাড়িতে বেশি বৌ থাক্‌লে চাষবাসের

পক্ষে ভালো। গেব্রিয়েল নিজে বিবাহিত, সে তার নিজের কুঁড়েতে আমাকে নিয়ে গেল। তার বৌকেও দেখলুম, অল্পবয়সী সুশ্রী য়োরুবা মেয়ে— লাজুক, ঘাড় হেঁট ক'রে হাসতে লাগ্‌ল। গেব্রিয়েল তার স্ত্রীর হাতে-বোনা এক টুকরো য়োরুবা কাপড় নমুনা হিসেবে আমাকে দিলে। মোটা খাদি কাপড়, নীল কালো আর সবুজ ডোরা কাটা। তার বাবার সঙ্গেও দেখা করিয়ে দিলে— আধবুড়ো ব্যক্তি, খালি গা, কোমরে সাদা কাপড় জড়ানো। গেব্রিয়েলের এক খুড়ো হ'চ্ছেন ইফা দেবতার পুরোহিত— বাবালোরো। তাঁর নাম হচ্ছে Sam অর্থাৎ Samuel Elufioye স্যামুয়েল এলুফিওয়ে। এ ভদ্রলোকও ঐ তেল-সুপুরি গাছের ফল দিয়ে ভবিষ্যৎ-গণনা ক'রে থাকেন। আমি এই ভাগ্য-গণনায় ব্যবহৃত গোটাকতক তেল-সুপুরি ফল কিনবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, গেব্রিয়েল তার খুড়োর বাড়িতে আমায় নিয়ে গেল। সরু কতকগুলি রাস্তা আর আঙিনা পেরিয়ে তার বাড়িতে ঢুকলুম। বাড়ির ভিতরে গিয়েই দেখি, একটি বিরাট্ ঘর, তার এক পাশে খুব ঘটা ক'রে রান্না চেপেছে। বাড়ির কম-বয়সী মেয়েরা হাঁড়িতে ক'রে নানা জিনিস সিদ্ধ ক'রছে, একরাশ মানকচু সিদ্ধ রয়েছে, আর তা ছাড়া রকমারি শাক আর আনাজ কোটা হ'চ্ছে। গেব্রিয়েলের খুড়ো বসত-ঘরের ভিতরে আমাকে নিয়ে গেলেন, পশ্চিম-বাঙ্‌লার মাটির দেয়ালের খড়ের চালের বাড়ির মতো। সর্বত্রই মাটির রঙ লাল্‌চে। ঘরের ভিতরে কাঠের বাক্স বা সিন্দুক, চেয়ার, ছোট নিচু য়োরুবা ঢঙের কাষ্ঠাসন— আমাদের মোড়ার মতন, ইত্যাদি। এঁর বসত-ঘরের মাটিতে খানিকটা জায়গায় সতরঞ্চির মতো পাতা। দু-একটি আলমারিও দেখলুম, তাতে কাপড়চোপড় থাকে, আর উপর থেকে শিকেতে কতকগুলি হাঁড়ি ঝুলছে। তাতে খাদ্যদ্রব্য আর অন্য নানা জিনিস থাকে। আমাকে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে' গেব্রিয়েল ভিতরে তার খুড়োকে আমার কথা নিজের ভাষায় ব'ললে। খুড়ো তাড়াতাড়ি সাদা আলখাল্লা প'রে বাইরে এসে আমাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তিনি ভালো ইংরিজি জানেন না, আর ইফার ভবিষ্যৎ-গণনা সম্বন্ধে দু-চার কথা যা ব'ললেন তা আমার বোধগম্য হ'ল না। তিনি দুটি তেল-সুপুরি ফলের বীচি আমাকে দিলেন আর তার জন্যে দুই শিলিং ছয় পেন্স চেয়ে ব'সলেন। তাই দিয়ে তাঁকে খুশি ক'রে আমরা বেরিয়ে এলুম। গেব্রিয়েল তার আপিসে নামিয়ে দিয়ে এলুম, আর তাকে দু শিলিং বখশিশ দিতে সে মহাখুশি হ'ল। গেব্রিয়েলকে ছোকরাটিকে মোটের উপর আমার ভালোই লাগ্‌ল ; আর এদের প্রাণখোলা সরল হাসি আমার কাছে বড়ো মিষ্টি লাগে।

এইবারে ইবাদান ফিরতে হবে। ড্রাইভার উইলিয়াম এই ব'লে চম্‌কিয়ে দিলে যে তার নিউমোনিয়া হয়েছে— রাত্তিরে তার জ্বর হয়েছিল, আর বুকে একটা ব্যথা হয়েছে। তার অনুরোধে আমি তাকে ইফের Saturday Adventist হাঁসপাতালে নিয়ে গেলুম— গতকাল সন্ধ্যায় যেখানে আমরা গিয়েছিলুম। তখন বেলা প্রায় সাড়ে-দশটা এগারোটা হবে। শনিবার ব'লে ঐদিনই তখন হাঁসপাতালের গির্জায় ডক্টর ন্যাগেল Nagel হাঁসপাতালের কটি আমেরিকান আর তাঁদের অনুগামী ঐ সম্প্রদায়ের কতকগুলি য়োরুবা খ্রীষ্টানদের নিয়ে সকলের উপাসনা শেষ ক'রেছেন। তিনি আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন, আর নিজে উইলিয়ামকে দেখে তাকে ইঞ্জেকশন দিলেন, আর খাবার জন্যে কতকগুলি ট্যাবলেট দিলেন। এই সৌজন্যের জন্যে বিশেষ কৃতজ্ঞভাবে ডক্টর ন্যাগেলের কাছে বিদায় নিলুম, উইলিয়ামও দেখলুম এই ইঞ্জেকশন নিয়ে আর বড়ি খেয়ে একেবারে চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল, আমাকে ব'ললে যে এই চিকিৎসায় সঙ্গে সঙ্গে তার খুব কাজ হ'য়েছে।

ইবাদান ফির্‌তে বেলা প্রায় পৌনে-একটা হ'য়ে গেল।

ভাই বীর সিং ১৮৭২ - ১৯৫৭

পাঞ্জাবী সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত হয় প্রায় সত্তর বছর পূর্বে। এই নবযুগ আনতে সহায়তা করেছে রাজনৈতিক চেতনা এবং আত্মরক্ষার প্রেরণা। স্বাধীনতার স্বপ্নকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য আটপৌরে ভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রয়োজন। এর চেয়ে বড় ছিল শিখ জাতির আত্মরক্ষার প্রশ্ন। সংখ্যালঘু শিখ-সম্প্রদায় মুসলমানদের নানাবিধ আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করে এসেছে কয়েক শতাব্দী ধরে। এদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা লক্ষ্য করে ইংরেজ শাসকরা বিচলিত হয়ে উঠল। তারা তৎপর হল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সমর্থন করে নবজাগ্রত চেতনাকে বিপথগামী করতে। নেতারা উপলব্ধি করলেন ধর্ম ও সমাজ সংস্কার দ্বারা শিখ-সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করতে পারলে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা সম্ভব। এর জন্য শিখ -ধর্ম ও -ঐতিহ্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করে তুলতে হবে। যে ভাষায় সাধারণ লোক কথা বলে সে ভাষায় শিখ-ধর্মের মর্মবাণী ঘরে ঘরে নতুন করে পৌঁছে দেওয়া চাই।

শিখ-গুরুদের আমল থেকে পাঞ্জাবী সাহিত্যে ব্রজভাষার আধিপত্য চলে আসছিল। এই ভাষার সঙ্গে সাধারণ পাঠকের যোগ না থাকায় পাঞ্জাবী সাহিত্য হয়ে পড়েছিল বদ্ধ জলাশয়ের মত প্রাণহীন। মধ্যপাঞ্জাবের কথ্যভাষার সঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ সংস্কৃত ও ফারসি শব্দ মিশিয়ে নতুন পাঞ্জাবী ভাষায় লিখতে আরম্ভ করলেন ভাই মোহন সিং ও ভাই কাহন সিং। শিখ-ধর্মশাস্ত্রে এঁদের দুজনেরই ছিল গভীর পাণ্ডিত্য। ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অসংখ্য পুথিপত্র লিখে এঁরা নতুন পাঞ্জাবী ভাষার প্রচলন করলেন। ভাই কাহন সিং সম্পাদিত শিখ-বিশ্বকোষ 'গুরুশবদ রত্নাকর' এক বিরাট কীর্তি।

পথপ্রদর্শক হলেও এঁরা ভাষায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। কারণ তাঁরা ভাষাশিল্পী ছিলেন না। ভাই বীর সিং এই নতুন ভাষাকে আপন প্রতিভায় প্রাণবান ও বেগবান করে তুলেছেন।

১৮৭২ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অমৃতসরে ভাই বীর সিং জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই সাধক-কবি ছিলেন। পিতা চরণ সিং সাংসারিক জীবনে ডাক্তার হলেও ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

১৮৯১ খৃস্টাব্দে ভাই বীর সিং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। জেলার ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়ে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। পরীক্ষায় এরূপ লোভনীয় ফল করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র উৎসুক ছিলেন না। এখানেই পড়া শেষ করে তিনি সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পুথিগত বিদ্যার প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা ছিল না সে কথা তিনি পরবর্তী জীবনে বলেছেন একটি কবিতায়—

> **আমার মনকে করেছিলাম ভিক্ষার পাত্র; বিদ্যার খুদ-কুঁড়ো ভিক্ষা করে ফিরেছি দ্বারে দ্বারে; সব শিক্ষায়তনের উচ্ছিষ্টে পূর্ণ হয়েছিল আমার পাত্র। গর্ববোধ করেছি পূর্ণপাত্রের অধিকারী হয়ে। ভেবেছি, আমি এখন পণ্ডিত হয়েছি।· · একদিন গেলাম গুরুর কাছে। তাঁকে উৎসর্গ করলাম আমার জ্ঞানের পাত্র। তিনি ঘৃণায় বলে উঠলেন, 'জঞ্জাল! জঞ্জাল!' তার পর উলটে ফেলে দিলেন সেই পাত্র।**

ভাই বীর সিং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর বৎসর সিং-সভা-আন্দোলনে যোগদান করেন। এই আন্দোলনের তিনি ছিলেন উৎসাহী কর্মী। সিং-সভার উদ্দেশ্য ছিল শিখ -ধর্ম ও সমাজের যুগোপযোগী সংস্কার দ্বারা জাতিকে সংঘবদ্ধ করে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। ১৮৯৪ সালে একই উদ্দেশ্যে তিনি ভাই কাউর সিংএর সহযোগিতায় খালসা ট্র্যাক্ট সোসাইটি স্থাপন করেন। শিখ-সম্প্রদায়ের নবজাগরণে এই সোসাইটির দান অপরিসীম। শত শত পুথিপত্র প্রকাশ করে শিখ -ধর্ম ও -সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে জনসাধারণকে সহায়তা করেছে এই সোসাইটি।

এই দুটি প্রতিষ্ঠানও তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হল না। ভাই বীর সিং তাঁদের আদর্শ প্রচারের জন্য একটি নিয়মিত মুখপত্রের অভাব বোধ করেন। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় পাঞ্জাবী ভাষায় 'খালসা সমাচার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি পাঞ্জাবের সাংস্কৃতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দীর্ঘকাল যাবৎ 'খালসা সমাচার'কেই শিখদের একমাত্র মুখপত্র বলে স্বীকার করা হত।

চরণ সিং পুত্রের রচনাশক্তির পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রাম্যলোকের ভাষা পাঞ্জাবী ভাষাকে গ্রহণ করায় তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। পুত্রকে উপদেশ দিলেন ব্রজভাষায় লিখতে। বীর সিং পিতা ও বন্ধুবান্ধবের উপদেশ অগ্রাহ্য করে পাঞ্জাবী ভাষাকেই তাঁর রচনার বাহন হিসাবে গ্রহণ করলেন। ব্রজভাষা বইয়ের ভাষা, জীবনের ভাষা নয়। এ ভাষা ব্যবহার করলে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে না। জনসাধারণকে নতুন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা একমাত্র সুমার্জিত পাঞ্জাবী ভাষার দ্বারাই সম্ভব। জনসাধারণের উপেক্ষিত ভাষাকে মার্জিত এবং নতুন শব্দ যোজনার দ্বারা সমৃদ্ধ করে ক' বছর যাবৎ প্রচারসাহিত্য রচনা করবার পর ভাই বীর সিং উপলব্ধি করলেন এই ভাষার মনের ভাব প্রকাশ করবার আশ্চর্য শক্তি আছে। এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধেও তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। পাঞ্জাবী ভাষার শক্তির পরিচয় পেয়ে তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় শুরু করলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

১৮৯৮ খৃস্টাব্দ পাঞ্জাবী সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসর প্রথম পাঞ্জাবী সাপ্তাহিক 'খালসা সমাচার' প্রকাশিত হয় ভাই বীর সিংএর সম্পাদনায়। ঐ বৎসরই তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সুন্দরী' প্রকাশিত হয়। এটি পাঞ্জাবী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। ভাই বীর সিং যে উদ্দেশ্যে প্রথম লিখতে শুরু করেছিলেন উপন্যাস রচনা করতে বসেও সেই উদ্দেশ্যকে তিনি একেবারে ভুলতে পারেন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল রাজশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিখদের প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হয়েছিল। 'সুন্দরী' সেই সময়কার কাহিনী। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে অতীত শৌর্যের কথা শিখদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন বীর সিং। তাঁর বিশ্বাস ছিল, নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন হলে তারা হয়তো জড়ত্ব ত্যাগ করবার উদ্দীপনা লাভ করবে।

'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং একটি মাত্র উপন্যাস লিখে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকসমাজে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, পাঞ্জাবে 'সুন্দরী' এবং তার লেখক ঠিক তেমনি ভাবেই অভিনন্দিত হয়েছেন। পাঠকদের প্রচণ্ড আগ্রহের ফলে তিনি নতুন নতুন উপন্যাস রচনার প্রেরণা পেলেন। একে একে অনেকগুলি উপন্যাস লিখলেও তিনি নিয়মিত ভাবে শিখ-ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও সম্পাদনার কাজ কখনো বন্ধ রাখেন নি। ১৯২০ সালে ভাই বীর সিং রচিত প্রথম ও দশম গুরুর

ভাই বীর সিং

জীবনী প্রকাশিত হয়। এই দুটি বই তাঁর গদ্যরচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এখানে উৎকৃষ্ট রচনাশৈলীর সঙ্গে অন্তরের প্রগাঢ় ভক্তি মিশ্রিত হয়ে রসসমৃদ্ধ এক অপূর্ব রচনার সৃষ্টি হয়েছে।

এখন পর্যন্ত পাঞ্জাবী সাহিত্যের এক প্রধান অংশ অধিকার করে আছে ভাই বীর সিংএর গদ্য রচনা। শুধু গুণে নয়, পরিমাণেও। পাঞ্জাবী গদ্যসাহিত্যের অর্ধেকই ভাই বীর সিংএর রচনা।

গদ্যের মত আধুনিক পাঞ্জাবী কাব্যও ভাই বীর সিংএর সৃষ্টি। পূর্বে দীর্ঘ কাব্যকাহিনীর প্রচলন ছিল। এই ধরনের কাব্যকে বলা হত কিস্সা। মুসলমান সুফী কবিরা গান করবার জন্য ঈশ্বরপ্রেমমূলক ছোট ছোট কবিতা রচনা করতেন। এই কবিতা কাফি নামে পরিচিত ছিল। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে লিরিক কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন ভাই বীর সিং। সম্পূর্ণ নতুন ভাব ও নতুন আঙ্গিক প্রবর্তন করে তিনি পাঞ্জাবী কাব্যসাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করলেন। তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিকতা, পরিশুদ্ধ প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা, ধ্বনিবৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্যানুভূতির মিলন ঘটেছে। কবি মিস্টিসিজমের যে কত বড় ভক্ত তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় প্রতিটি কবিতায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য শুধু বাইরে থেকে দেখেই তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি। পৃথিবীর সবকিছুর পশ্চাতে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কবি আভাস পান। এদিক থেকে ওয়ার্ডস্বার্থের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে।

ভাই বীর সিং একটি কবিতায় বলেছেন, আমরা যেখানে যত সৌন্দর্য দেখি তা কোনো বস্তু বা ব্যক্তির নিজস্ব নয়। আয়নায় সুন্দর মুখশ্রী প্রতিবিম্বিত হলে তো বলি না ঐ সৌন্দর্য আয়নার। তেমনি পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যই হল ঈশ্বরের রূপের প্রতিচ্ছবি।— এর মধ্যে ওয়ার্ডস্বার্থের চিন্তাধারার প্রভাব সুস্পষ্ট।

অন্যত্র দেখতে পাই পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দু দেখে কবি আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিমগ্ন হয়েছেন। সাধারণত পদ্মপত্রের জলবিন্দুর সঙ্গে চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী জীবনের তুলনা করে আমরা একটু বিষাদ অনুভব করি। কিন্তু ভাই বীর সিংএর মধ্যে এই বিষাদের সুর অনুপস্থিত। বৃষ্টির জল আকাশ থেকে পদ্মপাতায় পড়ে, তার পরে সূর্যের আকর্ষণে বৃষ্টিবিন্দু আবার উপরে উঠে যায়, চিহ্নও থাকে না। তেমনি এই পৃথিবীতে ভগবান কিছু দিনের জন্য আমাদের পাঠিয়েছেন, আবার আহ্বান এলে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সুতরাং দুঃখের কারণ নেই।

ভাই বীর সিংএর কাব্যে ঈশ্বরের উপর অবিচল আস্থা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কিকর গাছ'এ এই সুদৃঢ় আস্থা একটু বিচলিত হয়েছে বলে মনে হয়। দেশবিভাগের বেদনা অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও হয়তো কবিকে সংসারের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন করেছিল। বাবলা গাছকে পাঞ্জাবী ভাষায় বলে কিকর। অনুর্বর ভূমিতে এর জন্ম। কিকর গাছ দুঃখ করে বলছে, আমি লোকালয় থেকে দূরে সামান্য একটু জমির উপর আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছি; আমার জন্য জমি চাষ করতে হয় না, সার দিতে হয় না; ভগবান অকৃপণ হাতে দিয়েছেন রোদ ও বৃষ্টি, তাই আমার যথেষ্ট; কৃতজ্ঞতায় উর্ধ্বে মাথা তুলে ঈশ্বরের স্তব করি; কিন্তু সংসারের উপর কোনো দাবি না করলেও নিষ্ঠুর মানুষের শাণিত কুঠারের হাত থেকে আমার নিস্তার নেই।

ভাই বীর সিং শুধু লিরিক কবিতাই লেখেন নি। নানা ছন্দে কাব্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন। তিনি রূপক এপিক শিক্ষামূলক ও কাহিনীমূলক কাব্যও রচনা করেছেন। 'রানা সূরত সিং' (১৯০৫) তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে স্বীকৃত। এই কাব্যের পরিকল্পনা দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র ছায়া নিয়ে

করা হয়েছে। বিধবা রনী রাজ কাউর পরলোকগত স্বামীর আত্মার সহিত মিলিত হবার জন্য যাত্রা করেছেন। তাঁর যাত্রা অনুসন্ধান ও সান্ত্বনা লাভের কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। অপূর্ব স্বর্গীয় দৃশ্যের মধ্য দিয়ে তাঁর যাত্রা, এই দৃশ্যের বর্ণনাগুলি কাব্যের প্রধান সম্পদ। অনেক ঘুরে ঘুরে রানী এসে পৌছলেন আত্মার উৎসস্থলে। এখানে জন্ম ও মৃত্যু, বিরহ ও মিলন, সুখ ও দুঃখ— সব এক হয়ে গেছে। রানীর সকল সংশয় দূর হয়ে গেল, এখানে তিনি সকল প্রশ্নের উত্তর পেলেন। তাঁর শোক প্রশমিত হল, শান্তি লাভ করলেন তিনি। এর পর থেকে রানী প্রশান্ত মনে কর্তব্য কাজ করে যাবার শক্তি পেলেন।

রানী রাজ কাউরকে মানুষের আত্মার প্রতীক বলে ধরা হয়েছে। আর স্বর্গীয় পরমজীবনের প্রতীক হলেন তাঁর পরলোকগত স্বামী রানা সুরত সিং। • পরমজীবনের জন্য আত্মার যে আর্তি— এ কাব্য তারই রূপক। পঁয়ত্রিশ সর্গে বিভক্ত তেরো হাজার লাইনে সম্পূর্ণ এই সুদীর্ঘ কাব্যের সর্বত্র কাব্যরস অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় নি কবির পক্ষে। আদি গ্রন্থ থেকে শব্দ ভাব ও কল্পনা যথাসম্ভব গ্রহণ করবেন বলে পূর্ব থেকেই সংকল্প করায় কাব্য রচনায় কবির স্বাধীনতা অনেকটা সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবী কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সফল প্রয়োগ সর্বপ্রথম এই কাব্যেই হয়েছে।

যদিও জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভাই বীর সিং পাঞ্জাবী ভাষায় লিখতে শুরু করেছিলেন, তথাপি তাঁর কাব্য সাধারণ পাঠকের মধ্যে ব্যাপক প্রচার লাভ করে নি। এর কারণ তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিকতা এবং মিস্টিসিজমের প্রাধান্য। তথাপি কবি হিসাবেই ভাই বীর সিং পাঞ্জাবী সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর উপন্যাস এবং অন্যান্য গদ্য রচনার সাময়িক প্রভাব যত বড়ই হোক-না কেন, কাব্যের মধ্যেই ভাই বীর সিংএর সৃষ্টিক্ষমতার চরম বিকাশ ঘটেছে।

ভাই বীর সিং শুধু কবি নন, তিনি সন্ত কবি। সাহিত্যসাধনার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাঁর খ্যাতি নিবদ্ধ নয়। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, গভীর ধর্মবোধ, সুদৃঢ় আশাবাদ, অসাধারণ চরিত্রবত্তা, শিখজাতির মঙ্গলকামনায় অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং ঋষিকল্প সৌম্য মূর্তি পাঞ্জাবের হৃদয় জয় করেছে। ভাই বীর সিংএর সাহিত্যকে তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এবং বহুমুখী কর্মধারা থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। অন্তত যতদিন পর্যন্ত তাঁর সমাজ-হিতকর কাজগুলির প্রভাব প্রত্যক্ষরূপে বর্তমান থাকবে ততদিন নৈর্ব্যক্তিক বিচার সম্ভব নয়। অবশ্য ভাই বীর সিংএর সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের যে প্রচেষ্টা তা অপেক্ষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর দান অনেক বেশি; এবং শেষ পর্যন্ত এই দানের জন্যই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আধুনিক পাঞ্জাবী ভাষা তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং পাঞ্জাবী ভাষায় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যরচনা করবার কৃতিত্বও তাঁর। তাই তাঁকে পাঞ্জাবী ভাষার জনক বলা হয়ে থাকে। একজন লেখক নতুন ভাষায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে সেই ভাষাতেই প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

এই প্রচারবিমুখ কবিকে বিগত কয়েক বছরে দেশবাসী নানা সম্মানে ভূষিত করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে প্রকাশিত পাঞ্জাবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'মেরে সাইয়াঁ জিও'এর লেখক হিসাবে তিনি সাহিত্য আকাদামির পুরস্কার পেয়েছেন। ভারতসরকার গত বছর তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি ছিলেন পাঞ্জাব বিধানসভার রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত সদস্য। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছে। পরিপূর্ণ সম্মানের মধ্যে পরিণত বয়সে ভাই বীর সিং পরলোক-গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে পাঞ্জাবী সাহিত্য বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হল। এটা শুধু কথার কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্যসাধনা করে গেছেন। বয়স তাঁর সৃষ্টির ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। প্রায় ষাট বছর ধরে যিনি পাঞ্জাবী সাহিত্যকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করবার মত সাহিত্যসেবকের আবির্ভাবের জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাই বীর সিংএর কবিতার অনুবাদ

দুঃখ দেখে দুঃখ আসে

পৃথিবীর যন্ত্রণায় বিবর্ত চিত্রে
হৃদয় আমার দুঃখী।
অন্তর যার গলে
পারি না রুধতে চোখের জল।
জানি পৃথিবীর বেদনা কমবে না আমার বেদনায়,
এমনকি আমার তীব্র ত্যাগের উৎসবে।
তবু পাথর তো নই আমি,
পাথরও ভাঙে তোমার দুঃখে, হে পৃথিবী।

দাস, না, প্রভু

ঘুরছিল মেলায় একটি মানুষ,
গলায় তার ঝোলানো তবক,
লেখা তাতে
'আমি কৃতদাস কেনো আমায়।'
কিনতে গিয়ে বলল একজন আমার কানে :
'ও চায় না কোনো প্রভুকে—
ছদ্মবেশে ও ধরতে চায় আরো অধম দাসকে
যে ওকে কেনার দ্বারাই প্রমাণ করবে আপন দাসত্ব,
তার তুলনায় কৃতদাসই হবেন প্রভু।'

স্বাধীন ইচ্ছা

'যদি বিশ্বকর্মা চোখ দিতেন আমার খুলির উপর দিকে,
চাইতাম আকাশের দিকে।
চোখ পেয়েছি কপালের নিচুতে,

নিচু দিকেই না চেয়ে আমার উপায় নেই—
বিধিনির্দেশ আমাকে বেঁধেছে।'
'চোখ আছে বটে কপালে,
সঙ্গে আছে বিধিদত্ত ঘাড়
ইচ্ছামত চোখকে উঁচুনিচু চালাবার জন্যে।
বিধিনির্দেশে চোখ দিয়ে দেখায় নেই মুক্ত দৃষ্টি,
ইচ্ছায় উপরে চোখ চালাবার অধিকার মানুষের।'

দহন

ধীরে ধীরে উঠল মেঘ
কত নিচু থেকে আকাশের উঁচুতে—
কিন্তু সে কালো সে বোবা,
জানে না দিক।
অজানিতে তারো বুকে জাগল বজ্রের বিদ্যুৎ,
কখন্ হঠাৎ হল স্ফুরিত ;
অসহ্য আত্মদহন তার সেই আলো—
কিন্তু নীচে পৃথিবী হয়ে ওঠে ক্ষণিক উজ্জ্বল।

অমিয় চক্রবর্তী

সংকেত। অগ্রহায়ণ ১৩৫০

সংগীত-সমীক্ষা

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

ধ্বনি নাদ এবং শব্দ— এই তিনটিকে নিয়েই সংগীতশাস্ত্রের সূত্রপাত, উচ্চারণ থেকেই ধ্বনির উদ্ভব। ধ্বনি থেকে বর্ণের উৎপত্তি হল। বর্ণ থেকে সৃষ্ট হল পদ এবং পদ থেকেই এল বাক্য। এই সচল জগৎ বাঙ্ময় অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

নাদ এবং ধ্বনির মধ্যে তেমন প্রভেদ নেই। উচ্চারণসম্ভূত যে শ্রুতি তাও নাদ নামেই অভিহিত। এই নাদকে বাইশটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এক-একটি অংশের বিশিষ্ট আখ্যা হচ্ছে শ্রুতি। শ্রবণেন্দ্রিয় যে ধ্বনিকে গ্রহণ করতে সমর্থ হয় তাই শ্রুতি। এই বাইশটি শ্রুতি— ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ— এই সাতটি স্বরে পরিব্যাপ্ত।

বীণার তারে প্রথম আঘাতে যে ধ্বনি উত্থিত হল তা একটি শ্রুতি। এই ধ্বনিটি চকিতে উত্থিত হয়ে ক্রমে একটি অনুরণনের মধ্য দিয়ে স্থায়ী হল এবং তার পর বিলীন হল। এই অনুরণনটি অতি মধুর এবং সংগীতশাস্ত্রে এরই নাম স্বর। শ্রোতৃচিত্তকে স্বতই যা রঞ্জন করে তাই স্বর। ধ্বনিমাত্রই শ্রুতি কিন্তু সেই শ্রুতি মাধুর্যগুণসমন্বিত হলেই স্বর বলে স্বীকৃত হয়।

নাদের অপর একটি তত্ত্ব আছে, সেটি অনুভূতির দিক। আত্মা যখন নিজেকে প্রকাশ করতে চায় তখন অন্তঃকরণ জাগ্রত হয়। উদ্‌বুদ্ধ অন্তঃকরণ তখন দেহের অন্তর্নিহিত অগ্নিকে উদ্দীপিত করে। এই অগ্নি তার সহচর বায়ুকে জাগ্রত করে। ব্রহ্মগ্রন্থিতে অবস্থিত সেই বায়ু বহ্নি কর্তৃক তাড়িত হয়ে উর্ধ্বমার্গে উত্থিত হয় এবং আঘাতের দ্বারা হৃদয় কণ্ঠ এবং মুখে ধ্বনিকে প্রকটিত করে।

ব্রহ্মগ্রন্থি কি, এই প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া শক্ত, কেননা এসব মার্গে আমাদের সাধনা নেই। আমরা শুধু টীকাকারের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে বলতে পারি— 'সুষুম্নয়া সহ ইড়াপিঙ্গলয়োঃ সম্বন্ধস্থানং ব্রহ্মগ্রন্থি'। সুষুম্নার সঙ্গে ইড়া পিঙ্গলার সম্বন্ধস্থান হচ্ছে ব্রহ্মগ্রন্থি। এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য সাধকেরাই গ্রহণ করতে পারবেন ; তবে মূল কথা হল আবেগ, প্রকাশের আকুলতা যা বাতাহত অগ্নির মতো প্রধাবিত হয়। কবিগুরু এই আকৃতিকেই সংগীতে প্রকাশ করেছেন— 'তুমি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে'।

শাস্ত্রকার বলছেন ন-কার প্রাণবাচক এবং দ-কার অগ্নিবাচক। অগ্নিতে জাত এই প্রাণশক্তিই নাদ। আবার কেউ কেউ বলছেন 'নন্দতে ইতি নাদঃ'— যা নন্দন করে তাই নাদ। এই নাদ শব্দের নানাবিধ ব্যাখ্যায় সংগীতের সৌন্দর্য এবং বলিষ্ঠতা দুইই প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের সংগীত সুন্দর এবং কোমল, কিন্তু নির্বীর্য নয়।

ধ্বনি এবং নাদের পরে এল শব্দের প্রসঙ্গ। সংগীতশাস্ত্রে শব্দ মানে আমরা যাকে সাধারণ কথায় আওয়াজ বলি, তাই। রত্নাকর শব্দের মোটামুটি চারটি ভাগ করেছেন— খাহুল নারাট বোম্বক এবং মিশ্রক।

যে স্বর ঈষৎ শ্লেষ্মাজড়িত স্নিগ্ধমধুর সুকুমার এবং মন্দ্র-মধ্যস্থানে পরিব্যাপ্ত তার নাম খাহুল ; বাংলায় একে আমরা খোলা আওয়াজ বলি। নারাট স্বরের বিস্তৃতি আর-একটু বেশি অর্থাৎ 'তার' পর্যন্ত ; এই

আওয়াজ পিত্তোৎপন্ন, ঘন, গম্ভীর এবং অভগ্ন; একে আমরা 'নিরেট' বলি অর্থাৎ ঠাস ভরাট গলা। বোম্বক— এই নামেই বোঝা যাচ্ছে যে, এটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্বর; ভেরেণ্ডাগাছের ডাল যেমন ফাঁপা এই আওয়াজ তেমনি অন্তঃসারশূন্য, এটি ঘনত্ববিরোধী পরুষ এবং স্নিগ্ধতাবর্জিত। যে স্বরে এই তিনপ্রকার ধ্বনির মিশ্রণ লক্ষিত হয় তার নাম মিশ্রক। মিশ্রস্বর অর্থে কিন্তু বিরুদ্ধগুণের সমাবেশকে মেনে নেওয়া হচ্ছে না, অবিরুদ্ধ গুণের সমাবেশকেই স্বীকার করা হচ্ছে। মাধুর্যাদি গুণের সঙ্গে স্থৌল্যাদি গুণের বিরুদ্ধতা নেই; অতএব এটি হতে পারে। কিন্তু ঘনত্বের সঙ্গে নিঃসারতার সংযোগ স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটা অসম্ভব— অতএব এই মিশ্রণ কল্পনার বহির্ভূত।

এর পর শব্দের বহুতর ভেদ সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর না হয়ে শব্দের গুণপ্রসঙ্গে আসি। শব্দের পনেরোটি গুণের উল্লেখ আছে— মৃষ্ট মধুর চেহাল ত্রিস্থানক সুখাবহ প্রচুর কোমল গাঢ় শ্রাবক করুণ ঘন স্নিগ্ধ শ্লক্ষ্ণ রক্তিযুক্ত এবং ছবিমান। এর মধ্যে সবগুলির ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই কিন্তু দু-একটি কিছুটা অপরিচিত, যেমন চেহাল এবং ছবিমান।

চেহাল শব্দটি চিল্ল থেকে এসেছে, অর্থাৎ চিলের মত আওয়াজ। নাতিস্থূল এবং নাতিকৃশ অথচ স্নিগ্ধ স্বরের নাম চেহাল; স্ত্রীলোকের কণ্ঠে এই গুণটি স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে একটু কৃত্রিম ভাবে কণ্ঠকে সংকুচিত ক'রে এই আওয়াজটির সৃষ্টি করতে হয়। একটু চেপে গাইলে কণ্ঠ স্বীয় পরিধি অতিক্রম করে না এবং তখনই কণ্ঠের স্থূলত্বকে আয়ত্ত করে লালিত্য সম্পাদন করা যায়। ছেলেরা যখন তরুণ থাকে তখন এমনিতেই আওয়াজ নাতিস্থূল এবং নাতিকৃশ থাকে। তারুণ্যাবস্থায় এই স্বরটি কিন্তু চেহাল নয়, কেননা এটি স্থায়ী নয়; বয়সের সঙ্গেসঙ্গেই আওয়াজ বদলাবে। কণ্ঠস্বর যখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে তখনই তার স্বাভাবিক গুণ নির্ধারিত করতে হবে, তার আগে নয়।

ছবিমান শব্দের অর্থ দীপ্তিসম্পন্ন কণ্ঠস্বর। অনেক সময় কণ্ঠের গুণে সংগীত উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। টীকাকার এই শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন— 'যতশ্চ শব্দে জ্যোতিঃ প্রতীয়তে'।

কণ্ঠের দোষ আট প্রকার— রুক্ষ স্ফুটিত নিঃসার কাকোলী কেটি কেণি কৃশ এবং ভগ্ন।

কাকের মত নিষ্ঠুর আওয়াজকে কাকোলী বলে। যে আওয়াজ খাদ থেকে চড়ায় বিস্তৃত হলেও মাধুর্যগুণবিশিষ্ট হয় না তাকে বলে কেটি। আর, যে কণ্ঠের তার-মন্দ্র ব্যাপ্তিতে বহু ক্লেশ হয় তাকে বলে কেণি। সম্ভবত বাংলায় আমরা যাকে 'ক্যাঁটকেটে' এবং 'ক্যান্‌কেনে' গলা বলি, এ দুটি হচ্ছে তাই।

স্বরের বৈষম্য গুণ দোষ প্রভৃতি বিচারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল বৃন্দগায়নের দিক থেকে। আজকাল আমরা যাকে কোরাস বলি বৃন্দগায়ন বলতে তাই বোঝায়— অর্থাৎ সম্মেলক গান।

একটি উত্তম বৃন্দে মুখ্য গায়ক থাকতেন চার জন, সহযোগী গায়ক আট জন এবং গায়িকা থাকতেন বারো জন। এ ছাড়া বংশীবাদক থাকতেন চার জন এবং মার্দঙ্গিক চার জন। এই সংখ্যার অর্ধেক হলে তাকে বলা হত মধ্যমবৃন্দ, অর্থাৎ মুখ্য গায়ন দু জন, সহযোগী চার জন, গায়িকা ছ জন, বংশিক দু জন এবং মার্দঙ্গিক দু জন। এরও কম, অর্থাৎ মুখ্য গায়ন এক জন, সহযোগী তিন জন, গায়িকা চার জন, বংশিক দু জন আর মার্দঙ্গিক দু জন হলে তাকে কনিষ্ঠ বৃন্দ বলা হত। উত্তম বৃন্দের চেয়ে অধিক সংখ্যক শিল্পীর সমাবেশ হলে তাকে কোলাহল বৃন্দ বলা হত। কেবলমাত্র গায়িকাদের নিয়েও বৃন্দ গঠিত হত।

শিল্পীদের কণ্ঠের দোষগুণ ভালোভাবে বিচার করে তবে বৃন্দগঠন করা হত, যাতে বেখাপ্পা গলার

সমাবেশ না ঘটে। কেবলমাত্র কণ্ঠের বৈষম্য এবং গুণ-দোষের বিষয়ে সে যুগের সংগীতবিদ্‌গণ কত অভিজ্ঞ এবং সচেতন ছিলেন রত্নাকরবর্ণিত দীর্ঘ বিশ্লেষণই তার প্রমাণ।

অতঃপর রাগপ্রসঙ্গ। রাগের পুরোভাগেই আলাপ বা আলপ্তি। রাগের আলাপনকেই বলা হয় আলপ্তি। কিন্তু আলাপ না বলে আলপ্তি বলা হয়েছে কেন? আ+লপ্‌+ঘঞ্‌— এইভাবে আলাপ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে; আর আলপ্তি শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে আ+লপ্‌+ক্তি—এইভাবে। টীকাকার কল্লিনাথ বলছেন— ঘঞ্‌ আবির্ভাবসূচক এবং ক্তি তিরোভাবসূচক। শার্ঙ্গদেবের মতে আলপ্তি শব্দটিই আলাপনের পূর্ণতার প্রতীক, কেননা এই শব্দে রাগের আবির্ভাব এবং তিরোভাব এই দুটিই প্রকটিত হচ্ছে। আবির্ভাব না ঘটলে তিরোভাবকে সম্পূর্ণভাবে দেখানো যায় না। এই আলপ্তি দুই প্রকার— রাগালপ্তি এবং রূপকালপ্তি। সাধারণভাবে বলতে গেলে রাগালপ্তি হচ্ছে রাগের বিশিষ্ট স্বরগুলিকে কেন্দ্র করে আলাপন এবং রূপকালপ্তি হচ্ছে প্রবন্ধসংগীতের অনুসরণে আলাপন। আলংকারিক দৃশ্যকাব্য রূপকের সংজ্ঞানির্ণয় উপলক্ষ্যে বলেছেন— 'রূপারোপাৎতুরূপকম্‌'; অর্থাৎ রূপের আরোপ হচ্ছে রূপক। যেমন রাম হচ্ছে প্রকৃত রূপ এবং নটের উপর সেই রূপের আরোপ করা হচ্ছে; অথবা নটকর্তৃক রাম রূপায়িত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেই রকম অর্থাৎ নিবদ্ধ সংগীতের যে বিশিষ্ট রূপ রয়েছে স্বরালাপে সেই রূপটিকেই ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। প্রবন্ধসংগীতের অনুকরণে এই রূপায়নকেই বলা হয়েছে রূপকালপ্তি। বর্তমানে যে ভাবে আলাপ করা হয় তাতে রাগালপ্তি বা রূপকালপ্তি আলাদাভাবে বোঝা যায় না, তবে রূপকালপ্তির একটা প্রয়াস দেখা যায়।

যেসকল কর্তব্যদ্বারা রাগের অবয়ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয়েছে স্থায়। আমাদের বর্তমান সংগীতের প্রথম কলি স্থায়ী সম্ভবত এই স্থায় থেকেই এসেছে। রাগসংগীতের বিভিন্ন টেকনিকের সূক্ষ্মবিচার করেছেন শার্ঙ্গদেব। এর সংখ্যা এক শতের কাছাকাছি। এযুগেও এই স্থায়-প্রকরণটি বিশেষভাবে অনুশীলন করা দরকার, কেননা এইসব পরিভাষা বর্তমানেও বহুলভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সাংগীতিক আলোচনায়। বর্তমান সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে ছায়া অংশ ভজন প্রভৃতি কয়েকটি স্থায় বিশেষ চিত্তাকর্ষক। এই প্রসঙ্গে উক্ত তিনটি স্থায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে।

ছায়াকে কাকুও বলা হয়েছে। কাকু হচ্ছে ধ্বনির বিকার। কথা বলার বিবিধ ভঙ্গি আছে— উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যে বা গলার আওয়াজে অনেক সময় এক-একটা কথার বিশেষ অর্থ ফুটে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যকেই সংগীতশাস্ত্রে কাকু বলা হয়। অলংকারশাস্ত্রে কাকু বক্রোক্তির একটি অঙ্গ। রাগসংগীতে ছায়াস্থায় ছয় প্রকার— স্বরকাকু রাগকাকু অন্যরাগকাকু দেশকাকু ক্ষেত্রকাকু এবং যন্ত্রকাকু।

নির্দিষ্ট স্বরের যে শ্রুতি, গাইবার কায়দার তার কিঞ্চিৎ ন্যূনত্ব বা অধিকত্ব হলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয় তাকে স্বরকাকু বলে।

গানের মূলরাগের উপর সমধর্মী অপর রাগের ছায়াপাত হলে তাকে বলা হয় অন্যরাগকাকু। কিন্তু মুখ্যরাগেরই ছায়াপাত ঘটলে সেটি হবে রাগকাকু।

প্রতি দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী সংগীতে যে ছায়াপাত হয় তাকে বলা হয় দেশকাকু। বাঙালি যখন খেয়াল বা টপ্পা গান করেন তখন সেটা হিন্দী-গান হলেও তাতে বাংলার একটি প্রকৃতিগত ছায়াপাত ঘটে। এটিই হচ্ছে দেশকাকু। আমরা যাকে ঘরোয়ানা বলি সেটাও বলতে গেলে দেশকাকু।

প্রতি শিল্পীর যে একটি নিজস্ব গাইবার ঢং আছে তাতে তার দৈহিক প্রভাব অনেক পরিমাণে কার্যকর হয়। এই দেহগত প্রভাবটিই হচ্ছে ক্ষেত্রকাকু।

যান্ত্রিক ছায়াপাতকে যন্ত্রকাকু বলে। যন্ত্রস্থায় বলে আর-একটি টেকনিক আছে। এটি আর যন্ত্রকাকু এক জিনিস নয়। যন্ত্রস্থায় বলতে যন্ত্র দ্বারা রাগের প্রসার বোঝায়, কিন্তু যন্ত্রকাকু বলতে সংগীতের উপর যন্ত্রের কোনো-একটি বিশেষ প্রভাবকে বোঝায়।

অন্তরাগ স্থায়ের মত অপর একটি স্থায়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে, এর নাম অংশ। এ ক্ষেত্রেও একটি রাগে অপর রাগের অবয়ব সন্নিবিষ্ট হচ্ছে, কিন্তু অন্তরাগের সঙ্গে অংশের তফাত এই যে, এ ক্ষেত্রে প্রকৃত-রাগে অপর রাগের যে অংশ প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে এটি সব সময় প্রকৃত রাগের সমশ্রেণীয় হবে এমন নয়, বৈচিত্র্য এবং শোভাবর্ধনের জন্য একই সংগীতে ভিন্ন শ্রেণীর রাগের সমাবেশও ঘটতে পারে। এ ছাড়া একটি হচ্ছে কেবল ছায়াপাত অপরটি অংশ অর্থাৎ অবয়বের প্রক্ষেপ।

অংশস্থায় সাত রকমের— কারণাংশ কার্যাংশ সজাতীয়াংশ সদৃশাংশ বিসদৃশাংশ মধ্যস্থাংশ এবং অংশাংশ।

কার্যভূত রাগে কারণভূত রাগের যে অংশ তাকে বলা হয় কারণাংশ এবং কারণভূত রাগে কার্যভূত রাগের প্রক্ষেপ হলে তা হবে কার্যাংশ। শার্ঙ্গদেব উদাহরণস্বরূপ বলেছেন, 'ভৈরবে যথা ভৈরব্যংশঃ'। অর্থাৎ ভৈরবীর জনক রাগ হচ্ছে ভৈরব অতএব এটি কারণভূত রাগ এবং ভৈরবী কার্যভূত রাগ। এই কারণভূত রাগ ভৈরবে কার্যভূত ভৈরবীর অংশ প্রবিষ্ট হলে সেটি হবে কার্যাংশ। কার্য-কারণ সম্বন্ধ ছাড়াও সমজাতীয় রাগের মিশ্রণ ঘটলে তাকে বলা হয় সজাতীয়াংশ এবং সজাতীয়াংশের আর-একটু ঘনিষ্ঠরূপ অর্থাৎ বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত রাগের মিশ্রণ হলে তাকে বলা হয় সদৃশাংশ। এরই উলটো মিশ্রণ হচ্ছে বিসদৃশাংশ। যে রাগে গান গাওয়া হচ্ছে তাতে অত্যন্ত বিসদৃশ একটি রাগের কোনো অংশ প্রক্ষিপ্ত হলে তাকে বলে বিসদৃশাংশ। খুব সাদৃশ্য নেই অথবা বৈসাদৃশ্য নেই এই রকম রাগমিশ্রণকে বলা হয় মধ্যস্থাংশ, অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত অংশটি মধ্যমশ্রেণীর। অংশাংশ-স্থায় সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব বলছেন, 'অংশে অংশান্তর সঞ্চারাৎ অংশাংশ ইতি কীর্তিত'। সম্ভবত রাগাদির আংশিক মিশ্রন হলে তাকে অংশাংশ আখ্যা দেওয়া হত।

এ থেকে বোঝা যায় রাগমিশ্রণের বহু সুযোগ আমাদের সংগীতে ছিল এবং শাস্ত্রকারগণ রাগসংগীত সম্বন্ধে কঠোর মনোভাবাপন্ন বা শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন না। সৌন্দর্য এবং সৌকর্যের জন্য সবরকম কর্তব্যকেই শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেছেন। বর্তমান যুগে যাঁরা সংগীতের শুদ্ধতা নিয়ে অতিরিক্ত কড়াকড়ি করেন এবং কোনোরকম মিশ্রণকেই শাস্ত্রের নজির দেখিয়ে ক্ষমা করেন না তাঁদের বোধ হয় জানা নেই যে, রাগমিশ্রণ শাস্ত্রের অননুমোদিত নয় এবং কল্লিনাথের মত জ্ঞানী ব্যক্তিও সংগীতে শোভাবর্ধনের জন্য এই মিশ্রণকে স্পষ্টভাষায় সমর্থন করেছেন।

'ভজন' শব্দটি বর্তমানে আমরা যেভাবে ব্যবহার করি পূর্বে ঠিক এভাবে ব্যবহার করা হত না। রঞ্জকত্বগুণ সমধিক থাকলে তাকে ভজন বলা হত। রত্নাকর ভজন সম্বন্ধে বলেছেন—'রাগস্যাতিশয়াধানং প্রযত্নাৎ ভজনং মতম্'। সিংহভূপাল এখানে রাগের রঞ্জকত্ব অর্থ গ্রহণ করেছেন। রাগের অতিশয়াধান বলতে অবিকৃত এবং orthodox ভাবে রাগের প্রয়োগও বোঝাতে পারে, কিন্তু সিংহভূপালের সিদ্ধান্তই বোধ হয় সংগত। যেসব কর্তব্যে সংগীত মনোহারী হয়ে উঠত তাকে, অর্থাৎ খুব মিষ্টিগানকেই, ভজন বলা হত।

ভজন অর্থে ভক্তিরসাশ্রিত গান বোঝায়। এই ধরনের গানেরও প্রধান গুণ হচ্ছে রঞ্জকত্ব। মধ্যযুগে প্রচলিত মধুর এবং স্থললিত গানগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক রচনার প্রাধান্য ছিল বলেই বোধ হয় এই শ্রেণীর গান ভজন বলেই অভিহিত হয়ে এসেছে।

এর পরে রাগসংগীতের পরিচয়। নানা কারণে আমাদের দেশে যেমন জাতিবিভাগ হয়েছে, তেমনি সংগীতের বিস্তৃতির সঙ্গেসঙ্গে একটা জাতিবিভাগের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন লক্ষণ মিলিয়ে স্বরের একটা ছক তৈরি হল এবং এই হল জাতির গোড়াপত্তন। ক্রমে আঠারো রকমের জাতি তৈরি হল এবং এগুলি বহুদিন প্রচলিত ছিল। জাতির লক্ষণ কি? লক্ষণ হচ্ছে দশটি— গ্রহ অংশ তার মন্দ্র ন্যাস অপন্যাস অল্পত্ব বহুত্ব ষাড়ব এবং ঔড়ব। অর্থাৎ কোথায় ধরতে হবে কোথায় ছাড়তে হবে, কোন্ স্বরটার ব্যবহার বেশি হবে কোন্টার কম, কোন্টায় ছ'টা স্বর, কোন্টায় পাঁচটা— এইসব লক্ষণ মিলিয়ে এক-একটি জাতি তৈরি হল। পরবর্তী যুগে ঠিক এই লক্ষণগুলিই রাগসংগীতের উপর অর্পিত হয়েছে। স্বর তাল এবং পদ সহযোগে যে জাতিসংগীত রচিত হয়েছিল তাকে বলা হত গান্ধর্ব এবং এরই অন্তর্গত ছিল চারটি গীতি— মাগধী অর্ধমাগধী সম্ভাবিতা আর পৃথুলা। এইসব গীতি সেকালকার নাটকে ব্যবহৃত হত কিন্তু সেকালকার নাট্যসংগীত ধ্রুবার মত এরা নাটকের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল না। এই সময় থেকেই নাট্যের মাধ্যমে আমাদের রাগসংগীত বিকশিত হয়ে উঠেছে। পরবর্তী কালের শাস্ত্রীয় উল্লেখ থেকে এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, রাগসংগীত নাটকের মাধ্যমেই পরিপুষ্ট হয়েছে।

ক্রমে আঠারোটি জাতিতেও কুলিয়ে উঠল না। বহুতর মনুষ্যধারার সঙ্গে আমাদের মিশ্রণ ঘটল, তাদের অনেক জিনিস আমরা আত্মসাৎ করতে লাগলুম। দ্রুতগতিতে সংগীতের সম্প্রসারণ ঘটতে লাগল। ফলে, আস্তে আস্তে জাতিগুলির জাত যেতে লাগল এবং জাতিচ্যুত গায়নপদ্ধতিগুলি রাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের যুগোপযোগী রূপ প্রদান করতে লাগল। এই বিবর্তনের সম্পূর্ণ ইতিহাস আমাদের জানা নেই, কেননা যথেষ্ট উপাদান এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এই পরিবর্তন অনেকদূর অগ্রসর হয়ে যখন রাগসংগীতে ভাষারাগের প্রাধান্য চলেছে তখন মতঙ্গ প্রণীত বৃহদ্দেশীতে এর কিছুটা বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু জাতি কথাটি কেন উঠে গেল এবং কিভাবে ক্রমে ক্রমে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেটি জানা গেল না। তবে তিনি স্পষ্টভাষায় এ কথা বলেছেন যে, উক্ত দশলক্ষণযুক্ত গীতের নামই রাগ এবং এইসব গীতগুলি নাটকের পূর্বরঙ্গ প্রস্তাবনা গর্ভসন্ধি প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হত।

এই সময় যে গীতগুলিকে আশ্রয় করে রাগসংগীত বিস্তৃত হচ্ছিল সেগুলি আর মাগধী অর্ধমাগধী নয়, অনেক পরিবর্তনের ফলে সেগুলি তাদের রূপ অনুযায়ী অন্য আখ্যা পেয়েছিল। এই গীতগুলি হচ্ছে— শুদ্ধা ভিন্না গৌড়ী বেসরা বা রাগগীতি সাধারণী ভাষা এবং বিভাষা।

শুদ্ধা গীতি ছিল সরল এবং অবক্র। এই গানে স্থকুমার স্বরের প্রয়োগ হত এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্য লালিত্য। ভিন্নাগীতি ছিল কিছুটা বিকৃত ; তবে, সূক্ষ্ম মধুর এবং গমক -যুক্ত। গৌড়ীগীতি ছিল প্রখর— এতে গমকের বাহুল্য ছিল। বেসরাগীতির আর-একটি নাম রাগগীতি। এর কারণ হল গানক্রিয়ায় ব্যবহৃত স্থায়ী আরোহী অবরোহী এবং সঞ্চারী এই চারটি বর্ণের সমান প্রয়োগ এই জাতীয় গানে দেখা যেত। শুদ্ধা ভিন্না গৌড়ী এবং বেসরা এই চার রকমের গীতির নানা লক্ষণ মিশ্রিত যে সংগীত প্রচলিত ছিল তার নাম সাধারণী।

এইসব গীতিতে যে স্বর প্রযুক্ত হত এবং যেভাবে এসব গান গাওয়া হত, মূলত তাতে জাতিগায়নপদ্ধতি অবলম্বিত হলেও তার নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে ষড়্জ এবং মধ্যমগ্রামকে অবলম্বন করে এই স্বরের নাম হল গ্রামরাগ। এই উৎপত্তিকে এইভাবে সাজানো যায়—

গ্রামরাগ	শুদ্ধসাধারিত
গীতি	শুদ্ধা
গ্রাম	ষড়্জ
জাতি	ষড়্জমধ্যমা
বিনিয়োগ	গর্ভসন্ধি
রস	বীর, রৌদ্র

এই বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, রাগসংগীত বিশেষভাবে নাট্যে ব্যবহৃত হত এবং নাট্যসংগীতই প্রধানত রাগসংগীতের প্রেরণা দিয়েছে। পূর্বরঙ্গ গর্ভসন্ধি নির্বহণ প্রভৃতিতে বিশেষভাবে গ্রামরাগের ব্যবহার ছিল। এ ছাড়া মৃগয়ায় প্রবৃত্ত নায়কের প্রবেশ, সূত্রধরের প্রবেশ, গৃহী বা তাপসের প্রবেশ, কঞ্চুকীর প্রবেশ, অরণ্যে শ্রান্ত অবস্থায় স্থিতি, পথভ্রষ্ট অবস্থায় স্থিতি—এই সব ব্যাপারেও রাগসংগীতের ব্যবহার ছিল। নাটকের নানা রসে এর প্রয়োগ তো বহুলভাবেই হত।

ক্রমে এই পাঁচটি গীতিতেও নানা মিশ্রণ সংঘটিত হল এবং রাগসংগীত বিস্তৃত হল ভাষা বিভাষা এবং অন্তরভাষায়। এইসব মিলে মিশে তারও পরবর্তীকালে উদ্ভূত হল রাগাঙ্গ ভাষাঙ্গ এবং ক্রিয়াঙ্গ। শার্ঙ্গদেবের সময় এইসব রাগসংগীতের প্রচলন ছিল। এ ছাড়া কয়েকটি স্বর ছিল যাদের বলা হত উপরাগ এবং রাগ। এগুলির মূলও গীতি এবং গ্রামরাগ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। এই ভাবে ক্রমাগত মিশ্রণ চলতে চলতে গোষ্ঠীগুলি শিথিল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত রইল শুধু রাশি রাশি রাগ। পূর্বোল্লিখিত গীতিগুলির বদলে বিভিন্ন প্রবন্ধসংগীতের অভ্যুত্থান হল। ক্রমে তাদের পরিচয়ও লুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে রাগসংগীত আশ্রয় করে আছে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরি এইসব গানকে।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, শার্ঙ্গদেব রাগসংগীতের বিচারে প্রবন্ধসংগীতের উপর গুরুত্ব অর্পণ করেন নি এবং বলতে গেলে অগ্রাহ্যই করেছেন। রাগবিবেক অধ্যায়ে তিনি উদাহরণস্বরূপ যেসব গানের উল্লেখ করেছেন তাদের নাম আক্ষিপ্তিকা। গ্রামরাগাদি গান্ধর্ব সংগীতের বিকাশ আক্ষিপ্তিকা নামক চচ্চৎপুটাদি তালে নিবদ্ধ মার্গত্রয়ভূষিত এবং স্বরপদগ্রথিত সংগীতের মাধ্যমেই হয়েছে। আক্ষিপ্তিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কল্লিনাথ বলছেন—'পদতালাভ্যাক্ষিপ্তত্বাদাক্ষিপ্তিকেত্যন্বর্থা'। প্রবন্ধসংগীতে রাগের ব্যবহার হলেও সে যুগে তাদের রাগসংগীতের পর্যায়ে ফেলা হত না। এসব গান ছিল লঘুতর শ্রেণীর এবং এদের মূল্য সংগীতের সংগঠনের দিক দিয়ে অন্যভাবে নির্ণয় করা হয়েছে।

বর্তমানে আমরা যে ধ্রুবপদ গান করি তার মূল হচ্ছে সূড়প্রবন্ধ, যেটি শার্ঙ্গদেব প্রবন্ধ-অধ্যায়ে সাধারণ কাব্যসংগীত হিসাবে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ আসল রাগসংগীত বলতে ধ্রুবপদ বোঝায় না, তার পরিচয় ছিল স্বতন্ত্র। অতএব আজকের যুগের ধ্রুবপদ যে সাক্ষাৎভাবে রাগসংগীতের ঐতিহ্য বহন করে না, এটা না স্বীকার করে উপায় নেই।

অতঃপর প্রবন্ধসংগীত। প্রবন্ধ বলতে গান বোঝাচ্ছে, গান্ধর্ব নয়। গান্ধর্ব হচ্ছে সেকালের রাগসংগীত।

গান হচ্ছে প্রচলিত দেশী সংগীত যা বাগ্‌গেয়কার রচনা করেন। বাক্য এবং গেয় এই দুই অংশকেই যিনি পরিস্ফুট করেন তিনি বাগ্‌গেয়কার বলে পরিচিত। বাগ্‌গেয়কারের যে লক্ষণ আমাদের শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে তা থেকে ধারণা হওয়া উচিত যে, একজন প্রকৃত শিল্পী মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং প্রায় সব শাস্ত্রেই তাঁর পারদর্শিতা ছিল। এতবড় পণ্ডিত হওয়া বিশেষ কঠিন ব্যাপার সুতরাং সবাই যে সর্ববিদ্যাপারঙ্গম ছিলেন এমন নয়, শাস্ত্রে একটু বাড়িয়েই বলা হয়েছে, তবে শিল্পীর একটি নির্দিষ্ট মান ছিল এবং সাধারণত তাঁরা উচ্চশিক্ষিত হতেন।

বাগ্‌গেয়কারের লক্ষণ বর্ণনা করা যাক। শব্দানুশাসন এবং অভিধানে তাঁদের প্রবীণতা থাকত। শব্দানুশাসন মানে ব্যাকরণশাস্ত্রে জ্ঞান। ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তির জন্য তাঁরা কোন্‌টা সুশব্দ আর কোন্‌টা অপশব্দ তা বিবেচনা করতে সক্ষম হতেন। ছন্দশাস্ত্রে তাঁদের বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং অলংকারশাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি ছিল। বিভিন্ন রস এবং ভাব -বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাঁরা অভিজ্ঞ ছিলেন। বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন তাঁরা এবং বিভিন্ন কলাশাস্ত্রেও তাঁদের দক্ষতা ছিল। এঁদের কণ্ঠ সম্বন্ধে 'হৃদ্যশারীর'-আখ্যা দেওয়া হয়েছে। হৃদ্য শব্দের মানে হচ্ছে রমণীয়। রাগসংগীতে দক্ষতা যাঁদের শরীরের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই উৎপন্ন হয়েছে তাঁদের শারীর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শক্তি থাকলেও সাধনার দরকার হয় এবং অনেকেই বিশেষ অভ্যাসের ফলে রাগের অভিব্যক্তিতে সমর্থ হন। যিনি প্রকৃত বাগ্‌গেয়কার তাঁর স্বাভাবিক ধ্বনিই এমনি যে, অভ্যাস ছাড়া স্বভাবতই তাঁর কণ্ঠ রাগাভিব্যক্তিতে সমর্থ হয়। এই স্বাভাবিক ক্ষমতাই হচ্ছে শারীরগুণ। লয় তাল এবং মাত্রাজ্ঞান ছাড়া নানারকম ধ্বনির বিকার সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল। এই ধ্বনিবিকারের নাম কাকু। এর উল্লেখ পূর্বেই করেছি। বাগ্‌গেয়কারকে প্রভূত প্রতিভাশালী বলা হয়েছে। প্রতিভা হচ্ছে প্রজ্ঞাবিশেষ। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান— এই ত্রিকালের পরিপ্রেক্ষিতে যে নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা তাকেই প্রতিভা বলা হয়। অতএব প্রজ্ঞাসম্পন্ন শিল্পীর সৃষ্টিতে চিরন্তনগুণ বর্তমান। দেশী রাগে এঁদের অভিজ্ঞতা ছিল, চিত্তের সরসতা ছিল এবং আর-একটি মহৎগুণ ছিল সেটি হচ্ছে— উচিতজ্ঞতা। রসভঙ্গ যাতে না হয় তার জন্য কোন্ কোন্ প্রয়োগ কী পরিমাণে করতে হবে— এই ঔচিত্যবোধকেই উচিতজ্ঞতা বলা হয়েছে। বর্তমানযুগে ওস্তাদদের এই উচিতজ্ঞতার অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রখর কাব্যরসবোধ এবং দ্রুতগীতনির্মাণ-ক্ষমতা এঁদের ছিল। এ ছাড়া সাংগীতিক সংগঠনকে তাঁরা সংগতভাবে রক্ষা করতেন। মন্দ্র মধ্য তার— এই তিনস্থানে এঁদের কণ্ঠ স্বাভাবিকভাবে সঞ্চরণ করত। আলাপেও এঁদের দক্ষতা ছিল।

এতগুলি গুণ যাঁদের ছিল তাঁরাই ছিলেন উত্তম বাগ্‌গেয়কার। যাঁরা গানের অবয়ব সম্বন্ধে অর্থাৎ টেকনিকের উপর অধিক মনোযোগ দিতেন এবং বাক্যাংশের দিকে তেমন নজর দিতেন না তাঁরা ছিলেন মধ্যমশ্রেণীর। যাঁরা বাক্যাংশ ভালোই প্রস্তুত করতেন অথচ সংগীতাংশ ভালো সংযোগ করতে পারতেন না তাঁরা অধমশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হতেন।

সংগীতরচয়িতা সম্বন্ধেও এইরকম বিভাগ করা হয়েছে। যিনি উত্তমভাবে বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করতে পারেন তিনি বস্তুকবি। যিনি বর্ণনায় ভালো তিনি বর্ণকবি; আর যিনি কথা এবং সুর এই দুইএর মধ্যে সংগতি রেখে সৃষ্টি করতে পারেন না তিনি হচ্ছেন কুট্টিকার। বলা বাহুল্য, কবি হিসাবে ইনি অধমশ্রেণীর মধ্যে পড়েন। কুট্টন শব্দের মানে হচ্ছে ছেদন। এই থেকেই কুট্টিকার কথাটা এসেছে। অর্থাৎ,

যাঁর রচনা রসের দিক থেকে কাব্য এবং সংগীতের মধ্যে একটি ছেদ সৃষ্টি করে— এইরকম রচয়িতাকেই কুট্টিকার আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বাগ্‌গেয়কারগণ যে গানকে অবলম্বন করছিলেন তা ছিল নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ। এই নিবদ্ধ গানই আমাদের বর্তমান সংগীতের উৎপত্তিস্থল। নিবদ্ধ গান হচ্ছে ধাতু (বর্তমানে কলি) এবং অঙ্গ দ্বারা বদ্ধ সংগীত[১]; আর অনিবদ্ধ হচ্ছে আলপ্তি জাতীয় সংগীত, যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আমাদের বর্তমান স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ— এইসব কলি প্রবন্ধসংগীতেরই পরিণতি। এবং মধ্যে অন্তরা এবং আভোগ নাম দুটি পূর্বেও ছিল এখনও আছে।

রত্নাকরে বহুপ্রকার প্রবন্ধের উল্লেখ এবং বর্ণনা আছে। এইসব প্রবন্ধের বিশেষ গুরুত্ব আছে, কেননা উত্তম গবেষণা হলে ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত সংগীতের সঙ্গে এইসব প্রাচীন সংগীতের সম্বন্ধনির্ণয় করা সম্ভব হবে।

রত্নাকরের প্রবন্ধসংগীতের সঙ্গে বর্তমান ধ্রুপদপ্রমুখ প্রবন্ধসংগীতের তফাত এই যে, রত্নাকরের সময় এই-সব গান ছিল কাব্যসংগীত অথবা বড়জোর রাগাশ্রয়ী কাব্যসংগীত, আর বর্তমানে এইসব গানই রাগসংগীতের মর্যাদা পাচ্ছে এবং এদের ছায়া নিয়ে আবার নতুন রাগপ্রধান গান রচনা করা হচ্ছে। অতএব, এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ধ্রুপদ প্রভৃতি গানকে শাস্ত্রীয় রাগসংগীত বলা সংগত হবে বলে মনে হয় না; তবে, প্রাচীন রাগসংগীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর আর কোনো সংগীত যখন নেই তখন এদের যতটুকু কৌলীন্য ততটুকু অবশ্যই স্বীকার্য।

সংগীত সম্বন্ধীয় যেসব রচনা শাস্ত্রপদবাচ্য তাতে একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়; সেটি হচ্ছে সংগীতের সর্বাঙ্গীণ বিচার। সংগীতশাস্ত্রকে অলংকার শাস্ত্রের আদর্শে রচনা করবার একটি বিশেষ চেষ্টাও হয়েছিল। অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে যার সঙ্গে অলংকারশাস্ত্রের সম্বন্ধ রয়েছে। যেমন, অলংকারশাস্ত্রের গৌড়ীরীতি এবং সংগীতশাস্ত্রের গৌড়ীগীতি। গৌড়ীরীতি হচ্ছে ওজঃপ্রকাশক বর্ণ দ্বারা বদ্ধ আড়ম্বরযুক্ত সমাসবহুল রচনা; আর গৌড়ীগীতি হচ্ছে গাঢ় গমক এবং কম্পনবহুল মন্দ্র-মধ্য-তার স্থানে পরিব্যাপ্ত রমণীয় স্বরে নিবদ্ধ গীতি। এই গীতিতেও ওজস্বিতার অভাব ছিল বলে মনে হয় না। কল্লিনাথ গৌড়ীগীতি সম্বন্ধে লিখেছেন— 'গৌড়প্রিয়তাৎ গৌড়ী ইতি সংজ্ঞা অবগন্তব্যা'। গৌড়ের স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতার পরিচয় সেকালকার গানে ছিল। গানক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সঙ্গেও অলংকারশাস্ত্রের ব্যবহৃত শব্দের মিল আছে। উদাহরণস্বরূপ 'অপস্বরাভাস' শব্দটির উল্লেখ করা যেতে পারে। যে কাজটি সুস্বরযুক্ত হলেও অপস্বরের ন্যায় প্রতীয়মান হয় তাকে বলে— অপস্বরাভাস। এই প্রসঙ্গে রসাভাসের কথা স্বতই মনে আসে। রসের ক্ষেত্রে অনৌচিত্যপ্রযুক্ততা হলে তাকে বলা হয় রসাভাস। এ ক্ষেত্রেও স্বরের প্রযুক্ততায় অনৌচিত্য ঘটলে তাকে বলা হয়েছে অপস্বরাভাস। অর্থাৎ সুস্বর হবার সব উপকরণ থাকা সত্ত্বেও অনৌচিত্য দোষে তা সুস্বরের অন্তর্গত হতে পারে না।

আলংকারিকদের অনুবর্তী শার্ঙ্গদেব এবিষয়ে অগ্রণী হয়ে একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে সংগীতসাহিত্য হীনতর প্রতিভার হাতে পড়ে আদর্শচ্যুত হয়েছে। মধ্যযুগের অন্তে

১ বিশ্বভারতী-পত্রিকা কার্তিক-পৌষ ১৩৬৩ "কীর্তন ও ধ্রুবপদ" এবং মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩ "সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে নরহরি বর্ণিত গীতি" নিবন্ধে গীত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

দেখা যায় সংগীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিচারের পরিবর্তে এক-একটি বিষয়ের বিচ্ছিন্ন আলোচনা এবং নিরর্থক বাগ্‌বিস্তার বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে প্রাচীনশাস্ত্রের অর্থবোধে অকৃতকার্য হয়ে তাদের কয়েকটি অংশ হুবহু আত্মসাৎ করে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত বস্তুর এমন একটি মিশ্রণ ঘটিয়েছেন যে তাতে এ যুগের পাঠককে বিলক্ষণ অসুবিধায় পড়তে হয়। এর ফলে, এ যুগের সাংগীতিক আলোচনায় পূর্ববর্তী সংগীতের বিচারে এবং তার প্রকৃত উপলব্ধিতে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি হয়েছে। এইসব ত্রুটির দরুন সংগীতশিক্ষা অনেকটা কারিগরি শিক্ষার মত প্রচলিত হয়ে আসছে। আমাদের সংগীতের যে একটা তত্ত্ব দর্শন এবং অলংকারের দিক ছিল সেইটা আজ আবার আলোচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন, নইলে ভারতীয় সংগীতের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

আচার্য ও উপাচার্য

রাজশেখর বসু

কালক্রমে অনেক শব্দের মানে বদলায়। সংস্কৃত অভিধানে যেসব অর্থ পাওয়া যায় আধুনিক বাঙলা প্রয়োগে বহু ক্ষেত্রে তার অল্পাধিক পরিবর্তন হয়েছে। পাঠশালা আর বিদ্যালয় এই দুইএর মূল অর্থ একই, কিন্তু আজকাল মানে বদলে গেছে। সেই রকম— বৈদ্য ও চিকিৎসক, অভ্যর্থনা ও প্রার্থনা, ঘটনা ও যোজনা, প্রণাম ও নমস্কার। অনেক শব্দের অর্থব্যাপ্তি (connotation) আগের মতন নেই, যেমন, সাহিত্য-এর অর্থ প্রসারিত হয়েছে, কাব্য-এর অর্থ সংকুচিত হয়েছে। ধাতু বললে সাধারণ শিক্ষিত লোকে বোঝে metal, কিন্তু কবিরাজরা প্রাচীন অর্থ অনুসারে অধিকন্তু বোঝেন হরিতাল হিঙ্গুল প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ এবং রক্ত মাংস প্রভৃতি দৈহিক উপাদান।

একালে রাষ্ট্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সেকালের মতন নয়, সেজন্য অনেক শব্দের প্রাচীন অর্থ কিছু না বদলালে আমাদের আধুনিক প্রয়োজন মেটে না। কিন্তু মূল অর্থের সঙ্গে নূতন অর্থের ভাবগত বিরোধ যাতে না হয় তা দেখা দরকার। স্নাতক-এর একটি প্রাচীন অর্থ— বিদ্যাশিক্ষান্তে যে ব্রহ্মচর্য-সমাপ্তিসূচক স্নান করেছে। সমাবর্তন-এর অর্থ— ব্রহ্মচর্যের অন্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ। আজকাল এই দুই শব্দ গ্র্যাজুয়েট ও কনভোকেশন অর্থে চলছে। এতে আপত্তির কারণ কিছু নেই। নাচ-গানের স্কুলকে বিদ্যালয় বলা যেতে পারে, কিন্তু পাঠশালা বলা চলবে না, সেখানকার শিক্ষককেও গুরুমশায় বা অধ্যাপক বলা চলবে না।

কুলপতি শব্দের আভিধানিক অর্থ— যে বিপ্রর্ষি দশসহস্র মুনিকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। যেমন অক্ষৌহিণী শব্দের বিবৃতিতে ৬৫,৬১০ অশ্ব, ২১,৮৭০ গজ ইত্যাদির উল্লেখ আছে তেমনি কুলপতির বিবৃতিতে ১০,০০০ শিক্ষার্থী মুনির উল্লেখও পৌরাণিক সংখ্যান ধরা যেতে পারে। দশসহস্র শিষ্যের অর্থ অনেক শিষ্য, দু-এক হাজার বা দু-পাঁচ শ ও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর কুলপতি ছিলেন একথা বললে প্রাচীন অর্থের অপলাপ হবে মনে করি না।

মনুর বচন অনুসারে আচার্য শব্দের অর্থ— যে দ্বিজ শিষ্যকে উপনীত করে বেদাঙ্গ ও উপনিষৎ সমেত বেদ শিক্ষা দেন। আপ্তের অভিধানে আচার্য-এর একটি অর্থ দেওয়া আছে— (When affixed to proper names) learned, venerable (somewhat like the Eng. Dr)। এইসব অর্থের কালোচিত পরিবর্তন করলে রবীন্দ্রনাথের আচার্য উপাধিও সার্থক। গুরু আর আচার্য প্রায় সমার্থক, সেজন্য তাঁর গুরুদেব উপাধিও সার্থক।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আর বিশ্বভারতীর শুধু প্রতিষ্ঠাতা নন, বহুকাল স্বয়ং অধ্যাপনা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষার বিধায়ক ছিলেন। এ কারণে আচার্য উপাধি সর্বতোভাবেই তাঁর উপযুক্ত। বিশ্বভারতী এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, তার চানসেলর নেহরুজী দিল্লিতে থাকেন, কালেভদ্রে বিশেষ উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে আসেন, প্রশাসন বা administration সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে তাঁর সম্মতি নিতে হয়। কোনও স্কুল বা কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্টকে আচার্য বা অধ্যাপক বললে

যে দোষ হয়, বিশ্বভারতীর চানসেলরকে আচার্য বললেও সেই দোষ হয়। বিশ্বভারতী বা কলিকাতা বা অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের চানসেলরের পদে যিনি অধিষ্ঠান করেন তিনি রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী বা রাজ্যপাল যাই হ'ন, তাঁকে আচার্য বলা নিতান্ত অসংগত। চানসেলর আর আচার্য এই দুই শব্দে অর্থগত বা ভাবগত সাদৃশ্য কিছুমাত্র নেই।

কলেজের প্রিনসিপাল অধ্যাপনাও করতে পারেন। কিন্তু অধ্যাপনার উপর গুরুত্ব না দিয়ে তাঁকে শুধু প্রাধান্যসূচক পদবী দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি অধ্যাপকবর্গের প্রধান এবং পরিচালক। প্রিনসিপাল-এর প্রতিশব্দ অধ্যক্ষও প্রাধান্য ও কর্তৃত্বসূচক। Concise Oxford Dictionary-তে *University* Chancellor-এর অর্থ— titular head with Vice-c. acting, অর্থাৎ চানসেলর পদবীতে প্রধান হলেও ভাইসচানসেলরই প্রকৃত কর্তা। চানসেলরের যা অধিকার তা প্রশাসন বা ব্যয়-অনুমোদন সংক্রান্ত, তাঁকে আচার্য বলার পক্ষে কিছুমাত্র যুক্তি নেই।

ভাইসচানসেলরকে উপাচার্য বলা আরও আপত্তিজনক। ইংরেজী ভাইস-এর অন্ধ অনুকরণে বাঙলায় উপ- উপসর্গের প্রয়োগ একবারে নিরর্থক। ভাইসচানসেলর ইচ্ছা করলে অধ্যাপনা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃত কর্ম প্রশাসন বা পরিচালন। ইংরেজী নামে ভাইস- উপসর্গ সত্ত্বেও তিনি কারও স্থলাভিষিক্ত বা সহকারী নন। উপাচার্য শুনলে মনে আসে assistant professor। এই উপাধি তাঁর শুধু অযোগ্য নয়, মর্যাদাহানিকরও বটে।

সরকারী কার্যের পরিভাষা সংকলনের জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার একটি সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন। এই সমিতির সংকলিত তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কয়েকটি পরিভাষা আছে, যেমন— Senate অধিষদ্, Syndicate নিষদ্, Registrar নিবন্ধক, Vice-chancellor অধিপাল, Chancellor মহাধিপাল। (এই সংজ্ঞাগুলির রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য এম. এ. কাব্যসাংখ্যপুরাণতীর্থ)। কলেজের প্রধান যেমন অধ্যক্ষ, সরকারী বিভাগের ডিরেক্টর যেমন অধিকর্তা, কোনও সংঘের প্রধান নেতা বা নিয়ন্তা যেমন অধিনায়ক, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি প্রধান নিয়ন্তা তিনি অধিপাল।

একালের ভাইসচানসেলর (বিশেষত বিশ্বভারতীর তুল্য আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের) সেকালের কুলপতিরই সমপর্যায়ের। অধিপাল উপাধিতে তাঁর অধিনায়কত্ব ও পদোচিত গৌরব সূচিত হয়। চানসেলরকে আচার্য আখ্যা না দিয়ে মহাধিপাল বললে তাঁরও যথোচিত মর্যাদা বজায় থাকে।

৩।৯।৫৭

দর্শনচর্চার ভূমিকা

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

অনুবাদকের প্রস্তাবনা

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। এতদিন পরে ক্রমশ তাঁর যশ দেশে ও বিদেশে ছড়াতে শুরু করেছে। প্রাপ্য মর্যাদা পেতে এত দেরি হয়েছে বলে তাঁকে দেশের সাধারণ শিক্ষিত লোকে এখনো জানেন না। বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে যিনি এখন স্বীকৃত, তাঁর রচনার সঙ্গে কিছু পরিচয় রাখা দরকার। উপস্থিত প্রবন্ধটি লেখকের শেষজীবনের রচনা, যেমনি পাকা তেমনি বলিষ্ঠ চিন্তার অভিজ্ঞান। প্রবন্ধটি সোজা আর কঠিন একসঙ্গে দুইই, প্রথম আলাপীর কাছে সোজাই, অভিজ্ঞ ভাবুকের কাছে সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তাজালে ঢাকা গভীর। বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো হচ্ছে লেখকের নিরহংকার সাহস। বিশ বছর আগে লজিকাল পজিটিভিজমকে একটুখানিও স্বীকৃতি দেওয়া ভারতীয় দার্শনিকদের পক্ষে অভাবনীয় ছিল। লেখক কত সহজে তাকে স্বীকার করে সঙ্গে সঙ্গেই অতিক্রম করে গেছেন! দার্শনিকদের রচনায় নতুন কথা বা নতুন মতবাদ সত্যি খুব মেলে না। অনন্যপূর্বতা সম্ভব হয় বলবার ধরনে, ভাববার ভঙ্গিতে, উপলব্ধির বিন্যাসে। লেখকের বক্তব্যের সারকথা তাঁর মনটা থেকে আলাদা করে শোনালে আপনাদের খুব নতুন ঠেকবে না। কিন্তু বলছে যে মন তাকে বাদ দিয়ে বলা হল যে কথা তার তো বিশেষ দাম নেই। লেখকের রচনাতে দুর্লভ ও সুন্দর মননের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ মননের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় যাতে আপনাদের পক্ষে সহজ হয় তাই এই অনুবাদ।— পুণ্যশ্লোক রায়।

দর্শনচর্চা বলতে যে কি বোঝায় তার আলোচনা আমার কাছে দর্শনশাস্ত্রের কোনো একটা বিশেষ সমস্যা নিয়ে বিচার করার চেয়ে জরুরীতর ঠেকছে। বিজ্ঞান থেকে আলাদা করে দর্শনশাস্ত্র নামে কোনো জ্ঞান আদৌ সম্ভব কি না বর্তমানকালে সেটা প্রশ্নের বিষয়। আমি কোথায় দাঁড়াই তা দেখিয়ে দিতে চাই কাণ্টের দর্শনের সঙ্গে আমার মতের তফাত বুঝিয়ে।

কাণ্টের নিরিখে দিক্ নির্ণয়

অধিবিদ্যার বিষয় অর্থাৎ অধিসত্তা হিসেবে আত্মাকে জানা যায় কি না এ প্রশ্নের জবাবে কাণ্ট বলছেন— আত্মা আমাদের চিন্তার পক্ষে প্রয়োজনীয় ধারণা, আত্মা আমাদের নৈতিক বিশ্বাসের বিষয়, কিন্তু স্বরূপত সে অজ্ঞেয়। আমি বলছি— আত্মা জ্ঞেয়, যদিও তাকে চিন্তায় ধরা যায় না। অবশ্য আমরা বাস্তবিক তাকে জানি না আর তার সম্বন্ধে শুধু নৈতিক বিশ্বাসই রাখি, তবু সেই আত্মাকে যে চিন্তার মাধ্যম ছাড়াই জানা সম্ভব এটা মানতে হবে তা জানছি। এই জন্যেই যে তাকে জানাবার জন্যে আমাদের অন্তরে অন্তরে একটা দাবি রয়েছে। এই দাবি আমাদের অন্তরের অনেক আধ্যাত্মিক দাবির অন্যতম। আমি চিন্তা ও জ্ঞান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানতত্ত্বের গোটা প্রশ্নটাই ফের আলোচনায় আনতে চাই।

এই যে আমি আত্মাকে অচিন্ত্য বলছি, তার সঙ্গে সঙ্গেই আমি কাণ্ট-বর্ণিত 'প্রজ্ঞাগত

ধারণা'কে জ্ঞান, এমনকি আক্ষরিক অর্থে চিন্তা বলেও মানতে অস্বীকার করছি। অভিজ্ঞতা ছাপিয়ে চিন্তার প্রসারণ, অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা— এসব বলতে আমি বুঝি চিন্তার ভাষাগত রূপকে অচিন্ত্য কোনো সত্তার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করাটাকে। এই প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা আর চিন্তা করা কিন্তু এক নয়। আরো বলব, তর্কশাস্ত্রে যাকে চিন্তা বলে, প্রতীকীকরণ থেকে তফাত করে, সেও আক্ষরিক অর্থে চিন্তা নয়। আজকালকার স্পষ্টার্থবাদীরা অধিবিদ্যাকে অস্বীকার করলেও তাঁদের মধ্যে কেউই তর্কশাস্ত্রের সম্ভাবনাকে সংশয় করতে যাবেন না। বস্তুত তাঁরা তর্কশাস্ত্রের উপর নির্ভর করে তাকেই বিশুদ্ধ চিন্তা জেনে, অধিবিদ্যাকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে থাকেন। আমার দৃষ্টিতে তর্কশাস্ত্র বিজ্ঞানের নয়, দর্শনের অন্তর্গত। তর্কের বুদ্ধিগত রূপাবলী অধিবিদ্যার প্রতীকগুলির ছায়ামাত্র, তাই সেগুলি আপনাতে প্রতীকধর্মী।

অস্বীকৃতির দিকে আমি কাণ্টের চেয়ে আরো অনেক দূর এগিয়েছি। স্বীকৃতির দিকে কিন্তু আমি তাঁর অজ্ঞেয়বাদের স্বর নিচু করে ধরব। আত্মা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস যে আছে অথচ সেই আত্মা যে আমার জানা নয় এ কথারও উপরে বলব যে আত্মাকে চিন্তা ব্যতীত জানা যায় আর জানা দরকার। কাণ্টের দর্শনে আত্মা বা স্বাধীনতাকে 'নৈতিক স্বীকার্য' বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু নৈতিক স্বীকার্য হিসেবে এদের থিয়োরি করে লাভ হচ্ছে না নীতির দিক থেকে না অধিবিদ্যার দিক থেকে। 'নৈতিক স্বীকার্য' বলতে শুধু প্রজ্ঞাগত ধারণাই বা নন্দনী কল্পনার সৃষ্টি বোঝাবে না। এই 'নৈতিক স্বীকার্যে'র প্রবচন ও ধ্যান তাকে নৈতিক কল্যাণ বা উপভোগ্য মূল্যরূপ হিসেবে অবলোকন করবার জন্যে নয়, তাকে সত্য বলে জানবার জন্যে। এমন ধ্যান ভাববিলাস নয়, খেলাও নয়। এর পিছনে সেই বিশ্বাস থাকা চাই, যে বিশ্বাস সেই চিন্তা ছাড়া সত্যকে পাওয়া ব্যাপারটার সঙ্গে অভিন্ন। এই ধ্যান করাটা কর্তব্য নিশ্চয়ই নয়, তবে সেটা বাস্তবিক আরম্ভ হয়ে রয়েছে বলেই তাতে প্রকাশিত জ্ঞানের পূর্ণতা ঘটুক এই দাবিও এসেছে। আত্মা সত্য এই জেনে যে ধ্যান, সেটা নৈতিক চেতনা ছাড়া অন্য চেতনা থেকেও আরম্ভ হতে পারে। নৈতিক চেতনা তার মধ্যে বিশেষভাবে নাও আসতে পারে। যাকে আধ্যাত্মিক ক্রিয়া বলে চেনা যায় সে ক্রিয়া আপনিই শুরু হয়, তার অপর কোনো উৎস খুঁজবার দরকার নেই। আত্মা যে সত্য এ ধ্যান যে জ্ঞানের মধ্যে পূর্ণতা দাবি করে, সেটা অবশ্য শুধু তেমন মানুষেরই চেতনায় যার মধ্যে এই ক্রিয়া ইতিপূর্বেই আরম্ভ হয়ে গেছে। এ একটা অনন্যসাপেক্ষ পরম দাবি, অন্যান্য অনন্যসাপেক্ষ দাবিদের সমপর্যায়ী।

আত্মার বেলাতে যা, অন্য যে কোনো অধিসত্তার বেলাতেও যথাযোগ্য অদলবদল করে তাই খাটবে। অধিবিদ্যা বা তর্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানতত্ত্ব সম্বলিত দর্শনশাস্ত্র বাস্তবিক জ্ঞান নয়, এমনকি চিন্তাও নয়। তবু যে এদের বিষয়কে সত্য বলে ধ্যান করি সে শুধু এই বিশ্বাসে যে এরকম ধ্যান করেই পরম সত্যকে জানা সম্ভব হবে।

থিয়োরিধর্মী চেতনার পর্যায়ভেদ

দর্শন বলতে জ্ঞান বোঝায় কি না আর দর্শনে অক্ষরনিষ্ঠ চিন্তার কোনো কাজ আছে কি না সেটা নিয়ে হয়তো মতানৈক্য ঘটবে। সে যাই হোক, দর্শনে এমন কিছু প্রত্যয় এনে ধরে যেগুলি কথনযোগ্য, যেগুলি রীতিবদ্ধ সংজ্ঞাপনের উপযোগী। বিজ্ঞানের মতো দর্শনও থিয়োরিধর্মী চেতনার প্রকাশ।

থিয়োরিধর্মী চেতনার ন্যূনতম প্রকাশ হচ্ছে যা কথনযোগ্য তার বোধ। যা বলা যায় সেটা বলবার আগে প্রত্যয় করতে হয়। যা অপ্রত্যয় করা যায় সেটা আগে কাউকে না কাউকে একবারও অন্তত প্রত্যয় করতে হয়। শশকের শৃঙ্গ বা চতুষ্কোণ বৃত্তের মতো শব্দসংযোগের বিষয় প্রত্যয় তো করা যায়ই না, এমনকি অপ্রত্যয়ও করা যায় এপর্যন্ত বলা যায় না। অমন শব্দসংযোগ ভাষায় বলা হয় একমাত্র কি বলা হয় না তার উদাহরণ হিসেবে। কিছু বলা মানেই একটা প্রত্যয়ের প্রবচন। অনুজ্ঞাবাচক বা অন্তর্ভাববাচক কথাও বক্তার প্রত্যয়কেই প্রকাশ করে, যদিও এক্ষেত্রে প্রত্যয়টা সংজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যযুক্ত নয়। মিথ্যে কথা, অর্থাৎ যে কথায় বক্তার প্রত্যয় নেই, আর কারও কাছে না হোক অন্তত নিজের কাছে সংজ্ঞাপনের বা সাযুজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে নেই ; বক্তা তাকে বোঝে সব কথার পূর্বগামী, প্রত্যয় পাবার যে অনুক্ত বাসনা, তারই অঙ্গ বলে। প্রত্যয়ের বিষয়ই কথায় বলা সম্ভব, যা কথনযোগ্য তার বোধই থিয়োরিধর্মী চেতনা।

এই বোধ জ্ঞান নাও হতে পারে। কিন্তু কিছু যে জানা গেছে বা জানা যায় সে প্রত্যয়টা তার মধ্যে আছে। প্রকটভাবে হয়তো নেই, কিন্তু তাকে প্রকট করা সর্বদাই সম্ভব। 'জানি না' এই ভাবের প্রকট চেতনাতেও 'জানি' এই প্রত্যয় জড়িয়ে থাকে। অজ্ঞেয়বাদী, যুক্তিবিরোধী বা সংশয়বাদী— এঁরা সকলে 'জানি না' এইই মনে রাখেন। কিন্তু 'জানি না' মনে করতে গেলে 'জানি' এও মনে করতে হয়। তাঁরা অজ্ঞাতকে 'জানেন' বলতে পারেন না, কিন্তু তার প্রত্যয় রাখেন, তাই পরোক্ষে কিছু না কিছুকে জানা গেছে বলে মেনে নেন। সেই কিছু না কিছুকে ভাষাতীত বলে ধরে নেওয়া হলেও অন্ততঃ ঐ নামেই সেটা ভাষায় পরিচিত হবে। দর্শনের আওতায় এসব মতবাদ ততদূরই আসে, যতদূর এদের মধ্যে 'কিছু না কিছুকে জানি' এই প্রত্যয়যুক্ত থিয়োরিধর্মী চেতনার প্রকাশ ঘটে।

থিয়োরিধর্মী চেতনার সব রূপেই কথনযোগ্য কোনো না কোনো বিষয়ের বোধ জড়িয়ে থাকে। সাধারণত এ রূপগুলির সকলকেই 'চিন্তা' নাম দেওয়া হলেও এদের মধ্যে একটিই আক্ষরিক অর্থে চিন্তা। অন্যগুলিকে চিন্তা নাম দেওয়া উচিত নয়। সবসুদ্ধ চিন্তার চারটে রূপ বা পর্যায় ভাগ করা যেতে পারে। মোটামুটি এদের নাম দিচ্ছি অভিজ্ঞতাশ্রয়ী চিন্তা, বিশুদ্ধ বিষয়ের চিন্তা, আধ্যাত্মিক চিন্তা আর অধিরোহী চিন্তা। অভিজ্ঞতাশ্রয়ী চিন্তা বলতে বুঝি কোনো বিশেষ আধেয়ের সম্বন্ধীয় থিয়োরিধর্মী চেতনার সেই রূপ যাতে প্রত্যক্ষলভ্য বা প্রত্যক্ষলভ্য বলে কল্পিত বিষয়ের প্রতি নির্দেশ রয়েছে, উপরন্তু যার পক্ষে এই নির্দেশ আধেয়ার্থের অন্তর্গত। এমন আধেয়ও আছে যেগুলি বিষয়নির্দেশী হলেও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক জানায় না। এই ধরনের আধেয়ের চেতনাকে বিশুদ্ধ বিষয়ের চিন্তা বা 'অবলোকনী' চিন্তা বলা যেতে পারে। আধ্যাত্মিক চিন্তার আধেয় কোনো 'বিষয়' নয়, এমন কিছু নয় যাকে বিষয়মুখী ভঙ্গিতে অবলোকন করা যেতে পারে। ও হচ্ছে বিষয়ীমুখী ভঙ্গিতে 'উপভোগ' করার বস্তু। অধিরোহী চিন্তা হচ্ছে সেই আধেয়ের চেতনা যে আধেয় বিষয় বা বিষয়ী কারও অভিমুখে নির্দেশ রাখে না। এর সম্বন্ধে পরে আরো কথা হবে। চিন্তার এই চার পর্যায়ের আধেয়দের নাম দেওয়া যাক— তথ্য, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, বাস্তব আর সত্য। বিজ্ঞানের কারবার অভিজ্ঞতাশ্রয়ী চিন্তার আধেয় বা তথ্যকে নিয়ে। বিশুদ্ধ চিন্তার বিষয়মুখী বিষয়ীমুখী ও অধিরোহী ভঙ্গিতে পাওয়া বাকি তিন ধরনের আধেয়কে নিয়ে দর্শনের কারবার।

থিয়োরিধর্মী চেতনার সব আধেয়ই কথনযোগ্য। চিন্তার পর্যায় যাদের বলা গেল সেগুলি আসলে কথারই পর্যায়। বিজ্ঞানে বিবৃত হয় তথ্য, খবর হিসেবে ; তাকে বোঝা যায় তার ভাষায় পরিস্ফুট রূপটার

প্রতি উপেক্ষা করেই। কথায় ধরা না গিয়ে থাকলেও তথ্যের প্রত্যয় সম্ভব। অভিজ্ঞতাশ্রয়ী চিন্তার আধেয়ের পক্ষে কথনযোগ্যতা একটা অনাবশ্যক ঘটনাসংযোগ। কিন্তু বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তার আধেয়ের পক্ষে তা নিতান্ত আবশ্যক। দর্শনের আধেয় কথিত না হলে তার অর্থবোধ সম্ভব হয় না। বিশুদ্ধ চিন্তায় আধেয়— আধার ভেদ নেই। এইজন্যেই কখনো কখনো তাকে উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা ভাবা হয়েছে, দর্শনকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভাষার বিকার বলে। দর্শনের আধেয়কে স্বপ্রকাশ বলে প্রত্যয় হয়: স্বপ্রকাশ বা স্বতঃপ্রমাণ তাই যা কোনো বিশেষ ব্যক্তির কথায় প্রকট প্রত্যয়ের অপেক্ষা রাখে না। এই বাক-অনপেক্ষতা দর্শনের আধেয়ের অর্থের অন্তর্গত, কিন্তু বিজ্ঞানের আধেয়ের অর্থের অন্তর্গত নয়। বিজ্ঞানের আধেয়কে তার ভাষায় ধরা রূপটাকে উপেক্ষা করেও বোঝা যায়।

প্রতীত হয়েছে এমন কোনো আধেয়ের সঙ্গে যদি তার নিজের কথিত হওয়ার নির্দেশ থাকে তাহলে সেটা তথ্য হিসেবে বিবৃত হয় না। যাকে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বা বাস্তব বা সত্য বলা যায় তাকে তথ্য বলে উপস্থিত করা যেতে পারে না। এদের প্রত্যয় বিচারের কথিত রূপে প্রকট হতে পারে। সে বিচারের রূপটা কিন্তু কৃত্রিম বা প্রতীকধর্মী হবে। 'ক আছে খ-এর সঙ্গে এই সম্পর্কে'— এ ধরনের বিচারে তথ্যকে সবসময়েই ধরাছোঁওয়ার মধ্যে আনা যায়। শুধু এ ধরনের বিচারই আক্ষরিক অর্থে বোঝা যায়। 'ক আছে' এমন বিচার যদি কখনো তথ্যকে প্রকাশ করে তো সেটা উপরোক্ত ধরনের বিচারের সংক্ষেপে। 'ক আছে' এ বিচারে 'ক' বলতে যদি বোঝায় 'ক-এর খ-র মধ্যে এই সম্পর্ক' তবে বিচারটার অর্থ দাঁড়ায় সোজাসুজি— হয় ক খ-এর সঙ্গে এই ভাবে সম্পর্কিত আছে কিংবা ক যে খ-এর সঙ্গে এইভাবে সম্পর্কিত আছে, সেই ব্যাপারটা অন্য কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত। তথ্য মানেই অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কবদ্ধ তথ্য। যদি কখনো কোথায় 'ক আছে' এই বিচারটা সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু বিচার করে, তাহলে বুঝতে হবে 'ক' বলতে তথ্যকে নয়, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, বাস্তব বা সত্যকে বোঝাচ্ছে। এমন বিচার শুধু আপাতদৃষ্টিতেই বিচার বলে গ্রাহ্য। উদ্দেশ্য এখানে বিধেয়কে আগে থেকে ধরে নিয়ে বসেছে। বিধেয় এখানে পূর্বপ্রতীত উদ্দেশ্যের অর্থ প্রসারিত বা পরিস্ফুট করছে না। এখানে উদ্দেশ্য শুধু স্বপ্রকাশ বলে প্রতীত বিধেয়ের স্বতঃপ্রমাণ বিস্তার।

দর্শনচর্চা এমনিই স্বপ্রকাশের স্বতঃপ্রমাণ বিস্তার। কতকগুলি বিচারের সমষ্টি দর্শনশাস্ত্র নয়। স্বপ্রকাশ বা স্বতঃপ্রমাণকে কথিত করা যায়, বিবৃত করা যায় না। যা শুধু কথিতই হয়, নিজের কথিত হওয়ার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা আবশ্যিক। মনোগত ভঙ্গি অনুসারে এর তিনটি রূপ বা পর্যায় ভাগ করা যায়— বিষয়মুখী, বিষয়ীমুখী অথবা অধিরোহী। প্রথম দুই পর্যায়ের মধ্যে যে তফাত সেটা ধরা পড়ে 'বিষয় আছে' আর 'আমি আছি' এই দুই বিচারাভাসের পার্থক্যে। বিচারের যে রূপ— 'ক আছে খ'-এর সঙ্গে এই সম্পর্কে'— তাতে 'আছে' শব্দটার যদি কোনো অতিরিক্ত অর্থ থাকে, যদি সেটা ক এবং খ'-এর সম্পর্ক ছাড়া আরও কিছু বোঝায়, তবে ওই বিশিষ্ট আধেয়টা হবে যাকে বিষয়ত্ব বলা যায় তাই। একে বিচারাভাস করে বলা যেতে পারে 'সম্পর্কটা ক এবং খ'-এর মধ্যে আছে'। বিচারের আসল রূপে 'আছে' বলতে বোঝায় শুধু বিষয়ীর যে বিষয়মুখিতা সেইটেই। কিন্তু এই বিচারাভাসে 'আছে' বলতে বোঝাচ্ছে এমন একটা বিষয়-আধেয় যেটা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, যেটা তথ্য নয়। অবশ্য এই আধেয়কে প্রকাশিত বা প্রোক্ত করলে মনোগত ভঙ্গিটা বিষয়মুখীই থাকে। যে ভঙ্গি ছাড়া হয় যখনি বলি 'আমি আছি'।

এবার আধেয়কে কথিত করা হচ্ছে, বিবৃত করা হচ্ছে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একে বিষয়নির্দেশী নয় বলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। এর মধ্যে বিষয়নির্দেশিতা যদি কিছু থাকে তো তা প্রতীকধর্মী আভাস মাত্র। 'আছি' এ শব্দটার অর্থ যে কি সেটা বিষয়মুখী চেতনায় অবলোকনে ধরা যায় না, ধরা যায় বিষয়ীমুখী চেতনায় উপভোগে। তাকে অবলোকনের বস্তু বলে মনে হয় শুধু কথার আভাসে। তথ্যকে বিবৃত করা যায়, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠকে কথিত করা যায়, উভয়কেই ভাষায় প্রকাশ করা হয় তাদের কোনো না কোনো অর্থরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু যা বাস্তব তাকে কোনো অর্থরূপে নেওয়া যায় না, কথনে প্রকাশ পায় তার প্রতীকরূপ।

এ তিনটেই অক্ষরনিষ্ঠভাবে কথনযোগ্য। বিষয় যে বিষয়ী নয়, আর সেটা যে বিষয়ীর প্রতীক এ কথা অক্ষরনিষ্ঠভাবেই বলা যাচ্ছে। যে শব্দটার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার সেটা আক্ষরিক অর্থে গৃহীত হচ্ছে না, কিন্তু সেটা যার প্রতীক তা (এবং তার যে প্রতীক গৃহীত হচ্ছে এই ব্যাপারটা) আক্ষরিক অর্থেই কথিত হচ্ছে। বিষয়ী এখানে সেই সুনিশ্চিত সত্তা যাকে দিয়ে বিষয়টাকে বোঝা যাচ্ছে। বিষয়সাধারণ বা বিষয়ত্বের ধারণা বিজ্ঞানের বিষয়ধর্মী তথ্যরাশি পর্যবেক্ষণ করে আসে না। বিষয়ী 'আমা'র সাক্ষাৎ-চেতনা ও কথনযোগ্যতা না থাকলে বিষয়সাধারণের ধারণা কখনোই দানা বাঁধতে পারত না। উত্তমপুরুষ 'আমি' হচ্ছি সেই ধরনের আধেয়ের আদি উদাহরণ যার সঙ্গে তার নিজের কথিত হওয়ার আবশ্যিকতা জড়িয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে কথিত বস্তু আর কথনকার্য অভিন্ন। 'আমি আছি' এই বিচারাভাসে বিধেয়টা আক্ষরিক ভাবে কথিত উদ্দেশ্যের প্রতীক মাত্র। যাকে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বা বাস্তব বলে জানা যায়, তার কথন ও বোধ আক্ষরিকভাবেই সম্ভব হয়। কিন্তু যাকে সত্য বলে মানা যায় তাকে আক্ষরিকভাবে একেবারেই বোঝা যায় না।

তাহলে বাস্তবের অতীত যে সত্য তার কথন কি করে সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে তথ্য, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ আর বাস্তবের ধারণাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক আরও পরিষ্কার করা দরকার। এদের নেতিকরণ বা অস্বীকৃতি সম্ভব। 'ক আছে খ'-এর সঙ্গে এই সম্পর্কে' এ বিচারকে অস্বীকার করা যায় 'ক যে এই সম্পর্কে আছে এটা তথ্য নয়' এমনি বিচার দিয়ে। 'ক যে এই সম্পর্কে আছে' এটা বিচার নয়; আজকাল এর নাম দেওয়া হবে প্রস্তাব। এর প্রবচন ও অস্বীকৃতি সম্ভব কারণ স্বয়ংপ্রতিষ্ঠের প্রত্যয় আমাদের আগে থেকেই রয়েছে। প্রস্তাবটা যদি তথ্য-নয় এই হিসেবে গৃহীত হয় তবে তা শুধু আমরা তার স্বয়ংপ্রতিষ্ঠভাব অস্বীকার করতে পারছি না বলেই। (বস্তু কথাটার বদলে আমি স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ কথাটার ব্যবহার করছি কারণ আমরা কিছুকে অর্থরূপে নিতে পারি প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই। প্রতীত বস্তুই অর্থিত স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। অর্থরূপ মাত্রেই প্রতীত আধেয়, কোনো এক বিশেষ পর্যায়ে না হলে উচ্চতর পর্যায়ে।) স্বয়ংপ্রতিষ্ঠকে অস্বীকার করা যায় 'বিষয় নেই' এই রূপ বিচারে; বিষয় হচ্ছে যা বিষয়ী থেকে ভিন্ন এমন কোনো নির্দিষ্ট বা আত্ম-অভিন্ন আধেয় যাকে অবলোকন করা যেতে পারে। এ হল একটা বিশিষ্ট দার্শনিক মতের কথা, সে মতটাকে অর্থহীন মনে করার আপাতত কোনো কারণ দেখছি না। এ ধরনের অস্বীকৃতি সম্ভব কেননা আমরা আগেই বিষয়ীকে উপভোগলভ্য বাস্তব বলে বুঝেছি। বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় 'আমি (ব্যক্তিত্ববিশেষ বিষয়ী) নেই' এই বিচারে। এও আপাতত সহজবোধ্য। এ হচ্ছে অস্বীকৃতি বা নেতিকরণের আর একটা নতুন পর্যায়। ব্যক্তিত্ববিশেষ

বিষয়ীকে শুধু বিষয়ী হিসেবেই বাস্তব বলে বোঝা যায়। অবশ্য বলা যেতে পারে যে ও নিজেকে বিষয়ের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে অভিন্ন মনে করছে এবং সেইভাবেই তার ব্যক্তিবিশেষত্ব সম্ভব হচ্ছে। ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট হলেও 'আমা'র প্রত্যয় উপভোগের মধ্য দিয়েই। এই আধেয়ের অস্বীকৃতি সম্ভব হচ্ছে কারণ আমরা আগেই বাস্তবের অতীত যে সত্য তার ধারণায় এসে পৌঁছে গেছি।

'প আছে' এ ধরনের কোনো বাক্য নিলে দেখা যাবে যে যদি 'প', 'আছে' আর উভয়ের সংযোগ (অর্থাৎ বিচারটির রূপ) এই তিনটে আক্ষরিক অর্থে বোঝবার মতো হয় তবেই সমগ্র বাক্যটিকে একটা বিচার বলে মেনে নেওয়া সম্ভব হবে। যদি 'প' আর 'আছে' এই দুইকে আক্ষরিক অর্থে বোঝা যায় অথচ তাদের সংযোগকে যায় না তবে বুঝতে হবে 'প' বলতে কোনো স্বয়ংপ্রতিষ্ঠকে উদ্দিষ্ট করা হয়েছে। যদি 'প' কে উপভোগলভ্য ব্যক্তিগত আত্মসত্তা হিসেবে চেনা যায় তবে 'আছে' বলতে বোঝাবে সেই উপভোগলভ্য বাস্তবতার বিষয়াশ্রয়ী প্রতীক। তাদের সংযোগও হবে প্রতীকধর্মী। যদি 'প' বলতে ব্যক্তিগত আত্মসত্তার নেতিকরণকে বোঝায় তবে 'প'কেও আক্ষরিক অর্থে বোঝা সম্ভব হবে না, কেননা কোনো নিশ্চিত ও স্পষ্ট কিছুকে তার তুল্য বলে দেখা যাচ্ছে না। আত্মসত্তাকে বিষয়ী 'আমি' এই অর্থে কিংবা এই বিষয়ী 'আমি' কি নই সে অর্থে ছাড়া বোঝা যায় না। পরম বা অধিরোহী অর্থে আত্মসত্তার চেতনা বিষয়ী 'আমা'কে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। তেমন কোনো আত্মসত্তার বোধ যদি কখনও হয় তো হবে উপভোগলভ্য 'আমা'র সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই, তাকে এড়িয়ে নয়। তেমন আত্মসত্তার প্রত্যয় হয় বটে, কিন্তু 'আমি' কি তার ধারণাকে বাদ দিয়ে ওর কোনো প্রবচন সম্ভব নয়। এখানে 'প'কে বোঝা যাচ্ছে শুধু প্রতীক হিসেবে, তাই 'আছে' আর 'প' ও 'আছে'র সংযোগকেও প্রতীক হিসেবেই বুঝতে হবে। 'বিষয় আছে'— এ একটা বিচার নয়, এটা দ্বিরুক্তি। 'আমি আছি'— এও বিচার নয়, কেননা 'আছি' প্রতীকমাত্র। কিন্তু উভয়কেই অক্ষরনিষ্ঠভাবে বলা যায়, কারণ 'প'কে সুনিশ্চিত বলে উভয়তেই ধরে নিচ্ছে। 'পরমাত্মা আছেন'— এটাও বিচার তো নয়ই, এমনকি আক্ষরিকভাবে কথিতও হতে পারে না। তাই বলে বাক্যটা নেহাত অর্থহীন নয়। ওতে সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের আধেয় যে সত্য তাকে প্রতীক দিয়ে জানানো হচ্ছে। যাকে প্রত্যয় করা যায় অথচ যাকে আক্ষরিকভাবে বলা যায় না (তাই অস্বীকার করাও যায় না সেইটেই) সত্য।

কথনযোগ্যকে তাহলে চারটে পর্যায়ে ভাগ করতে হবে। প্রথমেই তফাত হবে কি আক্ষরিকভাবে কথনযোগ্য আর কি শুধু প্রতীক ভাবে। যা আক্ষরিকভাবে কথনযোগ্য তার মধ্যে ফের তফাত হবে যার বিবরণ তথ্যের খবর হিসেবে আর যার কথন তথ্যের বিবরণ হিসেবে নয়। যার কথন সম্ভব, বিবরণ সম্ভব নয়, তার মধ্যে আবার তফাত করতে হবে কিসে অর্থটা আক্ষরিকভাবে কথিত হচ্ছে আর কিসে প্রতীক ভাবে। সত্য কথিত হয় প্রতীক হিসেবে। বাস্তব কথিত হয় প্রতীক রূপে, কিন্তু আক্ষরিক ভাবে। স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ কথিত হয় উদ্দিষ্ট অর্থ রূপে, আক্ষরিকভাবে। এদের কোনোটিই খবর হিসেবে বলা হয় না। তথ্যের বিবরণ শুধু খবর হিসেবে। এরা অভিজ্ঞতাশ্রয়ী, অবলোকনী, উপভোগী এবং অধিরোহী চিন্তার প্রতিযোজী। যেটা খবর বা তথ্য হিসেবে বিবৃত হচ্ছে শুধু সেটাই আক্ষরিক অর্থে উদ্দিষ্ট হতে পারে। অবলোকনী, উপভোগী বা অধিরোহী চিন্তার যে আধেয় সেসব কথিত হয় কিন্তু বিবৃত হয় না। সেসব আধেয়কে 'প আছে' এরূপ বিচারের ছাঁচে ফেললে বিচার হবে প্রতীকধর্মী। প্রথম দুই

পর্যায়ে 'প'কে আক্ষরিক অর্থেই বুঝছি, তাই আধেয়কে আক্ষরিকভাবে ভাবতে না পারলেও আক্ষরিক ভাবে বলতে পারছি। অবলোকনী চিন্তায় শুধু বিচারের রূপটাই প্রতীকধর্মী। উপভোগী চিন্তায় "আছে" এই স্বীকৃতিটাও প্রতীক ধর্মী। অধিরোহী চিন্তায় 'প'ও প্রতীকধর্মী ; তাই সমগ্র 'প আছে' ব্যাপারটাই অক্ষরনিষ্ঠ চিন্তা আর অক্ষরনিষ্ঠ কথনের অতীত।

যে আধেয় আক্ষরিকভাবে বিবৃত হতে পারে সে হল বিচারের আধেয়। বিচারের আধেয় হতে পারে তথ্যের খবরটা, অর্থাৎ তাইই যাকে তার কথনের প্রতি উপেক্ষা করেও বোঝা যায়। অপরপক্ষে, যাকে তার কথনের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে হয়, তাকে প্রতীক হিসেবেই বুঝতে হয়, তাকে খবর, তথ্য বা বিচারের আধেয় বলে চিনিয়ে দেওয়া যায় না। বিজ্ঞানের প্রত্যয়গুলিই কেবল বিচাররূপে বলা আর আক্ষরিক অর্থে ভাবা যেতে পারে। যদি বিচারের আধেয়কে আক্ষরিকভাবে ভাবা যায় তবে সেই আধেয়কে জানি এই প্রত্যয়টা হবে বাস্তবিক জ্ঞান। যদি তাকে শুধু প্রতীক হিসেবেই ভাবা যায় তাহলে সে আধেয় জানা গেছে এ বলা যায় না, শুধু বলা যায় যে তাকে জানা গেছে এই প্রত্যয় রয়েছে।

থিয়োরিধর্মী চেতনা বলছি কথনযোগ্য যে কোনো আধেয়ের প্রত্যয়কে। অবশ্য তার সঙ্গে জানা গেছে এই প্রত্যয়টাও থাকা চাই। যখন কোনো আধেয় প্রতীক হিসেবে কথিত হয় তখন তাকে জানা গেছে এ প্রত্যয়টা সঙ্গে সঙ্গে নাও থাকতে পারে। কিন্তু সে যে, আর কিছু না হোক, কোনো কিছু জানা গেছে এমন প্রত্যয়ের দিকে নির্দেশ করছে এ বোধ অবশ্যই থাকা চাই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আধেয়টা কথিত হয় আক্ষরিকভাবে। সেই আধেয়টাই জানা গেছে বলে প্রত্যয় হয়, বাস্তবিক জানাও যায়। দর্শনের ক্ষেত্রে আধেয়টা কথিত হয় অন্তত অংশত প্রতীকরূপে। স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ আধেয়ের বেলাতে বিচারের রূপটিই শুধু প্রতীকধর্মী। অমন আধেয় বাস্তবিক জানা যায় না, তবে বিশুদ্ধ বিষয় হিসেবে তাকে অবলোকন করে জানবার একটা দাবি রয়েছে। তেমনি আরো, বাস্তব যে 'আমি' তাকে জানবার দাবি রয়েছে বিচাররূপ ছাড়া বিষয়মুখী ভঙ্গিটাও বাদ দিয়ে। এই তিন পর্যায়ে কিন্তু কিছু না কিছু আক্ষরিকভাবে কথিত হয়ে থাকে, আধেয়কে কথনাতীতভাবে জানবার কোনো দাবি নেই। সত্যকে, যাকে আক্ষরিকভাবে একেবারেই বলা যায় না, জানতে হবে কথনশীল ভঙ্গিটা বাদ দিয়ে। কথন ব্যাপারটা ব্যক্তিগত বিষয়িতার শেষ রূপ ; আধ্যাত্মিক বা উপভোগী চিন্তার বিশুদ্ধতম প্রকাশও তাকেই আশ্রয় করে ঘটে। অধিরোহী চেতনার প্রকাশ শুরু হয় সব রকম কথনকেই প্রতীকীকরণ বলে বুঝে। তাই তখনই তার পূর্ণতা সম্ভব হয় যখন এই প্রতীকধর্মী কথনও বাদ পড়ে। অধিরোহী চেতনা শেষ পর্যন্ত যে কি ব্যাপার, সে যখন কথন বা ব্যক্তিগত বিষয়িতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তখন তাকে আদৌ চেতনা বলা যাবে কি না এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব আমরা জানি না। কারণ পরম বা নৈর্ব্যক্তিক চেতনাকে আমরা শুধু নেতি নেতি করেই ধরতে পারি। কেবল এইই বলা যায় প্রতীকীকরণে যে সত্যের সূচনা তার প্রতীতি প্রতীকীকরণের সার্থকতা সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশ আরো সুস্থ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

থিয়োরিধর্মী চেতনার প্রকাশ বিজ্ঞানে আর দর্শনে। কেবল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্যকার বিচার পাওয়া সম্ভব। বিচারের আধেয় হচ্ছে তথ্য। তার উদ্দিষ্ট অর্থ তার কথনব্যাপারের প্রতি উদাসীন থেকেও বোঝা যায়। শুধু তাকেই বাস্তবিক জানা এবং আক্ষরিক অর্থে ভাবা যায়। দর্শনের আধেয় বাস্তবিক জানা যায় না, আক্ষরিক অর্থে ভাবাও যায় না। তাকে চিন্তার মাধ্যম বাদ দিয়েই জানতে হবে

এমনি দাবি রয়েছে। একে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, বাস্তব বা সত্য বলে বোঝা যায়। তাই দর্শনচর্চা আমাদের পক্ষে তিনটে আলাদা পর্যায়ে ঘটতে পারে। এদের নাম দেওয়া যায়, মোটামুটি,— বিষয়তত্ত্ব, বিষয়ীতত্ত্ব এবং সত্যতত্ত্ব।

বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যা

বিষয়তত্ত্বকে বিজ্ঞান থেকে তফাৎ করতে হবে। উভয় চর্চাই বিষয়কে নিয়ে, যে বিষয় জানা গেছে বলে বিষয়মুখী ভঙ্গিতে প্রত্যয় হয়। বিজ্ঞানে যে বিষয়ের প্রকাশ সে হল তথ্য। তথ্য বলতে বোঝায় যা প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা আক্ষরিকভাবে বিচাররূপে কথিত হতে পারে, যাতে তার কথিত হওয়ার প্রতি উপেক্ষা করেই প্রত্যয় করা যায়। স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বলতে বোঝায় যার প্রত্যক্ষের প্রতি কোনো নিশ্চিত নির্দেশ নেই, যা আক্ষরিকভাবে বিচাররূপে কথিত হতে পারে না, যাতে প্রত্যয় হয় শুধু তার কথনের সঙ্গে সঙ্গেই। কথনযোগ্য বলতে বোঝায় তাই যার হয় প্রত্যক্ষ নয় তার নিজের কথিত হওয়ার প্রতি নিশ্চিত নির্দেশ রয়েছে। যার প্রত্যয় ও বোধ শুধু তার কথনের সঙ্গে সম্পর্কযোগেই ঘটে, তা স্বতঃপ্রমাণ ও স্বপ্রকাশ অর্থাৎ ব্যক্তিমানস-অনপেক্ষ বলেই প্রত্যয় হয়। বিষয়মুখী ভঙ্গিতে স্বপ্রকাশ হতে পারে এক স্বয়ংপ্রতিষ্ঠই। বিজ্ঞানের তথ্য স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ নয়, এমন নয় যা কারও প্রত্যয় না হলেও থাকবে।

স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বিষয়, যাকে দর্শনের ব্যাপার বলছি, বিজ্ঞানের বিষয় নয়। এমনকি, তাকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে অস্বীকার করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বিষয়ের ধারণা করে কোনো কাজের সুবিধা হয় না। বিজ্ঞানের পক্ষে সব বিষয়ই জানা যায়, ব্যবহার করা যায়। কোনো বিষয় স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ একথা বলতে কিন্তু তাইই বোঝায় যে বিষয়টা স্বরূপত অজ্ঞেয় হলেও হতে পারে। বিষয়ী-অনপেক্ষ বিষয় অজ্ঞেয় হয়তো বাস্তবিক নয়, তবু তাকে জানাটা অধিকারসূত্রে ঘটে না। বিজ্ঞানের কাছে একথা ফালতু বা মিথ্যে ঠেকবে। সত্য যে স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, সে যে রহস্য, নিজেকে প্রকাশ করাই যে তার স্বভাব এসব কথা বিজ্ঞানের কাছে গোপনতাবিলাস বলে মনে হবে। বিজ্ঞানের কাছে কোনো দিকেই এমন কোনো বিষয় নেই যা তার নিজের প্রকাশ ঘটাতে পারে ; বিষয় অর্থ ই জ্ঞাত কিংবা জ্ঞেয় বিষয়, জানা নাও যেতে পারে এমন কোনো বিষয় থাকতে পারে না।

সব বিষয়কেই যে জানা যায়, ব্যবহার করা যায় এটা বিজ্ঞানের কাছে তর্কাতীত বিশ্বাসের জিনিস। এই বিশ্বাসকে তর্কের সভায় টেনে নিয়ে আসা দর্শনের অন্যতম কাজ। দর্শনের কাছে অমন বিশ্বাস বিষয়ীর স্বয়ংসম্পূর্ণমানিতার প্রকাশ বলে ঠেকে। সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে প্রকৃতিকে যে সচেতনভাবে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় তা মোটেই নয়। তার সঙ্গে লেনদেন চলে বরং আদিম বন্ধুতার মনোভাব নিয়েই। বিষয়ের প্রতি বিজ্ঞানের এই উদ্ধত শোষণেচ্ছু মনোভাবের প্রতিবাদ ওঠে দর্শন বা অমনি কোনো আধ্যাত্মিক প্রয়াসের রূপ ধরে। প্রকৃতিকে যে শুধুমাত্র প্রয়োজন সাধনের জন্যে ব্যবহার করা চলবে না, তাকে যে ধ্যানের বস্তু হিসেবেও নিতে হবে, এটা আধ্যাত্মিক চেতনারই দাবি। বিজ্ঞানে থিয়োরি তৈরি হয় ব্যবহারিক স্বার্থে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক রীতি পদ্ধতিগুলি বাস্তব বা অবাস্তব প্রকল্পের প্রয়োগমাত্র, ব্যবহারসিদ্ধির কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। বিষয়ের প্রতি বিজ্ঞানের যে মনোভাব তার দোষ আর অপূর্ণতার বোধ থেকে আসে বিষয় সম্বন্ধে দার্শনিক উৎপ্রেক্ষার প্রেরণা।

এই প্রেরণা বিজ্ঞানের তথাকথিত স্বতোবিরোধিতা ইত্যাদি থেকে আসতে পারে না, কারণ দার্শনিক যেখানে দোষ আর অপূর্ণতা দেখছেন বৈজ্ঞানিক সেখানে কোনো অভাব বোধ করেন না। স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বিষয়ের ধারণাটা হচ্ছে দর্শনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানী বুদ্ধিকে সংশোধনের চেষ্টার প্রথম প্রকাশ। বাস্তববাদ অন্য সব দর্শনের মতোই একটা বিশ্বাস। বিজ্ঞানের মনের কথা খুলে বললে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণমানী ভাববাদের একটা প্রয়োগবাদী রূপ।

বিজ্ঞান ও বিষয়তত্ত্বের পারস্পরিক সম্বন্ধটা খোলসা করা যেতে পারে কয়েকটা বিশেষ বিশেষ সমস্যা আলোচনা করে। এই সমস্যাগুলিকে কখনও কখনও ভুল করে দার্শনিক সমস্যা বলে ভাবা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রয়োগ ও লব্ধ ফলাফল একত্রিত করে একটা বিশ্বরূপদর্শন খাড়া করাটা এদের মধ্যে একটা। কেউ কেউ খুবই চেয়েছেন বিজ্ঞানগুলির প্রাথমিক নীতিগুলি থেকে ব্যাপকতর মূলনীতিতে পৌঁছতে। কিন্তু বিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতি ব্যতীত দর্শন যে এ কাজটা করতে পারবে অমন ধারণা বাতুলতা। এভাবে কিছু বর্ণনাত্মক ধারণা সংগ্রহ করা যেতে পারে। যদি প্রকৃত কোনো নীতি এভাবে ধরা যেত তাহলে তো বিজ্ঞানের কাজ দর্শনই হাতে নিতে পারত। এদিক দিয়ে বিশ্বের একটা কল্পনাময় বর্ণনা বেশ বানানো যেতে পারে। সেটা বাস্তবিক জ্ঞান হবে না, এমনকি এমন প্রকল্পও হবে না যাকে পরে জ্ঞান বলে প্রতিপন্ন করা যায়। তর্কনীতি বা অধিবিদ্যার থিয়োরির যে অভিজ্ঞতানপেক্ষ নিশ্চিতি সেও এ ধরনের চিন্তায় মিলতে পারে না। দর্শনের আধেয় জানা না গিয়ে থাকলেও অন্তত থিয়োরিতে প্রতীত হয়। কিন্তু এ ধরনের বিশ্বরূপদর্শন বিশ্বাসের ব্যাপার নয়। এ হচ্ছে শুধু নন্দনী কল্পনায় গঠিত ধ্যানরূপ, যার মূল্য বিজ্ঞানের পক্ষে ইঙ্গিতে-ইশারায় আর দর্শনের পক্ষে উদাহরণে উপমায়।

এ ধরনের উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ হিসেবে নাম করতে পারি তার যা অভিব্যক্তিদর্শন বলে খ্যাত হয়েছে, অভিব্যক্তি ব্যাপারটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থেকে তফাৎ হয়েছে। অভিব্যক্তি বলতে কি বোঝায় সেটা সাধারণভাবে অধিবিদ্যায় আলোচনা করা যেতে পারে। বস্তুত ওটা জীবনের ধারণার সঙ্গে অভিন্ন। ওর পদার্থবাদী, অধ্যাত্মবাদী এমনি নানান্ ব্যাখ্যা সম্ভব। এই আলোচনার জন্যে অধিবিদ্যাকে বসে বসে বিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্যরাশি জুড়তে-গোছাতে হবে না। তার যা প্রমাণ দরকার তা পাওয়া যাবে পদার্থ, জীবন, মন— এদের অস্তিত্বে। এ তো নিজেকে দেহী বলে জানার মধ্যেই পেতে পারি। বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি তথ্য ও বিশেষ বিশেষ সামান্যসিদ্ধান্ত অভিব্যক্তিদর্শনে ব্যবহার হতে পারে প্রমাণ হিসেবে নয়, শুধুই অধিবিদ্যার থিয়োরির উদাহরণ হিসেবে। অভিব্যক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে জ্ঞান বা অন্তত প্রকল্প বলতে হয়, জীবনকে পদার্থ ও মন থেকে আলাদা দেখে তার সম্পর্কীণ অধিবিদ্যাকে প্রতীত বলতে হয়, কিন্তু তথাকথিত অভিব্যক্তিদর্শন হচ্ছে আসলে যা জানা গেছে আর যা ধরে নেওয়া গেছে দু-ধরনের কথা মিশিয়ে বলা গল্প, সেই একক অদ্বিতীয় বিশ্বজীবনের আশ্চর্য কাহিনী। বিশ্বজীবন বলে কোনো তথ্য নেই, তাকে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হিসেবে হয়তো বা প্রত্যয় করা যেতে পারে। বিশ্বজীবনের ইতিহাসটা তাই বিজ্ঞানের তথ্যসমাবেশের ফাঁকফাটল কল্পনার জোরে জুড়েবুজিয়ে বানানো গল্প, স্বতঃ-প্রমাণ নয়, পরতঃপ্রমাণও নয়। বিশ্ব-অভিব্যক্তির কাহিনী বিজ্ঞান বা দর্শন কোনোটাই নয়। ও হচ্ছে কল্পনাত্মক সাহিত্যসৃষ্টি।

বিজ্ঞানের স্বীকার্য বা কাঠামোগত ধারণাগুলির প্রবচনকেও এককালে দর্শনের সমস্যা বলে মনে

করা হয়েছে। কাণ্ট তো বিশুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞান নামে একটা কিছুকে অধিবিদ্যার শাখা বলে ধরে নিয়ে সংশ্লেষধর্মী জ্ঞানের অভিজ্ঞতানপেক্ষ নীতিগুলি থেকে তাকে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। আজকাল রিলেটিভিটি থিয়োরি ঘিরে যে রোমান্টিক দর্শন চালু হয়েছে তার মধ্যেও এই ধরনের চিন্তার বিপর্যয় দেখতে পাই। তবে কাণ্ট দর্শনকে বিজ্ঞান ভেবে নিয়েছিলেন, আর এখন বিজ্ঞানকে দর্শন ভেবে নেওয়া হচ্ছে। উভয়ক্ষেত্রেই তথ্য ও স্বয়ংপ্রতিষ্ঠের মাঝকার অলঙ্ঘনীয় ব্যবধানকে অস্বীকার করা হয়েছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের স্বতঃসিদ্ধগুলি স্বীকার্যমাত্র, তাদের প্রবচন বিজ্ঞানেরই কাজ। স্বীকার্য বলা যায় সেই প্রকল্পকে যার উদ্দেশ্য তথ্যকে এগিয়ে জানা নয়, তাকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। তার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য প্রকল্প সম্ভব। তাকে বাতিল করে দেওয়া যায়, তথ্যের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না এ কারণে নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পের চেয়ে জবড়জঙ ও অসুবিধাজনক বলেই। বিজ্ঞানের স্বীকার্য থেকে বিষয়টার কোনো ধারণাতে সরাসরি পৌঁছনো যায় না। জগতটা সত্যি সত্যি চতুঃপরিসর কি না, বা আচরণে স্বরূপত অনির্দেশ্য কি না, এসব কথার কোনো জবাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজকের তথ্যসমূহকে যে ধারণাকৌশল-গুলি সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারছে তাদের ওপর নির্ভর করে পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞানের স্বীকার্য আর বিষয়ের অধিবিদ্যাগত ধারণার মধ্যে কোনো তর্কনীতিসম্মত সম্বন্ধ নেই।

বিষয়তত্ত্ব

তাহলে বিষয় সম্বন্ধে দর্শনের কিই বা বলবার থাকতে পারে? বিষয়মুখী মনোভঙ্গি বোঝা যায় শুধু বিষয়ীমুখী বা উপভোগী মনোভঙ্গির সঙ্গে তুলনায়। বিষয়কে, অর্থাৎ যাকে বিষয়মুখী ভঙ্গিতে প্রত্যয় করা যায়, বিষয়ীর সঙ্গে সম্পর্কিত না করেও বোঝা যেতে পারে। তেমন হলে সে বিষয়কে বলে তথ্য। বিজ্ঞানের কাজ তথ্যের চর্চা। দর্শন যে বিষয় নিয়ে কারবার করে সে বিষয়কে বিষয়ীর সম্বন্ধ ছাড়া বোঝা যায় না। বিষয়ী বলতে বুঝি ব্যক্তিসত্তা, 'আমি', একে থিয়োরিগত চেতনায় সেই কথনক্রিয়া বলে চেনা যায়, যেটা কথিত বিষয়ের রূপে নিজেরই প্রতীক সৃষ্টি করে। যে বিষয়ের মধ্যে তার কথনের আবশ্যিক নির্দেশ রয়েছে সে বিষয় দর্শনের পক্ষে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ।

স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বিষয়ের ধারণা প্রবচন ও ব্যাখ্যান দর্শনে ঘটে। অমন বিষয় আর বিজ্ঞানের তথ্যের মধ্যে মিল আনছে উভয়ের বিষয়ভাব। এই বিষয়ভাবটা নিজে কিন্তু তথ্য যাকে বলে তা নয়। এ হল, বিষয়মুখী চেতনাতে উভয়কেই বোঝা যায়, শুধু এই ঘটনাসংযোগটা। বিষয়ের বিষয়রূপটুকুই তার স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ রূপ; তাই সেটা তর্কনীতিতে আলোচিত হতে পারে। এই রূপ কথিত তথ্য ও স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ উভয়েরই রূপ; তাই তথ্য বা প্রত্যক্ষলভ্য কোনোকিছুর সঙ্গে তার কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। এই রূপের অধ্যয়ন তর্কনীতিতে; তাই তর্কনীতি বিজ্ঞানের নয়, দর্শনেরই একটা শাখা। এই রূপটা বিশুদ্ধ বিষয় এবং বিশুদ্ধ বিষয়ের রূপ, এক সঙ্গের দুইই। তর্কনীতির বিষয় অধিবিদ্যালভ্য বিশুদ্ধ বিষয়েরই প্রতীক, তারই ছায়া। তর্কনীতি ও অধিবিদ্যা বিষয়তত্ত্বের দুই শাখা।

তর্কনীতিগত রূপ বা বিষয়ত্বের ধারণা নানান্ বিষয় বা তথ্যকে তুলনা করে তবেই যে আসে তা নয়। বিষয়ত্ব বোঝা যায় প্রথমত আধ্যাত্মিক চেতনার স্বতঃ প্রামাণ্য আধেয় যে বিষয়িত্ব তারই সঙ্গে তুলনা করে। আধ্যাত্মিক পর্যায়ের থিয়োরিগত চেতনাতেই বিষয়কে বিষয় বলে প্রথম চেনা যায়। 'আমি আছি'

এই চেতনায় বোঝা যায় উপভোগী মনোভঙ্গি থেকে বিষয়মুখী মনোভঙ্গির পার্থক্য। অবশ্য এই চেতনায় বিষয়মুখী মনোভঙ্গিকে একটা প্রয়োজনীয় ছল বলেই মনে হয়। সংস্থাপিত সত্তা বা 'আছি'র চেতনা এখানে বিষয়ীর ('আমা'র) পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতীকের চেতনা হিসেবে দেখা দেয়। বিষয় যে বিষয়ীর প্রতীক এর মানে বিষয় বিষয়ী থেকে পৃথক অন্যকিছু। নেতিকরণের চেতনা প্রতীকচেতনার সহগামী, তারই মধ্যে প্রথম দেখা দেয়। বিষয় সম্বন্ধে চেতনা থাকতে পারে বিষয়ী সম্বন্ধে কোনো বিশেষ পরিস্ফুট চেতনা না থাকলেও। কিন্তু বিষয় বলে কোনো অর্থ সম্পন্ন কিছু বুঝতে গেলে তাকে বিষয়ীর নেতিকরণ তথা প্রতীক বলে বুঝতে হবে। প্রতীকভাব এখানে আবশ্যিক। সেইজন্যেই যখন বিষয়ীর প্রতি নির্দেশ চেতনায় অস্ফুট তখন বিষয়কে বিষয়ীর অব্যবহিত প্রত্যক্ষ, এমনকি বাস্তব বলেই ঠেকে। তথ্যকে বিষয় হিসেবে বোঝবার আগেই তাই বিষয়কে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হিসেবে বোঝা যায়। সুতরাং যে বিষয়কে অর্থত বাস্তব বলে ঠেকে তার অর্থাৎ অধিবিদ্যাগত বিষয়ের সম্পর্কেই বিষয়ের রূপ বা বিষয়ত্বকে বুঝতে হবে। এদিক থেকে দেখলে অধিবিদ্যা তর্কনীতির পূর্বানুবন্ধ।

অধিবিদ্যা বিষয়সম্পর্কীণ দর্শন, থিয়োরিগত চেতনার বিষয়মুখী ভঙ্গিতে তার ভিত্তি। বিষয়ীসম্পর্কীণ অধিবিদ্যা সম্ভব নয়। ও নামে যা চলে সে হচ্ছে মনকে একটা বিশেষ ধরনের বিষয় ধরে নিয়ে তার সম্পর্কীণ অধিবিদ্যা। অথবা সেটা অধিবিদ্যাই নয়, শুধু আধ্যাত্মিক চেতনার আত্মপ্রতীকীকরণের বিশিষ্ট রূপ। অধিবিদ্যার আধেয়গুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক করার যুক্তি পাওয়া যেতে পারে একমাত্র আধ্যাত্মিক আভিজ্ঞতার অন্তঃসমীক্ষণলভ্য পার্থক্য থেকে। পদার্থ, প্রাণ, মন— এই যে স্থূল বিষয়বিভাগ এও তথ্য থেকে আরোহপ্রণালীতে মেলে না। এইগুলি যে সব, আর কিছুই যে বকি পড়ে গেল না, এ কথাটা অন্তত আরোহপ্রণালীতে কিছুতেই মিলবে না। বিষয়রূপ বিশ্বের যে প্রত্যয় সেটা একটা অসীম এককের প্রত্যয়, কোনো একটা সামান্য বা জাতির প্রত্যয় নয়। এমন একটা এককের বিভাগ সীমিত ক'টা ধনাত্মক পদে বেবাক সম্ভব হতে পারে যদি সেই একক স্বতঃপ্রমাণভাবে প্রত্যেকটা পদে নিজেকে প্রকাশ করে, যদি প্রত্যেক পদ প্রত্যেক অপর পদ এবং সমগ্র বিশ্বকে উদ্দেশ্য করে। এরকম একটা বিশ্বসংগঠন স্বতঃপ্রমাণ হতে পারে কেবল অন্তঃসমীক্ষণলভ্য বা উপভোগলভ্য আধেয়ের প্রতীক অথবা নিজে যে দেহ ধরে বাঁচছি এই সরল অখণ্ড চেতনার প্রতীকধর্মী বিশ্লেষণ হিসেবে। বিশ্লেষণ এখানে প্রতীকধর্মী, কেননা আধেয়ের তথাকথিত উপাদানপদগুলিকে— অর্থাৎ পদার্থ, প্রাণ, মন, ওদের— এই চেতনার সম্পর্ক ছাড়া এমনিতে বোঝা যায় না। ওদের পারস্পরিক পার্থক্য অব্যবহিতভাবে অনুভূত হয়, ওদের প্রত্যেক আপাতদৃষ্টিতে তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা বোঝা যায় শুধু এই অনুভূতির প্রতি সম্পর্ক বুঝে।

অধিবিদ্যার কোনো ধারণাকেই বিষয়ী বা আত্মার প্রতি তার সম্পর্কবিচার ছাড়া বোঝা যায় না। বিষয়ী বা আত্মা কিন্তু অধিবিদ্যার আধেয়কে ছাপিয়ে যায়। অধিবিদ্যার বিশিষ্ট চিন্তাগুলি একদিক থেকে দেখে মনে হয় 'অতি উচ্চ স্তরজাত', আর এক দিক থেকে 'ভাষার বিকার'। আসলে এদের অর্থ প্রতীকভাবের অর্থ, মূল্য এদের মধ্যে প্রতীকীকৃত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতারই মূল্য। অধিবিদ্যার ভিতরে তাই কোনো সত্যিকার বিচার নেই, অধিবিদ্যাগত প্রত্যয়গুলিও তর্কনীতিসম্মত অনুমান দিয়ে পাওয়া যায় না। অধিবিদ্যায় প্রায়ই যে বিস্তারিত অবরোহী প্রমাণাবলী দেখা যায় সেগুলি ছল। কখনও

কখনও প্রমাণপ্রক্রিয়াকে কোনো অদৃষ্টপূর্ব দ্বিরুক্তির পরিস্ফুটন বলে ধরা যায় ; তখন অবশ্য ব্যাপারটা একটু অন্যরকম দাঁড়াবে। অধিবিদ্যার যে চিন্তা মেলে সেটা প্রতীকভাবের ধারণাবলীর রীতিবদ্ধ ব্যাখ্যান। এই ধারণাগুলি বস্তুত উপভোগলভ্য প্রত্যয়গুলির আধেয়ের প্রতীক।

তথ্য আর স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ উভয়েই আক্ষরিক অর্থে কথিত হয়। উভয়তেই প্রতীত আধেয় কথনে রূপায়িত। তথ্য এই রূপায়ণ ছাড়াই রয়েছে, কিন্তু স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ উপস্থিত হয় এই রূপায়ণ হিসেবেই। উভয়েরই রূপ ভাষাগত। এমন ভাষারূপও আছে যা ঔপপাতিক। তবু কিছু না কিছু গঠনগত রূপ আছে যা প্রত্যয় সংজ্ঞাপনের পক্ষে আবশ্যিক। এগুলি খালি ভাষার নয় বোধগম্য আধেয়েরও রূপ বলে প্রতীত হয়। কথিত তথ্যের মধ্যে একটা বিশেষ দ্বৈতভাব, উদ্দিষ্ট এবং প্রতীত উভয়ের বোধগম্য আধেয়ের মধ্যে একটা তফাৎ থাকে। যা প্রতীত তা উদ্দিষ্টার্থকে ছাপিয়ে যায়, তা প্রত্যক্ষলভ্য বলেই বোঝা যায়। স্বয়ংপ্রতিষ্ঠের বেলাতে এই দ্বৈতভাব থাকে না, উদ্দিষ্ট আর প্রতীত এক হয়ে যায়। ভাষার আবশ্যিক রূপগুলি এখানের উদ্দিষ্টার্থেরও রূপ। তর্কনীতিতে উদ্দিষ্টার্থের রূপগুলি আলোচিত হয়। তর্কনীতির বিভিন্ন সংগঠন সম্ভব। কেননা অধিবিদ্যা তর্কনীতির পূর্বানুবন্ধ, আর অধিবিদ্যায় বিকল্প সম্ভব। তর্কনীতির মূল বিতর্কগুলি আসলে অধিবিদ্যারই বিতর্ক। তর্কনীতির কোনো একটা বিশেষ সংগঠনে কোনো ঔপপাতিক গলদ আছে কি না সেকথা অবশ্য আলাদা। কোনো একটা বিশেষ সংগঠনের চেয়ে অন্য আর একটা সংগঠন ভালো কি না সে প্রশ্নের জবাব তর্কনীতিতে দিতে পারে না, দিতে পারে অধিবিদ্যায়। অধিবিদ্যার বিতর্কের সমাধান তর্কনীতি দিয়ে চলে না। কেননা অধিবিদ্যার প্রত্যেক সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে যায় তার নিজস্ব স্বতন্ত্র তর্কনীতি।

বিষয়কে আর বিষয়ীকে যে একই ভাবে প্রত্যয় করা হয় না এ সন্দেহ অধিবিদ্যার মধ্যে আসতে পারে না। অধিবিদ্যার মধ্যে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ ও বাস্তবকে পৃথক করা যায় না। উদাহরণত পদার্থ বা মনকে বাস্তব বলে ধরলে অধিবিদ্যায় আপাতত কোনো দোষ মনে হবে না। তফাতটা তর্কনীতি ও অধিবিদ্যার তুলনা করে ধারণা হচ্ছে। তর্কনীতিতে উদ্দিষ্টার্থের যে রূপগুলি আলোচিত হয়ে থাকে, সেগুলিতে প্রত্যয় সম্ভব, তবু সেগুলিকে বাস্তব বললে নেহাৎ আজগুবি শোনাবে। এগুলি বাস্তব নয়, অথচ কিছুই যে না তাও নয়, তার মানে এগুলি স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। তর্কনীতির রূপ বা বিষয়ত্ব যদি স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হয় তাহলে অধিবিদ্যার বিষয়ের স্থান কোথায়? সাকার নিরাকারভেদ তথ্যের মধ্যেই সম্ভব। বিষয় তাই বিষয়ত্ব ছাড়া আর কিছু বোঝাবে না। অধিবিদ্যার বিষয়কে তথ্যের সঙ্গে তুলনা করে বিষয়ত্ব বা স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ অর্থ বলে পরিচিত করতে হয়। অধিবিদ্যার সংজ্ঞা তর্কনীতি।

অধ্যাত্মতত্ত্ব

স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ আর বাস্তব, এদের পার্থক্যটা প্রকট ও প্রমাণিত হয় আধ্যাত্মিক বা উপভোগী চেতনাতে, যে চেতনায় বিষয়টা বাস্তব বিষয়ীর প্রতীক হিসেবে প্রতীত হয়। 'আমি আছি' এই কথাটায় 'আছি' বলে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ সত্তাটাকে বিষয়মুখী চেতনায় বোঝা যায়, তবু তা বিষয়ীমুখী চেতনায় বোধলভ্য 'আমা'র প্রতীক মাত্র। কোনো কিছু আধেয়ের উপভোগলভ্য বোধ সম্ভব হয় বিষয়মুখী চেতনায় অবলোকিত কোনো অর্থবিশেষকে তার প্রতীক করে। এরকম প্রতীক না থাকলে বিষয়ীকে শুধু

উপভোগ করা যায়, সঙ্গে সঙ্গে বোঝা কিন্তু যায় না। বিষয়ীকে বোঝা যায় স্বয়ংপ্রতিষ্ঠের মতোই নিজের কথন ব্যাপারটার প্রতি আবশ্যিক নির্দেশ সহিত ; উপরন্তু বোঝা যায় যে ভাষাগত রূপটা তার প্রতীক। অন্তঃসমীক্ষণ বলতে বুঝি এরকম উপভোগী বোধ। অন্তঃসমীক্ষণে থিয়োরিগত চেতনা থাকে, কিন্তু বিষয়মুখী মনোভঙ্গি বাদ পড়ে যায়। এর আধেয় তথ্যরূপ বিষয় নয়, এমনকি স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বিষয়ও নয়। এই আধেয় 'দেহের অভ্যন্তর' নয়, তাহলে তো তথ্যই হত। মনও নয়, কেননা মন স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বিষয়। এ হল 'আমি', প্রকটভাবে না হোক সম্বৃতভাবে। যদিও 'আমি' কথিত হই বিষয় হিসেবে, 'আমা'কে বোঝা যায় বিষয় যা নয় তাই অর্থাৎ বিষয়ী হিসেবে।

অন্তঃসমীক্ষণ করা মানে উত্তমপুরুষে কথা বলা। উত্তমপুরুষে কথা বললেই যে, বিষয় যা 'আমি' তা নই, এ হুঁশ থাকবে তা নয়। তেমন হুঁশ থাকলে তবেই কিন্তু অন্তঃসমীক্ষণ ঘটছে বোঝা যাবে। আবার, অন্তঃসমীক্ষণী কথনে যা বলা হচ্ছে আমিই তাই এ চেতনা নাও থাকতে পারে। যদি থাকে তো তাকে বলব আধ্যাত্মিক অন্তঃসমীক্ষণ। যা বলা হচ্ছে আমিই তাই, এ চেতনা বিষয়ীর পক্ষে তার আপন সত্তার গভীরতর উপলব্ধি। বিষয়নিষ্ঠ তথ্যের জ্ঞান এমন নয়। তথ্যকে জানলে তথ্যের কোনো বদল ঘটে না। অবশ্য এক ধরনের অন্তঃসমীক্ষণ সম্ভব যাতে আপাতদৃষ্টিতে আধেয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটে না ; এরকম হতে পারে বিষয়ী সত্তার কোনো বদলি নিলে। একে আধ্যাত্মিক অন্তঃ-সমীক্ষণের সম্বৃত রূপ বলা যেতে পারে। কখনও আবার এ ধরনের বদলি নেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে থিয়োরিধর্মী চেতনাকে বাদ দিয়ে চলার চেষ্টা ঘটে ; এরকম হলে অন্তঃসমীক্ষণ গিয়ে ঠেকে 'আমা'-বিহীন মনের বিষয়মুখী চেতনায়— সাধারণত একেই বলে মনস্তাত্ত্বিক অন্তঃসমীক্ষণ।

আধ্যাত্মিক অন্তঃসমীক্ষণে 'আমি' কখনও একলাই স্বীকৃত হয় না। সঙ্গে কিছু না কিছুকে 'আমা'র সম্পর্কেই উপভোগ করা হয়। এর পর্যায় তিনটে। প্রথম পর্যায়ে বিষয়ীকে অজ্ঞাত কারণে দেহধারী বলে বোঝা যায়। বিষয়ীকে বিষয়, মনও, যা নয় তাই হিসেবে বোঝা এর থেকে অভিন্ন। দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্য ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেতনা আসে। তৃতীয় পর্যায়ে আসে অতিব্যক্তিক আত্মার চেতনা ; তাকে উপভোগ করে বোঝা যায় বিষয়ী 'আমা'র সঙ্গে তার সম্বন্ধ, আর 'আমা'র সঙ্গে তার একাত্মতার অনুভূতির মতো একটা আধ্যাত্মিক সমাগমের অভিজ্ঞতা সম্ভব হয়। এই উপভোগলভ্য একাত্মতাকে 'তাদাত্ম্য' বা 'মূর্ত অভিন্নতা' বলা হয়ে থাকে। বিষয়মুখী মনোভঙ্গি নিয়ে এ সম্বন্ধ বোঝা অসম্ভব। বিষয়তত্ত্বের ক্ষেত্রে অভিন্নতা বিমূর্ত, তার মডেল হচ্ছে ক=ক। আর তথ্যের জগতে অভিন্নতা বলে কোনো সম্বন্ধের স্থান নেই। অতিব্যক্তিক আত্মার চেতনা এবং 'আমি' যখন অভিন্ন হয় তখন তাকে ধর্মচেতনা নাম দেব। 'আমা'র প্রতি প্রকটভাবে নির্দেশ করে যে সমস্ত আধেয় উপভোগলভ্য তাদের নিয়ে অধ্যাত্মতত্ত্ব।

আধ্যাত্মিক চেতনা শুধু বাস্তবতার চেতনা নয়, বাস্তবতা স্বয়ং। তার বিশেষভাবে ধর্মনিষ্ঠ রূপটাতে ছাড়া অন্য রূপগুলিতে কেবল বিষয়িত্ব ছাড়াও বিশেষভাবে বাস্তবতার প্রতি নির্দেশ থাকে। আত্মাকে বিষয়ে দেহ বা প্রতীক সম্পন্ন জেনে উপভোগ করে যে চেতনা, তাতে বিষয়কে স্বীকার করা হয়েছে শুধু বিষয়ী 'আমা'র ছায়া বা প্রতীক হিসেবেই। সেই ছায়া বা প্রতীকের চেতনাটা নিজরূপে শূন্য। ব্যক্তিগত সম্পর্কাবলীর চেতনায় 'আমি' এবং অন্যজন একে আর এক তো নইই, একে আরেকের

প্রতীকও নই। প্রতীক সংগঠন এখানে পরস্পর বিকল্প। অন্যজন আমার কাছে আর এক 'আমি' ; একথার কোনো আক্ষরিক অর্থ নেই অথচ তাকে এই এক ভাবেই বোঝা সম্ভব। উত্তমপুরুষ 'আমি' তার কাছে প্রথমপুরুষ 'এই লোকটা', এও স্বতোবিরোধী কথাকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করার নমুনা। এখানে প্রত্যেক বিকল্প উপভোগ বাস্তব, অথচ অর্থে বা থিয়োরিতে স্বতোবিরোধী। ধর্মীয় উপাসনা অতিব্যক্তিক বাস্তবতার চেতনা, 'আমা'কে বোঝে তারই প্রতীক হিসেবে। 'আমা'কে সচেতনভাবে প্রতীক করাটা আত্মবিসর্জনের অ-থিয়োরিসম্ভব অভিজ্ঞতা। ও হল সচেতনে কিছুই-না হয়ে যাওয়া, কিন্তু কিছু-না হিসেবে 'আমা'র চেতনাটা থেকে যায়। থিয়োরিসম্ভব ধর্মীয় চেতনায় প্রকাশ পায় শুধু এই অতিব্যক্তিক সত্তা। এইভাবে ধর্মীয় চেতনা সব শূন্য বিষয়িত্বকে ছাপিয়ে উঠে সত্তার উপভোগলভ্য পূর্ণতায় পরিণত হয়।

ধর্ম-অভিজ্ঞতা সত্তার সচেতন পূর্ণতা, সরল এবং বৈচিত্র্যমুক্ত। অনন্য অতুলনীয় ধর্ম-অভিজ্ঞতা কিন্তু অনন্তসংখ্যায় সম্ভব। এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিজেদের মধ্য থেকেই নির্ধারিত হয়, বাইরে থেকে কোনো চিন্তা দিয়ে নয়। একটা অভিজ্ঞতা গভীরতর হয়ে ওঠে, তার মধ্য দিয়েই অন্য অভিজ্ঞতার বিরোধী বা ওর সঙ্গে সমন্বিত হয়। একটা অভিজ্ঞতায় হয়তো অন্য আর একটা অভিজ্ঞতাকে উপভোগ করা যায় প্রথমটারই আদিমতর পর্যায় হিসেবে। কিংবা ওর একান্ত বিরোধী বলে একে জেনে। তৃতীয় কোনো অভিজ্ঞতা হয়তো আবির্ভূত হয়ে এদের উভয়কে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তি দিয়ে এদের কোনো সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আপনা থেকেই এরা বেশ কিছু দূর সংগঠিত হয়ে ওঠে। সে সংগঠন কিন্তু কখনই একটা একমাত্র নয়। বহু বিকল্প সংগঠন উপস্থিত হয়ে থাকে ও হতে পারে। প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই সত্যের প্রকাশ, অভিজ্ঞতার এক-একটা সংগঠনও সমগ্রভাবে সত্যের প্রকাশ বলে প্রতীত হতে পারে। অন্তর্বিরোধশূন্য, অনির্দিষ্ট সীমা সম্পন্ন, ব্যাপক সংগঠনও বাস্তবিকই প্রকাশ হতে পারে। অবশ্য কোনো সংগঠনেরই কোনো অভিজ্ঞতানপেক্ষ প্রয়োজন অনুভব করা যায় না, কোনো একটা এক মাত্র সম্ভব সংগঠনের তো নয়ই। হেগেলের ধারণা ছিল সকল ধর্মকে ও ধর্ম-অভিজ্ঞতাকে যথাযথ স্থান দিয়ে একটা একমাত্র সম্ভব সংগঠন গড়া যায় ; আমার কাছে অমন ধারণা মূলত ধর্মবিরোধী মনে হয়।

ধর্মীয় সংগঠনের থিয়োরিগত রূপ ধর্মতত্ত্ব। ধর্মের যতগুলি সংগঠন আছে ঠিক ততগুলিই ধর্মতত্ত্ব। দর্শনের নিম্নতর পর্যায়ে এদের প্রতিরূপ আছে। প্রাক্‌ধর্মীয় অধ্যাত্মচেতনা, বিষয়চেতনা, বিষয়তত্ত্ব এমনকি তর্কনীতিতেও। প্রত্যেক ধর্মতত্ত্বের নিজস্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা ও তর্কনীতি আছে। তর্কনীতির বিতর্কগুলি মূলত অধিবিদ্যাসংক্রান্ত, অধিবিদ্যার বিতর্কগুলি মূলত আধ্যাত্মিক, ধর্মনিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক চিন্তার বিতর্কগুলি মূলত ধর্মচিন্তার। ধর্মের সংখ্যা বাড়তে পারে, তারা পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিত হতে পারে, সীমা অনির্দিষ্ট। সাধারণভাবে দর্শনের থিয়োরিতে তাই অনির্দিষ্ট পরিসর রয়েছে বৈচিত্র্যের সঙ্গে বৈচিত্র্যের সমন্বয়ের। দর্শনের পক্ষে কোনো একমাত্র সর্বজনস্বীকার্য সমাধানের প্রতি এগোবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। সব দর্শনই সংগঠিত প্রতীকমালা, সব প্রতীকেরই বিকল্প থাকতে বাধ্য।

ধর্মে বিষয়ী 'আমা'র থিয়োরিগত অস্বীকার সম্ভব নয়। উপাসনাতে অবশ্য বিষয়ী আত্মবিসর্জন করে থাকে; কিন্তু সেখানে সেটা উপভোগের ব্যাপার, থিয়োরির নয়। 'আমি কিছুই না', বিষয়ী বা ব্যক্তিগত আত্মা যে অসত্য, এরকম থিয়োরিধর্মী চেতনা হতে পারে। 'আমা'কে অস্বীকার করতে পারি, যখন কোনো একটা পরম কিছুকে মানি। পরম যা সে কিন্তু ধর্মে যাকে অতিব্যক্তিক আত্মা পরিচয়ে উপভোগে জানা যায় তা নয়। পরম মানে তাই যা বিষয়ী 'আমি' নই। 'আমা'তে উপভোগলভ্য ও প্রতীকীভূত বাস্তব ধর্মীয় চেতনা আর এ ধরনের থিয়োরিগত অস্বীকার এক জিনিস নয়। যাকে পরম বলা হয় তাকে ইতি বলেই প্রত্যয় করি, কিন্তু বুঝি নেতি নেতি করে। এ হল এমন কিছু যাকে যেমন প্রত্যয় করি তেমন বুঝতে পারি না। প্রতীকের ব্যবহার ছাড়া তার কথন সম্ভব নয়। ধর্মে উপলব্ধ বাস্তবতার প্রতীক 'আমি'। যতদূর পর্যন্ত এই বাস্তবতার প্রকাশ আত্মা রূপে, ততদূর পর্যন্ত প্রকাশের ভাষাগত রূপটা অক্ষরনিষ্ঠ। পরম সত্তার ইতির দিক কিন্তু কেবল 'আমা'কে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই, 'যা আমি নই' তাকে দিয়েই প্রকাশ করতে হয়। এই প্রকাশের ভাষাগত রূপটা অক্ষরনিষ্ঠ নয়। সেইজন্যে যদি বলি পরম কিছু আছে, তখন থাকা বলতে বাস্তবতাকে না বুঝে বুঝি সত্যকে। বাস্তবতাকেই উপভোগ করা যায়, সত্যকে নয়। সত্য প্রতীত হয়, কিন্তু বিষয়মুখী বা বিষয়ীমুখী মনোভঙ্গিতে বোধলভ্য হয় না। সত্য কথনযোগ্য আক্ষরিক অর্থে নয়, কথিত হয় বিশুদ্ধ প্রতীকীকরণে। এই সত্যের চেতনা ধর্ম-অতিগামী, অধিরোহী চেতনা।

যাকে প্রত্যয় করা যায় অথচ যাকে আক্ষরিক অর্থে বলা যায় না বলেই বুঝতে হয়, সে স্বপ্রকাশ। বাস্তবকে আক্ষরিক অর্থে বলা যায়, তার প্রকাশ কথননির্ভর, যদিও কথনক্রিয়া (অর্থাৎ 'আমি') সেখানে শূন্য বিষয়িত্ব নয়। সত্য প্রতীত বা প্রকাশিত হয় কথননিরপেক্ষ ও স্বপ্রকাশ হিসাবে। যা সত্য তা 'আমি' নয়। ওকে বলতে হলে ওকে পৃথক জেনে প্রত্যয় করতে হয়। কিন্তু যার কাছে 'আমি'ও শুধু প্রতীক, তার মানে নিজরূপে কিছুই না, তাকে তো আর কিছু থেকে পৃথক করে দেখবার উপায় নেই। ওই তো পরম। সত্যকে পৃথক করতে হলে আপনা থেকেই পৃথক করতে হয়। পরম সত্তার এই আত্মপৃথককরণ আর ধর্মীয় চেতনায় আবশ্যিক বলে গ্রাহ্য তাদাত্ম্য এক নয়। এই আত্মপৃথককরণের কোনো আবশ্যিকতা নেই। পরম সত্তা হতে পারে সত্য, হতে পারে সত্য যা নয় তাই, হতে পারে উভয় সম্ভাবনার পশ্চাৎবর্তী কোনো ঐক্যের অপেক্ষা না রেখেই শুধু উভয়ের পৃথককরণ ব্যাপারটাই অর্থাৎ সেই অনির্ধার্য সংযুক্তভাব যাকে সত্য বা সত্য-নয় কোনোটা একমাত্র করে বলা যায় না। যা সত্য নয় অথচ ইতিধর্মী সে হচ্ছে আমাদের বাস্তব-অতিগামী মুক্তি, আমাদের ইচ্ছার পরম অনন্যপেক্ষতা। অনির্ধারিতভাবে সত্য ও সত্য-নয় উভয়ই হতে পারে মূল্যসত্তাই। পরম সত্তাকে সত্য, মুক্তি ও মূল্য এদের ঐক্য বলে পরিচিত করার কোনো মানে হয় না। এদের প্রত্যেকটাই পরম সত্তা। এদের বলা হচ্ছে পৃথক করে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, না পৃথক করে না এক করে। সত্যের থিয়োরিধর্মী চেতনা সত্যকে নিজের মুক্তিরূপ এবং এই অনির্ধার্য পৃথককরণ বা মূল্যরূপ থেকে পৃথক করে জানে। ধর্মের উপভোগলভ্য বাস্তবতা ছাড়িয়ে গিয়ে যা আছে তা হল সত্তা (সত্য), অসত্তা (মুক্তি) আর অনির্ধার্য (মূল্য)। অদ্বৈতবেদান্তে পরমসত্তাকে সত্য বলে ধারণা করা হয়েছে। শূন্যবাদী বৌদ্ধদর্শনে বোধ হয় পরমসত্তাকে মুক্তি বলে ধারণা করা হয়েছে। হেগেলের দৃষ্ট

পরমসত্তা হচ্ছে সত্য ও মুক্তির সংযুক্তভাব (অভিন্নতা বলে এ সম্বন্ধকে চেনানো ভুল হবে) অথবা মূল্য। এই কটা দার্শনিক মত অধিরোহী পর্যায়ের।

এই ত্রিগুণ পরমসত্তা থেকেই বিষয়ীর জ্ঞান, অনুভূতি ও কর্ম তিন ক্রিয়ার ভেদকে বোঝা সম্ভব হয়। এ ক্রিয়াগুলি আসলে অধিরোহী চেতনারই আত্মপৃথককরণ। আধ্যাত্মিক চেতনায় এদের তফাত বোঝা যায় না। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সহজ ও অখণ্ড। 'আমা'র চেতনা এই তিন ক্রিয়ার কোনো একটা জটিল ঐক্যের চেতনা নয়। এমনকি এ তিনের প্রত্যেকটার মধ্যে আলাদাভাবে প্রকাশ হচ্ছে এমন কোনো ঐক্যেরও নয়। তার মধ্যে আত্মবিশ্লেষণ ঘটে না, ঘটবার কোনো হেতুও পাওয়া যায় না। চেতনার এমন ত্রিধাবিভাগ অন্তঃসমীক্ষণের ব্যাপার নয়, অধিরোহী ব্যাপার। পরমসত্তাগুলি নিজেকে নিজেই প্রকাশ করে। 'আমা'র ত্রিত্ব শুধু তাদেরই ছায়া বা প্রতীক হিসেবে। পরমসত্তাগুলি ঐক্যসম্বন্ধ-যুক্ত নয়, তাই তাদের বিষয়ীগর্ভাস্থিত ছায়াগুলিও ঐক্যসম্বন্ধযুক্ত নয়। এমনি 'আমা'র কোনো ভিন্ন ভিন্ন অংশ বা দিক নেই। এই তথাকথিত ক্রিয়াগুলিকে বিশুদ্ধ ক্রিয়া বা 'আমা'র স্বার্থবৃত্তি বলে বোঝা যায় না। এগুলিকে বিষয়ীর দিক থেকে বোঝা যায় না, বিষয়ীগত অনন্য অভিজ্ঞতা বলেও চেনা যায় না। অন্তঃ-সমীক্ষণেও এগুলিকে পৃথক করা যায় না। এগুলিকে বোঝা যায় কেবল স্বপ্রকাশী পরম সত্তার বৈচিত্র্যকে হেতু মানলে।

সত্যের থিয়োরি অন্য দুই পরম সত্তারও থিয়োরি। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পরম সত্তার নিজস্ব থিয়োরি পরিস্ফুট করার সম্ভাবনাও মেনে নেওয়া হল। মূলগত এই থিয়োরিগুলির ছায়া বা প্রতিরূপ মেলে দর্শনের নিম্নতর পর্যায়গুলিতে। সত্যের থিয়োরি, যার ধারণা হয় অধিরোহী পর্যায়ে, ছায়া ফেলে অধ্যাত্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞানতত্ত্বে, আর বিষয়তত্ত্বের মাঝখানে, অধিবিদ্যা ও তর্কনীতির মধ্যবর্তী কোনো এক স্থানে, বিষয়তত্ত্বের রূপ বা বিষয়মাত্রাগুলির থিয়োরিতে।

পরিভাষাসূচী

অতিগামী transcendent
অধিরোহী transcendental
অধিবিদ্যা metaphysics
অনন্যসাপেক্ষ absolute
অনির্ধার্য indeterminate
অবলোকন contemplation
অব্যবহিত immediate
অভিজ্ঞতানপেক্ষ a priori
অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ a posteriori
অভিজ্ঞতাশ্রয়ী empirical
অক্ষরনিষ্ঠ (চিন্তা) literal (thought)
আক্ষরিক (অর্থ) literal (meaning)
আধেয় content
আবশ্যিক necessary, obligatory
ইতিধর্মী positive
উৎপ্রেক্ষা speculation
উদ্দেশ to mean
উপপাত accident, chance
উপভোগ enjoyment
কথন speaking

কথনযোগ্য speakable
তথ্য fact
তর্কনীতি logic
থিয়োরিগত, থিয়োরিধর্মী theoretic
ধ্যান meditation
নন্দনী কল্পনা aesthetic imagination
নির্দেশ reference
পদার্থ matter
পদার্থবাদ materialism
পরম absolute, supreme, ultimate
পর্যায় grade
পূর্বানুবন্ধ presupposition
প্রকট explicit
প্রকল্প hypothesis
প্রজ্ঞাগত ধারণা idea of reason
প্রতিপন্ন deduced (justified)
প্রতিযোজী correlate
প্রত্যয় belief
প্রবচন formulation
প্রয়োগবাদ pragmatism
প্রস্তাব proposition
বস্তু subsistent
বাস্তব reality
বিচার judgement
বিচারাভাস apparent judgement
বিজ্ঞানতত্ত্ব epistemology
বিবরণ speaking of
বিমূর্ত abstract
বিশ্বাস faith
বিষয় object
বিষয়নিষ্ঠ, বিষয়গত objective
বিষয়মাত্রা category
বিষয়সাধারণ object in general
ব্যক্তিবিশেষত্ব individuality
মূর্ত অভিন্নতা concrete identity
রূপ form
সংগঠন system
সংজ্ঞাপন communication
সত্তা being
সম্পর্ক reference, connection
সম্বৃত implicit
সুনিশ্চিত positive, definite
স্পষ্টার্থবাদ positivism
(গূঢ়ার্থবাদ mysticism)
স্বতঃপ্রমাণ self-evident
স্বতঃসিদ্ধ axiom
স্বপ্রকাশ self-revealing
স্বরূপত, নিজরূপে, আপনাতে in itself
স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ self-subsistent
স্বয়ংসম্পূর্ণমানিতা solipsism
স্বীকার্য postulate

গোয়ালপাড়া

শ্রীনন্দলাল বসু

ধূসর পাণ্ডুলিপি। জীবনানন্দ দাশ। সিগনেট প্রেস, কলকাতা। তিন টাকা

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। নাভানা, কলকাতা। চার টাকা

সাতটি তারার তিমির। জীবনানন্দ দাশ। গুপ্ত রহমান অ্যাণ্ড গুপ্ত, কলকাতা। আড়াই টাকা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা। নাভানা, কলকাতা। পাঁচ টাকা

সাগর থেকে ফেরা। প্রেমেন্দ্র মিত্র। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, কলকাতা। তিন টাকা

সংবর্ত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সিগনেট প্রেস, কলকাতা। দু টাকা

পারাপার। অমিয় চক্রবর্তী। সিগনেট প্রেস, কলকাতা। আড়াই টাকা

পালা-বদল। অমিয় চক্রবর্তী। নাভানা, কলকাতা। দু টাকা

বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা। নাভানা, কলকাতা। পাঁচ টাকা

শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর। বুদ্ধদেব বসু। নাভানা, কলকাতা। আড়াই টাকা

বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা। নাভানা, কলকাতা। চার টাকা

বিগত তিরিশ-চল্লিশ বছরে বাংলা কবিতায় গুরুতর যে-সব পরিবর্তন ঘটেছে, আশা করা অসংগত নয় যে, আগ্রহী পাঠকমাত্রেই তার খবর রাখেন। পরিবর্তন শুধুই বাচনভঙ্গির নয়, বক্তব্যেরও। আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু, উভয় ক্ষেত্রেই— প্রথমে দ্রুত, পরে বিলম্বিত লয়ে— সেই পালা-বদলের সুর ধ্বনিত হয়েছে। প্রথমেই দ্রুত লয়ে, কেননা— সর্বব্যাপারেই যা হয়ে থাকে— রাতারাতি একটা পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতেই বাঙালী কবিরা তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ভেবে দেখেন নি, সমকালীন ব্যক্তি- অথবা সমাজ-মানসে কিংবা পারিপার্শ্বিক ঘটনা-পরিবেশের মধ্যে এমন কোনো দাবি নিহিত ছিল কিনা, যা সেই রূপান্তরণকে কার্যকারণের সংগতি দান করতে পারে। খুব সম্ভব ছিল না। 'কল্লোল'এর প্রাথমিক বিদ্রোহ যে পরে অনেকটা ঝিমিয়ে এসেছিল, সকলেই তা জানেন। হয়ত বা পূর্বোক্ত কারণেই তার গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে থাকবে।

মন্দীভূত হয়েছিল, কিন্তু রুদ্ধ হয় নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। তার কারণ, বিগত তিরিশ-চল্লিশ বছরে পশ্চিম এবং পূর্ব-গোলার্ধের ব্যবধান ক্রমশ অনেকখানিই হ্রাস পেয়েছে। এবং, এই কারণেই, বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁরা পশ্চিমী চিন্তা-বিপ্লবের সূত্রটিকে তন্মুহূর্তেই হারিয়ে ফেলেন নি, বরং দেশজ পরিস্থিতির পটভূমিকায় ধীরে-ধীরে আরও দৃঢ় মুষ্টিতে তাকে ধারণ করতে চেয়েছেন, তাঁদের কাব্যকলা এখন আর আমাদের হৃদয় অথবা মস্তিষ্ককে ততখানি বিপন্ন করে না, আগে যেমন করত।

আলোচ্য গ্রন্থগুলি পড়ে এই কথাটাই আবার নতুন করে মনে হল। গ্রন্থকর্তাদের প্রত্যেকেই এ-কালের অগ্রগণ্য কবি ; এবং অনেকেই, প্রচলিত সাহিত্যরীতির বিরুদ্ধে বিশের দশকে যে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল— আলোচনার প্রারম্ভেই যার উল্লেখ করেছি— তাতে উল্লেখ্য অংশ নিয়েছিলেন। সেই সন্ধিলগ্নের পর থেকেই এঁরা কবিতার বক্তব্য এবং বিন্যাস নিয়ে নিত্যনূতন পরীক্ষায়

নিরত থেকেছেন। তার ফলাফল যে সর্বক্ষেত্রেই শুভংকর হয়েছে এমন নয়, তবে বহু ক্ষেত্রেই হয়েছে। এবং তারই ফলে বাংলা কবিতায় যে ইতিমধ্যেই নূতন একটি চারিত্র যোজিত হয়েছে, তাতেও সন্দেহ নেই।

এ-কালের প্রখ্যাত চারজন কবির "শ্রেষ্ঠ কবিতা"র সংকলন আমাদের এই আলোচনার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। চারখানিই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কিন্তু প্রথমেই বলে রাখি, কোনো কবিতাকে কোনো কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা বলায় আমার আপত্তি আছে। কোনো সংকলনকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন বলায়। এই ধরনের নামকরণের মধ্য দিয়ে যে একচক্ষু অসহিষ্ণুতা মূর্ত হয়ে থাকে, তা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। বিশেষ করে এই কারণে যে, সচরাচর যে-সব কবিতা খানিকটা প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে, তাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ কবিতা বলতে প্রলুব্ধ হই। এবং ভুলে যাই যে, কোনো কবির চিন্তাভাবনার আমুপূর্ব পরিচয় নিতে হলে শুধু তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতাবলীর সাহায্য নিলেই চলে না; এমন অনেক কবিতার সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয়, যা হয়তো পাঠকমহলে তেমন আদৃত হয় নি, কিন্তু কবির কোনো জরুরী চিন্তার পরিচয় বহন করছে।

নাভানা থেকে যে-কটি "শ্রেষ্ঠ কবিতা"র সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আমার আপত্তি অবশ্য নামমাত্র, মাত্রই নামকরণে। গ্রন্থগুলি পড়লে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, সম্পাদনাকালে শুধুই প্রসিদ্ধ কিছু কবিতার উপরে লক্ষ্য রাখা হয় নি; লক্ষ্য রাখা হয়েছে কবির সামগ্রিক কাব্যসাধনার উপরে; এবং এমনভাবে কবিতা নির্বাচন করা হয়েছে, কবিকর্মের সম্পূর্ণ চেহারাটি যাতে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"ঝরা পালক", ধূসর পাণ্ডুলিপি", "বনলতা সেন", "মহাপৃথিবী" এবং "সাতটি তারার তিমির"— জীবনানন্দ দাশের এই পাঁচটি গ্রন্থ থেকে কবিতা বাছাই করে নিয়ে তাঁর "শ্রেষ্ঠ কবিতা" প্রকাশ করা হয়েছে। তা ছাড়া এমন অনেক কবিতা এ-বইয়ে আছে, যার কিছু-কিছু ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয় নি, এবং কিছু-কিছু এই প্রথম ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করল।

জীবনানন্দর বিষয়ে কোন আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। নানা স্থানে নানা আলোচনায় এই ধরনের একটি ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করেছি যে, তিনি নিতান্তই নির্জনতার উপাসক ছিলেন। এর চেয়ে ভ্রমাত্মক ধারণা বোধহয় আর কিছুই হতে পারে না। সন্দেহ নেই যে, তাঁর কবিতায় শব্দবিরল শান্তিময়তার এমন অসংখ্য চিত্র বারবার দেখা দিয়েছে, যাতে মনে হতে পারে, হওয়া স্বাভাবিক যে, নিঃসঙ্গ নিভৃতির এক স্থির স্বপ্নই তিনি লালন করতেন। এমন এক করুণ অথচ প্রসন্ন পৃথিবীর স্বপ্ন, যেখানে

> হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে
> শিশিরে পালক ঘ'ষে-ঘ'ষে
> পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে,
> ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে-দেখে
> মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
> জাগে একা অঘ্রানের রাতে
> সেই পাখি।

—মাঠের গল্প। ধূসর পাণ্ডুলিপি

যেখানে

দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়—

—স্বপ্নের হাতে। ধূসর পাণ্ডুলিপি

কিন্তু একমাত্র এই নিরাকাঙ্ক্ষ নির্জনতার পটভূমিকায় যদি কেউ তাঁর সামগ্রিক কবিচিত্তের বিচার করতে বসেন, তাতে ভ্রান্তি ঘটবার আশঙ্কা। তার কারণ, "বনলতা সেন" এবং "মহাপৃথিবী"র পর্যায়েই আমরা তাঁর এই সুন্দর স্বপ্নবাসনাকে ইতস্তত ঈষৎ বিঘ্নিত হতে দেখেছি, এবং "সাতটি তারার তিমির"এর পর থেকে এই স্বপ্নের সঙ্গে তাঁর অতি সামান্যই যোগ ছিল।

কবিদের মধ্যে এমন অনেকে থাকেন, তাৎক্ষণিক ঘটনার কেন্দ্রে এসে দাঁড়ান যাঁদের অসাধ্য নয়। বরং তাতেই যাঁদের চিত্তবৃত্তির স্ফূর্তি ঘটে। জীবনানন্দ তাঁদের সগোত্র নন। বস্তুত, ঘটনার ঘনঘটায় তাঁর চিত্ত অতি অল্পই আলোড়িত হয়েছে। কিন্তু তার কারণ এই নয় যে, জনজীবনের সঙ্গে তিনি যোগ রাখতে চান নি। চেয়েছিলেন, তাঁর নিজস্ব উপায়ে। তাৎক্ষণিকতার আকর্ষণ থেকে দূরে সরে গিয়ে মানবজীবনের সারাৎসারকেই তিনি তাঁর কাব্যে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। দূরে যাবার দরকার ছিল। তিনি জানতেন, ঘটনাবলীর কেন্দ্রবিন্দুতে এসে দাঁড়ালে কদাচ তার সামগ্রিক চেহারাটিকে দেখতে পাওয়া যায় না। তার জন্য ঈষৎ দূরত্ব রচনার প্রয়োজন ঘটে। তিনি যখন বলেন,

"আছে আছে আছে" এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষণ্ণ হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

—সময়ের কাছে। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা

তখন মনে হয়, দূরে গিয়েও—হয়ত দূরে গিয়েই—তিনি আমাদের কাছে থাকতে চেয়েছিলেন।

"সাতটি তারার তিমির"এর রচনাকাল ১৩৩৫-১৩৫০। অর্থাৎ এ-বইয়ের প্রাচীনতম কবিতা রচিত হয়েছে আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে ; নবীনতম কবিতার বয়সও প্রায় পনেরো বছর হল। কবি জীবনানন্দর সেই সময়কার মনোভঙ্গিরই পরিচয় এখানে বিধৃত হয়েছে, আপন কাব্যসাধনার ধারায় একটি সুস্পষ্ট পর্যায় থেকে আর-একটি সুস্পষ্ট পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার প্রাক্‌কালে চেতনার এক অস্থির, অনচ্ছ জিজ্ঞাসায় তিনি যখন নিরন্তর পীড়িত হয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা,— "সাতটি তারার তিমির" নামের এ ছাড়া অন্য আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে, আমি জানিনে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের কথা বলতেই মহাকাশের যে এক অনাদি বিপুল প্রশ্নচিহ্নের কথা আমাদের মনে পড়ে যায়, জানি না সেই প্রশ্নচিহ্নের দ্বারাই জীবনানন্দ তাঁর এই সময়কার চিন্তাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন কিনা। যখন তাঁকে বলতে শুনি :

জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে
ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে ?

—ক্ষেতে প্রান্তরে। সাতটি তারার তিমির

অথবা

এ-রকম কেন তবে হয়ে গেল সব
বুদ্ধের মৃত্যুর পর কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে।
একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে
আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে ?

—ভাবিত। সাতটি তারার তিমির

তখন অন্তত সেইরকমটিই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কথাটা প্রায় আপ্তবাক্যের মত শোনাবে, কিন্তু বলতেই হয় যে, "সাতটি তারার তিমির"এর মধ্যে যে প্রগাঢ় এবং অসহায় যন্ত্রণা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, একমাত্র সেই যন্ত্রণাই হয়তো জীবন-জিজ্ঞাসার স্থির এবং বিশুদ্ধ কোনো উত্তর এনে দিতে পারে। জীবনের একেবারে শেষের দিকে এমন-কিছু কবিতা লিখেছিলেন জীবনানন্দ, যা পড়ে মনে হয়, তেমন কোনো উত্তর তিনি পেয়েও থাকবেন। আধুনিক বাংলা কবিতার চরিত্র নির্মাণে জীবনানন্দর ভূমিকা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাঁর পরবর্তী কবিদের উপর যে কী অপরিসীম প্রভাব বিস্তারে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন, তা কারও অজ্ঞাত নয়। সুতরাং সংগত কারণেই আশা করা যেতে পারে, কবিতার অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁর কাব্য-চেতনার শুধুই সুচর অংশের নয়, ঈষৎ দুশ্চর অংশেরও পরিচয় গ্রহণে উৎসাহী হবেন। "সাতটি তারার তিমির" যে ঈষৎ দুর্গম গ্রন্থ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবনানন্দর সামগ্রিক কবি-সত্তাকে যিনি উপলব্ধি করতে চান, জিজ্ঞাসার তিমিরে আবৃত এই গ্রন্থখানিও তাঁর অবশ্যপাঠ্য।

জীবনানন্দর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বুদ্ধি আর বোধি, মস্তিষ্ক আর হৃদয়, এই দুয়ের মধ্যে সেতুসাধনে তাঁর প্রয়াস কখনও ক্লান্তি মানে নি। এ-ব্যাপারে এই কালেরই আরও একজন কবির কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করতে হয়। তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র। আবেগরহিত বুদ্ধির চর্চাতেই অধিকাংশ বাঙালী কবির যখন আত্যন্তিক উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, সেই একদেশদর্শিতার মুহূর্তেও তিনি তাঁর কবিতায় হৃদয়ের উত্তাপকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রর কবিতা যে মূলত হৃদয়নির্ভর, তাতে সন্দেহ নেই ; সন্দেহ নেই যে, হৃদয়নির্ভরতাকে প্রচ্ছন্ন রাখবার কোনো অহেতুক প্রয়াসও তাঁর ছিল না। কিন্তু একইসঙ্গে আরও-একটি কথা স্বীকার করতে হয় : ব্যক্তি-মানুষের অল্পে-তুষ্ট স্বল্পে-সুখী জীবনের পাশাপাশি সামগ্রিক মানব-জীবনের জরুরী কিছু-কিছু সংবাদকেও তিনি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বর্জনে তিনি কদাচ সম্মত নন, আবার জনতার সঙ্গে যোগসাধনেও তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। এবং এই দ্বিধা আকর্ষণের কারণেই তাঁর কবিতা সুন্দর একটি ভারসাম্য খুঁজে পেয়েছে। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করলেই, আশা করি, এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে :

সমবায়ে সুখ আছে আর আছে শান্তি,
যত পারো গড়ো সমবায় সমিতি সুতরাং !
কিন্তু সাম্রাজ্যও যে চাই আমার
তোমার আমার সকলের চাই সাম্রাজ্য।
শুধু সদস্য আমরা নই, আমরা যে সম্রাট !

শুধু লভ্যাংশে মন ভরে না, চাই সাম্রাজ্য।
বিধাতার সাথে সেই তো আমাদের চুক্তি

—সম্রাট। প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র সমদর্শী কবি ; তাঁর কাব্যসাধনার আনুপূর্ব পরিচয় যিনি পেতে চান, "প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা" তাঁকে যথেষ্টই সাহায্য করবে। "প্রথমা", "সম্রাট" এবং "ফেরারী ফৌজ", প্রেমেন্দ্র মিত্রর এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থের বহু বিখ্যাত কবিতা— সময় এবং রুচির পরিবর্তন সত্ত্বেও যে-সব কবিতা আজও আমাদের সমান আকর্ষণ করে, এবং যার একাধিক পংক্তি এখন প্রায় প্রবাদবাক্যের মত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বললে বোধহয় একটুও বাড়িয়ে বলা হয় না— এই গ্রন্থের অন্তর্ভূ'ত হয়েছে। তা ছাড়া এমন কিছু কবিতা এখানে আছে, এই সংকলন প্রকাশিত হবার আগে যা কোনো গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নি। এগুলিরও অধিকাংশ এখন "সাগর থেকে ফেরা"য় পাওয়া যাবে, এখনো পর্যন্ত যেটি তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। শেষোক্ত শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা পড়ে স্পষ্টই মনে হয়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যচিন্তা আবার নতুন কোনো পথে মোড় নিচ্ছে। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করি :

আমার শহর নয়কো তেমন বুড়ো ;
অতীত কালের অস্থি মুদ্রা চৈত্য বিহার কিছু
পাবে না তার কোথাও মাটি খুঁড়ে।
হঠাৎ কখন নদীর ধারে ব্যাপারীদের নায়ে
আমার শহর নেমেছিলো কাদামাখা পায়ে
এই তো সেদিন নারকেল আর খেজুর গাছের ঝোপে।

—শহর। সাগর থেকে ফেরা

অথবা

খুঁজে দেখো, আছে, আছে
আধ-আলো এঁদোগন্ধ পুরানো পুঁথিতে ঠাসা
কোনো এক বেচারী দোকানে,
কিম্বা পথে পড়া কোনো রোয়াকে ছড়ানো
কাঙালী বই-এর ভিড়ে
বিস্মৃত সে লেখা
—ধুধু সময়ের শূন্যে কার কবেকার
জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ের চিহ্ন এক ছিটে,—
উড়ো এক ভীরু ক্ষীণ সম্ভাষের কাপাশের আঁশ !

—আছে। সাগর থেকে ফেরা

এই রকমের পংক্তি আরও কিছু-কিছু তুলে দেওয়া যায়, যা থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, প্রেমেন্দ্র মিত্রর কাব্যে নতুন করে আবার হাওয়া-বদলের কাজ শুরু হয়েছে। কবি হিসেবে সেটা তাঁর অদম্য

প্রাণশক্তিরই পরিচায়ক। সাহিত্যিক অর্থে জীবন্ত থাকাই যে সাহিত্য-জীবনের সবচাইতে বড় কথা, তা নিয়ে নিশ্চয় মতদ্বৈধের অবকাশ নেই।

জীবনানন্দ অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রর কবিতায় যে বুদ্ধি এবং বোধের মধ্যে সমন্বয়সাধনের একটি সুস্পষ্ট প্রয়াস বর্তমান, এ-কথা বলবার পরেও স্বীকার করতে হয়, হৃদয়বৃত্তিই এঁদের কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় যেমন যুক্তিবুদ্ধি। বাংলা কবিতায় পালা-বদলের দুরূহ অধ্যায়টিকে যাঁরা সত্যিকার একটি তাৎপর্য দিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। সুধীন্দ্রনাথ সেই স্বল্পসংখ্যকদেরই অন্যতম। যেমন প্রবন্ধে, তেমনি কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিশুদ্ধির পক্ষপাতী; এবং যে অপরিমিত আবেগকেই একদা কাব্যকলার অনিবার্য সর্ত বলে গণ্য করা হত, তা তাঁর কাছে কোনোদিনই প্রশ্রয় পায় নি। সুধীন্দ্রনাথ মিতভাষী কবি, শব্দনির্বাচনে তিনি ধ্রুপদী পন্থায় আস্থাবান। ফলত, কাব্যে যাঁরা হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রাবল্য, বাগ্‌বহুলতা এবং ঘরোয়া ভাষারীতির প্রত্যাশা রাখেন, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁদের কাছে ঈষৎ দুরূহ ঠেকতে পারে। তবে পরিশ্রমী পাঠকমাত্রেই জানেন, সেই প্রাথমিক বাধা কিছু অনতিক্রম্য নয়। এবং সেটিকে অতিক্রম করতে পারলেই যুগসংশয়ে পীড়িত, প্রশ্নার্ত অথচ মীমাংসাজিজ্ঞাসু এক অসাধারণ শিল্পী-মানসের সান্নিধ্য পাওয়া যায়। শুধু তা-ই নয়, তিনি যখন বলেন:

> …বস্তুত জোয়ারে
> ততটাই ফিরে আসি, যতটাই এগোই ভাঁটাতে।
> অপ্সরীরা ব'সে আঘাটাতে
> নিশ্চেষ্ট কৌতুক দেখে; স্তব্ধপাখা
> সাগরবলাকা
> অধীর চিৎকার হানে সন্ধ্যার আকাশে।
>
> —জেসন্‌। সংবর্ত

অথবা

> নাটকী নায়ক-রূপে আজীবন দেখেছি নিজেকে;
> ভেবেছি আমার সঙ্গে অদৃষ্টের দ্বৈরথসমর:
> মর্ত্যের প্রতিভূ আমি, প্রতিপক্ষ সন্ত্রস্ত অমর,
> কাজেই নিস্তার নেই পরিণামী সর্বনাশ থেকে…
>
> —কঞ্চুকী। সংবর্ত

চিন্তার ক্ষেত্রে তখন তাঁকে এই বিংশ-শতকীয় দ্বিধাতাড়িত মানবসমাজের পরমাত্মীয় বোধে গ্রহণ করাও অনেক সহজ হয়ে ওঠে। সুধীন্দ্রনাথ, আগেই বলেছি, মীমাংসাজিজ্ঞাসু কবি। কিন্তু প্রশ্নের যন্ত্রণাকে এড়িয়ে গিয়ে অন্যতর, সহজতর পথে মীমাংসায় উত্তীর্ণ হওয়াতে তাঁর আস্থা নেই। বস্তুত, প্রশ্নের যন্ত্রণাকেই তিনি মীমাংসার মূল্য বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ "সংবর্ত" অন্তত সেই কথাই বলবে।

প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে আধুনিক কবিদের মধ্যে যাঁর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের ব্যবধান প্রায় অসেতুসাধ্য, তিনি

অমিয় চক্রবর্তী। এমন নয় যে, মানবজীবন এবং তার পরিবেশের নানা অসংগতি অমিয় চক্রবর্তীর চোখে কখনও ধরা দেয় নি। দিয়েছে; কিন্তু তা তাঁর কাছে খুব পীড়াদায়ক হয় নি বলেই বিশ্বাস করি। তার কারণ, সেই অসংগতির চিত্রটিকে তিনি নিতান্তই আপাতক বলে ভাবতে পেরেছেন, এবং একইসঙ্গে বিশ্বাস করেছেন যে, এই মুহূর্তে যাকে আমরা অসংগত, প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করছি, তা-ও কখনো কোনো বৃহৎ দৃশ্যপটের অংশ হিসেবে সম্পূর্ণ এবং পারম্পর্যময় হয়ে উঠবে। "সংগতি" কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যেখানে ঝোড়ো হাওয়া, পোড়ো বাড়ি, ভাঙা দরজা ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই এক অনিবার্য উত্তরসংগতির কথা বলা হয়েছে। যুক্তিনিরপেক্ষ এই বিশ্বাস, কবির কাছে এরও মূল্য হয়তো অপরিসীম, এবং এই বিশ্বাস আছে বলেই অমিয় চক্রবর্তীর পক্ষে এত সহজে বলা সম্ভব হয়েছে :

মধ্যাহ্নের রিক্তপটে রৌদ্র লেগে
ঐ দেখ বৃক্ষচ্ছবি আছে জেগে।
ধ্যানের মতন
বিশুদ্ধ তাকেই দেখ, মন।
আলোয় রয়েছে ডুবে, হাওয়া তাকে যায় স্পর্শ করে,
মন্ত্র লাগে তারাময় ভোরে।

—গাছ। পারাপার

"পারাপার"এর পর "পালা-বদল"। নাম দেখে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, এ-বইয়ে অমিয় চক্রবর্তীর কাব্য-ভাবনার কোনো উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটেছে। ঘটে নি বলেই আমাদের বিশ্বাস। তবে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অত্যন্তই ছোট ছোট শব্দ-সমষ্টি দিয়ে নিতান্তই অনায়াসে সুন্দর এক-একটি ছবি তিনি বানিয়ে তুলতে পারেন। সেই ছবির বিষয়বস্তু এখানে ভিন্ন চেহারায় দেখা দিয়েছে, এইটুকুই যা পার্থক্য। তার মাধুর্য অবশ্য আগের মতই নিবিড়। নিবিড় এবং সংহত। দু-একটি পংক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি, কথাটা তাতে আরও পরিষ্কার হতে পারে :

পুরোনো শালের লাল পশমের লাল
মেপ্‌ল্ পাতায়
ঝরে হ্রদ-আয়নায়।
আগুনি বেগুনি বেলা হঠাৎ দারুণ
জ্ব'লে উঠে ডোবে বহুগুণ, গাঢ় ঢেউয়ে।

—এই হ্রদ। পালা-বদল

অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে যে-কথাটি সবচেয়ে আগে বলা উচিত ছিল, তা হল এই যে, তিনি একটি রুচিসুন্দর, শুচিশুভ্র হৃদয়ের অধিকারী। তাঁরই সমসাময়িক আরও একজন কবির সম্পর্কে এ-কথা বলতে পারা যায়। তিনি বুদ্ধদেব বসু। বিগত তিরিশ বছর ধরে বাংলা কবিতায় যে-সব পরীক্ষা চলেছে, বুদ্ধদেব বোধহয় কখনও তার থেকে দূরে সরে থাকেন নি। কিন্তু এই সান্নিধ্য সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় যে কখনো কোনো উন্মার্গতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় নি, তার একমাত্র কারণ বোধহয় এই যে, রুচির ঈষণ্মাত্র স্খলনও তাঁর ক্ষমার অযোগ্য ছিল। তাঁর কবিতা মূলত প্রেমকেন্দ্রিক,

এবং সেই প্রেম মূলত মানবকেন্দ্রিক। যৌবনের প্রগাঢ় যন্ত্রণাকেই তিনি তাঁর ভাষার পিঞ্জরে বন্দী করতে চেয়েছিলেন। সেই ভাষা যে ইতস্তত তাঁর ভাবনার পরিধিকে ছাপিয়ে গিয়েছে, বর্ণনীয়ের চেয়ে বর্ণনাই যে ইতস্তত তাঁর কাছে অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে, তাতে সন্দেহ করি না। এবং এমন মনে হওয়াও বিচিত্র নয় যে, তাঁর কবিতা বড়-বেশি বর্ণনাবহুল, বর্ণনাও বড়-বেশি শব্দবহুল। কিন্তু সেইসঙ্গে আরও একটি কথা যোগ করতে হয়। ভাষাকে এত সুন্দরভাবে, এত সার্থকভাবে, তার শরীরকে এত নমনীয় করে, এত বাঁকিয়ে-চুরিয়ে, এমন বিস্ময়কর দক্ষতায় বোধহয় সম্প্রতি আর কেউই ব্যবহার করতে পারেন নি। এবং সেই ভাষাই কি মাত্র একরকম ?

একসার মেঘ, সরু, এলোমেলো, আঁকাবাঁকা কালো সাপের মতো
গাছের শরীরে জড়ায়ে শরীর রয়েছে প'ড়ে।
আঁকাবাঁকা মেঘ, একা বাঁকা চাঁদ, বাঁকারেখা চাঁদ জলের নিচে,
আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা।

—কঙ্কাবতী। বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা

এই ক্ষিপ্র, ক্ষীণকটি ভাষার নূপুরঝংকার মিলিয়ে আসতে-না-আসতেই তাঁর কণ্ঠে যখন শুনতে পাই :

…রক্তপায়ী উদ্ধত সঙিনে
সুন্দরেরে বিদ্ধ ক'রে, মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, 'আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়ো।'
দেশে-দেশে সমুদ্রের তীরে-তীরে কাঁপে থরোথরো
উন্মত্ত জন্তর মুখে জীবনের সোনার হরিণ।

—রবীন্দ্রনাথের প্রতি। বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা

স্বরগ্রামের রেখাবে-নিখাদে তাঁর অনায়াস সঞ্চরণের ক্ষমতায় তখন বিস্ময় না মেনে উপায় থাকে না।

বুদ্ধদেবের সাম্প্রতিক কবিতা পড়লে অবশ্য মনে হয়, ভাষার সৌকর্যের চাইতে ভাবনার সংহতির দিকেই তিনি এখন বেশি মন দিয়েছেন। তাঁর নূতন কাব্যগ্রন্থ "শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর" পড়ে তা-ই মনে হল। আগের চেয়ে অনেক বেশি ভরাট, অনেক বেশি গম্ভীর হয়েছে তাঁর কণ্ঠস্বর, এবং কিছুকাল আগেও যে-সব কথা বলতে গিয়ে অনেক বলেও তাঁর মন তৃপ্তি পেত না, সেই কথাগুলিকেই তিনি এখন অনেক সংক্ষেপে বলতে পারছেন। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করি :

তবু যদি মনে হয় ভুল
নীলিমায় নিজেরে মিলাও,
মুছে যাক ব্যবহার্য নাম ;
হাওয়ার আনন্দে ব'য়ে যাও
তারার রুপালি অন্ধকারে ;
তরঙ্গেরে বলো, 'আমি আছি,'
পৃথিবীরে : 'আমিও ছিলাম।'

—চল্লিশের পরে। শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর

বুদ্ধদেব বসুর কবি-হৃদয় অত্যন্তই সুবেদী। সামান্যতম আলোড়নেও সেখানে কথার ঝংকার বেজে ওঠে। সেই কথাগুলি এখন ঈষৎ বিষণ্ণ, সুতরাং অনেক বেশী ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। এর চেয়ে সুখের কথা আর কী হতে পারে।

এতক্ষণ যাঁদের কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছি, তাঁদের প্রায় সকলকেই— কাউকে কম, কাউকে বেশি— কলাকৈবল্যের সাধক বলে মনে হতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, সামাজিক ঘটনা-পরিবেশের দাবি তাঁদের রচনায় উপেক্ষিত থেকেছে। কোনও সৎ সাহিত্যিকের রচনাতেই তা থাকে না। কিন্তু সেই দাবিকে মাত্রাতিরেকী প্রাধান্য না দিয়েও সাহিত্যিক তাঁর দায়িত্ব অতি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন। আসল কথা, আর্টের নিজেরও কিছু দাবি-দাওয়া থাকে, এবং সমাজের দাবির চেয়ে তার গুরুত্ব কিছু কম নয়। এই সহজ সত্যটাকে কেউ-কেউ বিস্মৃত হন বলেই সাহিত্যের আসরে বিশেষ এক ধরনের অর্বাচীন মেঠো-বক্তৃতা মাঝে-মাঝে প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। সাহিত্য তাতে লাভবান হয় না। অনুমান করি, সমাজও তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিষ্ণু দে অবশ্যই সমাজনিষ্ঠ কবি। তাঁর কবিতা পড়ে অনুমান করতে পারি, নিজেকে তিনি প্রথমত সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে গণ্য করেন, এবং— এই কারণেই— সামাজিক বক্তব্য নিয়ে সাহিত্য-রচনায় তাঁর কিছুমাত্র কুণ্ঠা নেই। সেটা কিছু উল্লেখ্য ব্যাপার নয়। তাঁর পরে তো বটেই, তাঁর আগেও আরও অনেকেই তা করেছেন। কিন্তু সেই আরও-অনেকের সঙ্গে বিষ্ণু দের একটি প্রবল পার্থক্য বর্তমান। পার্থক্য এইখানে যে, সামাজিক বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহিত্যের অতিসরলীকরণে আস্থাশীল নন। কখনও ছিলেন না। তা ছাড়া মানব-হৃদয়ের যে-সব মৌল প্রবৃত্তি জাগতিক ঘটনা-পরিবেশের দ্বারা সামান্যই প্রভাবিত হয়, তারও মূল্যকে তিনি সর্বত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। এবং এরই ফলে তাঁর কবিতায় এমন একটি সমঞ্জস সম্পূর্ণতার স্বাদ পাওয়া যায়, অন্যত্র যা খুব সুলভ নয়। আসলে, তাৎক্ষণিক সমস্যার আঘাতে প্রতিনিয়ত জর্জর হয়েও তাঁর কবি-সত্তা কখনও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ক্ষেত্র থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় নি। যদি নিত, সেটা খুব শোকাবহ ব্যাপার হত সন্দেহ নেই, এবং সেক্ষেত্রে

> দুর্দিন আসে লেলিহরসনা। পাগ্‌লা হাতির পাল
> ছুটেছে অর্থগৃধ্নু অন্ধমাতালের অঙ্কুশে।
>
> —I am Cinna the Poet, Cinna the Poet. বিষ্ণু দে-র কবিতা

এই ভয়াবহ চিত্র রচনার প্রায় পরমুহূর্তেই এত শান্ত, এত প্রসন্ন কণ্ঠে তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হত না :

> সোনালি হাসি, সোনালি গানে ভরি
> তাই বিরল সন্ধ্যা, সহচরী,
> কাজে অকাজে তোমাকে আজ স্মরি,
> মরণজয়ী প্রাণের মমতায়।
>
> —শেষ রোমান্টিক। বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা

বিষ্ণু দের কবিতা পড়ে আমার মনে হয়েছে, প্রথাটা এযাবৎ যতই নিন্দিত হয়ে থাকুক, চিন্তার ক্ষেত্রে একই সময়ে দুই নৌকোয় পা রাখাটা হয়ত সত্যিই খুব ক্ষতিকারক নয়। তাতে, আর কিছু না

হোক, সিদ্ধান্তের উগ্রতা অনেক প্রশমিত হয়ে আসে, চিন্তার ফলিত শরীরে একটা ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া যায়।

অত্যন্তই অল্প পরিসরে অনেকগুলি বইয়ের পরিচয় এখানে লেখা হল। প্রতিটি গ্রন্থ নিয়েই সবিস্তার আলোচনার অবকাশ ছিল তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু সে-পথে না গিয়ে গ্রন্থকর্তাদের চিন্তা আর অনুভূতির মৌল কয়েকটি লক্ষণকেই এখানে চিনিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠক আশা করি বুঝতে পারবেন যে, অস্থায়ী এবং অস্থির নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আধুনিক কালের কবিতা এখন স্থায়ী এবং সংহত একটি রূপ নিয়েছে ; কাব্যচিন্তায় এমন একটি দৃঢ় প্রসন্নতা এখন দেখা দিয়েছে, অকস্মাৎ যার অবসান ঘটবার কোনো সংগত হেতু নেই। সেই চিন্তার নতুন ফসল কী হয়, সেইটেই এখন লক্ষ্য করবার। আধুনিক বাংলা কবিতা ইতিমধ্যেই আমাদের হাতে আশার অতিরিক্ত সম্ভার তুলে দিয়েছে ; সুতরাং আপন অধিকারেই সে এখন আমাদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা দাবি করতে পারে। আমরা প্রতীক্ষায় থাকব।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দেবতাত্মা হিমালয়। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা।
দাম প্রথম খণ্ড : সাড়ে আট টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড : সাড়ে নয় টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল রচিত এই বইয়ের দুইখণ্ড পড়া শেষ করে সপ্রশংস বিস্ময়ে আবিষ্ট হতে হয় ; এর মূল্যায়ণে প্রবৃত্ত হয়ে কিছু বলতে কথা সরে না। কি করে লেখক এত দেখেছেন, এই দুর্গম সুবিস্তৃত পর্বত-অঞ্চলের সকল কথা— তা সে বজ্রঘোষবাণীই হোক আর মৃদুমধুর গুঞ্জনই হোক— কেমন করে শুনেছেন এবং মনে গেঁথে রেখেছেন, ভাবলে অবাক হতে হয়।

এ গ্রন্থে আছে বিবিধ সম্ভার। ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, ইতিহাস, পুরাণকথা, প্রকৃতিবর্ণনা তো আছেই ; তা ছাড়া পথে-দেখা কত নরনারীর চিত্র, চমৎকার কত গল্পের উপাদান এর মধ্যে যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত। এমন বিচিত্ররসসমৃদ্ধ ভ্রমণ-মহাকাব্য নিতান্ত দুর্লভ।

এ-জাতীয় রচনার একটা সুবিধে এই যে, আঙ্গিকের বিশেষ বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলতে হয় না ; এর আদি-অন্ত বলে সুনির্দিষ্ট কিছু না থাকলেও চলে। এর কাঠামোটা ঢিলেঢালা : যে-কোনো স্থানে খুলে পড়া শুরু করা চলে, পূর্বের অধ্যায় না পড়েও পরের অধ্যায় বোঝার বা উপভোগের বিশেষ কোনো বাধা নেই। এই ঢিলেঢালা কাঠামোতে একজন নানারসের রসিক, সংবেদনশীল, জিজ্ঞাসু মানুষের অনেক দেখা, অনেক শোনা, অনেক ভালোলাগার পরিচয় অনায়াসে স্থান পেয়েছে। লেখক তাঁর সারা জীবনের ভাবনা ও সাধনার নির্যাসটুকু যেন এ গ্রন্থে ঢেলে দিয়েছেন ; অথচ তাঁর চিন্তার বা মতামতের প্রকাশ, কিংবা অনুভূতির বিশ্লেষণ অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না, পথচলার কাহিনীর সঙ্গে এমন সহজে তা মিশে গিয়েছে।

নগাধিরাজ হিমালয় এই কাহিনীর মহান নায়ক। আশ্চর্য তার রূপ, কখনো ভীষণ কখনো মনোহর। এই মহান চরিত্রকে কেন্দ্র করে বহুকাল ধরে মানব-ইতিহাসের যেসব রোমাঞ্চকর অধ্যায় রচিত হয়ে

এসেছে, লেখকের তা জানা আছে। তাই মাঝে মাঝে হিমালয়ের কোনো একটি বিশেষ প্রকাশের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি বর্তমান থেকে সরে গিয়ে সুদূর অতীতে নিবদ্ধ হয়েছে, নানাকালের নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিরি-পথে-পথে বিচিত্র বর্ণের ও ধর্মের বিবিধ মানুষের মিছিল তিনি দেখতে পেয়েছেন। নিজেকেও তাদের মধ্যে দেখেছেন, কেননা হিমালয়ের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'প্রতি পাথর কথা বলেছে আমার কানে কানে। ইতিহাস শুনিয়েছে, রহস্য-যবনিকা তুলে ধরেছে।··· দেখে এসেছি আমার লক্ষ লক্ষ বছরের কাহিনী এই হিমালয়কে সাক্ষ্য রেখে। ওরই জঠরে, কোটরে, গহ্বরে, গুহায়, ছায়ায়, মায়ায়, আমার আবহমানকালের প্রাণসত্তা আছে লুকিয়ে।'

এটা অহমিকা নয়, ঠিক তার উল্টো। এ হল মহতের প্রতি একটা সহজ আকর্ষণ, এবং তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার একটা দিব্যানুভূতি। বিস্মিত হতে হয় যে এই সুদীর্ঘগ্রন্থব্যাপী নিজের নানা অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণের মধ্যেও নিজেকে বড় করে দেখাবার প্রয়াস নেই, আত্মগরিমার স্পর্শ কোথাও নেই ; সত্যিকারের ভালোবাসায় একেই তো অহমিকার স্থান নেই ; তার উপর লেখকের অনুরাগের পাত্র এক্ষেত্রে এতই মহিমান্বিত যে তার কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর বুদ্ধিবিদ্যার, খ্যাতিপ্রতিপত্তির চেতনাই ক্ষীণ হয়ে আসে। হিমালয়ের আহ্বানে তিনি বারবার ছুটে আসেন সব ফেলে— তাঁর কাজ, তাঁর আরাম, তাঁর অভ্যস্ত জীবনের সকল উপকরণ। তার সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের নিবিড় সম্বন্ধ বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর প্রাণ যখন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন সে তাগিদের কাছে জীবনের আর সবই তাঁর তুচ্ছ মনে হয়। প্রিয়জনের স্নেহ, বন্ধুর প্রীতি, কোনো মানবীয় সম্বন্ধের মায়া তাঁকে ধরে রাখতে পারে না। এমনকি কেউ যদি তাঁর সঙ্গ নেয় তো সে পথের সাথীকেও তিনি বিবাগী করে ছাড়েন ; সুখসুবিধাই যে শুধু তাকে ছাড়তে হয় তা নয়, তার চিন্তার রীতিই বদলে যায়, তার পরিচিত মূল্যবোধের ওলটপালট হয়ে যায়। এটা কিন্তু লক্ষণীয় যে যার ডাকে তিনি বেরিয়ে পড়েন তার কাছে এসেও তাঁর একটা অতৃপ্তি থেকে যায়, সে এত বিরাট ও ঐশ্বর্যময় যে তাকে যেন হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন না। তাই অনেক স্থানে এ-লেখায় একটা বিষাদের সুর বেজে ওঠে।

পূর্বেই বলেছি যে হিমালয়ে এই বিশাল পরিক্রমার বৃত্তান্ত প্রথমত এবং প্রধানত হিমালয়-কথা হলেও পথে-দেখা মানুষের কথাও এতে কম নেই। লেখক নিপুণ কথাশিল্পী, তাই এইসব মানুষের চরিত্র অনায়াসেই তিনি এঁকে গিয়েছেন। এরা এত জীবন্ত যে একবার দেখেই এদের অনেককে ভোলা শক্ত। ধীরগতি, পরিহাসপ্রিয়, সাবধানী পালিত মশাইয়ের শ্রমকাতরতা ; ঠাণ্ডায় তাঁর মুখ ফাটার জ্বালা এবং পার্বত্য ছোট শহরে কোথাও ভেসলীন কিনতে না পাওয়ায় ক্ষোভ ; বাঘের ভয় সত্ত্বেও লেপমুড়ি দিয়ে অমলেকগঞ্জের এক দোকানঘরের মেঝেতে শুয়ে তাঁর গভীর নিদ্রা ; পথে হঠাৎ প্রয়োজন হলে যে সোনার হারটিকে বেচে পাথেয় সংগ্রহের জন্যে আনা হয়েছিল, প্রয়োজন সত্ত্বেও সেটিকে না বেচে গলায় পরেই তাঁর প্রত্যাবর্তন এবং যথাস্থানে প্রত্যর্পণ— এইসব উপাদানে তৈরি একটা চেহারা মনে এঁকে যায়। অমরনাথ-যাত্রায় লেখকের অশ্বরক্ষী, দুর্যোগে আতঙ্কে অভয়দাতা, দীর্ঘকায় সুশ্রী গৌরবর্ণ গণিশের, মুখেচোখে যার সহাস্য বন্ধুত্ব, অশেষ বিপদসঙ্কুল পথে অক্লান্ত যার সেবা ও সহযোগিতা— সেও অবিস্মরণীয়।

এমনি আরো বহু চরিত্রচিত্রণ মনে দাগ কাটে। দ্বিতীয় খণ্ডের অনেকখানি জুড়ে আছেন শ্রীমতী মায়া গুপ্ত, যিনি ক্ষণকালের জন্যে দেখা দিয়েছিলেন প্রথম খণ্ডে। শ্রীনগরে এক অভূতপূর্ব দুর্যোগের রাত্রিতে

তাঁর অতিথিসেবার আশ্চর্য নিষ্ঠা; বাড়িঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ার হঠাৎ সঙ্কল্প; সামান্য-চেনা লোকের সঙ্গে আলাপ জমাবার স্বাভাবিক শক্তি; প্রবাসী পতির গুণবর্ণনায় অক্লান্ত উৎসাহ; পথকষ্ট তুচ্ছ করার ক্ষমতা; এবং, সর্বোপরি, প্রসাধন-মার্জিত চেহারার ভিতরে স্নেহে কোমল ভক্তিতে নম্র অন্তর— এমনি রকমারি রঙে আঁকা তাঁর ছবিটি ক্ষুদ্রাকৃতি নয়, প্রায় প্রমাণসই।

তথ্যের দিক থেকে এ বইয়ে কোথায় কি ভুল আছে তা বিচার করবার মতো জ্ঞান আমার নেই। এক হিসেবে সেটা সুবিধে বলেই মনে করি, কারণ পড়তে পড়তে হিমালয়ের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মানস-ভ্রমণে কোথাও হোঁচট খেতে হয় নি; অর্থাৎ দুটো-চারটে ভুলে আটকে গিয়ে এ বইয়ের রস আস্বাদনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হয় নি। লেখক যে মহান চিত্র এঁকেছেন তার সহস্র সহস্র রেখার নিপুণ বিন্যাসের মধ্যে কোথায় দু-চারটে টান অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, এ সন্ধান করতে প্রবৃত্তি হয় না। বড় কথা হল এই যে, বহুবিস্তৃত এই গিরি-অঞ্চলের একটা সামগ্রিক রূপ পাঠকের চোখের সামনে ধরা দেয়, এবং লেখকের মনে সে রূপ কি মায়া বিস্তার করেছে তার কতকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এ কৃতিত্ব সামান্য নয়।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হয় যে, দ্বিতীয় খণ্ডের চেয়ে প্রথম খণ্ড পাঠককে অনেক বেশি আনন্দ দেয়। তার প্রধান কারণ প্রথম খণ্ডে বিষয়বস্তুর আকর্ষণ অধিক, এবং উপকরণ বেশি থাকাতে কথা বাড়াবার ইচ্ছা সংযত করতে হয়েছে; ফলে কাহিনীতে এসেছে একটা গতিবেগ। সে গতি দ্বিতীয় খণ্ডে মন্থর হয়ে গিয়েছে, মাঝে মাঝে কাহিনীর স্থান জুড়েছে ঈষৎ-ফেনিল ভাবালুতা। অবশ্য প্রবোধকুমার ভাষার দক্ষ শিল্পী: এসব স্থলেও ভাষায় তাঁর কারিগরি পাঠক তারিফ না করে পারেন না। তবে স্থানে স্থানে মনে হয় লেখক শব্দ-বিলাসে বিভোর হয়ে কথার সঙ্গে কথা গেঁথেই চলেছেন যেন তিনি আপন রচনা-শৈলীতে আপনি মুগ্ধ। তা ছাড়া একই রকম প্রসঙ্গের আলোচনা বেশি দীর্ঘ হলে খানিকটা ক্লান্তিকর হতে বাধ্য। তাই একএকবার মনে হয়েছে যে, প্রথম খণ্ডের পর ও-বিষয়ে আর না লিখলেই বোধ হয় লেখক ভালো করতেন, যেহেতু উৎকৃষ্ট জিনিসও পরিমাণে বেশি পেলে লোকে তার কদর করে কম।

উপসংহারে বলব যে এ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একটা দিক বিশেষ সমৃদ্ধ করেছে। এর বহিরবয়বও মনোহর। কাগজ অত্যুৎকৃষ্ট; এবং ছাপা বাঁধাই প্রভৃতির শিল্পে আমাদের দেশে কি বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে, এ বই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

স্মৃতিরঙ্গ। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। নাভানা, কলিকাতা। আড়াই টাকা।

ইংরেজির মতো বাংলাসাহিত্যেও এখন যে-যুগ চলছে সেটা প্রধানত স্মৃতিরঙ্গের যুগ। হঠাৎ হঠাৎ চমকে দেবার মতো কবিতা, এবং কিছু গল্প প্রবন্ধ যে না লেখা হচ্ছে তা নয়। অনুবাদও প্রচুর হচ্ছে, যার শ্রেষ্ঠ অংশ আবার কবিতা থেকেই করা। কিন্তু পরিমাণে যেটা অতিমাত্রায় হচ্ছে তা এমন কি উত্তমশ্রেণীর মাসিক ত্রৈমাসিক ওলটালেও চোখে পড়বে; দেখা যাবে, কী পরিমাণ সাম্প্রতিক গদ্য

লেখার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে স্মৃতি, অতীতের রোমাঞ্চিত রোমন্থন। রাজনীতি করতে গিয়ে অনেকে অনেক মহৎ কর্ম করেছিলেন ; লেখক হতে গিয়ে অনেকে বহুবিধ প্রশস্তিপত্রাদি পেয়েছিলেন ; ভ্রমণ করতে গিয়ে বিদেশের দ্রষ্টব্য জিনিসপত্র অনেককে হয়তো সমাদর ক'রে দেখানো হয়েছিল , আত্মকথার নামে সেইসবের লিষ্টি পড়তে পড়তে প্রাণ যাদের হাঁপিয়ে ওঠে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। এর বেশির ভাগ লেখাই এমন নিঃসার, রচনায় পরিণত-কারিগরীর অভাব এমন প্রকট যে প'ড়ে ওঠার ব্যায়ামটা শেষ পর্যন্ত অবৈতনিক কসরতে গিয়ে দাঁড়ায়। বিরক্তির আরো একটা কারণ বোধ করি এই যে, কথায়-বার্তায় ভুলিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই লেখক আসলে যা আমাদের দেখাতে চান তা হচ্ছে তাঁর নিজের আঁকা মাল্যচন্দনভূষিত নিজেরই একখানি প্রতিকৃতি। পাঠক অপ্রস্তুতের একশেষ।

অন্যপক্ষে "স্মৃতিরঙ্গে"র লেখক নিজেকে তো তাঁর লেখার নায়ক করবার চেষ্টা করেননই নি, বরং 'খানকয়েক পুরনো চিঠি, গোটাকয়েক রংছুট ছবি, ডায়েরিতে টুকে রাখা কতক টুকরো-টুকরো খাপছাড়া কথা, কিছু উপহারদ্রব্য— এই উপকরণের সাহায্যে প্রবাসকালের প্রায় মুছে যেতে বসা স্মৃতি থেকে এই স্কেচগুলি উদ্ধার' ক'রে, তাদের পুরো চেহারাটা ধরাবার মতো জায়গা তাঁর বর্তমান লেখায় না-থাকার জন্য উপরন্তু দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আঁকতে জানলে স্কেচও রীতিমত উপভোগ করার জিনিস হয়ে ওঠে এবং শিল্পের জ্ঞান পাকা না থাকলে স্কেচ কখনো ওতরায় না। স্মৃতিকথার ছলে এই বইতে স্তুতিকথা প্রবেশ করে নি, লেখক তাঁর স্নেহ কৌতুক ভালোবাসা মিশিয়ে এইভাবে তাঁর স্মৃতির ঋণ শোধ করেছেন। এবং তাঁর কৌতুকবোধ এমন স্বাভাবিক যে, বইয়ের আমিটিকে স্থানে স্থানে করুণ, প্রায় হাস্যকর ক'রে তুলতেও তাঁর আটকায় নি। কাজেই এ লেখাকে আমরা অচিরাৎ ভালোবেসে ফেলি।

এই যেসব বিদেশী চরিত্রের স্কেচ তিনি এঁকেছেন তার মধ্যে ক্যাবস্টলের মালিক জন, শিল্পীর মডেল আয়লা স্যাণ্ডহাম, দেশলাই-বিক্রেতা রহস্যময় রবার্ট ব্রাউন এবং কনসার্ভেটিভ দলের আত্মনির্ভরশীলা মেয়ে অলিভ আইভিদের দেখা গেলেও বাদবাকি প্রায় সবাই কবি শিল্পী সাহিত্যিক, নয় তো সম্পাদক। এবং তাঁদের মধ্যে কারো কারো নাম বিখ্যাতদের তালিকায় না দেখে থাকলেও, হয়তো বিশেষ ক'রে সেইজন্যেই, তাঁরা আমাদের মন জুড়ে বসেন। হার্বার্ট পামার এই বইতে তুলে দেওয়া গ্রাম্য বাংলা গানটির যে অনুবাদ লেখককে তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন সেটি চমৎকার হলেও কবিখ্যাতি তাঁর সবিশেষ না-থাকাই সম্ভব ; তৎসত্ত্বেও, লণ্ডন শহরের ম্যানহাটান নামক অখ্যাত চায়ের দোকানটি যেদিন প্রথম খোলা হয় সেদিন এই কবির আত্মহারা কবিতা পড়বার দৃশ্যটি লেখক অতি মনোজ্ঞ করে এঁকেছেন। দরিদ্র কবি টেডি কোলের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাতের বিবরণটি তাই। ম্যানহাটান, জন, সেলশক প্রভৃতি রচনা তো রীতিমত ভালো ছোটোগল্প হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের উৎসাহ বিশেষ করে সেইসব লেখায় যেখানে পাউণ্ড-ইয়েটস্-এর মতো কবি, আরনেস্ট রীস্-এর মতো সম্পাদক, রটেনস্টাইনের মতো শিল্পীকে লেখক খুব কাছের থেকে তাঁদের ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে দেখিয়েছেন। লেখকের উদ্দেশ্য এঁদের প্রতিভার বিশ্লেষণ করা নয়, মানুষ হিসেবে এঁদের স্কেচ আঁকা। তাঁর সে উদ্দেশ্য খুবই সার্থক হয়েছে। বিশের যুগের কোনো এক সন্ধ্যায় এজরা পাউণ্ডকে আরনেস্ট্ রীস্-এর বাড়িতে ঘরসাজানো টিউলিপ ফুল চিবিয়ে তাঁর মনের ক্ষোভ মিটিয়েছিলেন— সে কথা তাঁর প্রামাণিক কোনো জীবনচরিতে লেখা থাকবে না বটে, কিন্তু অভিজ্ঞ পাঠক ঐটুকু থেকেই এই আশ্চর্য অহংকারী প্রতিভার অধীশ্বর কবিটির চেহারা চিনতে পারবেন।

রসালো করে বলতে পারলে জমিয়ে আড্ডা দেওয়াটাও একটা আর্ট হয়ে উঠতে পারে। এবং সেরা আড্ডার উপকরণ হচ্ছে শিল্প সাহিত্য এবং সেসব যাঁরা সৃষ্টি করেন তাঁরা, যদিও সে সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক অর্থাৎ আলোচনা প্রায়ই মনান্তরে গিয়ে পৌছয়। "স্মৃতিরঙ্গ" বইখানি থেকে পাঠক এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট আড্ডার স্বাদ পাবেন, শিক্ষা সংস্কৃতি এবং রুচির একটি পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে যা বিশেষ সহায়ক।

বিদেশের গুণীজনমণ্ডলীর ঘরোয়া আসরে সমাদরের আসনটিই তিনি পেয়েছিলেন। শুধু পরিচয়পত্রের বলে নয়, তাঁর নিজের গুণে। তার একটি প্রমাণ— মোহিনী চ্যাটার্জির স্মরণে লেখা ইয়েট্‌স্‌এর কবিতাটি। (তিনি নিজে বলেন নি, কিন্তু তাঁর পিতার উদ্দেশে লেখা ঐ কবিতা একরকম তাঁকেই যে উৎসর্গ করা সেটা আমরা অনুমান করে নিতে পারি)। তার চাইতেও বড় প্রমাণ আলোচ্য এই বই।

নরেশ গুহ

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। হুমায়ুন কবির। বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা -১২। দুই টাকা।

জীবনের সমস্যা আর তার সমাধানের চেষ্টাকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন করে ভাবতে অভ্যস্ত। কোনোটাকে ভাবি আর্থিক, কোনোটাকে সামাজিক, কিছু কিছু আলোচনা ধর্মগত, কতকগুলি শিক্ষা-কেন্দ্রিক— এইভাবে নানা নামে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে মানুষের জীবনের কাজ-চিন্তা-অনুভূতি-কামনার বিচার-বিশ্লেষণ আমরা করে থাকি। শ্রেণীবিভাগ করে বিচার করায় আপত্তি যে থাকবেই এমন নয়; বরং সমস্যাটিকে ভালোভাবে বুঝে নিতে হলে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে দেখা একটা সার্থক উপায় বলেই মনে করা উচিত। কিন্তু আপত্তি আছে একটি জায়গায়। খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করতে গিয়ে আমাদের বিচার-দৃষ্টিটা ঐ খণ্ডের মধ্যেই সচরাচর আবদ্ধ হ'য়ে যায়, বিচারী মন তখন খণ্ডিত সমস্যাটির বাইরে বৃহত্তর ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে, তখন মন ভুলে বসে যে জীবনের কোনো-কিছুকে একান্ত করে দেখা যায় না। সাধারণতঃ মানুষের বিশ্লেষণে মনের বন্দিত্ব ঘটে বলেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন উদারদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীরা। শিক্ষার আলোচনায় নিশ্চয়ই শিক্ষার ব্যাপারটিকেই মুখ্য করতে হবে, শিক্ষা-প্রচেষ্টার সকল দিকই যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করে বুঝে দেখতে হবে, শিক্ষা-পদ্ধতির সম্ভাব্যতা লক্ষ্য সবই বিশদভাবে জানতে হবে, হৃদয়ংগম করতে হবে। তাই ব'লে শিক্ষার বিশেষ বিষয় নয় ব'লেই যে, ধর্ম সমাজ বা আর্থিক ব্যবস্থার দিকে চাইতে বারণ করা হবে, সেটা ঠিক নয়। মন যদি তার পাকা অভ্যাসবশে গণ্ডীবদ্ধ শিক্ষা-ব্যাপারের মধ্যেই থেকে যায়, তা হলে যত বিশুদ্ধ নির্ভুল বিশ্লেষণই করুক না সে, তার বিচার সমগ্র জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নিরর্থক হবে, অর্থাৎ নির্ভুল বিচার-বিশ্লেষণ জীবনের ক্ষেত্রে গোটা সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যবহারিক দিক দিয়েই ব্যর্থ হয়ে দাঁড়াবে। সেইজন্য বিশ্লেষণ যেমন দরকার তেমনি খণ্ডিত ক্ষেত্রের বাইরে বড় জীবনের ভূমিকায় ক্রমাগত মনকে টেনে আনা দরকার। সার্থক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের এই সতর্কবাণী কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রেই সত্য নয়। জীবনের কোনো খণ্ডিত অংশই সমগ্র জীবনের মতো সত্য নয় ব'লে মানুষের সকল চিন্তায় চেষ্টায় এই বাণী সত্য।

'শিক্ষক ও শিক্ষার্থী'তে লেখক কেবল বিশ্লেষণ করেন নি, ব্যাপক সমাজের ও সমাজের বিরাট পরিবর্তনের ভূমিকায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমস্যাবলী আলোচনা করেছেন। তাঁর সন্ধানী মন আসল

জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পেরেছে, সমাধানের পরামর্শগুলিও সত্যই বাস্তবগুণসম্পন্ন হ'য়ে উঠেছে। সমস্যার মূল কোথায় কতদূরে সেটা ঠিক ঠিক অনুসন্ধান করতে গেলে যেমন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী দরকার, তেমনি দরকার খুঁটিনাটি বিষয়ের যথার্থ অভিজ্ঞতা। লেখকের লেখায় এই বিরল গুণের পরিচয় আছে পাতায় পাতায়। তার সঙ্গে আছে দার্শনিক মন, যা স্বভাবতঃই সব বিষয়কেই বৃহতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখে। ছোট বই, কিন্তু তার চিন্তাসম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান্। মূল্যবান্ হয়েছে অভিজ্ঞতায়, বিশ্লেষণে, বৃহত্তর দৃষ্টিতে আর বিষয়টি সামাজিক পরিবর্তনের বিশাল ভূমিকায় বিচার করা হয়েছে ব'লে।

লেখকের চিন্তার দু'একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণে একটা শৃঙ্খলার অভাব দেখা যাচ্ছে আজকাল। দু'একটা জায়গায় এই ত্রুটি দেখা যাচ্ছে তা নয়, প্রায় সর্বত্রই এই অনভিপ্রেত আচরণ। এক-একটা বিদ্যালয়ে বা কলেজে এ বিষয় অনুসন্ধান করলে শুনতে পাওয়া যাবে ছাত্রদের 'অন্যায়' 'কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুর সহানুভূতিহীন আচরণ' 'অভিভাবকদের প্রশ্রয়' বা এই রকম একটা কিছু। আঞ্চলিক সমস্যা হিসাবে দেখলেও এই সব কারণ যথেষ্ট মনে হবে না। আমাদেরই মন বলবে আঞ্চলিক সমস্যা বা রাজ্য-জোড়া ত্রুটির মূল কোনো বিশেষ কলেজের বা বিশেষ বিদ্যালয়ের মধ্যে নেই, মূল আছে আরো গভীরে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিশ্বাস ছাত্রসমাজের এই ব্যাপক শৃঙ্খলাহীনতার মূলে রয়েছে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মনে বিশেষ কোনো আদর্শের অসদ্ভাব। লেখক বলছেন, "পৃথিবীর সকল দেশেই পুরাতন জীবনদৃষ্টি ও সনাতন আদর্শ ধ্বংস হ'তে বসেছে। তার ফলে যে আদর্শ- হানি ও শূন্যতা, তাকে পূরণ করবে এমন কোনো নতুন আদর্শও আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি।" ভারতের বা অন্য দেশের ছাত্রসমাজ, পৃথিবীব্যাপী আদর্শশূন্যতার আবহাওয়ায় থেকেও স্বতন্ত্রভাবে স্ফুট-আদর্শ হতে পারবে কি ? লেখক বলছেন, "তাদের [ছাত্র-ছাত্রীদের] জীবনের ভিত্তি টলে গিয়েছে এবং তাই সামান্য কারণেই বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়।"

ছাত্রবিশৃঙ্খলাকে লেখক কোনো স্থানবিশেষের সমস্যারূপে দেখেন নি, দেখেছেন বর্তমান যুগে মানুষের মনের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার ভূমিকায়। মানুষ এখন আদর্শগত, সমগ্রজীবনগত পরিবর্তনের আবর্তের মধ্যে পড়েছে—"পৃথিবীর সকল দেশেই মানুষ আজ নতুন আলো, নতুন পথনির্দেশের প্রত্যাশী, কিন্তু সে-আলোক বা নির্দেশের প্রকাশ আজও স্পষ্ট নয়।" নূতন আদর্শ নূতন জীবনভঙ্গী আসছে, আভাসে আসছে, তবে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে নি। পুরাতন চলে যাচ্ছে, নূতন আসছে। এই বিরাট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন লেখক স্থানীয় ছাত্রবিক্ষোভের, কোনো স্থিতিশীল ক্ষুদ্র ভূমিকায় নয়।

শুধু বৃহত্তর ভূমিকায় নয়, শুধু গতিশীল পরিপ্রেক্ষিতে বিচার নয়, রীতিমত স্থানীয় অবস্থার বিশ্লেষণও করেছেন লেখক। তিনি বলছেন, "··· তা ছাড়াও ভারতবর্ষের ছাত্র-বিক্ষোভের কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ রয়েছে। সমস্ত কারণের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা সহজ নয়, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা না করেও এ-কথা বলা চলে যে শিক্ষকের নেতৃত্বলোপ, সমাজে অর্থসংকট, শিক্ষাপ্রণালীর গলদ এবং জনসাধারণের একটি বিরাট অংশের আদর্শচ্যুতি, মোটামুটি এই চার পর্যায়ে তাদের ভাগ করা চলে।" যাঁরা শিক্ষক ও শিক্ষাদান ব্যাপারের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত আছেন এবং একটু বিস্তৃত ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পেরেছেন তাঁরা সকলেই এই বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ সায় দেবেন। এই বিশ্লেষণ বাস্তব জ্ঞানের দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত। একেবারে ঠিক জায়গায় দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছেছে। কোনো একটি বা দু'টি ত্রুটিকে নিয়ে আলোচনা করা হয় নি ; সবগুলিকে অঙ্গাঙ্গীভাবে দেখা হয়েছে।

সমাধানের নানা পথ খোঁজা হয়েছে, পরামর্শ যা দেওয়া হয়েছে তা যেমন স্পষ্ট তেমনি নির্ভীক। সরকারের দায়িত্ব যে কত বড় এবং তার এতটুকু ত্রুটিতে কত বিষময় ফল হ'তে পারে তার দ্বিধাহীন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ; অপর দিকে শিক্ষকদের আত্মবিশ্বাসে উদ্‌বুদ্ধ হবার গুরুত্ব বিশেষ করেই বোঝানো হয়েছে। সামাজিক মর্যাদার অভাব, আর্থিক দৈন্য, অনিশ্চয়তার ভাব, আত্মবিশ্বাসচ্যুতি সমস্ত মিলে এক পাপচক্র সৃষ্টি করেছে। এই পাপচক্র বা প্রমাদের গোলক-ধাঁধা ভেদ করার দায়িত্ব অবশ্য সরকারেরই বেশী, অন্তত বর্তমান অবস্থায়। বড় বড় আর্থিক দায়িত্বের কথা এনে সরকার এই দায়িত্ব লঘু করে দিতে পারেন না। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাশেষে দেখছে তাদের স্বপ্ন ভেঙে গেছে, চারি দিকে শুধু আর্থিক নৈরাশ্য। আদর্শ অস্পষ্ট, শিক্ষার নিজস্ব মর্যাদা নেই বললেই চলে, কোনো দিকে কোনো পথ খোলা নেই আত্মশ্রদ্ধার। ফলে আর্থিক অনিশ্চয়তা সমস্ত মনকে নৈরাশ্যে পঙ্গু করে দিচ্ছে। আবার হতাশ পঙ্গু মনের আর্থিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, সামাজিক মর্যাদাও দূরপরাহত— সেই একই পাপচক্র। এখানে তাদের মনকে, তাদের শিক্ষকদের মনকে আরো ছোটো করে আনছে চারিপার্শ্বের বিচারহীন শ্রদ্ধাহীন নিন্দা। যিনি বোঝেন তিনি তবু একটু আশার কথা বলেন সমালোচনার সময় ; আর অধিকাংশই ঢালাও নিন্দা করেন শিক্ষকের, শিক্ষার্থীর, শিক্ষাব্যবস্থার, শিক্ষাপ্রণালীর, সরকারের। একেবারে সব দিক থেকে ক্রমাগত নিন্দা-সমালোচনা শুনে শুনে সকলেরই মন ক্রমশ নৈরাশ্যে আত্মঅবিশ্বাসে নেমে আসে। লেখক এই নির্বিচারে চারি দিক থেকে নিন্দা করাকে অত্যন্ত অনভিপ্রেত বলে মনে করেন। লেখকের এই বিশ্বাসের সঙ্গে মত না মেলালে ভুল হবে আমাদের। সবই নিন্দার যোগ্য নয়, নিন্দার যোগ্য বলে মনে হয় সব ব্যবস্থাকেই যখন খণ্ডিত ক্ষেত্রে দেখি।

এইখানে (এবং প্রচ্ছন্নভাবে অন্যত্রও) একটি বিশ্বাসের সুর ফুটে উঠেছে লেখকের। লেখক মোটেই হতাশ নন, সাময়িক নৈরাশ্যের পর যে পুনর্গঠনের বিরাট কাজ আরম্ভ হবে সে বিষয়ে লেখকের আশা আছে। তিনি বলছেন—"এ-কথাও ভরসা করে বলা চলে যে ছাত্র-অসংযম আজ এ-দেশে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তা ভাবনার বিষয় হ'লেও হতাশ হবার কারণ নেই।"

লেখকের সমস্ত পরামর্শই সর্বজন-সমর্থিত হবে এমন নয়। বরং দুই-একটা কথার সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতার পার্থক্য রয়েছে। কোনো শিক্ষাকেন্দ্রের উন্নতিবিধানের জন্য কেন্দ্রের অধ্যক্ষ যতখানি করতে পারেন ততখানি আর কেউ নয়। তবু অধ্যক্ষ একা বেশিদূর অগ্রসর হ'তে পারেন না, তাঁর সহকর্মীদের একতান সহযোগিতা ছাড়া। সহকর্মীদের দিকটি বিশেষ মনোযোগের যোগ্য হ'য়ে পড়েছে। আগের যুগে অধ্যক্ষেরা স্বভাবতঃই সহকর্মীদের সসম্ভ্রম আনুগত্যের অধিকারী ছিলেন ; তিনি আদর্শবান বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী হ'লে অপর সকলে তাঁকে সাধ্যমত নিষ্ঠার সঙ্গে সাহায্য করত। এখন অধ্যক্ষের অধিক বেতনের প্রতি বিরাগ কটাক্ষ রেখে কাজ চালিয়ে যাওয়াটাই একপ্রকার রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ শিক্ষকদের চেয়ে বেতনের পার্থক্য নজরে পড়ার মতো হ'লে অসাধারণ গুণবান্ ক্ষমতাবান্ অধ্যক্ষ ছাড়া অন্য কোনো অধ্যক্ষই সহকর্মীদের দ্বিধাহীন আনুগত্যের অধিকারী হ'তে পারছেন না। অর্থ-গৌরবের দিনে, আদর্শ-শূন্যতার ক্ষণে, আর্থিক বৈষম্যটাই বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে মনের মধ্যে ; তাই প্রধানদের আর্থিক সম্মান খুব বাড়িয়ে দিলেই যথেষ্ট নয়, অপরদের দিকটি ঠিক একই মাত্রায় না হ'লেও 'প্রায় এক মাত্রায়' তুলে দিতে হবে। এটা অবশ্য ছোট একটা মতামতের কথা।

সহজ সরল নির্ভীক ভাষা। স্পষ্ট চিন্তা। প্রবন্ধ আকারে লেখা বলে যে কোনো অসুবিধা হয়েছে তা নয়। কোনো কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দেবার জন্য একাধিকবার সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করা হয়েছে, সেটা ঠিক পুনরাবৃত্তি নয়। বইটির উদ্দেশ্য সার্থক হোক কামনা করি।

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়

স্বরলিপি

স্বপন-পারের ডাক শুনেছি, জেগে তাই তো ভাবি—
কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি ॥
নয় তো সেথায় যাবার তরে, নয় কিছু তো পাবার তরে, নাই কিছু তার দাবি—
বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবি ॥
চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না-পাওয়া ফুল ফোটে,
দিশাহারা গন্ধে তারি আকাশ ভরে ওঠে।
খুঁজে যারে বেড়াই গানে, প্রাণের গভীর অতল-পানে যে জন গেছে নাবি,
সেই নিয়েছে চুরি করে স্বপ্নলোকের চাবি ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি : শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

II মা মা -পা । পা পা -মা I পা -া -ধা । না ধা -না I
স্ব প ন্ পা রে র্ ডা ॰ ক্ শু নে ॰

I ধপা -া -া । -া -া -া I না না -া । না না -র্সা I
ছি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ জে গে ॰ জে গে ॰

I ধা -া র্সা । না ধপা -া I পা -া না । ধা না -ধপা I
তা ই তো ভা বি॰ ॰ কে উ ক খ নো ॰॰

I পা ধা -পা । পা ধা -পমা I মা -া পা । পধা পা -া I
খুঁ জে ॰ কি পা ॰য়্ স্ব প্ ন লো॰ কে র্

I মপা মগা -া । গা গা -মা I পা -না না । ধনা ধপা -া II
চা॰ বি ॰ জে গে ॰ তা ই তো ভা॰ বি ॰

II পা -ধর্সা র্সা । র্সা র্সা -া I না না -র্রা । র্সা র্রর্সা -না I
ন ॰য়্ তো সে থা য়্ যা বা র্ ত রে॰ ॰

I না -া র্রা । র্সা র্রর্সা -না I না না -র্সা । না ধপা -া I
ন য়্ কি ছু তো॰ ॰ পা বা র্ ত রে॰ ॰

I পা -না না । না ধা -না I নধা ধপা -া । -া -া -া I
না ই কি ছু তা র্ দা বি ॰ ॰ ॰ ॰

I পা -া না । ধা নধা -পা I পা ধা পা । পা ধপা -মা I
বি শ্ শ হ তেং ০ হা রি য়ে গে ছেং ০

I মা -া পা । পধা পা -া I মপা [ম]গা -া । গা গা -মা I
স্ব প্ ন লোং কে র্ চাং বি ০ জে গে ০

I পা -না না । ধনা [ধ]পা -া II
তা ই তো ভাং বি ০

II { সা সা -া । রা রা -গা I মা পা -া । মা গা -মা I
চাও য়া ০ পাও য়া র্ বু কে র্ ভি ত র্

I রা -া গা । মা পা -ধা I মা পা -া । -া -া -া I
না ০ পাও য়া ফু ল্ ফো টে ০ ০ ০ ০

I পা পা -দা । দা দা -ণদা I পা -ণা ণা । [ণ]দা পা -া I
দি শা ০ হা রা ০০ গ ন্ ধে তা রি ০

I মা পা -া । পদা পা -া I মপা [ম]গা -া । -া -া -া } I
আ কা শ্ ভ০ রে ০ ও০ ঠে ০ ০ ০ ০

I না না -র্সা । র্সা র্সা -া I না না -র্রা । র্সা র্রর্সা -না I
খুঁ জে ০ যা রে ০ বে ড়া ই গা নেং ০

I না না -র্রা । র্সা র্রর্সা -না I না না -র্সা । না ধপা -া I
প্রা ণে র্ গ ভীং র্ অ ত ল্ পা নেং ০

I পা পা -না । না ধা -না I [ন]ধা [ধ]পা -া । -া -া -া I
যে জ ন্ গে ছে ০ না বি ০ ০ ০ ০

I পা -া না । ধা নধা -পা I পা ধা -পা । পা ধপা -মা I
সে ই নি য়ে ছেং ০ চু রি ০ ক রেং ০

I মা -া পা । পধা পা -া I মপা [ম]গা -া । গা গা -মা I
স্ব প্ ন লোং কে র্ চাং বি ০ জে গে ০

I পা -না না । ধনা [ধ]পা -া II II
তা ই তো ভাং বি ০

দিনান্ত

শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্দশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৮৭৯ শক

চিঠিপত্র

শ্রীঅমল হোমকে লিখিত পত্রাবলী হইতে নির্বাচিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

তুমি আমাকে তোমার কল্পনা দিয়া দেখিয়াছ। তোমার বয়সে এইরূপ দেখা স্বাভাবিক। কিন্তু এ দৃষ্টি সত্য নহে। কল্পনার রঙীন আলোকে দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকে না। তোমার দৃষ্টি সত্যপ্রতিষ্ঠ হউক।

আমি অ-সাধারণ নই। সাধারণ মানুষের মতই আমি রাগবিরাগে অভিভূত হই, স্বার্থবুদ্ধি হইতে আমার চিত্ত মুক্ত নয়। কিন্তু ইহার বেদনা আমাকে স্থির থাকিতে দেয় না— সকল তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্তির কামনা নিরন্তর আমাকে অশান্ত রাখে। কাহাকেও আমি পথনির্দ্দেশ করি এমন শক্তি আমার নাই।

দেশের যুবকদের উপর আমার আশার অন্ত নাই। তোমরা একদিন জ্ঞানে ও কর্ম্মে, সাধনায় ও সিদ্ধিতে এ দুর্ভাগা দেশের অপমান দূর করিবে এই ভরসা রাখি। জ্ঞানের চর্চ্চায় অবহিত থাকিয়া সেবায় ও কল্যাণকর্ম্মে স্বদেশের উপর আপন অধিকার স্থাপন কর, কোন সহজ উপায়ে কি কেবলমাত্র দুঃসাহসিকতায় স্বদেশের উদ্ধারসাধন কল্পনা কদাচ মনে স্থান দিও না। বহু বিনিদ্র রজনীর কঠোর সাধনা, দীর্ঘদিনের তপস্যা তোমাদের সম্মুখে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। জড়ত্বের যে জঞ্জালস্তূপ, মূঢ়তার যে লাঞ্ছনা, বহু শতাব্দীর যে শত আবর্জনা আমরা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা তোমরাই দূর করিয়া স্বদেশের নিষ্কলঙ্ক ললাটে তোমরাই রাজটিকা পরাইবে। আপনাকে প্রস্তুত কর, আপন স্বদেশবাসীকে প্রস্তুত কর।— নিষ্ঠায় তোমরা প্রতিষ্ঠ হও, চিত্ত তোমাদের বলিষ্ঠ হউক। ইতি ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

শিলাইদা

কল্যাণীয়েষু,

তুমি এখানে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ। কোন বাধা নাই। শুধু যেন পূর্ব্বাহ্নে খবর পাই, কেন না আমাকে জমিদারীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে।

আমি এখানে আসিয়া পদ্মার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। তাহার স্নিগ্ধ শান্তিতে আমার সকল ক্লান্তি ও অবসাদের অবসান ঘটিয়াছে। পদ্মা আমার বহুদিনের সঙ্গিনী কিন্তু তাহার প্রতি বাঁকে এখনো আমার

পরম বিস্ময়— অতিপরিচয়ের অবজ্ঞাদৃষ্টিতে আমি তাহাকে কোনদিন দেখিতে পারি নাই। নির্জ্জন বালুচরে আমার বোট বাঁধা, অদূরে আমাদের কুঠিবাড়ী বোটের ছাদ হইতে দেখা যায়। ইতি ২৩ আষাঢ়, ১৩১৭

শুভার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

অচলায়তন নিয়ে বাংলাদেশে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে তার উত্তাপ তোমাদের ছাত্রমহলেও সঞ্চারিত হয়েছে দেখচি। তোমার ইন্‌ষ্টিটিয়ুটের বন্ধুদের বোলো যে 'ভারতের ধর্ম্মসাধনাকে ছোট করবার জন্য শোণপাংশুদের বড় করা হয়েছে' একথা ভুল। ধর্ম্মের নামে, সমাজের নামে, আচারের নামে যে বিরাট কারাগার আমরা আমাদের চারপাশে গড়ে তুলেছি সেই বন্দীশালা থেকে, আমাদের সংস্কারকে, অভ্যাসকে, যুক্তিকে মুক্তি দেবার আহ্বানই অচলায়তনের আহ্বান।

অধ্যাত্মসাধনায় মন্ত্রের স্থান আমি কোনদিনই অস্বীকার করি নি— আমার পিতৃদেবের ও পরিবারের দীক্ষা ও শিক্ষা উপনিষদের মন্ত্রেই কিন্তু সে মন্ত্র যখন নিরর্থক আবৃত্তিচক্রে তার নিহিতার্থ লুপ্ত করে দেয় তখন সে মুক্তির নামে বন্ধনই করে সৃষ্টি। প্রাচীনের জয়ঘোষণায় করতালি লাভ আমার পক্ষে কঠিন নয়, একদিন তা পেয়েওছি, কিন্তু মনকে আর দেশকে সনাতনের চুষিকাঠি হাতে ধরিয়ে ছেলেভোলানোর প্রবৃত্তি নেই আর। দেশের তরুণদের কাছেও প্রিয়বচন ছড়িয়ে প্রিয় হতে চাই নে— আঘাত দিতে ও নিতে প্রস্তুত যত দুঃখই পাই না কেন। আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ো। ইতি ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেনকে চিঠিখানি দেখিও। শুনেছি সেও নাকি ক্ষুব্ধ হয়েছে।

৪

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

অজিতের কাছে জানা গেল যে তুমি নাকি কি কাগজ বের করে সাহিত্যচর্চ্চায় এমন মনোনিবেশ করেছ যে কালেজের পাঠ্য পড়বার আর অবকাশই পাচ্ছ না। তোমার অভিভাবকসম্প্রদায় তোমার এই অকাল সাহিত্যপ্রীতির মূলে শান্তিনিকেতনের যোগ কল্পনা করে ক্ষুব্ধ শুনেছি।

তুমি পরীক্ষা পাশ করবার পূর্ব্বেই বিশ্বসাহিত্য পালিয়ে যাবে না, ঠিকই থাকবে। ইস্কুলপালানো ছেলের দলে ভিড় বাড়িয়ো না, আমার নজীর সর্ব্বত্র নাও চলতে পারে।

নববর্ষে আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। তোমার শুভবুদ্ধি ও কল্যাণকামনা করি। ইতি ২রা বৈশাখ, ১৩১৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুরুজনদের আপত্তি না থাকলে রাজা দেখতে আসতে পার ছুটির আগে। এবার আরো ভালো হবে।

র

৫ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

অমল, অজিতের মৃত্যু তার বন্ধুদের অন্তরে যে স্থান শূন্য রেখে গেল তা যে পূরণ হবার নয় তারি ক্লিষ্ট পরিচয় রয়েছে তোমার চিঠিতে। তরুণ বয়সেই অজিত আমার কাছে এসেছিল, অনুরাগে ও শ্রদ্ধায় তার সমস্ত সত্তা আমার সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল অতি অল্পদিনেই। তার সাহিত্যবিচারবুদ্ধির সঙ্গে মিলেছিল তার উদার দৃষ্টি। এমনটি অল্পই দেখা যায়। তার যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি সে দিয়েছে এখানে আমাকে ঘিরে। ইদানীং সে একটু দূরে সরে গিয়েছিল, সেটা একদিক থেকে ভালই হয়েছিল তার স্বাতন্ত্র্যবিকাশে।

চারটি শিশু অতি অসহায় অবস্থায় আজ লাবণ্যর উপরে। বুড়োও অকালে চলে গেল। ভেবে পাই না কি হবে।

তোমার ব্যথিত চিত্ত শান্ত হোক্ এই কামনা করি। ইতি ২০ পৌষ, ১৩২৫

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

Nrurs Palais
Darmstadt
June 16, 1921

কল্যাণীয়েষু,

সর্ব্বাঙ্গে ডাকমোহরের নামাবলী জড়িয়ে তোমার চিঠি অবশেষে উপনীত এইখানে।

আমি বর্লিনের জনতার হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছি এখানে এক রাজন্যপ্রাসাদে। বকুনির কিন্তু বিরাম নেই। কেজারলিংএর নাম শুনেচ নিশ্চয়ই— আধুনিক জর্ম্মানীর বড়ো লিখিয়ে একজন। ভারতবর্ষ ঘুরে এসেচেন। শান্তিনিকেতনের ধরণে তাঁর গাছতলার ইস্কুলে প্রত্যহ কিছু বলি।

তোমার কাগজের জন্য আমার 'জয়যাত্রার' কিছু বিবরণ চেয়েচ। সেটা আমার কাছ থেকে অসঙ্গত হবে— হয়তো অবিশ্বাস্যও হবে। তবু তোমাকে একেবারে নিরাশ করতে চাইনে। সম্প্রতি অয়কেনের সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ ঘটেচে তার নকল তোমাকে পাঠালুম। ছাপতে পার। তবে অয়কেনের ইংরেজী খবরের কাগজের পাঠকদের সহজবোধ্য নাও হতে পারে। যদি ছাপ, তাঁর একটু পরিচয় দিয়ো। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা সেবার আমেরিকায়।

থেকে থেকে দেশের খবর পাই আলোয়-আঁধারে মেশা। শুনচি ননকো-অপারেশনের ঢেউ ভুবনডাঙার শুক্‌নো মাঠ ভাসিয়ে দিল— মাষ্টারমশাইদের অনেকে নাকি কোমর বাঁধচেন ঝাঁপিয়ে পড়বেন বলে। গান্ধিকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি, তাঁর চারিত্রমাহাত্ম্যের তুলনা নেই। কিন্তু পাপ যে আমাদের অনেক, বহু যুগের সঞ্চয়। সে কি ঘুচবে অসহযোগে? ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

6 Dwarakanath Tagore Lane
Calcutta
Sept. 7, 1921

কল্যাণীয়েষু,

আমার একেবারেই ইচ্ছা নয় মহাত্মাজির সঙ্গে আমার কালকের আলাপ আলোচনা কাগজে কিছু বের হয়। তুমি সে অভিপ্রায় ত্যাগ কর। এণ্ড্রুজকেও আমি সে কথা জানিয়েছি।

আজ সন্ধ্যায় এলে কথাবার্ত্তা হতে পারবে। তোমাদের কাগজে জোড়াসাঁকোর প্রাঙ্গণে অগ্নি-সংকারোৎসবের বিবরণ ঠিকই বেরিয়েচে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলাম না।

খবরের কাগজে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার রিপোর্ট ফলাও করে বের করবার কোনো প্রয়োজন আমি দেখি না। ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে একদল সাংবাদিক নিয়ে তুমি এলে শান্তিনিকেতনের শান্তিভঙ্গ ছাড়া আর কিছুই হবে না। ইতি ৪ঠা পৌষ, ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

ওঁ

[June 8, 1922]

কল্যাণীয়েষু

রুসিয়ার উপবাসী বিদ্বজ্জনের সহায়ার্থে তোমার দান পেয়ে খুব খুসি হলুম। কমিটি বাঁধবার জন্যে শীঘ্রই কলকাতায় যাব— ইতিমধ্যে তুমি প্রমথ বাঁড়ুয্যেমশায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে রেখো তিনি যদি প্রস্তুত থাকেন তাহলে তাঁকেই সেক্রেটারির পদে বরণ করা যাবে। ভিনোগ্রাডফের পত্রের অধিকাংশ (আমার সম্বন্ধীয় প্রশংসাবাণী বাদে) খবরের কাগজে পাঠানো যাচ্চে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

জোড়াসাঁকো
বুধবার
[1925]

কল্যাণীয়েষু

অমল, কাল তোমার ওখানে রাজশেখরবাবুর সঙ্গে কথা বলে ভারি খুসি হয়ে এসেচি। ওঁর হাতে কুঠার আছে কিনা জানি না কিন্তু ওঁর অন্তরে আছে পাবক যা নিঃশেষ করে চিত্তবুদ্ধির আবর্জনা। উনি

সহজ করে সব জানেন— সহজ করে সব বলতে পারেন। ওঁকে একবার শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসবার ভার রইল তোমার উপর।

শুভার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অমল, অসহ্য গরমের বিভীষিকায় ভরতপুর দুর্গজয়ের সঙ্কল্প ছেড়ে দিয়েচি।

নটরাজ কপি শেষ হয়েচে, মোকাবিলায় উপদেশ দিয়ে সেটা তোমার হাতে দেব— অতএব মহম্মদকেই পর্ব্বতের কাছে আসতে হবে। কবে তার তারিখ পড়বে জানতে চাই। যদি শীঘ্র আসতে পার তা হলে বিচিত্রা সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা হতে পারবে। প্রমথকে এ সম্বন্ধে একখানা চিঠি আজ দিয়েছি— আশা করি রাজি হবে। তুমি ইহজন্ম নিয়ে অত্যন্ত নিবিষ্ট আছ, আমার মত পরজন্মধ্যানমাত্রসম্বলকে তুমি উপেক্ষা করতে পারো কিন্তু এমন কোনো কোনো কাজ আছে যা ইহজন্মের মত অতি নিকট ও পরজন্মের মত অতি সুদূর নয়— যা পৃথিবীর মাটিতে নয় বটে কিন্তু পৃথিবীরই আসমানে— সেই কাজের প্রয়োজনে এখনো আমার দ্বারে আনাগোনা করতে হবে। ইতি ১২ চৈত্র ১৩৩৩

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ জোড়াসাঁকো

অমল

চন্দননগরে চলেছি কাল ফোঁটা নিতে মালা পরতে। সঙ্গ চাও তো কাল সকালের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিও। অসহ্য হবে না।

দক্ষিণাও মিলবে শুনচি। তোমার বিচিত্রার দাক্ষিণ্যে বুভুক্ষা মিটবে না। দংশন চরমে পৌঁছেচে। অতএব গোঁদলপাড়ায় আমি যাবই যাবই যাব। ২০ বৈশাখ ১৩৩৪

রবীন্দ্রনাথ

১৩ Shillong

কল্যাণীয়েষু

অমল, যে বয়সে হরিনাম করবার সেই বয়সে আমাকে লাগিয়ে দিলে গল্প লিখতে। যারা কোনোকালে কোথাও ছিল না সেই একদল মানুষকে দিনরাত মাথার মধ্যে করে বেড়াচ্চি— তারা পরিচিতদের চেয়ে বেশি পরিচিত হয়ে উঠল— কেন না তাদের মনের কথা সম্বন্ধে কিছুই আমাকে আন্দাজ করতে হয় না। আমিই তাদের অন্তর্যামী। এর থেকেই বুঝবে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ও সার্ভেন্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার নিয়ে আমার গল্পের গাড়ি চলেচে— টার্মিনাস্ এখনো দূরে কিন্তু ষ্টীমের অভাব নেই— অতএব নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

যে কবিতা নববর্ষে লিখেছিলেম তার নাম "হাসির পাথেয়"— তার সংস্কারিত ও সম্পূর্ণ রূপটি তোমার কাছে নেই। অমিয়কে বলেছি কপি করে তোমাকে পাঠাতে।

নন্দলাল পোষ্টকার্ডে আমাকে একটি পাহাড়ী ছবি পাঠিয়েছে কর্শিয়ং থেকে— আমি তাকে তার জবাবে পাহাড় ও মেঘ সম্বন্ধে একটি শুকসারী সংবাদ পাঠিয়েচি। যথাসময়ে দেখতে পাবে।· ·

এখন চল্লুম তোমার গল্প লিখতে। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪ শিলং

কল্যাণীয়েষু

· ·এখানে যেমন খানিক বৃষ্টি খানিক রোদ্দুর তেমনিভাবে গল্প লিখে চলেচি— খানিকটা লেখা, খানিকটা না-লেখার বুনুনি। বিষয়টা কঠিন, মনস্তত্ত্বটা দুর্গম, এবং হয়তো পরিণামে মনুসংহিতার সঙ্গে অসঙ্গতি ঘটিয়ে ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকদের চিত্তবেদনাকর হতেও পারে। তখন আমাকে দোষ দিয়ো না, অদৃষ্টকে অপরাধী কোরো, কারণ সাহিত্য-সংসারে ভালো মন্দ যা কিছু ঘটে অনিবার্য্য বলেই ঘটে— আমাদের কলম সেটা ঘটায় এ কথা ভুল। আমি নিশ্চয় জানি জন্মকালে বিধাতাপুরুষ আমাদের কপালে প্রথম প্যারাগ্রাফটা লিখে দেন তার পরে সেই প্যারাগ্রাফ বাকিগুলোকে টেনে আনে। ইতি ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫ [১৩৩৪]

কল্যাণীয়েষু,

বিচিত্রা দেখে খুসি হয়েছি একথা বলতে পারলে খুসি হতুম। এ কাগজের সাহিত্যমর্যাদারক্ষার ভার কি শুধু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই? প্রবাসীর এ রাজকীয় সংস্করণে উল্লাসের কোনো কারণ দেখ্‌চি নে। প্রমথকে যদি রাজী করাতে পারতে এর চেহারা অন্যরকম হোত— খেচরান্ন নয়, পরমান্ন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ Government House
Singapore

কল্যাণীয়েষু,

অমল, খবর যদি চাও আমার কাছে নয়; জগৎসংসারকে মেসেজ দিতে আমি ব্যস্ত— অর্থাৎ এই ভবসংসারে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আমার যাত্রা নয়, আমার গতি মালগাড়িতে— প্রত্যেক ইষ্টেশনেই আমাকে বোঝা নামানামি করতে হচ্চে। কোন্ পাপে পোয়েট আবু হোসেনকে প্রফেটের সিংহাসনে চড়িয়ে দিলে — দেবতার এই কৌতুক মানুষ হয়ে সামলাতে পারচি না।

রানীকে যে চিঠি লিখে চলেচি, সেগুলো বিচিত্রার জন্য তোমার হাতে দিতে বলবো। কাঁঠালের ঝাঁকায় ফুল পাঠাবার চেষ্টা করা ভুল, দুটোর সম্পূর্ণ বিভিন্ন ওজন হওয়াতে বিপত্তি ঘটে।

চিঠি ডাকে দেবার জন্য লোক দাঁড়িয়ে আছে। অতএব, বাহুল্য কথা বাদ দেওয়া যাক। শিলঙে থাকতে নন্দলালের সেই পাহাড়ের উপর দেবদারু আঁকা কার্ডের উত্তরে যে কবিতাটি লিখেছিলাম তার একটা রূপান্তর পাঠাচ্ছি— যুগলমিলন ঘটিয়ে দিয়ো। চিত্রটি তো তোমারই হাতে। ইতি ৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৪

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭ ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

কাল রাত্রে তুমি হাবল-সনাথ আশ্রমে আসবে এমন জনশ্রুতি শোনা গেল। রাত্রে স্টেশনে গাড়ি গেল— শুতে যাবার পূর্ব্বে নিশ্চয় স্থির করলুম যে, সেই যানবাহনযোগে তোমরা যথাস্থানে যথাসময়ে এসে যথানির্দ্দিষ্ট কক্ষে যথোচিত বিশ্রাম করবে। প্রত্যুষে আমার চায়ের টেবিল প্রস্তুত হবার পূর্ব্বেই তোমাকে আমন্ত্রণ করে লোক পাঠালুম সে ফিরে এসে বল্লে তুমি আসনি। আস্‌লে কি ক্ষতি ছিল?

অভিনয়ের জন্যে কলকাতায় অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে যাবার কথা। কিন্তু দিনু স্টেট্‌সম্যানে পড়েছে যে কলকাতায় টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ অতিমাত্রায় প্রবল হয়েচে। সত্য হলে ছেলেদের নিয়ে যাবার দায়িত্ব কিছুতেই নিতে পারিনে। শীঘ্র খবর দিয়ো, পরামর্শ দিয়ো, আর যদি অসম্ভব না হয় তো দর্শন দিয়ো। আরো অনেক কথা আছে। ইতি ১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

অমল, তোমার উত্তেজনা অস্বাভাবিক না হতে পারে— কিন্তু তার উত্তাপ আমাকে দেবার চেষ্টা কেন? সাহিত্যনীতি নিয়ে যে কোলাহল তুমি দিল্লীতে সুরু করেছিলে, তা বেড়েই চলেচে। তাতে কান দিতে গেলে যে বাণী অন্তর থেকে শুনতে চাই সে আর শোনা হয় না। কি হবে এসব ক্ষণজীবী বাক্যপতঙ্গের গুঞ্জনধ্বনিতে মনকে বিক্ষিপ্ত করে? এমন কতবার কত হল্লা শোনা গেল— ধূলো ওড়ার চোটে মনে হয় সূর্য্যটাকে বুঝি অত্যন্ত ময়লা ঝাড়ন দিয়ে মুছেই ফেল্‌লে, তার পরে দেখি আকাশে কোন চিহ্নই নেই। এবারকার ধূলো ওড়াতেও আকাশের জন্যে আশঙ্কা কোরো না— ঝাঁটা লাগাবার দরকারই হবে না। ইতি ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

শান্তিনিকেতন
৮।১১।২৮

কল্যাণীয়েষু

অমল, কলকাতার রাস্তায় বাড়ির নম্বরবিভ্রাট নিয়ে যে বিপাকে পড়েছিলুম একবার তোমার 99/1/N-এ পৌঁছতে, তারি স্মরণে আমার এই প্রস্তাবটি পৌরকর্ত্তাদের দরবারে পেশ করলুম— তোমার কাগজের মারফৎ। অপূর্ব্ব এখানে আছে। সে পড়ে বাহবা দিলে। তবে তার যথেষ্ট সন্দেহ তোমার বার্ষিকীর কাজে লাগলেও তোমার কর্ত্তৃপক্ষেরা এটি কাজে লাগাবেন কি না।

তোমার অভিপ্রায়মতো স্বাক্ষরিত ফোটো যাচ্চে শুভেচ্ছাসহ। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রপরিচয়

পত্র

৩

১৩১৮ আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতে অচলায়তন মুদ্রিত হইলে 'এই নিয়ে কাগজপত্রে বিস্তর মারামারি কাটাকাটি' চলিয়াছিল; রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ডে অচলায়তনের গ্রন্থপরিচয়ে তাহার কিছু বিবরণ আছে, এই প্রসঙ্গে কবির দুইখানি পত্রও মুদ্রিত আছে। শ্রীঅমল হোম লিখিয়াছেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অচলায়তন পড়িয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এই সংবাদ সত্য নহে, কবি ভুল শুনিয়াছিলেন।

ইনষ্টিট্যুট — ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট।

৪

এই সময় শ্রীঅমল হোম তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় জাহ্নবী নামে একখানি মাসিক পত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৫

অজিত ॥ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের ত্যাগব্রতী শিক্ষক— রবীন্দ্রনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাব্যপরিক্রমা প্রভৃতি গ্রন্থের লেখকরূপে খ্যাত অজিতকুমার চক্রবর্তী। লাবণ্য — পত্নী লাবণ্যলেখা। বুড়ো — অজিতকুমারের ভ্রাতা সুজিতকুমার।

৬

রাজন্যপ্রাসাদে ॥ কবি এই সময় Darmstadt শহরে Grand Duke of Hesse -এর প্রাসাদভবনে আতিথ্য স্বীকার করেন। এই যাত্রায় কবি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন।

কেজারলিং ॥ Count Herman Keyserling (১৮৮০)। তাঁহার *Significant Memories* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ অভিমত দ্রষ্টব্য। তাঁহার সম্পাদিত *The Book of Marriage*

১৯২৪। কলিকাতা

শ্রীঅমল হোম গৃহীত ফোটোগ্রাফ

প্রবন্ধসংগ্রহে কবি ভারতবর্ষীয় বিবাহ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। এই সময় তিনি Darmstadtএ একটি বিদ্যায়তন পরিচালনা করিতেছিলেন।

তোমার কাগজ ॥ কলিকাতার অধুনালুপ্ত সুবিখ্যাত দৈনিক পত্র *Indian Dailg News*— শ্রীঅমল হোম তখন ইহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

অয়কেন ॥ Rudolf Christoph Eucken (১৮৪৬-১৯২৬) বিখ্যাত জর্মন দার্শনিক। কবিকে লিখিত অয়কেনের উক্ত পত্র প্রথমে *Indian Daily News*এ, পরে *Calcutta Municipal Gazette*, Tagore Memorial Special Supplement (September 1941) এ প্রকাশিত।

৭

মহাত্মাজির সঙ্গে…আলাপ আলোচনা ॥ ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের প্রচারকল্পে মহাত্মাজি কলিকাতায় আসিয়া, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; রুদ্ধদ্বারকক্ষে দীর্ঘকাল উভয়ের আলোচনা চলে— একমাত্র সি এফ এণ্ড্রুজ উপস্থিত ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ এই ত্রয়ীর যে চিত্র আঁকিয়াছিলেন তাহা বিশ্বভারতী পত্রিকায় মাঘ-চৈত্র ১৩৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

জোড়াসাঁকোর প্রাঙ্গণে অগ্নিসংকারোৎসব ॥ এই…আলোচনার সময় একদল লোক জয়ধ্বনিসহকারে জোড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাঙ্গণে বিলাতী কাপড় দাহ করেন। রবীন্দ্রনাথ বিলাতী কাপড় পোড়াইবার ব্যাপারে বিরুদ্ধ-মত ছিলেন।

৮

১৩২৮ সালের ৭ পৌষ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা-উৎসব প্রসঙ্গে এই পত্র লিখিত।

৯

১৯২২ সালে রাশিয়ার দুর্ভিক্ষে বিপন্ন মনস্বীদের সাহায্যের জন্য সর্বত্র যে আবেদন প্রচারিত হয়, তদনুরূপ আবেদন অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি ভিনোগ্রাডফ রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন; তাঁহার পত্রের প্রারম্ভে অধ্যাপক মহাশয় লেখেন—

Oxford May 19, 1922

When I met you in Calcutta eight years ago, I little thought that I should have to appeal to you on behalf of my unfortunate countrymen in Russia.

The impression I carried away after our interview was that I had met one who was fitted to represent the great Indian nation that has struggled for centuries with all kinds of hardships— physical and moral. It is to such humanitarians and idealists that I appeal in order to bring to their notice a grievous and pressing need— the need of the intellectual leaders, the brain-workers of Russia who are thereatened with destruction…

"রবীন্দ্রনাথ বিনীতভাবে এই কার্যে নিজের অযোগ্যতা জানাইয়া তাহা সত্ত্বেও দৈনিক কাগজগুলিতে অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফের চিঠির সারাংশ সমেত নিজের আবেদন ছাপাইয়াছেন। তাঁহার নিকট শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ঠিকানায় যিনি যত অর্থ পাঠাইবেন তিনি তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন।"— প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯

প্রমথ বাঁড়ুয্যে ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব মিন্টো-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০

কবির সহিত এই প্রথম সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্‌ধৃতিযোগ্য—

প্রথম পরিচয়

প্রায় কুড়ি বৎসর আগেকার কথা। অমল হোম মহাশয় বলে পাঠালেন রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে আসবেন, আমাকে দেখতে চান। ভয় হল, কারণ আমি দর্শনীয় লোক নই, বয়স হলেও অভ্যস্ত গণ্ডির বাইরে লাজুক, কুনো আর অসামাজিক বলেও আমার বদনাম আছে। কাব্যজ্ঞান কিছুমাত্র নেই, অন্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ও নগণ্য। কি সম্বল নিয়ে কবির সঙ্গে আলাপ করব? আমার পরিচিত একটি ছেলের কাছে শুনেছিলাম সে একবার কবির সঙ্গে কথা কইতে গিয়েছিল, কিন্তু দরজায় পৌঁছেই প্রচণ্ড বুক ধড়ফড় করায় বেচারা ফিরে আসে। আমার অবস্থা ততটা খারাপ হয়নি, কিন্তু ভয় ছিল আমার সঙ্গে কথা কয়ে কবি নিরাশ হবেন।

কবি কি মনে করেছিলেন জানি না, কিন্তু আমি নিরাশ হই নি। আগন্তুকের সমস্ত সংকোচ এক মুহূর্তে দূর করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। যার যে বিষয়ে যতটুকু দৌড় তাই বুঝে নিয়ে তিনি আলাপ করতে পারতেন। পরে দেখেছি, শিক্ষিত অশিক্ষিত ছেলে বুড়ো সকলেই তাঁর সঙ্গে অবাধে মিশেছে এমন কি উপদ্রবও করেছে। তাঁর কাছে ঘোমটাক্রান্তা পল্লীবধূরও জড়তা দূর হয়েছে, যেমন তীর্থস্থানে হয়। স্থান কাল পাত্র অনুসারে নিজেকে আবশ্যকমত প্রসারিত বা সংকুচিত করবার এই শক্তি তাঁর লোকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। "হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা"— এই কবিতায় তিনি অজ্ঞাতসারে নিজের স্বভাবের একদিকের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৬-২-৪৬

—পঁচিশে বৈশাখ, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত সংকলনগ্রন্থ।

১১

ভরতপুর দুর্গজয় ॥ কবি অবশেষে এইবারেই ভরতপুরে গিয়াছিলেন, হিন্দী সাহিত্যসম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন।

নটরাজ ॥ এই সময়ে শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত বিচিত্রা পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন চলিতেছে; শ্রীযুক্ত অমল হোমের মধ্যবর্তিতায় কবির নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা, পরে তিনপুরুষ বা যোগাযোগ উপন্যাস (১৩ ও ১৪ সংখ্যক চিঠিতে ইহাই উল্লিখিত) ও অন্যান্য অনেক রচনা (পরবর্তী কয়েকটি চিঠিতে

উল্লিখিত) বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। ১৬ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত 'রানীকে যে চিঠি লিখে চলেচি' সেগুলিই জাভাযাত্রীর পত্র নামে বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়।

প্রমথকে এ সম্বন্ধে চিঠি ॥ 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ডে মুদ্রিত, প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত ১২ চৈত্র ১৩৩৩ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য।

১২

এই সময়ে (২১ বৈশাখ ১৩৩৪) প্রবর্তক সংঘের আমন্ত্রণে উৎসব উপলক্ষে কবি চন্দননগরে গিয়াছিলেন।

১৭

হাবল ॥ শ্রীহিরণকুমার সান্যাল। দিমু ॥ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮

"যে কোলাহল তুমি দিল্লীতে সুরু করেছিলে" ॥ ১৩৩৩ সালের পৌষ মাসে দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনে শ্রীঅমল হোম পঠিত 'অতি-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য' প্রবন্ধে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, ১৩৩৪ শ্রাবণ সংখ্যায় বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে তাহা বিস্তার লাভ করে। এ বিষয়ে তর্কবিতর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষণ ও রচনাদি রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রয়োবিংশ খণ্ডে মুদ্রিত আছে। এ সম্বন্ধে আরো লিখিবার অনুরোধের উত্তরে এই পত্র লিখিত।

১৯

"আমার এই প্রস্তাব" ॥ শ্যামবাজার ট্রামডিপোর কাছে একটি অনামা গলিতে শ্রীঅমল হোমের 99/1N কর্নওয়ালিস স্ট্রীট বাড়ি খুঁজিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের যে অসুবিধা ঘটিয়াছিল তাহার যাহাতে নিরাকরণ হইতে পারে সেই অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে—The Poet Wants a Street Number যে প্রস্তাব করেন, অনেক বৎসর পরে তাহা কার্যে পরিণত হয়। প্রবন্ধটি Calcutta Municipal Gazette-এর রবীন্দ্রস্মৃতিসংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ১৯৪১) পুনর্মুদ্রিত আছে।

অপূর্ব্ব ॥ শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চন্দ।

প্রাচীন ভারতে গৌড়ীয় সংগীত

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

ভারতের নাট্যশাস্ত্রে যে সংগীতের পরিচয় দেওয়া আছে সেটিই হচ্ছে আমাদের সংগীতের ভিত্তি। পরবর্তীকালে সংগীতরত্নাকর নামক গ্রন্থে শার্ঙ্গদেব সেই ভিত্তিকে অবলম্বন করেই প্রশস্ততর সংগীতের সৌধ নির্মাণ করলেন। ত্রয়োদশ শতকে তিনি সংগীতকে চমৎকারভাবে পর্যবেক্ষণ করে যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন অনুবর্তীগণ তাকেই সাধারণভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব প্রাচীন ভারতের সংগীত এবং সমসাময়িক সংগীত উভয়েরই প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়েছেন। এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন সিংহভূপাল এবং কল্লিনাথ। এই দুটি টীকা এবং রত্নাকরের বিষয়বস্তু আমাদের সংগীত সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অবকাশ দিয়েছে। রত্নাকরকে অবলম্বন করে প্রাচীন গৌড়ীয় সংগীতের কয়েকটি তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করলে ইতিহাসের কিছু উপাদান মিলতে পারে।

সংগীতের প্রধান বস্তু হল গীত। রাগ-রাগিণী, বিবিধ সাংগীতিক ক্রিয়াকলাপ— এই গীতের উপরেই বিন্যস্ত হয়েছে। শার্ঙ্গদেব মাগধী গীতির পরিচয় দিয়েছেন। এই গীতি জাতির সাহায্যে রূপায়িত হত। জাতিই হচ্ছে বর্তমান রাগের আদি রূপ। জাতির লক্ষণগুলিই ক্রমে রাগের লক্ষণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। মাগধী যুগের পরে এল পঞ্চগীতির যুগ। এই পাঁচটি গীতি হচ্ছে— শুদ্ধা ভিন্না গৌড়ী বেসরা এবং সাধারণী। এই গীতিগুলি যাকে অবলম্বন করে রূপায়িত হত তা গ্রামরাগ নামে পরিচিত। এই গ্রামরাগগুলির সঙ্গে জাতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান।

শুদ্ধাগীতির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অবক্র এবং ললিতস্বরের প্রয়োগ। ভিন্নাগীতিতে বক্র অথচ সূক্ষ্ম এবং মধুর গমকযুক্ত স্বরের প্রয়োগ হত। অতিরিক্ত আবেগপূর্ণ অর্থাৎ রঞ্জনধর্মী একপ্রকার গীতের নাম ছিল বেসরা বা বেগস্বরা। এটিকে রাগগীতিও বলা হত। সবরকম গীতের লক্ষণ মিলিয়ে যে গীত তৈরি হয়েছিল তার নাম ছিল সাধারণী। গৌড়ী গীতির বর্ণনা উপলক্ষে রত্নাকর বলছেন—

গাঢ়ৈস্ত্রিস্থানগমকৈরোহাটী-ললিতৈঃ স্বরৈঃ।

অখণ্ডিতস্থিতিঃ স্থানত্রয়ে গৌড়ী মতা সতাম্।।

অর্থাৎ, গাঢ়, ত্রিস্থানে গমকযুক্ত এবং স্থানত্রয়ে অখণ্ডিতস্থিতি ওহাটীযুক্ত ললিতস্বরে যে গীত রচিত হয়েছে তা গৌড়ী গীতি নামে পরিচিত।

গাঢ় শব্দের অর্থ নিবিড়। সিংহভূপাল এর অর্থ করেছেন প্রখর। কিন্তু নিবিড় শব্দটিই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে হয়। ত্রিস্থানে গমকযুক্ত মানে মন্দ্র মধ্য এবং তার— এই তিন জায়গাতেই যথোচিত পরিমাণে গমকের প্রয়োগ ; স্থানত্রয়ে অখণ্ডস্থিতি কথাটির অর্থ এই যে, খাদে মধ্যস্থানে এবং চড়ায় গানটি সমানভাবে পরিব্যাপ্ত থাকবে। কল্লিনাথ এর অর্থ করেছেন— 'অবিচ্ছিন্ন অবস্থান'। ওহাটী শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব বলছেন—

ওহাটী কম্পিতৈর্মন্দ্রৈর্মূর্চ্ছদ্রুততরৈঃ স্বরৈঃ।

হকারৌকারযোগেণ হৃন্ন্যস্তে[1] চিবুকে ভবেৎ।।

---

১ পাঠান্তর : হৃদিস্থে

আসলে ওহাটী বস্তুটি একপ্রকার গমক। শার্ঙ্গদেব 'কুম্পিত' শব্দটি প্রয়োগ করে এটিকে স্পষ্টতর করেছেন, কেননা 'কম্পিত' নামক একটি গমকের অস্তিত্ব রয়েছে। শ্রোতৃচিত্তসুখাবহ স্বরের কম্পনকে গমক বলা হয়। ওহাটী নামক গমকটি মন্দ্রস্থানে করতে হয়। এই কারণে চিবুককে নামিয়ে এনে হৃদয়সংলগ্ন করে এই খাদের কাজটি নিষ্পন্ন করতে হয়। কল্লিনাথ বলছেন—"চিবুকে হৃন্ন্যস্তে সতীতি মন্দ্রস্বরপরম্পরাপ্রয়োগে প্রযত্নোক্তিঃ। হকারৌকারযোগেণোপলক্ষিতৈঃ, তদা হকারৌকারানুকারপ্রতীতির্ভবতি, ন তু সাক্ষাত্তাবেবোচ্চারণীয়াবিত্যর্থঃ। এতেনৌকারহকারাবটতি গচ্ছতীত্যোহাটীপদনিরুক্তিঃ সূচিতা। এবং প্রযত্নে ক্রিয়মাণে মৃদু কোমলং যথা ভবতি তথা দ্রুততরৈরধরাধরং শীঘ্রৈঃ কম্পিতৈঃ কম্পিতাখ্যগমকযুক্তৈর্মন্দ্রৈঃ স্বরৈরোহাটী ভবেদিতি লক্ষণার্থঃ।" এই ব্যাখ্যায় সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং এইটাও বোঝা গেল যে ও-কার এবং হ-কার যে সব সময় উচ্চারণ করতে হবে এমন কথা নয়, খাদের দিকে যে গমকটি অনুষ্ঠিত হবে সেটি হবে মৃদু কোমল এবং দ্রুত।

গমকের বিশেষ প্রয়োগ থাকাতে গৌড়ীগীতিতে কিছুটা ওজঃপ্রকাশক গুণ যে ছিল না এমন নয়, তবে কাব্যের দিক দিয়ে গৌড়ী রীতি যেমন ওজঃপ্রকাশক আড়ম্বরযুক্ত এবং সমাসবহুল ছিল, সংগীতে এই ওজঃগুণটি তদপেক্ষা অনেক কম ছিল বলেই মনে হয়।

গৌড়ীগীতির লক্ষণগুলি যথোচিত ব্যাখ্যার পর কল্লিনাথ বলছেন—"গৌড়প্রিয়ত্বাৎ গৌড়ী ইতি সংজ্ঞা অবগন্তব্যা।" এই উক্তি থেকে গৌড়ী গীতি যে গৌড় থেকেই সংগঠিত সেটাই ধারণা হয়।

এই পঞ্চগীতির সঙ্গে পূর্বোক্ত মাগধী গীতির ভেদ কোথায় সেটি কল্লিনাথ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। মাগধী গীতি প্রধানত পদতালাশ্রিত; আর শুদ্ধা প্রভৃতি গীতিগুলি প্রধানত স্বরাশ্রিত। এ থেকে বোঝা যায় সংগীত রঞ্জনধর্মকে স্বীকার করে ক্রমেই কাব্যসংগীতের দিকে ঝুঁকেছে। এই গীতিগুলি কিন্তু আমরা যাকে গীতপ্রবন্ধ বলি সেই বস্তু নয়। এই গীতিকে বলা হত আক্ষিপ্তিকা। রত্নাকর বলছেন—

> চচ্চৎপুটাদিতালেন মার্গত্রয় বিভূষিতা।
> আক্ষিপ্তিকা স্বরপদগ্রথিতা কথিতা বুধৈঃ॥

অর্থাৎ স্বরাশ্রিত হলেও এ গানের আকৃতি-প্রকৃতি অনেকটা জাতিগায়নের মতই ছিল। তবে এ সংগীতের পূর্বে আলাপ-করণ ছিল; তাতে করে এটি অধিকতর রঞ্জনকারী হত। এই ধরনের গীতিকে শার্ঙ্গদেব গান্ধর্বের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'গান' শব্দে কি বোঝায় তাও শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

> যত্তু বাগ্‌গেয়কারেণ রচিতং লক্ষণান্বিতম্।
> দেশীরাগাদিষু প্রোক্তং তদ্‌গানং জনরঞ্জনম্॥
> নিবদ্ধমনিবদ্ধং তদ্‌দ্বেধা নিগদিতং বুধৈঃ॥
> বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে।

যে জনরঞ্জক কাব্য কলিদ্বারা নিবদ্ধ হয়ে দেশীরাগে রূপায়িত হচ্ছে তাকেই বলা হয় গান। অর্থাৎ আমাদের বর্তমান সংগীত এই গানের পর্যায়েই পড়ে।

পূর্বোক্ত পঞ্চগীতি গ্রামরাগের সাহায্যে গাওয়া হত। এই গ্রামরাগের সংখ্যা ছিল তিরিশ। আলোচ্য গৌড়ীগীতিতে আশ্রিত ছিল তিনটি গ্রামরাগ— গৌড়কৈশিকমধ্যম গৌড়পঞ্চম এবং গৌড়কৈশিক।

এর পরে শার্ঙ্গদেব যে কুড়িটি রাগের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে দুই প্রকার বঙ্গাল রাগের উল্লেখ করা হয়েছে।

তার পরে আসছে ভাষারাগের প্রসঙ্গ। ইতিহাসের দিক থেকে ভাষা বিভাষা এবং অন্তরভাষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এইসব আখ্যা থেকেই সংগীতের বিবর্তন বোঝা যায়। ভাষারাগের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব বলছেন—

ভাষা মুখ্যা স্বরাখ্যা চ দেশাখ্যা চোপরাগজা।
চতুর্বিধা মতঙ্গোক্তা মুখ্যাঽনন্যোপজীবনী।
স্বরদেশাখ্যয়া খ্যাতা স্বরাখ্যা দেশজা ক্রমাৎ।
অন্যোপরাগজা তাভ্যো যাষ্টিকেনোদিতাঃ পুনঃ।

ভাষারাগের চারটি প্রকারভেদ ছিল— মুখ্যা স্বরাখ্যা দেশাখ্যা এবং উপরাগজা।

মুখ্যা ভাষা হচ্ছে অনন্যোপজীবনী অর্থাৎ যেটি স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কল্লিনাথ বলছেন— "অনন্যোপজীবিত্বং স্বরদেশাপেক্ষয়া প্রবর্তমানত্বম্ তেন বিনা স্বাতন্ত্র্যেণ প্রবর্তমানা অত্র মুখ্যা"। অর্থাৎ যেটি স্বর এবং দেশকর্তৃক প্রবর্তিত নয়, যার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, কাউকে অবলম্বন করে গঠিত হয় নি সেইটিই মুখ্যা। স্বরজ ভাষা বা যে ভাষাটি স্বরগত তাকে বলা হয় স্বরাখ্য ভাষা। দেশাখ্য ভাষা দেশজ বা দেশের জনপ্রিয়তায় সংগঠিত হয়েছে। অপরগুলিকে উপরাগজ বলা হয়ে থাকে। সিংহভূপাল বলেছেন, মুখ্যা স্বরাখ্যা এবং দেশাখ্যার মিশ্রণে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি উপরাগজ।

এখন, ভাষারাগ বলতে কি বোঝায় সেটি বলা যাক। কল্লিনাথ বলেছেন— "গ্রামরাগাণামেব আলাপপ্রকারা ভাষা বাচ্যা। ভাষাশব্দঃ অত্র প্রকারবাচী ইতি। এবম্ বিভাষা অন্তরভাষাশব্দৌ অপি তৎ তৎ অনন্তর উৎপন্ন আলাপপ্রকারবাচকৌ ইতি অবগন্তব্যম্।" অর্থাৎ গ্রামরাগের আলাপপ্রকারকে ভাষা বলা হয়। ভাষাশব্দ এখানে প্রকার-বাচক। এখানে আলাপপ্রকারকে বলতে বিবিধ গায়নভঙ্গি বোঝানো হয়েছে। দেশ, গোষ্ঠী এবং শিক্ষা ভেদে গ্রামরাগের গায়নরীতি কিছু কিছু পাল্টে গিয়েছিল এবং সেই variation বা পরিবর্তিত রূপটিই হচ্ছে ভাষা। এই পরিবর্তনের আধিক্য অনুসারে বিভাষা এবং অন্তরভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

ভাষারাগের জনক পনেরোটি গ্রামরাগ। এই গ্রামরাগের ভাষাগুলির মধ্যে কোথায় কোথায় গৌড় বা বঙ্গালের উল্লেখ আছে সেটি এই ছকে দেখানো হল—

গ্রামরাগ	ভাষা
হিন্দোল	গৌড়ী
মালবকৈশিক	বাঙ্গালী, গৌড়ী
ভিন্নষড়জ	বাঙ্গালী

ক্রমে এই গ্রামরাগ এবং ভাষাগুলি পরিবর্তিত হতে হতে দেশীরাগের পর্যায়ে এসে পড়ল। দেশীরাগত্ব হেতু এদের আখ্যাও পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল চারটি নামে— রাগাঙ্গ ভাষাঙ্গ ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ। অর্থাৎ বহুতর মিশ্রণের ফলে এইসব রাগকে কেবলমাত্র মূলের অঙ্গোৎপন্ন বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই অঙ্গগুলিও বহুকাল ধরে চলে এসেছে। এই কারণে এদেরও পূর্বপ্রসিদ্ধ এবং অধুনাপ্রসিদ্ধ— এই দুই-

ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পূর্বপ্রসিদ্ধ অঙ্গাদির মধ্যে গৌড়ী বা বঙ্গালের উল্লেখ নেই। অধুনাপ্রসিদ্ধ অঙ্গাদির মধ্যে এই রাগগুলির উল্লেখ এইরকম—

রাগাঙ্গ—বঙ্গাল, গৌড়

ক্রিয়াঙ্গ—গৌড়কৃতি

উপাঙ্গ—গৌড়মল্হার, কর্ণাটগৌড়, দেশবালগৌড়, তুরুস্কোগৌড়, দ্রাবিড়গৌড়।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্রমে ক্রিয়াঙ্গ অর্থাৎ বিবিধ ক্রিয়াকলাপে অনুষ্ঠিত সংগীতও রাগসংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উপাঙ্গগুলি হচ্ছে এই অঙ্গরাগগুলির মিশ্ররূপ। এগুলি এত সংকীর্ণ যে এদের কোনো বিশিষ্ট অংগের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

এইসব রাগগুলির লক্ষণ বর্ণনা করা যাক। গৌড়কৈশিকমধ্যম গৌড়পঞ্চম এবং গৌড়কৈশিক এই তিনটি গ্রামরাগের লক্ষণগুলি নিম্নলিখিত তালিকায় দেখানো হল—

১ গ্রামরাগ	২ গ্রাম	৩ জাতি	৪ গ্রহ[1]	৫ অংশ[2]	৬ ন্যাস[3]
গৌড়কৈশিকমধ্যম	ষড়জ	ষড়জমধ্যমা	ষড়জ	ষড়জ	মধ্যম
গৌড়পঞ্চম	ষড়জ	ধৈবতী এবং ষড়জমধ্যমা	ধৈবত	ধৈবত	মধ্যম
গৌড়কৈশিক	ষড়জ ও মধ্যম	কৈশিকী ও ষড়জমধ্যমা	ষড়জ	ষড়জ	পঞ্চম

৭ অলঙ্কার	৮ মূর্ছনা	৯ প্রয়োগ	১০ স্বরসংখ্যা	১১ কাল	১২ বিশেষত্ব
প্রসন্নমধ্য	ষড়জাদি বা উত্তরমন্দ্রা	ভয়ানক বীর	সম্পূর্ণ	দিবসের মধ্যমযাম	কাকলী নিষাদের ব্যবহার
প্রসন্নমধ্য	ধৈবতাদি বা উত্তরায়তা	ভয়ানক বীভৎস বিপ্রলম্ভ উদ্ভট নটন	ষাড়ব	দিবসের মধ্যমযাম গ্রীষ্ম	পঞ্চমবর্জিত কাকলীনিষাদ এবং অন্তরগান্ধার ব্যবহৃত হয়।

১ যে স্বর দিয়ে গীত আরম্ভ করা হয় তাকে গ্রহস্বর বলে।

২ অংশস্বর হচ্ছে প্রধান স্বর।

৩ যে স্বরে গীত সমাপ্ত হয় তাকে ন্যাসস্বর বলে।

প্রসন্নাদি	ষড়্জাদি বা উত্তরমন্দ্রা	বীর রৌদ্র অদ্ভুত	সম্পূর্ণ	দিবসের মধ্যমযাম শিশির বা হেমন্তকাল	কাকলী নিষাদ ব্যবহৃত হয়। ত্রিশ্রুতিক পঞ্চম এবং চতুঃশ্রুতিক ধৈবত ব্যবহৃত হয়।

এর মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, গৌড়পঞ্চম গ্রামরাগে পঞ্চম স্বরটিই বর্জিত। এক্ষেত্রে এর নাম যে কেন গৌড়পঞ্চম হল সেটি বোঝা দুঃসাধ্য। আর-একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, গৌড়কৈশিক গ্রামরাগটি ষড়্জ এবং মধ্যম উভয়গ্রামের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। এর মধ্যে কোথায় ষড়্জগ্রাম এবং কোথায় মধ্যমগ্রাম লাগবে সেটি কল্লিনাথ তাঁর টীকায় স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে মূর্ছনাটি ষড়্জ-গ্রামের উত্তরমন্দ্রা হবে এবং ঠাটটি হবে মধ্যমগ্রামের অর্থাৎ ত্রিশ্রুতিক পঞ্চম এবং চতুঃশ্রুতিক ধৈবতের ব্যবহার হবে। এইসব গ্রামরাগের এবং গীতের উদাহরণ রত্নাকরে দেওয়া আছে, কিন্তু এস্থলে সেগুলি উদ্ধৃত করে দেবার সুযোগ নেই।

এই তিনটি গৌড়ীয় গ্রামরাগের কোনও ভাষার উল্লেখ শার্ঙ্গদেব করেন নি। এতে মনে হয় এই গ্রামরাগগুলি ভারতে যথেষ্ট প্রচলিত থাকলেও এগুলিতে কোনো মিশ্রণ ঘটে নি।

এর পর রাগ বঙ্গাল ভাষারাগ গৌড়ী এবং বঙ্গাল-এর প্রসঙ্গে আসি।

রাগ বঙ্গালএর লক্ষণ হচ্ছে এইরকম—

রাগ	গ্রাম	জাতি	গ্রহ	অংশ	ন্যাস	বিশেষত্ব
বঙ্গাল (প্রথম)	ষড়্জগ্রাম	ষড়্জমধ্যমা	ষড়্জ	ষড়্জ	ষড়্জ	
বঙ্গাল (দ্বিতীয়)	মধ্যমগ্রাম	কৈশিকী	ষড়্জ	ষড়্জ	ষড়্জ	মন্দ্রস্বরের প্রয়োগ নাই। তার এবং মধ্য সপ্তকের পঞ্চম ব্যবহৃত হয়। উক্ত মন্দ্রস্বরের ব্যবহার হয় না।

ভাষারাগ গৌড়ী এবং বঙ্গালের লক্ষণ এইরকম—

ভাষা	গ্রামরাগ	গ্রহ	অংশ	ন্যাস	প্রয়োগ	বিশেষত্ব
গৌড়ী	হিন্দোল	ষড়্জ	ষড়্জ	ষড়্জ	প্রিয়সম্ভাষণ	মন্দ্রষড়্জের প্রয়োগ হয়। ধৈবত এবং ঋষভ বর্জিত। পঞ্চমে উৎপন্ন গমকের বাহুল্য আছে।
গৌড়ী	মালবকৈশিক	ষড়্জ	ষড়্জ	ষড়্জ	বিরহ অথবা বীর	তার এবং মন্দ্র উভয় ষড়্জের প্রয়োগ হয়। নিষাদের বহুল প্রয়োগ হয়।
বঙ্গালী	মালবকৈশিক	মধ্যম	মধ্যম	ষড়্জ		সম্পূর্ণ জাতীয়। মধ্যম স্বরটি উজ্জ্বলভাবে প্রযুক্ত হয়। রে এর নি-র সঙ্গতি হয়।
বঙ্গালী	ভিন্নষড়্জ	ধৈবত	ধৈবত	ধৈবত		ধা-নি এবং সা-গা এই দুই স্বরের সঙ্গতি হয়। শ্লক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্মস্বরে গাওয়া হয়।

মালবকৈশিক গ্রামরাগের ভাষা বঙ্গালী (বাঙ্গালী)র পরিচয় শার্ঙ্গদেব দেন নি। টীকাকার কল্লিনাথ এটি অপর শাস্ত্র থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন। কল্লিনাথের উদ্ধৃত শ্লোকটি তুলে দিচ্ছি—

অথ মালবকৈশিকে—

সান্তা মাংশগ্রহা পূর্ণা বাঙ্গালী মধ্যমোজ্বলা।
রিনিসংবাদিনী ভাষা ভবেন্মালবকৈশিকে॥
ইতি বাঙ্গালী॥

ভিন্নষড়জ গ্রামরাগের ভাষা বাঙ্গালীর পরিচয় প্রসঙ্গে বৃহদ্দেশী বলছেন—

ধৈবতাদ্যন্তসংযুক্তা সম্পূর্ণা লোকরঞ্জিকা।
ধৈবতনিষাদসম্বাদঃ ষড়জগান্ধারয়োস্তথা॥
বঙ্গালদেশসম্ভূতা বঙ্কালী দিব্যরূপিণী।
এষা ভাষা রসা চ ধৈবতস্যাপি বল্লভা॥
প্রয়োগে শ্লক্ষসূক্ষ্মশ্চ গায়কৈঃ স্বরশোভিতৈঃ।

এই রাগ সম্বন্ধে রত্নাকরের বর্ণনাও উদ্ধৃত হল :

ধন্যাসাংশগ্রহাভাষা বাঙ্গালী ভিন্নষড়জা।
গাপন্যাসা দীর্ঘরিমা ধমন্দ্রোদ্দীপনে ভবেৎ॥

এই প্রসঙ্গে এটি বলা প্রয়োজন যে, ত্রিবন্দ্রাম সিরিজের বৃহদ্দেশী গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় ভিন্ন ষড়জের যে ন'টি ভাষাগীতির উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে 'মাঙ্গালী' শব্দটি হয় লিপিকরের প্রমাদ নয় পাঠোদ্ধারে ভ্রম। এটি 'বঙ্গালী' বা 'বাঙ্গালী' হবে কেননা উক্ত গ্রন্থের ১২৬-১২৭ পৃষ্ঠায় ভিন্নষড়জের বিভিন্ন ভাষার যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে সেখানে বঙ্গালীর কথা বলা হয়েছে মাঙ্গালীর নয়। "বঙ্গাল দেশসম্ভূতা বঙ্কালী (বঙ্গালী)"— এই উক্তিতে এই গীতি যে বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতকলা— এ সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ নেই।

এর পর রাগাঙ্গ বঙ্গাল এবং গৌড়-এর লক্ষণ দেওয়া গেল।

রাগাঙ্গ	গ্রামরাগ	গ্রহ	অংশ	ন্যাস	প্রয়োগ	বিশেষত্ব
বঙ্গাল	ষাড়ব	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম	হর্ষ	
গৌড়	টক্ক	নিষাদ	নিষাদ	নিষাদ		পঞ্চমবর্জিত

অতঃপর ক্রিয়াঙ্গ, ভাষাঙ্গ এবং উপাঙ্গ রাগগুলির পরিচয় দেওয়া যাক—

ক্রিয়াঙ্গ	গ্রহ	অংশ	ন্যাস	প্রয়োগ	বিশেষত্ব
গৌড়কৃতি	ষড়জ	ষড়জ	ষড়জ		তার মধ্যম এবং মন্দ্রপঞ্চমের ভূয়সী প্রয়োগ হয়। ঋষভ এবং ধৈবত বর্জিত।
ভাষাঙ্গ					
কর্ণাট বঙ্গাল		গান্ধার	ষড়জ	শৃঙ্গার	পঞ্চমবর্জিত

(গৌড়) মল্‌হার	ধৈবত	ধৈবত	ধৈবত	পঞ্চম নামক গ্রামরাগের বিভাষা অন্ধালিকার উপাঙ্গ রাগ। এই রাগে ষড়জ এবং পঞ্চম বর্জিত। মন্দ্র গান্ধার এবং তার-নিষাদের ব্যবহার হয়।
কর্ণাট-গৌড়	ষড়জ	ষড়জ	ষড়জ	ঋষভ এবং পঞ্চম বর্জিত
দেশবাল-গৌড়	ষড়জ	ষড়জ	ষড়জ	ষড়জের প্রয়োগ আন্দোলনযুক্ত হয়। এ রাগটিও ঋষভ এবং পঞ্চম বর্জিত।
তুরুষ্ক-গৌড়	নিষাদ	নিষাদ	নিষাদ	ঋষভ এবং পঞ্চম বর্জিত। গান্ধারের বহুল প্রয়োগ হয়।
দ্রাবিড়-গৌড়	নিষাদ	নিষাদ	নিষাদ	গান্ধারের উচ্চারণ বক্র এবং ষড়জ ও পঞ্চমের উচ্চারণ স্ফুরিত হয়।

মল্‌হার রাগটির সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি ষড়জ এবং পঞ্চম বর্জিত। এক্ষেত্রে ষড়জবর্জিত রাগটি কিভাবে গাওয়া হত সেটি এযুগে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয় কেননা ষড়জহীন রাগ আমরা কল্পনা করতে পারি না। অবশ্য উল্লিখিত বহু রাগেরই সুস্পষ্ট পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় কেননা এগুলি যে কী ভাবে গাওয়া হত সেটা জানবার কোনো উপায় নেই তথাপি বিবিধ উল্লেখ থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় যে প্রাচীন ভারতে গৌড়ীয় সংগীত সংস্কৃতির প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছিল।

উল্লিখিত রাগের লক্ষণতালিকা থেকে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় যে, গৌড়ীয় বিবিধ গীতে ষড়জ স্বরের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। গৌড়কৈশিকমধ্যম এবং গৌড়কৈশিক গ্রামরাগে ষড়জের গুরুত্ব রয়েছে। দুই প্রকার বঙ্গালরাগেও ষড়জই প্রধান স্বর। হিন্দোলভাষা গৌড়ী এবং মালবকৈশিক-ভাষা গৌড়ী এই উভয় রাগেও ষড়জ স্বরেরই প্রাধান্য দেখা যায়। মালবকৈশিক-এর ভাষা বঙ্গালী এবং ভাষাঙ্গ কর্ণাট-বঙ্গাল-এর ন্যাস স্বর হচ্ছে ষড়জ। এছাড়া ক্রিয়াঙ্গ গৌড়কৃতি, উপাঙ্গ কর্ণাট-গৌড় এবং দেশবাল-গৌড়— এই রাগগুলিরও প্রধান স্বর হচ্ছে ষড়জ। ষড়জ স্বরটি গাম্ভীর্য প্রকাশক এবং বীররসে এর প্রয়োগ প্রশস্ত। অতএব এই স্বর প্রয়োগ থেকেও গৌড়ীয় গীতিগুলি যে ওজস্বিনী ছিল সেইটিই প্রমাণিত হয়।

রত্নাকর-বর্ণিত মল্‌হার রাগটি গৌড়মল্‌হার কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মল্‌হার এই রাগটি অন্ধালিকার উপাঙ্গ। মল্‌হারী নামেও এর অপর একটি উপাঙ্গরাগ ছিল। কিন্তু মল্‌হারী এবং মল্‌হারের লক্ষণ এক নয়। মল্‌হারীর গ্রহ, অংশ এবং ন্যাস স্বর পঞ্চম ; আর মল্‌হার রাগে পঞ্চম স্বরটি বর্জিত এবং এর গ্রহ, অংশ, ন্যাস স্বর হচ্ছে ধৈবত। রত্নাকর সাতাশটি উপাঙ্গ রাগের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলছেন—

ভল্লাতিকা চ মল্‌হারী মল্‌হারো গৌড়কান্ততঃ।
কর্ণাটো দেশবালশ্চ তৌরুষ্কদ্রবিড়াবিতি।

মনে হয় 'মল্‌হারো গৌড়কান্ততঃ'-এই উক্তিকে উপলক্ষ করেই মল্‌হারকেও গৌড়-মল্‌হারে পরিণত করা হয়েছে।

গৌড়ীয় গীতিগুলির আলোচনা সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থের রাগাধ্যায়ের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। গ্রামরাগ রাগ রাগাঙ্গ ভাষাঙ্গ ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ— গান্ধর্বগীতির এইসমস্ত শাখা-প্রশাখাতেই গৌড়ীয় পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বঙ্গদেশে গ্রামরাগের প্রসিদ্ধি হেতু এটাও অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, জাতি গায়নও এদেশে সুপ্রচলিত ছিল। সমগ্রভারতে সাংগীতিক বিবর্তন যেভাবে হয়েছে বাংলাদেশেও সেই ভাবেই হয়েছে। বঙ্গ থেকে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে গীতিগুলির প্রচার এবং মিশ্রণ বিশেষভাবে হয়েছে। মালবকৈশিক বাংলায় এসে গৌড়ী-ভাষার সৃষ্টি করেছে এবং এই গৌড়ীর সঙ্গে বঙ্গাল-এর সম্পর্কও নিবিড়। মালবকৈশিক-এর ভাষা গৌড়ী, হিন্দোল-এর ভাষা গৌড়ী এবং রাগ বঙ্গাল-এর মধ্যে তফাত খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না, কেননা এই তিন ক্ষেত্রেই গ্রহ অংশ এবং ন্যাস স্বর হচ্ছে ষড়জ। তফাত যেটুকু সেটুকু গায়নবৈশিষ্ট্যে এবং তার-মন্দ্রস্বরের প্রয়োগবিধিতে মাত্র। বঙ্গাল দেশে গৌড়ী রাগের প্রচারের ফলে বঙ্গাল নামক নবতর নামকরণ হওয়াও অসম্ভব নয়। এদিকে দক্ষিণভারতের সঙ্গে সংযোগের ফলে কর্ণাট এবং দ্রাবিড় পদ্ধতির সঙ্গেও বাংলার সংগীত-সংস্কৃতির একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল।

সংগীতসংস্কৃতির এই বিরাট প্রতিষ্ঠা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অক্ষুণ্ণ ছিল। পরে কালের প্রভাবে কি করে এই পদ্ধতিগুলি নানা মিশ্রণে বিলুপ্ত হয়ে গেল তা বোঝবার মত ঐতিহাসিক উপাদান এখনও পাওয়া যায় নি। আমরা যখন জয়দেবের যুগে আসছি তখন এই সব গান্ধর্বগীতি বাংলার কোথায় কিভাবে প্রচলিত ছিল তা বলবার উপায় নেই। জয়দেবের গীতপ্রবন্ধ গান্ধর্বের অন্তর্ভুক্ত নয় তা গান-এর পর্যায়ে পড়ে এবং এই সময় থেকেই বাংলাদেশ প্রবন্ধসংগীতে নিজস্ব ধারার প্রবর্তন করতে শুরু করেছে। এযুগটির সঙ্গে প্রাচীনযুগের আর সাক্ষাৎভাবে কোনো সম্বন্ধ নেই।

সংগীতরত্নাকর-এর উদ্ধৃতি সম্পর্কে সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী সম্পাদিত অ্যাডায়ার লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

চিত্র

কানাই সামন্ত

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামসূত্রের টীকায় যশোধর এই শ্লোকটি প্রসঙ্গক্রমে সংকলন করেছেন, কোন্ আকরগ্রন্থ থেকে সে আমাদের জানা নেই। শিল্পী ও পথিকৃৎ অবনীন্দ্রনাথ এই শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যায়, ভারতীয় চিত্রকলা যে কী বস্তু সেটি সবিশেষ বুঝিয়েছেন। আমরাও তাঁরই অনুসরণে বিষয়টি সংক্ষেপে বুঝে নিতে পারি।

উত্তম চিত্রের তথা চিত্ররচনার ষড়ঙ্গ, অর্থাৎ ছয়টি অঙ্গ সম্পর্কে এই শ্লোকে বলা হয়েছে।

প্রথমেই নিখিল রূপরাজির ভিতর থেকে একটি বিশেষ রূপকে বেছে নেওয়ার কথা। বিশ্বের ভূমিকায় বিশেষের গলায় বরমাল্য না দিলে তো আর্টের উদ্ভব হতে পারে না; চিত্র বলো, মূর্তি বলো, কবিতা বলো, কিছুই প্রত্যক্ষ ও পরিচিত হয় না। ছন্দোবিধৃত ও রসনিষ্ণাত হলে সেই বিশেষ রূপই তখনকার মতো বিশ্বরূপের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ায়। সে আলোচনা পরে। উপস্থিত এটুকু স্মরণ করলেই হবে যে, জড়ের সঙ্গে জীবের প্রভেদ আছে, উদ্ভিদ পশু পাখি সরীসৃপ কীট পতঙ্গ মানুষ কেউ কারও মতো নয়, আর উল্লিখিত যে-কোনো শ্রেণীর মধ্যেও যে-কোনো-একটি আকারে আয়তনে— জাতি কুল লিঙ্গ বয়স ও অবস্থার গুণে— অন্য সবগুলি থেকে পৃথক। ষড়ঙ্গের, অর্থাৎ চিত্ররচনার অপেক্ষাকৃত বহিরঙ্গের, এইটিই হল প্রথম প্রণিধানের বিষয়। দেখে বুঝতে পারা চাই চিত্রিত মানুষটি নর অথবা নারী, অল্প অথবা অধিক -বয়সী, সুস্থ সবল অথবা রুগ্ন দুর্বল, কোন্ দেশের কোন্ জাতির কোন্ শ্রেণীর কিরূপ লোক— স্থূলকায় অথবা কৃশ, বামন অথবা প্রাংশু। আবার, নর বা বানর সেটিও, অবশ্য, স্থির হওয়া চাই। ঘোড়া এঁকে সেটি যে ঘোড়া, গাধা নয়, অনুদ্গতশৃঙ্গ ভেড়াও নয়, এ তো লিখে দিলে চলবে না।

রূপভেদের প্রয়োজনে আপনি এসে পড়ে প্রমাণ, অর্থাৎ নানাবিধ মাপ-জোপ। বানর থেকে নর বিশেষ হয়েছে সুদীর্ঘ একটি অঙ্গ নেই বলেই নয়; হাত-পায়ের, মুখ-চোখের, মান-প্রমাণের আরও বহুপ্রকার পার্থক্যে। মানুষে মানুষে জাতি কুল স্বাস্থ্য ও বয়ঃক্রম -জনিত যা-কিছু ভেদ সেও পরস্পর মাপজোপের অসংখ্য ভেদ-রূপেই আমাদের চক্ষুগোচর হয়। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট প্রমাণগুলির প্রয়োগ জানলেই অভীষ্ট রূপের জাতি কুল বয়স ও অবস্থা পরিষ্কার এঁকে দেখানো যাবে।

ষড়ঙ্গকে চিত্ররচনার বহিরঙ্গ বলেছি বটে, রূপভেদ ও প্রমাণের পরেই তবু চিত্ররচনার নিগূঢ় গভীর রহস্যের দিকে, অন্তরঙ্গ তাৎপর্য ও সেটি ফুটিয়ে তোলার অপরূপ কৌশলের দিকে, শিল্পী ও রসিকের ক্রমিক আরোহণ-পর্ব সূচিত হচ্ছে।

এক নজরে ধরা পড়ে এমন তথ্যের জোগান বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজে, চার্ট্ বা পোস্টার -রচনায়, ষড়ঙ্গের সূচনার দুটি অঙ্গই যথেষ্ট বলা যেতে পারে। কিন্তু ছবি ব'লে তাকেই আদর করল না মানুষ

চিরদিন। চিরদিনের আদর কাড়তে হলে চিরকাল হৃদয়ে দোলা দেয় এমন জিনিস হওয়া চাই তো। যা-কিছু খবর এবং তথ্য কোনো না কোনো প্রয়োজনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা; আজ হোক কাল হোক, প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় আর প্রয়োজনসাধক বস্তুও অনাদৃত বা বিস্মৃত হয়। ফুরোতে চায় না ভাব ও লাবণ্য -যুক্ত বস্তু। ভাব বলতেই হৃদয়ের ভাব, হৃদয়ের অভিব্যক্তি। তাই ভাব সম্পর্কে হৃদয়ের আসক্তি, অনুরাগ, বিস্ময়, যাই বলো, কিছুতে শেষ হয় না; অন্তরের ভাবকে বাইরে অভিব্যক্ত হতে দেখলে মুগ্ধ হয়ে বলে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

এই ভাব দিয়ে দেখা হয় ব'লেই সহৃদয়ের কাছে সূর্যচন্দ্রতারার উদয়াস্ত পুরাতন হয় না, শিশু বা নারীর মুখ চিরসুন্দর। হর্ষ বিষাদ ভক্তি প্রীতি ভয় বিস্ময় কৌতুক বা ঘৃণা কোনো-একটি ভাব যে রূপের আধারে ভরে ওঠে তাই আমাদের নানা প্রকারে কেবলই আকর্ষণ করে এবং সহজে স্মৃতি হতে মুছে যায় না। এই ভাবই হল রসের মূল উপাদান এবং রসেই যে সর্ববিধ শিল্পের পরাকাষ্ঠা ও পরাগতি সে আমরা সকলেই জানি বা মানি।

ভাবের আধার হলে, সুন্দর বা কুৎসিত, তরুণ বা জরাগ্রস্ত, এ-সকল বিচার-বিবেচনা অবান্তর হয়ে পড়ে। স্নেহময়ী মায়ের কাছে কানা ছেলেও যে পদ্মলোচন। আর, সহৃদয় ব্যক্তি ছেলেকে দেখতে হলে মায়ের অনিমেষ চোখের দেখা দিয়েই দেখবেন। এই-যে বিশেষ দেখার বিশেষ স্বাদ— রূপে রূপে ভাবের পরিস্ফুটনে ভঙ্গীর সমাবেশ শুধু নয়, মনের মাধুরী অথবা ভীত-চকিত মুগ্ধ-বিস্মিত হৃদয়ের স্পর্শ— এটিকে লাবণ্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ, ভঙ্গী দিয়ে যার গঠন সেই ভাবেরও ভাব হল লাবণ্য। 'লবণ' থেকে 'লাবণ্য' শব্দের উৎপত্তি ধরা যেতে পারে, আবার 'লব' শব্দের সঙ্গেও তার যোগ রয়েছে। অম্ল-মধুর কটুতিক্ত কষায় নানা স্বাদ থাকলেও, লবণ না হলে যেমন রন্ধনের সমুচিত আস্বাদন হয় না, অভাবটি স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় অথবা 'কী যেন নেই' 'কী যেন নেই' মনে হতে থাকে— চিত্ররচনায় ভাবের পরিস্ফুটনে, ভঙ্গী আছে অথচ ভাবলাবণ্য নেই সে হল অনুরূপ ঘটনা। রূপে ভাব যুক্ত হল; অতঃপর লেশমাত্র, লব-পরিমাণ, লাবণ্য দিতে পারলেই বাহ্যতঃ অসুন্দর রূপেও সৌন্দর্য পুরা হয়ে উঠবে। 'লাবণ্য' শব্দের ব্যাখ্যায় রূপগোস্বামিপাদ বলেছেন: মুক্তাফলেষুচ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা প্রতিভাতি যদঙ্গেষু। নিটোল মুক্তাটির রূপের ধারণা বা বর্ণনা সহজেই করা যেতে পারে, কিন্তু তার ঢলঢল সর্বাঙ্গে যে তরলিত আভা সেটির বর্ণনা হয় না; চিত্রকর কী কৌশলে সেটি আপনার পটে ফুটিয়ে তুলবেন সেও বলা কঠিন। কিন্তু, শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে ঘনীভূত উজ্জ্বলরসের উজ্জ্বলতা ফুটবে না সেই লাবণ্য না হলে। তেমনি অন্যান্য ভাব ও রস সম্পর্কেও। কায়া নয়, কান্তি— রূপের মুকুর থেকে ঠিকরে-পড়া হৃদয়ভাবের দ্যুতি এই লাবণ্য।

ষড়ঙ্গতত্ত্বের প্রথম পদক্ষেপেই যথাযথ প্রমাণ -সহ রূপভেদ, দ্বিতীয়ে ভাবলাবণ্যযোজনা, আর তৃতীয়ে পুনরাবর্তন— কোথায়? সাদৃশ্যতত্ত্বে। সাদৃশ্য বলতে শুধু বুঝি নে গোরুর মতো গোরু অথবা মানুষের মতো মানুষ, যত্ন-মধুর বাহ্য অবয়বের যথাযথ নকল ক'রে যত্ন-মধুর প্রতিচ্ছবিমাত্র। কারণ, যথোচিত মান-পরিমাণ-সহ রূপভেদ যখনি নিষ্পন্ন হল তখনি তো ছবিতে প্রতিচ্ছবির যতটা প্রয়োজন তা

পাওয়া গিয়েছে। একই বিষয়ের পুনঃপুনঃ উল্লেখ অনাবশ্যক ও অনুচিত, বিশেষতঃ সূত্ররচনায় বা তত্ত্ববিচারে। সাদৃশ্য বলতে সারূপ্য ব্যতীত মনে ওঠে তুলনা বা উপমার কথা। সকল যুগের সকল কবিকৃতিতে এই তুলনার বা উপমার ভূয়িষ্ঠ প্রয়োগ দেখা যায়। কাব্যালংকারের মধ্যে এইটিই অতুলনীয় বলা যেতে পারে। এবং স্থূল, সূক্ষ্ম— রূপের, তেমনি ভাবের— নানাবিধ উপমা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কাব্যশরীরের বিভূষণ এটি শুধু নয়, সে অর্থে অলংকারও সব সময়ে নয়। অবশ্য, প্রধানতঃ চোখের দেখায় সহজপ্রতীয়মান তুলনা যা দেওয়া যেতে পারে, কেবল কাব্যে নয়, শিল্পেও তার ব্যবহার ও উপযোগিতা প্রচুর— আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল লিখে ও এঁকে ভালোভাবে তা বুঝিয়েছেন[১] ভারতীয় চিত্র ও মূর্তির পরম্পরাগত আদর্শে। তাতে দেখা যাবে, সিংহকটি বা বক্ষকবাট এগুলি উপর থেকে চাপানো কতকগুলি বাঁধা ধারা-ধরণ নয়, মন-গড়া আকার হলেও বাস্তববিরুদ্ধ নয় এবং ভাব-প্রকাশের উপযোগীও বটে। পদ্মপলাশনেত্রে নয়নবিশেষের সীমাঙ্কন শুধু নয়, গড়নও সুন্দরভাবে সূচিত হচ্ছে। আবার হরিণের সঙ্গে, খঞ্জনের সঙ্গে সাদৃশ্য-যে নিছক রীতির অনুরোধে হতে হবে এমনও নয়— কারণ, আকৃতি ও প্রকৃতি দু দিক দিয়েই কোনো সুন্দরীর চকিত-চঞ্চল নয়ন দুটি হরিণের মতো বা খঞ্জনের মতো হওয়া অসম্ভব নয়। তা হলেও, কাব্যে উপমালংকারের বা চিত্রে সাদৃশ্য-প্রয়োগের এ-সবই হল বাহিরের কথা।

অতিপুরাতন একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশেষকে নানাভাবে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া, নন্দিত হৃদয়ের পুলক ও বিস্ময়কে সেইভাবে ব্যক্ত এবং জাগ্রত করা, উপমাপ্রয়োগের এই হল নিঃসীম সার্থকতা। কেননা—

বিরলে বসিয়ে চাঁদের মুখ নিরখি

এ কথায় আকারের সাদৃশ্য সূচিত হচ্ছে অল্পই ; চাঁদের মতো কিম্বা ততোধিক শোভাময়, ঘর-বার-আলো-করা, প্রীতিপ্রদ তাঁর বাছনির মুখ এই কথাই মা বলতে চেয়েছেন। আর, 'ধনকে নিয়ে' বিরল বনে যদিবা যান, তা হলেও তাঁর কোলের সন্তানের যোগে তিনি যে আভূমিআকাশ যেখানে যা-কিছু সুন্দর ও মধুর আছে তার সঙ্গে যুক্ত রইলেন সেও ভালো ভাবেই বলা হয়েছে। প্রেয়সীর—

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল

অথবা প্রিয়তমের রূপ—

দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়

এ শুধু কথার কথা নয়, সাদৃশ্য বা উপমা সে অর্থে নয়। এক রূপের সঙ্গে অন্যান্য রূপের, এক গতি-প্রকৃতির সঙ্গে অন্য গতিপ্রকৃতির সংযোগসাধন ; সেই উপায়ে রস ও রহস্যের সৃজন ; ভেদ থেকে শুরু করে নিখিলের যত্রতত্র ঐক্যে ও আত্মীয়তায় উত্তরণ।

ভেদের মধ্যে অভেদের উপলব্ধি, অনন্তবৈচিত্র্যের মধ্যে অনুস্যূত ঐক্যের জ্ঞান, এ যেমন দর্শনবিজ্ঞানের সারমর্ম, তেমনি রূপসৃষ্টিরও অন্যতম মূল প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, রূপভেদের পর রূপসাদৃশ্যের

১ বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালায় : ভারতশিল্পে মূর্তি : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সন্ধান এই হিসাবেই সার্থক ও সংগত। বিশেষকে বিশ্বের ছন্দে মিলিয়ে দেওয়ার পক্ষে তার উপযোগিতা রয়েছে প্রচুর।

ষড়ঙ্গের সর্বশেষ সাধন হল বর্ণিকাভঙ্গ। আসলে এটি দুই, এক নয়। বর্ণ বিলেপন করে যে তুলি তাকেই বর্ণিকা বলা হয়েছে। যেমন তুলি না হলে বর্ণ তেমনি বর্ণ না হলে তুলি নিষ্ফল। অতএব বর্ণিকাভঙ্গে বর্ণের রুচি আর তুলিচালনার বৈশিষ্ট্য, চিত্রকরের এই দ্বিবিধ কৃতি ও নৈপুণ্যই লক্ষ্য করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, কোনো চীনা সমঝদার কালী তুলি ও রঙ সম্পর্কে যা বলেছেন[২] সংকলন করতে চাই—

Ink applied meaninglessly to silk in a monotonous manner is called dead ink : that appearing distinctly in proper chiaroscuro is called living ink.

অর্থাৎ, রেশমী পটে নিরর্থকভাবে পর্দা-দীন যে কালী বুলোনো হয় তা প্রাণহীন, সজীব কালী হল তাই যা মনোমত[৩] ধূপছায়াপর্যায়ের দ্যোতক ও পরিস্ফুট।

কালীর সম্পর্কে যা বলা হল প্রকারান্তরে রঙ সম্পর্কেও তা খুবই সত্য। ছবিতে বহু বর্ণের সমাবেশ হলেই হবে না, বর্ণের বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বলের বিচিত্র পর্দায় পরিষ্কার সংগীত বেজে ওঠা চাই। কেননা—

Colouring in a true pictorial sense, does not mean a mere application of variegated pigments. The natural aspect of an object can be beautifully conveyed by ink-colour only, if one knows how to produce the required shades.

অর্থাৎ, ছবিতে বহুবিধ রঙ ব্যবহার করলেই সার্থক বর্ণবিলেপন হল না। কেবল কালীর রঙেই যে-কোনো বস্তু সুন্দর ভাবে ফুটে উঠতে পারে যদি জানা থাকে কোথায় কোন্ পর্দার ব্যবহার হবে। পরে আরও বলা হয়েছে—

In ink-sketches the brush is captain and the ink is lieutenant, but in coloured painting colours are the master and the brush the servant. In other words, ink complements, but colours supplement, the work of the brush.

অর্থাৎ, কালী-তুলির কাজে তুলিকারই প্রাধান্য, কালী তার সহায়। রঙের কাজে রঙগুলি মনিবিআনা করে, তুলি থাকে তাদের অধীনে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তুলির কাজের অনুগত থাকে কালী, রঙ তাকে ছাপিয়ে যায়।

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা নয়। তুলিকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন ব'লেই সেরা সেরা চীনা শিল্পীদের ঝোঁক বেশি কালী-তুলির কাজে। তাঁরা জানেন কাগজে, কাপড়ে, রেশমের পটে, নিরঞ্জন শুভ্রতার বুকে, কালো কালীতেই রামধনুর সব ক'টি রঙ, তথা প্রভাত সন্ধ্যা দুপুর আর বর্ষা শরৎ শীত বসন্তের সকল

২ Chapter XI, *The Flight of the Dragon* by Laurence Binyon in Wisdom of the East Series.

৩ এ ক্ষেত্রে চোখে দেখার অনুকরণে আলো-ছায়ার বা উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বলের বিন্যাস নয়। গাঢ় থেকে গাঢ়তর, গাঢ়তম, এবং ফিকে থেকে ক্রমশই আরো ফিকে— কালীর বিচিত্র পর্দার সমাবেশে কালিমার একটি স্পৃহনীয় প্যাটার্ন, বা নক্সার রচনা— এইমাত্র লক্ষ্য।

রূপরাগ দেখাতে পারেন মায়াবী চিত্রকর। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'কালী তখন আর কালী থাকে না, যদি মন তাহাকে রাঙায় আপনার বর্ণে'।

বর্ণসংগীতির দ্বারা বিবিধ ভাবের বিচিত্র ব্যঞ্জনা দেওয়া যায়, সে কথা অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকৃতি-প্রসঙ্গে অন্যত্র আমরা আলোচনা করেছি। উপস্থিত বর্ণের বদলে বর্ণিকার কথাই আর-একটু বিশদভাবে বলা দরকার। চীনা চিত্রকর ও চিত্রজ্ঞগণ এ বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন; সব আমাদের জানাও নেই। এ পর্যন্ত জানি, ও দেশে উৎকৃষ্ট লেখাঙ্কনে আর উৎকৃষ্ট চিত্রে কোনো তফাত করা হয় না। এ কথা ঠিকই— লেখাঙ্কনে আসল যেটি দেখবার জিনিস সে হল তুলির টান এবং তারই বশে কালীর সচ্ছন্দ প্রবাহ ও পর্দা। সাবলীল তুলির প্রত্যেক টানে শুধু যে বিস্ময়কর সৌন্দর্য আছে তা নয়, আছে লেখকের চরিত্রের দ্যোতনা, ব্যক্তিসত্তার সুনিশ্চিত ছাপ। সেই তুলিচালনায় কখনো আছে শাণিত তরবারির বিদ্যুচ্চকিত গতি, কখনো বা শ্যামায়মান বনান্ধকারে কামিনীফুলদলের নিঃশব্দ ঝরে পড়া, কখনো আবার শরৎপূর্ণিমায় নিস্তরঙ্গ তড়াগের বুকে দূরের সুরলহরীর অতিলঘু স্পর্শ। সকল কবিত্ব বাদ দিলেও এ কথা সত্যই, লেখাঙ্কনে, তুলির টানে টানে যতটা প্রকাশ করেন আপনাকে লেখক বা শিল্পী, প্রকাশ হয় তাঁর স্থায়ী চরিত্র এবং বিশেষ সময়ের বিশেষ মেজাজ, তন্ময়তা বা তারই এতটুকু অভাব ও অসংগতি, অন্য কোনো উপায়েই তা হতে পারে না। অর্থাৎ, পাশ্চাত্য মতের স্টাইল, যেটি হল ব্যক্তিসত্তার অলিখিত অথচ সুস্পষ্ট স্বাক্ষর, সেটি আছে তুলির ভঙ্গীতেই।[৪] বর্ণিকাভঙ্গের সেটি হল বিশেষ কথা, তেমনি ষড়ঙ্গেরও সারকথা বা শেষকথা। লেখাঙ্কনে বা কালীতুলির আলেখ্যে শুধু নয়— আসলে, তুলি ধ'রে আঁকা যাবতীয় শিল্পসৃষ্টিতে। প্রচলিত-ব্যবহার-অনুযায়ী ছবি আঁকার পর ছবিতে স্বাক্ষর লেখার প্রয়োজন হয়ে থাকে; নইলে সে ছবির মূল্য বা মর্যাদা নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু, ছবির কোনো এক কোণে, এমন-কি পাঁচ জায়গায়, বানান করে নাম লেখার চেয়ে ছবির সর্বত্রই অলিখিত লেখার স্বাক্ষর রাখা বহুগুণে চমৎকারজনক ও শ্রেয়স্কর, সেও কি বলতে হবে? শিল্পী এবং সমঝদারগণের না-জানা তো নয়— আঙ্গিকের যোগে অথচ অজ্ঞাতভাবে বিষয় এবং বিষয়ীর অবিভাজ্য মিলন, তারই অন্য নাম 'সার্থক শিল্পসৃষ্টি'।

দেখা গেল ষড়ঙ্গের সব-কটি অঙ্গই অতি প্রয়োজনীয়, তাদের অর্থও অতিশয় প্রাঞ্জল। অথচ শিল্পীকে ও রসিককে বলতেই হবে: এহ হয়, আগে কহো আর। অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী অবনীন্দ্রনাথও এ কথা বুঝেছিলেন। তাই এই বিচ্ছিন্ন শ্লোকটি ছাড়া, তাঁর প্রবন্ধ-রচনার সময়ে, ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে অন্য তেমন কোনো গূঢ়ার্থদ্যোতক বচন না পেয়ে, যে বিশ্বাস ও উপলব্ধি তাঁর অন্তরে ছিল, সকল কালের সকল রসিকের অন্তরেই আছে, এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় সে প্রসঙ্গও যোগ করতে বাধ্য হয়েছেন— সে হল ছন্দ এবং রসের প্রসঙ্গ।[৫] অথচ ছন্দ এবং রসের কথা এ শ্লোকে একেবারেই নেই। থাকবার হলে অতিশয় স্পষ্টভাবেই থাকত না কি? কেননা, যে-কোনো শিল্পসৃষ্টিতে রস ও ছন্দের অস্তিত্ব এবং মর্যাদা-যে কোনো প্রকারেই গৌণ বা অপ্রধান এমন তো বলা যায় না।

---

৪ বলা হয়তো বাহুল্য, চীনে বা জাপানে এক তুলিতেই লেখা ও আঁকা দু কাজ হয়ে থাকে।

৫ দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী-প্রকাশিত : ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্রলেখা

শ্রীনন্দলাল বসু

রস বা ছন্দের উল্লেখ এ শ্লোকে নেই। কারণ, আসলে এটি চিত্রের অথবা চিত্রণকর্মের ছয়টি অঙ্গের অথবা অঙ্গে-অঙ্গে-লীন লক্ষণেরই বিবরণ— তার প্রাণধর্মের বা আত্মস্বরূপের নির্দেশ নয়। সে প্রসঙ্গ যথাবিধি ও যথাক্রমে নিশ্চয়ই অন্য কোনো শ্লোকে বা শ্লোকরাজিতে নিবদ্ধ ছিল, আজ অবলুপ্ত। উপায়ে উদ্দেশ্যে উপাদানে উপকরণে একশা করে দেখবার কোনো কারণ ছিল না। যা হোক, কামসূত্রের 'জয়-মঙ্গল' টীকায় উদ্‌ধৃত এই শ্লোকের বিচ্ছিন্নতা ও তজ্জনিত 'অপূর্ণতা' অপ্রত্যাশিতভাবে দূর করছে অন্য শাস্ত্রের অন্য দু-চারটি শ্লোক। তন্মধ্যে, বক্তব্যে ও অর্থব্যঞ্জনায় যে শ্লোকটি অতুলনীয়, পৃথগ্‌ভাবে তারই আলোচনা সেরে নিতে চাই আগে। শ্লোকটি[৬] হল—

বিনা তু নৃত্যশাস্ত্রেণ চিত্রসূত্রং সুদুর্বিদম্।
জগতোঽনুক্রিয়া কার্যা দ্বয়োরপি যতো নৃপ॥

নৃত্যশাস্ত্র সহায় না হলে চিত্রসূত্র অতিশয় দুর্জ্ঞেয়, যেহেতু উভয়েরই কার্য বা করণীয় হল জগতের অনুক্রিয়া।

এই শ্লোকের প্রায় প্রত্যেক শব্দটি বিশেষ-তাৎপর্য-বাহী, কাজেই সার্থক। চিত্রের বিবিধ অঙ্গ অথবা বিচিত্র লক্ষণ এ শ্লোকের লক্ষ্য নয়। চিত্রের কার্য, অতএব তার স্বভাব বা প্রকৃতি হল এ ক্ষেত্রে একমাত্র বিচার্য বিষয়। কী কার্য নৃত্যের অথবা চিত্রের? জগতের অনুক্রিয়া। বিশ্ব-আকৃতির অনুকৃতি নয়। তা যদি হত তা হলে ক্রিয়া অনুক্রিয়া অথবা জগৎ শব্দ একেবারেই অর্থহীন হ'ত।

জগৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ হল যা গতিশীল, জঙ্গম, যা প্রতিনিয়তই চলছে। চিত্রকর্মে ও তার গূঢ়ার্থবিচারে বিশ্বভুবনের আকৃতিসমূহ চোখে দেখার চেয়ে তার আসল প্রকৃতিটি মনে ধারণা করাই প্রথম এবং পরম প্রয়োজনীয়। বহিঃপ্রতীয়মান আকৃতিতেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলে অনুকরণের কথা উঠত, আর্ট্ যে কোনো-না-কোনো ভাবে চোখে-দেখা রূপেরই অনুরূপ এই ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ থাকত। কিন্তু অতিপ্রাচীন ঋষি আর অতিআধুনিক বিজ্ঞানী উভয়েই জানেন— অস্থিরকে স্থির ব'লে ধারণা করা মিছে। চিরচলিষ্ণু জেনেই তার সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করতে হবে চিরপরিবর্তমান চলার ছন্দে, ক্রিয়ার ছন্দে।

---

৬ বিষ্ণুধর্মোত্তর উপপুরাণে তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক। ১৯১২ খৃস্টাব্দে ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস - কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠ বা অপপাঠ -অনুযায়ী, এ শ্লোকের সব্যাখ্যা ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ভারতশিল্পতত্ত্ববিদুষী শ্রীমতী স্টেলা ক্রাম্‌রীশ। দ্বিতীয় ছত্রের ইংরেজি এই—

Hence no work of (this) earth, (oh) king should be done even with the help of these two, (for something more has to be done).

অর্থ বোঝা যায় না, বিশেষতঃ প্রসঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে। এজন্য দায়ী পূর্বলব্ধ পাঠ : জগতো ন ক্রিয়া কার্যা দ্বয়োরপি যতো নৃপ। (নু স্থলে ন, আর কিছুই নয়।) স্থান কাল ও প্রসঙ্গের বিচারে কিছু অর্থ একান্তই যদি আদায় করতে হয় তবে এই ভাষান্তর হয়তো হতেও পারে : যেহেতু, হে নৃপ, জগতের ক্রিয়া (যথাযথ) করণীয় (অর্থাৎ, অনুকরণীয়) নয় (নৃত্য এবং চিত্র) উভয়েরই। তা হলে, বিধি হিসাবে যা বলবার বিষয় সেটা অন্তত ঘুরিয়ে নিষেধের ছলেও বলা হয়। কিন্তু, বর্তমান ক্ষেত্রে নিষেধের চেয়ে বিধিরই বিশেষ উপযোগিতা। এজন্য পূর্বপাঠ'কে আমরা লিপিকারপ্রমাদ বলেই গণ্য করছি। ১৯১২ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত উল্লিখিত গ্রন্থে লিপিপ্রমাদের অপ্রতুলতা নেই; বহু স্থলে যা অর্থহীন মনে হয় তারই দু-একটি অক্ষরের অদল-বদলে চমৎকার একটি অর্থ ফুটে ওঠে।

উদ্‌ধৃত নূতন পাঠ, একখানি নেপালী পুঁথি থেকে উদ্ধার ক'রে ও আমাদের গোচরীভূত ক'রে বন্ধুবর শ্রীকালিদিণ্ডিমোহন বর্মা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

বিজ্ঞানের ভাষা আমাদের তেমন পরিচিত নয়, তার সামগ্রিক তত্ত্ব তেমন বিস্তারপূর্বক ব্যাখ্যা করা যাবে না— প্রয়োজনও অবশ্য নেই। মোটের উপর মিল আছে জানি নবীনে এবং প্রাচীনে। প্রাচীন, বিষ্ণুধর্মোত্তর উপপুরাণের যিনি বক্তা বা সংকলনকর্তা তাঁর থেকে বহুগুণে প্রাচীন, ঋষি বলেছেন—

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।[৭]

বিশ্বের সমস্ত কিছুই প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে সর্বদা প্রাণেই গতিমান রয়েছে। জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রাণ হল energy, প্রৈতি[৮], নিয়তকম্পন, নিয়তগতি। 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং' পদবন্ধনের অর্থ আরও পরিস্ফুট হবে ঈশোপনিষদের অনুরূপ শ্লোকাংশে: যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজি করেছেন: whatsoever is individual universe of movement in the universal motion.

অর্থাৎ, নিখিলগতির অন্তর্গত অগণ্য গতিসর্বস্ব ভুবন।

জগৎ-ব্যাপারটি এমন যে, অনন্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্ররাজি ভ্রাম্যমাণ রয়েছে কল্পনাতীত দূর সুদূর কক্ষপথে, অসংখ্যের মধ্যে একটি নক্ষত্র হল আমাদের এই সূর্য, সূর্যকে ঘিরে বহু গ্রহ, গ্রহগুলি ঘিরে কত চন্দ্রমা— নিয়ত একটি প্রদক্ষিণ করে চলেছে প্রদক্ষিণপর অন্য বৃহত্তর সত্ত্বকে। ভয়ে বিস্ময়ে অনন্ত (?) আকাশ থেকে দৃষ্টি ও কল্পনা ফিরিয়ে যদি আনি দেখতে পাব (চোখে অবশ্য দেখবার নয়) প্রত্যেক জড়-জীবের মধ্যে অণু-পরমাণু এবং প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যেও বুঝি মহাশূন্য-পূর্ণ-করা নিখিল নাক্ষত্রজগতের প্রতিবিম্ব ঝলকিত— নানাজাতি অচিন্ত্যগতি বৈদ্যুতকণের অশ্রান্তভ্রমণবেগে।

রূপস্রষ্টা ও রসিকের পক্ষে অবশ্য এতটা জানা বা 'দেখা' সর্বদা অপরিহার্য নয়। যদি দেখেন তা হলেও, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপদর্শনে অর্জুন যেমন ধন্য হয়েছিলেন, আবার ভয় পেয়ে বলেছিলেন, হে বিশ্বমূর্তি, তোমার সৌম্য, সৌম্যতর, যে নারায়ণ ও নর রূপ তাই আমায় দেখাও— শিল্পী এবং রসিকও তাই বলবেন। নয়ন ও মনের অগ্রে অনন্তরূপের যে অপরূপ বিভ্রম সে তিনি ত্যাগ করবেন না, তবে এটুকু সততই মনে রাখবেন— বিশ্ব গতিময় আর তারই গতির অন্তরে গতিময় প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক ব্যক্তি। স্থির কিছু নেই। তুলি ধ'রে এঁকে তুলতে হবে স্থিরপ্রতীয়মান পটে এই অস্থিরকেই। সেটি যে কেমন ক'রে সম্ভবপর সেই তো উত্তম রহস্য।[৯]

সবই গতিশীল এ কথার অর্থ সবই **সক্রিয় বা সক্রীড়।** রূপের-অনুকরণ-আকাঙ্ক্ষা যদি ছেড়ে দেওয়া

---

৭ কঠোপনিষৎ।

৮ রবীন্দ্র-প্রয়োগ।

৯ অনুকরণের দিকে ঝোঁকা যে মূঢ়তা এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির উল্টোমুখে চলা, সদ্য তার একটি প্রমাণ পেয়েছি। নতুন এই ছেলে-ভুলোনো (stereoscope) খেলনার রন্ধ্রযুগলে চোখ লাগিয়ে অতিকারী কাচচক্ষুর ভিতর দিয়ে দেখা যায় অতিশয় বাস্তব, অতিপ্রত্যক্ষ দৃশ্যাবলী— মূলে রয়েছে তার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙিন আলোকচিত্রযুগ্মক। মায়াবী কাচচক্ষুর গুণে ছোটো ছবি আর ছোটো থাকে না তা ছাড়া পুরোদস্তুর তিন আয়তন নিয়ে দেখা দেয়। কিন্তু তাই দেখে রূপরসিকমাত্রই মর্মাহত হবেন। কারণ, জড় ও অনড় পাহাড় পর্বত মূর্তি মন্দিরে আপত্তির কিছু নেই, জীবগুলি (পশু পাখি মানুষ) জীবনের ভঙ্গী উদ্যত করে হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যেন মরে গিয়েছে। এই জীবন্মৃতের ভুবনে বা ডামির রাজত্বে ঘুরে ফিরে অল্পেই দম বন্ধ হয়ে আসে, পালাতে পারলে বাঁচি। কী কুৎসিত! অথচ, অনুকরণ যে ষোলো আনা তাতে আর সন্দেহ নেই।

যায়, ক্রিয়ার অনুকরণ তো করা যেতে পারে? মোটের উপর সেটিই হল নাট্য বা অভিনয়। অথচ 'অনুক্রিয়া' শব্দে সেটিই যে এই শ্লোকের সূত্রধরের অভীষ্ট, নানা কারণে তাও তো মনে হয় না। মনে হয় না এজন্যই যে, নাট্যের সঙ্গে চিত্রের তুলনা না দিয়ে নৃত্যের সঙ্গেই তাকে এক সূত্রে গাঁথা হয়েছে। নৃত্য হোক আর নৃত্তই[১০] হোক, নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা বা কাহিনীর প্রসঙ্গ থাক্ আর না'ই থাক্, ঐ-সকল ক্ষেত্রে ছন্দেরই একান্ত প্রাধান্য। অতএব সূত্রকারের মতে চিত্রেও সেইটেই বাঞ্ছিত। এও তো জানি, খৃস্টপূর্ব সময় থেকে পাঠান-মোগলদের রাজত্বকাল পর্যন্ত এ দেশে চিত্ররচনার যে ধারা নানা শাখা প্রশাখায় প্রবাহিত, প্রায় সর্বসময়ে তাতে ছন্দই প্রধান। অর্থাৎ, সূত্রের মধ্যেই যে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে আর সূত্রের বাইরেও[১১] যে রীতিপদ্ধতি এ দেশে সহস্রাধিক বৎসর ধ'রে আচরিত, দুয়েরই প্রমাণে সন্দেহ থাকে না যে, অনুক্রিয়া বলতে তথাকথিত 'অনুকরণ' নয়।

এই ভবের খেলায় প্রত্যহ প্রতিক্ষণে কত-কিছু আমরা অনুভব করি। অনুভব ব্যাপারটা কী? ভব, যা হয়েছে, প্রাণের টানে, সত্তার আনন্দে বা বেদনায়, তাই পুনরায় হওয়া। এই অনুভবরূপ ক্রিয়ায় অনুভবগম্য বিষয়টির কতই না বাদ পড়ে যায়— বহু কাঁটাখোঁচা, বহু খুঁটিনাটি, বাহিরের বহু প্রক্ষেপ। অর্থাৎ, যা আকস্মিক, যা আরোপিত, যা আগন্তুক, সে-সব স্বভাবতঃই পরিহার ক'রে, বস্তু বা ব্যাপারের যা সার, যা স্বরূপ, তাই আমরা অনুভব করি বা করতে চাই— অন্তরে অন্তরে তারই সঙ্গে আমাদের সত্তাকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিই। অনুক্রিয়াও ঐরূপ। কোনো ক্রিয়ার যেটি নিহিত মর্ম বা নিগূঢ় 'রূপ'— যা অলক্ষ্যে আদ্যন্ত ক্রিয়ার অন্তরে অনুস্যূত থেকে তাকে ধারণ ক'রে আছে, চালিয়ে নিয়েও যাচ্ছে— সেই অস্খলিতসুন্দর গতি ও বেগ, সেই ছন্দ, তাকে গ্রহণ করা, তাকে ধারণ করা— তাকেই এক উপাদান থেকে অন্য উপাদানে, এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে, বলা চলে এক সৃষ্টি থেকে আর-এক সৃষ্টিতে, সঞ্চারিত ও সঞ্চালিত ক'রে দেওয়া এই হল অনুক্রিয়ার স্বরূপ বা স্বধর্ম, কী নৃত্যে আর কী চিত্রে। যে-কোনো ক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ দেশ কাল পাত্র এবং অবস্থা -হেতু যা-কিছু অস্বাভাবিক বা অবান্তর, যা-কিছু শক্তি বা সুষমার প্রকাশে ব্যাঘাত বা বাধা, সেগুলি কম-বেশি পরিত্যাগ ক'রেই **অনুক্রিয়া-রূপ ছন্দটি** ফুটে উঠতে পারে

---

১০ উদ্‌ধৃত শ্লোকে 'নৃত্য' থাকলেও, অন্য বহু শ্লোকে 'নৃত্ত' আছে— কতটা শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় আর কতটা লিপিকারের 'অবদান' বলা কঠিন। অনেকে বলেন, আখ্যানকথন বা ঘটনাব্যাখ্যান -শূন্য 'নৃত্ত' কলাটি যেমন প্রাচীনতর, শব্দটিও তেমনি— নৃত্যের তুলনায়। চিত্রে ঘটনা বা আখ্যান প্রায়শঃই থাকে, সুতরাং নৃত্য-উপমান অবশ্যই অসংগত নয়। আর, নৃত্যেরই অপেক্ষাকৃত অবচ্ছিন্ন বা abstract রূপ হল নৃত্ত, এ হিসাবে তার সম্পর্কেও শিল্পী বা রসিকের যথেষ্ট সাভিনিবেশ, সচেতন থাকা দরকার। কাজেই মোটের উপর বলা চলে, নৃত্ত বা নৃত্য যে শব্দের ব্যবহার হয়ে থাক্, তাৎপর্যের খুব বেশি পার্থক্য ঘটে না।

১১ 'বিষ্ণুধর্মোত্তরম্' কোন শতকে কখন রচিত সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত ধারণা নেই। নানা প্রমাণে বা অনুমানে শ্রীমতী ক্রাম্‌রীশ মনে করেন, চিত্রকলা সম্পর্কে যেসব অধ্যায় সেগুলির রচনা খৃস্টীয় সপ্তম শতকে, অজন্তা-চিত্রশৈলীর প্রৌঢ় পরিণতির ও বিশেষ উৎকর্ষের সমকালে। এ সিদ্ধান্ত একেবারে বিতর্কাতীত হোক বা না হোক, এটি অন্তত স্পষ্টই দেখতে পাই যে, সংকলিত শ্লোক আর পূর্ণপরিণত অজন্তা-চিত্রশৈলী পরস্পরকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করে ও উদ্ভাসমান সৌন্দর্যে চিনিয়ে দেয় তা যার-পর-নেই বিস্ময়জনক। সূত্রে ও শিল্পসৃষ্টিতে এতটা মিল আর কোথাও দেখা যায় না। সূত্র এবং চিত্র (অথবা, চিত্র এবং সূত্র বলাই হয়তো সংগত) একই কালের রচনা হলে, বিস্ময়ের হেতু অল্প হয়, অন্তত হেঁয়ালি থাকে না। একই কার্যকারণসূত্রে দুটি সহজেই বাঁধা পড়ে; উভয়ের পিছনে আর সামনে, অতীতে ও বর্তমানে, কখনো ম্লান কখনো উজ্জ্বল সাজে চলেছে এক অশেষ শোভাযাত্রা— সেই হল ভারতীয় চিত্রকলার অচ্ছিন্ন পরম্পরা।

এবং ওঠে। নৃত্যের বেলায় এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ওঠে না। আর চিত্রের বেলাও বিতর্কের সম্ভাবনা দেখি নে, পরম্পরাগত ভারত-চিত্রকলার নানা দিগ্‌দেশে কার্যতঃ, অথবা মনে মনেও, একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

পূর্বেই একপ্রকার বলা হয়েছে, ষড়ঙ্গ-প্রসঙ্গে ছন্দের অনুল্লেখে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ যেমন বিব্রত তেমনি হয়তো বিস্মিত হয়েছিলেন। এ দিকে দেখেছিলেন, চীনদেশে খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষে বা ষষ্ঠ শতাব্দের আরম্ভে যে ছয়টি চিত্রসূত্র বিধিবদ্ধ ও লিপিবদ্ধ হয়েছিল (তার পূর্ব থেকেই প্রবর্তিত ও প্রচলিত ছিল না কে বলবে) ঐ সূত্রাবলী সব রকমে ছন্দকেই শিরোধার্য করে রেখেছে। চীনা থেকে সেই প্রথম সূত্রটির ইংরেজি ভাষান্তর অনেকে অনেক প্রকার করেছেন।[১২] জড়ে[১৩] জীবে তরুলতায় সর্বত্র, জীবনের সব দৃশ্যতঃ-ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ছন্দের ভিতরে ভিতরে, বিশ্বের বা বিশ্বাত্মার যে ছন্দ অনুস্যূত সেটিরই ধ্যানধারণা ও প্রকাশ— এই-যে উল্লিখিত সূত্রের মোটের উপর নির্দেশ সে বিষয়ে কেউ সন্দেহ করেন না।

At any rate, what is certainly meant is that the artist must pierce beneath the mere aspect [outward appearance] of the world to seize and himself to be possessed by that great cosmic rhythm of the spirit which sets the currents of life in motion.[১৪]

অর্থাৎ, বহিঃপ্রতীয়মান রূপের প্রতিফলন হৃদয়ে ধরাই আর্টের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল তার নিখিল-রূপকে সঞ্জীবিত ও সঞ্চলিত করে রেখেছে যে ছন্দ, মনুষ্যসৃষ্টিগত রূপের ছলে সেই অরূপকেই প্রকাশ।

আমাদের মনে হয়, ভারতের রসরূপদ্রষ্টা চিত্রসূত্রকার 'অনুক্রিয়া' শব্দে এই ছন্দের প্রতিই লক্ষ রেখেছেন।

প্রশ্ন তবু ওঠে, চিত্রের কথা বলতে গিয়ে বিশেষ ক'রে নৃত্যের কথাই বা কেন এল ? ভালো নাচিয়ে হলে তবেই ভালো চিত্রকর হয়ে থাকে এমন আজগুবি ঘটনার বিষয় শুনি নি আর বিশ্বাস করাও কঠিন।

নাচতে জানবেন এমন নয়, নাচের তত্ত্ব জানবেন চিত্রকর। এমনও বলা চলে, যথাবিধি নৃত্যশাস্ত্র তিনি নাই বা জানলেন, নৃত্যশাস্ত্রের যেটি সারকথা, যেটি দেহের বিশুদ্ধ গতিচ্ছন্দেরই কথা, অন্তর বা বাহির যেখান থেকে যেমন ক'রে হোক, সেটি যখনই ধ্যানধারণায় ধরবেন চিত্রশিল্পী, চিত্রকর্মে দখল হবে তাঁর পুরা। চিত্রের বিষয়ে বলতে গিয়ে নৃত্যের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে গুরুতর কয়েকটি কারণে। প্রথম তো দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকলা যেগুলি তার মধ্যে, নৃত্তেই, অথবা নৃত্যেও, ছন্দের বিশুদ্ধ রূপ ও সর্বময় প্রভুত্ব সব থেকে বেশি। সুতরাং নয়নমনোগোচর ছন্দের বিষয়ে যিনি উপদেশ দিতে চাইবেন নৃত্ত বা নৃত্য ছাড়া আর কোন্ কলাকে তিনি আদর্শ হিসাবে ধরবেন ? দ্বিতীয়তঃ অনেকেই বলেছেন, হয়তো আমাদের শাস্ত্রকারদেরও সেই অভিমত ছিল, যে, মানুষের সকল কলাসৃষ্টির মধ্যে নৃত্ত বা নৃত্যই আদিম। রূপকলা-সমূহের মধ্যে তো বটেই। তৃতীয়তঃ ভারতীয় ধারাবাহী চিত্রকলায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই যে রূপ যার-পর-নেই মুখ্য ও আদরণীয় হয়ে আছে সে হল মানুষেরই রূপ, অথবা রূপান্তর। অরণ্য পর্বত গাছপালা

---

১২ দ্রষ্টব্য : ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ।

১৩ 'জড়'কে সত্যই অচেতন ও জীবনহীন ব'লে ধারণা করা জাত-শিল্পীর পক্ষে, বিশেষতঃ প্রাচ্য শিল্পীর পক্ষে অসম্ভব।

১৪ *The Flight of the Dragon.*

পশুপাখি নিয়ে বিশাল প্রকৃতি যখন যে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিয়েছেন সে হল ছবির পাড়-হিসাবে বা পটভূমি-রূপে। মনুষ্যরূপের ছন্দ, তার দেহের বিচিত্র গতি ও স্থিতির মাত্রা ও যতি, এগুলি নৃত্যকলাতেই যে বিশেষভাবে প্রকটিত। মূর্তিকলাও প্রধানতঃ মানুষ নিয়ে, মনুষ্যদেহী দেবতা নিয়ে, আর এ দেশে সে ক্ষেত্রেও পরিস্ফুট ছন্দের শ্রী ও শক্তি অল্প কিছু নয়— বিশেষতঃ ধাতুমূর্তিসমূহে— তবে, রঙ ও রেখা -নির্ভর হওয়াতে, বিহিত উপায় ও উপকরণগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসসাধ্য ও বশ্য হওয়াতে, ছন্দোবেগ চিত্রে যে ভাবে যতটা প্রকাশ করা সম্ভবপর এবং বাঞ্ছিত মূর্তিতে তেমন নয়। এ ব্যাপারে নৃত্যের পরই চিত্রের স্থান।

তাই বলা হয়েছে: বিনা তু নৃত্যশাস্ত্রেণ চিত্রসূত্রং সুদুর্বিদম্। ছন্দোময়ী ছবিকে জানতে হলে ছন্দে বাঁধা আর ছন্দেই মুক্ত নৃত্যকে ভালোভাবে জানা চাই।

এখানে একটি কথা ভেবে দেখা দরকার। সংকলিত শ্লোকটি, বিষ্ণুধর্মোত্তর উপপুরাণের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে— নিঃসঙ্গ এককভাবে নয়। ইষ্ট-আরাধনা করবেন ব'লে মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে উপদেশপ্রার্থী হয়েছেন বজ্রনরপতি। তাতেই এল প্রতিমা, তথা প্রতিমালক্ষণের প্রসঙ্গ। মুনি বললেন, চিত্রসূত্র না জানলে প্রতিমালক্ষণ জানা যায় না।

বেশ, তাই উপদেশ করুন মুনিবর।

নৃত্য না জানলে চিত্র জানা যায় কি?

নৃত্য সম্পর্কে জানতেও নৃপতির অশেষ কৌতূহল।

নৃত্যের জন্য প্রয়োজন আতোদ্য বা বাদ্য।

সে সম্পর্কেই বলা হোক-না কেন।

তখন মুনি বললেন, গীত না হলে বাদ্যে কী হবে, নৃত্যও হয় না।[১৫]

বোঝা গেল ভারতীয় হিন্দুর কাছে, হিন্দু শাস্ত্রকারের কাছে, জীবনের কিছুই খণ্ড বা বিচ্ছিন্ন নয়। ধর্মার্থকামপ্রদ ও মোক্ষপরিণামী সমগ্র জীবনের একটি কল্পনা— বা বাস্তবতাই বলা সংগত— সর্বদা তাঁদের ধ্যানধারণায় জাগরূক; সেই সমগ্রতার ভিতরেই জীবনের সবকিছু নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কর্তব্য করে যাচ্ছে। ধর্মার্থকামমোক্ষসমন্বিত জীবনে চতুঃষষ্টিকলারও অবশ্যই স্থান আছে অপরূপ একটি সংহতি ও সংগতির আকারে। প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক ব্যাপারের, মানুষের প্রত্যেক প্রবৃত্তি বা প্রবণতার প্রবল স্বাতন্ত্র্যলীপ্সায় ও সমূহ বিকাশে আজ যদি সেই সুসংহতি ও সমগ্রতা দীর্ণ বিদীর্ণ ধূলিবিকীর্ণ হয়ে থাকে, তবু প্রাচীন আদর্শ যে মন্দ ছিল আর আজকের অবস্থা ও ব্যবস্থা— প্রায়শঃই দুরবস্থা ও অব্যবস্থা— সে-সব যে স্বভাবতঃই ভালো, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। একটি সম ছেড়ে আর-একটি সমের দিকে চলেছে মনুষ্যসমাজ আর মানুষের জীবন, মানুষের সকল জ্ঞান বিজ্ঞান কলা কৃতি,

---

১৫ অতঃপর সংগীত সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা।

বলা বাহুল্য, উপরে বিষ্ণুধর্মোত্তরের বক্তব্যের সারসংকলন করা হয়েছে মাত্র। তা ছাড়া, সমগ্র 'বিষ্ণুধর্মোত্তরম্' আমরা আলোচনা করে দেখি নি। আজ হোক কাল হোক সে কাজ যিনি করবেন (যথার্থ ভারততত্ত্ববিদ্ ও ভারতের-সর্ববিধ-কলা-বিদ্ তাঁর হওয়া চাই) আমাদের অনেক ভুলভ্রান্তি তিনি সংশোধন করতে পারবেন— অথচ আমাদের মূল বক্তব্যের হয়তো হানি হবে না।

যেখানে আবার এক অতি বৃহৎ সামঞ্জস্যের মধ্যে, সংগীতির মধ্যে সব মিলতে পারবে— প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক বিষয় সার্থক হবে সকলের যোগে আর সম্পূর্ণ করবে সকলকে।

ফলকথা, উপস্থিত বিষয়কে প্রাচীন যেভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণই তাঁদের দেশকালোপযোগী, আর আমরাও যে পৃথগ্‌ভাবে একটি বিষয়েরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি সেও আমাদের কালোপযোগী, আমাদেরই সীমিত সাধ্য এবং সাধনার অনুকূল।

মুনির ব্যাখ্যামুখে জানা গেল বিভিন্ন কলার মধ্যে রয়েছে একটি ক্রমিক শৃঙ্খলা, দূর ও নিকটের একটি সংগত অন্বয়। নৃত্যের সঙ্গেই চিত্রের বিশেষ সাধর্ম্য, তাই বিশেষ সম্পর্ক, সে আলোচনা আমরা যথাসাধ্য করেছি। নৃত্যের যে ছন্দ, যে-কোনো ক্ষেত্রে যে-কোনো ছন্দ, তার জন্য এক দিকে চাই মাত্রা ও তাল, অন্য দিকে চাই স্বর। চতুর্বিধ আতোদ্য— যেমন বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, মন্দিরা[১৬]— তার কতকগুলিতে স্বর বাজে, কতকগুলিতে তাল। স্বর এবং তালের প্রয়োজন হয় মনুষ্যকণ্ঠের গীতে। এই ভাবে একপ্রকার আরোহগতিতে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, 'অচল' থেকে সচলে— অর্থাৎ, মূর্তি থেকে চিত্রে, চিত্র থেকে নৃত্যে, নৃত্য থেকে আবার বাদ্যসহকৃত গীতে পৌঁছে আমরা ক্ষান্ত হই। সমুদয় কলাগুলির মধ্যে যার-পর-নেই বিমূর্ততার মূর্তি ঐ গীতে; 'তাল' এবং 'স্বর' চরমে এই দুটি মাত্র উপায়ে বা উপাদানে পর্যবসিত হওয়ায়, গীতের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে ছন্দের ও রসের বিশুদ্ধতম বা আদিতম প্রকাশ। ছন্দের কারণে, বিশেষতঃ রসের কারণে, গীত অন্য সবগুলি মুখ্য কলায় নিহিতভাবে অবশ্যই আছে। অতএব এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুধর্মোত্তরে মিথ্যা বলা হয় নি: গীতশাস্ত্রবিধানজ্ঞঃ সর্বং বেত্তি যথাবিধি।

কিন্তু, আমাদের ধারণা এই যে, রসের বিশ্লেষণ হয় না যেমন, আসলে সুরেরও হয় না। অতএব যেমন নৃত্যের সঙ্গে, তেমনি গীতের সঙ্গেও, চিত্রের পরম নিগূঢ় সম্পর্কের উল্লেখ ক'রেই এখন আমরা পূর্বপ্রসঙ্গে, চিত্রের ছন্দোময় প্রকৃতির প্রসঙ্গে ফিরে যাব।

চিত্রে ছন্দোবেগের এই প্রাধান্য-বশতঃ শাস্ত্রকার এ কথা বলেছেন—

রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্যা বর্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ॥

চিত্রে রেখাই বিশেষ করে গতির ব্যঞ্জনা দেয়, ছন্দকে প্রকট করে, এজন্য প্রশংসনীয় হলে, বিশেষ ক'রে রেখারই প্রশংসা করেন শিল্পী ও শিক্ষাদাতা আচার্যগণ। যাঁরা শিল্পী বা আচার্য নন, অথচ সমজ্‌দার, তাঁরা বিশেষ ক'রে গড়নেরই প্রশংসা করেন চিত্রে— এই গড়ন চিত্রিত রূপকে দেয় প্রয়োজনীয় বাস্তবতা। এক দিকে রেখাশ্রিত ছন্দোবেগে রূপ ছুটে যেতে চাইছে অরূপে বা অলক্ষ্যে, অন্য দিকে দেখি গড়ন দিয়ে, বাস্তবতা দিয়ে, ভার চাপিয়ে, তাকে ধরে রাখতে চাইছে মাটির পৃথিবী— বলছে যেন, 'হাওয়ায় পা ফেলো না। আমার বুকের উপর দিয়ে চলো!'

চিত্রে স্ত্রীজাতি বা অনুরূপ যাঁদের প্রকৃতি, তাঁরা পছন্দ করেন অলংকরণ, কেননা মণ্ডনে আরও যেন মধুর সুন্দর করে স্বভাবসুন্দর রূপকে, মেয়েরা নিজেও তো নানা বিভূষণ ধারণ করেন দেহে— তা ছাড়া খুঁটিনাটি এটি-সেটিতে তাঁদের যথেষ্ট মনোযোগ, যা না হলে কোনো ব্যক্তিকে বা বস্তুকে ভূষিত করা যায় না।

---

১৬ যথাক্রমে তত, শুষির, আনদ্ধ ও ঘন, এই চতুঃশ্রেণীর এক-একটির উল্লেখ হয়েছে।

অথবা, 'ভূষণমিচ্ছন্তি' প্রয়োগে যদি মনে করি, মণ্ডনদ্রব্য তো নয়ই, চিত্রের এখানে সেখানে কারুকার্য বা মণ্ডনকার্যও নয়, সমুদয়-চিত্রে-ওতপ্রোত মণ্ডনগুণই দেখতে চান স্ত্রীজাতি বা সমপ্রকৃতি অন্যজন, তা হলেও অনুচিত বা অবাস্তব ব্যাখ্যা কিছু হয় যে এমনও নয়। বরং তার বিপরীত। চিত্রে ছন্দঃপ্রাধান্যের অবশ্যম্ভাবী ফল হল অল্প বা অধিক পরিমাণে, প্রচ্ছন্ন বা প্রকট ভাবে, মণ্ডনগুণ, মণ্ডনধর্ম। ছন্দের দূরগামী এবং পারগামী তাৎপর্যটি যথাযথ ধারণা করা দুরূহ হলেও, ছন্দের সেই বহির্লক্ষণে আকৃষ্ট হওয়া, তজ্জনিত রূপসুষমায় বা কান্তিতে মুগ্ধ হওয়া স্ত্রীস্বভাবোচিত সন্দেহ নেই। এই মণ্ডনগুণ থাকে রূপ ও রঙ উভয়েরই।

আচার্য পণ্ডিত ও স্ত্রীজাতি -বহির্ভূত জনসাধারণ, চিত্রে তাঁরা দাবি করেন বর্ণাঢ্যতা, বর্ণসুষমা ঠিক নয়, উচ্চগ্রামে বাঁধা রঙচঙ— দেশ-কাল-বিশেষে দ্বন্দ্বমান রঙের কোলাহলে বা কলহেও অভিরুচি হতে পারে— যেহেতু তাঁরা চান চড়া স্বর, প্রবল প্রকট রূপ।

বাকি রইল রসের প্রসঙ্গ। সকল সার্থক কলাসৃষ্টির রসেই সূচনা যদি না'ও হয়, অথবা জ্ঞানতঃ না হয়, রসেই গতি ও স্থিতি তার আর সন্দেহ নেই। বিষ্ণুধর্মোত্তরে রসের উল্লেখ নেই যে এমন নয়। সম্পূর্ণ একটি অধ্যায়ের উনচল্লিশটি শ্লোকই 'শৃঙ্গারাদিভাবকথনে' নিযুক্ত, তবেই চিত্রসূত্রের সমাপ্তি। কিন্তু রসের নামরূপ যতই আলোচিত হয়ে থাকুক, রসের সংজ্ঞার্থ পাওয়া যায় না ; উক্ত অধ্যায়ে রসের তত্ত্বকথা বা মর্মকথা এমন কিছু বলা হয় নি যাতে রসিকচিত্তের চিরচমৎকার জন্মাতে পারে। আদৌ সে উদ্দেশ্য ছিল না শাস্ত্রকারের। অথচ এ কালের আমরা তার কমেও সন্তুষ্ট হতে পারি নে। রসের যে স্থায়ী ও ব্যভিচারী -ভেদে শ্রেণী ও সংখ্যা বেঁধে বর্ণনা দেওয়া যায় বা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে— হয়তো এ বিশ্বাসই আমাদের নেই। রস যে কী সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তাকে উস্কিয়ে দিয়ে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করেছেন মার্কণ্ডেয় মুনি, রসলক্ষণের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে নয়, কিন্তু পূর্বোক্ত শ্লোকরাজিতে যার চরমে বলা হয়েছে 'সকল কলাসৃষ্টি তত্ত্বতঃ জানেন যিনি গীত জানেন'।

যেটিকে অর্থের, অর্থাৎ মননের, পারে পৌঁছে রস বলি, উপায় ও উপাদানের চরমে পৌঁছে **সেটিকেই** সুর বলা হয়ে থাকে— এই আমাদের বিশ্বাস। প্রকারান্তরে এ কথা পূর্বেই বলেছি। অথচ সুরের বিচার-বিশ্লেষণে আমাদের যোগ্যতা নেই যেমন, বস্তুলাভ হতে পারে এ আশাও মিথ্যা। আলোচ্য চিত্রকলায় সুর হয়েছে রূপ। সুতরাং, রসকে অনির্বচনীয় রস ব'লেই স্বীকার করে নিয়ে, রসের বিস্তারিত নামরূপ আচার-আচরণের হিসাবনিকাশের মধ্যে না গিয়ে, শুধু রস এবং রূপের সম্পর্কটি নিয়ে কতদূর কী বোঝা যায় ভেবে দেখতে হবে। এ ব্যাপারে সুপ্রচলিত একটি বচনের তাৎপর্য গ্রহণ ক'রে আমরা লাভবান হতে পারি। বহু ধীমান রসিক ব্যক্তির বহুশত বৎসরের কাব্যবিচারের পরিণামে সেটি পাওয়া গিয়েছে। অবোধ অচেতনকে প্রবোধ দিতে বিশল্যকরণীর মতোই অব্যর্থ। অবশ্য, বিশল্যকরণী চাই ব'লেই গন্ধমাদন উৎপাটন করে আনব না— পণ্ডিতজন আমাদের এ অক্ষমতা ক্ষমা করবেন।

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্[১৭] —অতি প্রসিদ্ধ এই বচন। পরিষ্কার অর্থ তার : রস যার আত্মা, সেই বাক্যই কবিতা। কবিতার দেহ হল বাক্য বা বাগর্থ।

ভাব অনুভূতি আবেগ বা প্রক্ষোভ— এগুলি রস নয়। আখ থেকে 'রস', তা থেকে গুড় (তৎপূর্বে

---

১৭ সাহিত্যদর্পণ।

তাড়ি তৈরি হবারও একটি সম্ভাবনা রইল), গুড় থেকে অল্প বা অধিক -পরিষ্কৃত চিনি, চিনি থেকে মলিন বা উজ্জ্বল স্ফটিকের মতো দানাবাঁধা মিছরি, এ যেমন পরিবর্তনপরম্পরা, পণ্ডিতেরা বলেন— অতি স্থূল দুঃখসুখ বাসনাবেদনার বিক্ষোভ থেকে উত্তরোত্তর-উৎকর্ষের সিঁড়ি ভেঙে অবশেষে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রসে পৌঁছুনো যায় এবং 'বোধে বোধ'[১৮] হয়ে থাকে। সেখানে সুখদুঃখ শোকসান্ত্বনা ভয়বিস্ময় ক্রোধঘৃণা সবই অনির্বচনীয় আনন্দের বা চেতনার নানা নাম, নানা রূপ— যা ছিল ব্যক্তিগত তা হল বিশ্বজনীন, আর বিশ্বসত্তারও সব-কিছু ব্যক্তির অনাসক্ত অনুরাগ, স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং আনন্দময় প্রতীতির বিষয় হয়ে উঠল।

যে বিচার ও সিদ্ধান্ত কাব্য সম্পর্কে সত্য, প্রকারান্তরে সেটি অন্যান্য কলাসৃষ্টি সম্পর্কেও অবশ্যই সত্য এবং অর্থদ্যোতক হবে। এ হিসাবে **রসাত্মক ও ছন্দোময় হলেই** বাগর্থকে কাব্য, ধ্বনিতরঙ্গকে গীত, ধ্বনিতরঙ্গিত বাগর্থকে সংগীত, জড়পিণ্ডকে মন্দির বা মূর্তি, অঙ্গভঙ্গীকে নৃত্ত বা নৃত্য, ক্রিয়ারূপকে অভিনয় এবং বস্তু বা [১৯]অবস্তু -রূপকে চিত্র বলা যেতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে রসই আত্মা, ছন্দই প্রাণ। বাক্ অথবা ধ্বনি অথবা আকৃতি হল শরীর শুধু। শরীরকে চালনা করে যেমন প্রাণ বা ছন্দ, বিভিন্ন উপায়ে ও উপাদানে, অন্নে, তাকে গঠনও করে সে'ই— প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভাব আবেগ তত্ত্ব তথ্য -যোগে এক-একটি সূক্ষ্ম শরীরও গ'ড়ে ওঠে— আমাদের দেশে মনকেই সূক্ষ্মশরীর ব'লে থাকে— তারও স্রষ্টা যেন প্রাণ বা ছন্দ— আকর্ষক ও আশ্রয়দাতা।

অতীত-বর্তমানের কলালোকে একটি চিন্তনীয় ব্যাপারের প্রতি রূপস্রষ্টা আর রসিক জনের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে এ আলোচনা শেষ করতে চাই।

বিভিন্ন উপাদানে বিভিন্ন কলাসৃষ্টি, বিভিন্ন-ইন্দ্রিয়-সহায় চিত্তবৃত্তির যোগে তার বিচিত্র উপভোগ, বহু ক্ষেত্রেই কলাসৃষ্টি রূপ ধরেছে দুই প্রকার— অনুষঙ্গী ও অবচ্ছিন্ন, অথবা বলাও যেতে পারে 'মূর্ত' এবং 'বিমূর্ত', concrete এবং abstract। নৃত্তে তাই কাহিনী নেই, যন্ত্রের বা কণ্ঠের গীতেও কথা নেই, স্থাপত্যে জগৎসংসারের কোথাওকার কোনো স্পষ্ট সাদৃশ্য বা অনুষঙ্গ নেই, অথচ উল্লিখিত প্রত্যেক কলাসৃষ্টি ছন্দোবেগবান তো বটেই— রসাত্মক যে, সে বিষয়েও রসিকের মনে কোনো সন্দেহ উপস্থিত হয় না। কাব্য এবং চিত্রের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যহীন বা অনুষঙ্গরহিত কোনো-প্রকার রসাত্মক কলাসৃষ্টির বিষয় আমাদের জানা ছিল না। একেবারে অর্থহীন অথচ ছন্দোবদ্ধ কোনোরূপ শব্দসংহতি আজও প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে কোথাও রচিত ও কাব্য ব'লে আদৃত হচ্ছে কিনা জানি নে। যেখানে জাগ্রতে-জানা-চেনা কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য নেই, অন্তত স্বপ্ন অথবা মনোবিকারের সঙ্গেও সাদৃশ্য আছে— রসসৃষ্টি হওয়া না-হওয়া সর্বদাই পৃথগ্‌ভাবে বিচার্য। চিত্রের বেলায় ব্যাপার হয়েছে বিচিত্র। স্বপ্নসাদৃশ্যে অথবা অবচেতনগূঢ় কামনা কল্পনা স্মৃতি বিস্মৃতির প্রেরণায় ও উপাদানে রচিত হয়ে, অথবা জ্যামিতি ও ঘনমিতির চতুর ছদ্মবেশে অল্পাধিক আত্মগোপন

১৮ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষা।

সংস্কারকামনাদি পার হয়ে ক্রমশ রসে পৌঁছোন কিভাবে কবি ও রসিক, পরিষ্কার নক্সা এঁকে দেখিয়েছেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তাঁর ব্যাখ্যাও মৌলিক হোক বা না হোক— চমৎকার। দু'ই পাওয়া যাবে 'কাব্যপরিমিতি' গ্রন্থে।

১৯ বস্তু বলতে চেতন বা অচেতন সর্ববিধ দৃষ্ট বস্তুই বোঝাচ্ছে। অবস্তুর এখানে, এই সংজ্ঞার্থে, স্থান হয় কিনা সন্দেহ আছে। অবস্তু যদি বস্তুরই দেহ ধরে কথা নেই, যেমন বুদ্ধ বা নটরাজ -মূর্তিতে অথবা চৈনিক ড্র্যাগনে। abstract বা অবস্তু থাকবে অথচ রেখায় বা রঙে, ছন্দ শুধু নয়, রসের উদ্রেক করবে— এমন হয় ব'লে আমাদের জানা নেই।

ক'রে, যে-সব চিত্ররীতি অপূর্ব সার্থকতার, হয়তো বা রসাত্মকতারও দাবি উপস্থিত করেছিল একদিন, তারই 'শেষ' বিবর্তনে প্রায়-সকল-সংস্কার-ও-অনুষঙ্গ-মুক্ত যে 'কেবল রূপ' নিয়ে দেখা দিয়েছে চিত্র আজ পাশ্চাত্য দেশে— তাকেও কি কলাসৃষ্টি বলব? কার্পেটে, কাপড়ে, হাঁড়ি-কলসীতে, ধামা-কুলোয়, যুগে যুগে সভ্য বা অসভ্য জাতিদের মধ্যে এতদিন যা নক্সা রচিত হয়েছে— যখন সাদৃশ্য থাকে নি— সেও তা হলে বুদ্ধ বা ম্যাডোনার মুখচ্ছবি, চীনদেশীয় জলস্থল আকাশের দৃশ্যকাব্য, ভ্যান্ গগের আঁকা প্রদীপ্ত পুষ্পস্তবক বা টার্নারের মায়াতুলি-উদ্‌বোধিত তাণ্ডবমত্ত সমুদ্র, সে-সবেরই সমশ্রেণীতে স্থান পাবে কি? অথবা, ধনী-নির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রায় সর্বশ্রেণীর নেত্রপ্রীতিকর হওয়াতেই অন্ত্যজ বলে গণ্য হবে এবং স্পর্শ বাঁচিয়ে দূরে থাকবে, অন্তত ফ্রেমে বাঁধানো হয়ে বাসর বা বৈঠকখানার দেওয়াল থেকে ঝুলবে না?

জড়পিণ্ড দিয়ে রসসৃষ্টির বেলায় সাদৃশ্যযুক্ত মূর্তির বড়ো শরিক ছিল সাদৃশ্যমুক্ত স্থাপত্য— জীবনযাত্রার তথা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার অন্য একটি বিশিষ্টতাও আছে। বর্তমানে পরম্পরানিষ্ঠ মূর্তি ও স্থাপত্যের মাঝখানে আরএক 'বিমূর্ত মূর্তিকলা' পাশ্চাত্যে রচিত হয়েছে বা হচ্ছে যাকে কখনো মূর্তি কখনো বা অব্যবহার্য স্থাপত্য ব'লেই ভ্রম হয়। স্বপ্নের অনুষঙ্গে, স্থূল ও প্রত্যক্ষ স্থিতির নিশ্চয়তায়, রস বা রসের আভাস কোথায় কত দূর থাকে অথবা আদৌ থাকে না তার, মহাকালই তার যোগ্য বিচারকর্তা।

ইতিমধ্যে, ভারতের ধারাবাহী চিত্রকলার বিচার-বিবেচনা থেকে এই আমরা জেনেছি যে, দুই আয়তনের ক্ষেত্রে উদ্ভাসমান, ছন্দোবিধৃত, ছন্দেই মুক্ত, রসাত্মক যে রূপ তারই নাম চিত্র বা ছবি।

কবি হুয়ান রামন হিমেনেথ[১]

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

হুয়ান রামন হিমেনেথ কবি— সত্যকার কবি। সত্যকার কবি এই জন্য যে তিনি প্রায় নবীর পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করেছেন অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি ও বাণী লাভ করেছে একভাবে মন্ত্রেরই মাহাত্ম্য— তাতে রয়েছে অর্থের গাঢ়তা আর রূপের সুষমা। তাঁর লক্ষ্য তাঁর অন্তরঙ্গ ভগবানকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন

তুমি এসেছ আমার উত্তরকে নিয়ে আমার দক্ষিণ দিকে[২]
তুমি এসেছ আমার পুব হতে আমার পশ্চিম দিকে—
তুমি আমার সঙ্গে চলেছ, হে অদ্বিতীয় ক্রুশফলক, তুমি আমাকে
পথ দেখিয়ে চলেছ।
ঐ চিরন্তন দিক চতুষ্টয়ের মধ্যে
আমায় সর্বদা রেখেছ তার কেন্দ্রস্থলে, আমারও যা কেন্দ্রস্থল,
যা আবার তোমারি কেন্দ্রস্থল।

কথাগুলি স্পষ্টই রহস্যময়— বৈদিক ঋষি যাকে বলতেন নিণ্যা বচাংসি, নিগূঢ় বাক্, কিন্তু একান্ত রহস্যময় বা অবোধ্য নয়, যদি আমাদের আন্তর চেতনা একটু সজাগ ও উন্মুখী হয়ে থাকে। কবি নিজেই পরে একটু স্পষ্ট করে বলছেন—

সবই চালিত হয়েছে
এই প্রাণবন্ত সম্পদের দিকে,
হে আকাঙ্ক্ষিত হে আকাঙ্ক্ষী ভগবান,
খনির মধ্যে আমার হীরকখণ্ড আমার জন্য অপেক্ষা করছে॰॰

সর্বত্র তিনি সর্বভূতান্তরাত্মা— চিন্ময় তিনি, প্রেমময় তিনি। এই সৃষ্টিমণ্ডলের মধ্যে ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত তিনি, তাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, তার সর্বোচ্চ শিখর অবধি—

তোমার সহস্র দিক দিয়ে তুমি সকলের কাছে এসেছ[৩]
সকলের মধ্যে বাস কর তুমি তোমার সহস্র প্রতিধ্বনি আশ্রয় করে,

---

১ Juan Ramón Jimenez— স্পেনীয় ভাষায়, j=h (হ) আর z=th (থ)। এ হল বিশুদ্ধ উচ্চারণ— তা ছাড়া z=s (অর্থাৎ ss), এ উচ্চারণও চল আছে, বিশেষতঃ দুই আমেরিকায়। জন্ম ১৮৮১ সালে, স্পেন দেশে। অন্তর্বিপ্লবের সময়ে (তিরিশের দশকে) উদারমতাবলম্বী ছিলেন বলে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। প্রথমে বহুকাল থাকেন দক্ষিণ-আমেরিকায়— বর্তমানে উত্তর-আমেরিকাতে এসে বাস করেছেন (শিক্ষকতার কাজ নিয়ে আছেন)। সাহিত্যে ১৯৫৬ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

২ TÚ VIENES CON MI NORTE HACIA MI SUR
(Thou comest with my north towards my south)
TU VIENES DE MI ESTE HASTA MI OESTE
(Thou comest from my east to my west)

৩ A TODOS LLEGAS TŪ POR TUS MIL LADOS
(To all thou comest by thy thousand sides)
EN TODOS VIVES TŪ CON TUS MIL ECOS
(In all thou livest with thy thousand echoes)

তোমাতে এমন একটিও স্ফুলিঙ্গ নাই কোথাও,
সুখী হোক আর দুঃখী হোক, কোনো-না-কোনো চোখে গিয়ে যে আঘাত করে না· ·
কারণ, তুমি ভালবাস, আকাঙ্ক্ষিত ভগবান, আকাঙ্ক্ষী ভগবান, আমি যেমন করে ভালবাসি।

"আকাঙ্ক্ষিত ভগবান, আকাঙ্ক্ষী ভগবান" এই বাক্যটি বারবার উল্লেখ করছেন মন্ত্রজপের মত— এবং এর মধ্যে পাই হিমেনেথের একটা বৈশিষ্ট্য— সাধারণভাবে যা বলতে পারি ভক্তের বৈশিষ্ট্য। এর অর্থ ভগবান মানুষের, জগতের, প্রতি জীব ও বস্তুর বাঞ্ছিত কাম্য ; কিন্তু এই যে বাঞ্ছা কামনা সৃষ্টির মধ্যে দেখা দিয়েছে স্রষ্টার জন্যে, তার হেতু ভগবান নিজে বাঞ্ছা করেন কামনা করেন তাঁর সৃষ্টিকে। আর একজন ঋষি-কবি অনুরূপ ভাবেরই কথা বলছেন—

স্বর্গ তার আনন্দ নিয়ে স্বপ্ন দেখে নিখুঁত পৃথিবীর,
পৃথিবী তার দুঃখ নিয়ে স্বপ্ন দেখে নিখুঁত স্বর্গের"—

ভগবান আনত হয়ে আছেন পৃথিবীর দিকে— এই হল ভগবানের আকিঞ্চন, আকাঙ্ক্ষী ভগবান নেমে এসে নিজেকে অনুস্যূত করে রেখেছেন পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণার মধ্যে। এই নিভৃত চেতনার কল্যাণে, ভাগবত আকিঞ্চনের প্রেরণায় আবার প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু ও প্রাণ উঠে চলেছে ঊর্ধ্বে, পেয়েছে ভগবানকে আকাঙ্ক্ষা করবার উৎসাহ।

ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটা ধারা— খৃস্টীয় ধর্মে যা বিশেষ প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে— তা হল জগৎ-অতীত, জগৎ-বিচ্ছিন্ন ভগবান, স্রষ্টা বা প্রভু মাত্র ভগবান। ভগবান যে জগতের মধ্যে রয়েছেন ওতপ্রোত, ভগবান যে জগৎ হয়েছেন, জগৎ জগতের প্রতি বস্তু যে ভগবানই এই অনুভব পাশ্চাত্যে বিরল, কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষার তা একান্ত পরিচিত অঙ্গ। ইউরোপে একে Pantheism নাম দেয় এবং সাধারণতঃ সুনজরে দেখা হয় না, প্রাচীনতর অপরিণত বুদ্ধির পরিচয় বলে একে সরিয়ে রাখা হয়। এই দোষে দার্শনিক স্পিনোজা একদিন তাঁর সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। যা হোক, কবি হিমেনেথ কিন্তু এই অনুভবের মধ্যেই পেয়েছেন তাঁর নিবিড়তম পূর্ণতম মর্মবাণী— এবং তাকে এমন গাঢ় গভীর ঐকান্তিক ভাবে গ্রহণ করেছেন যে তা বৈদান্তিক পর্যায়ের উপলব্ধি হয়ে উঠেছে।

ভগবান হলেন চিন্ময়, চৈতন্যই তাঁর স্বরূপ— আর চৈতন্য সর্বব্যাপক, অখণ্ডমণ্ডলাকার (কবির কথা, DIOS EN REDONDA CONCIENCIA—God of rounded conciousness)। তাই কবি বলেছেন—

এই চেতনা আমায় ঘিরে ছিল
আমার সারা জীবন ধরে,
জ্যোতির্মণ্ডলের মত, সূক্ষ্ম কোষের মত, আবহাওয়ার মত আমারই নিজের সত্তার,
কিন্তু এই যে এখন সে আমার অন্তরের মধ্যে স্থাপিত।

৪ Heaven in its rapture dreams of perfect earth,
Earth in its sorrow dreams of perfect heaven.
—Sri Aurobindo, "Savitri" xi.

সে জ্যোতির্মণ্ডল এখন অন্তরে আমার,
দেহ আমার এখন আমার "আমি"র প্রত্যক্ষ কেন্দ্র—
আমি হলেম এই জ্যোতির্মণ্ডলের প্রত্যক্ষ পরিণত দেহ—
ফল যেন, তার নিজেরই ফুলের, এখন সে হয়ে উঠল
আমারই ফুলের ফল।

আত্মার ও দেহের, চৈতন্যের ও জড়ের একাত্মতা, একত্ব— অনুপম এ অদ্বৈত সিদ্ধি। বাহিরে যে সর্বব্যাপী চেতনা ছিল, বিশ্বসত্তা, যাকে নাম দিয়েছিলাম ভগবান, এখন দেখছি তাই আমার অন্তরে আমি হয়ে দেখা দিয়েছে—আমি-রূপ সেই ভাগবত অন্তশ্চেতনারই পরিণত প্রকাশ আমার এই বিশ্বাঙ্গীভূত দেহ। অন্তরে তুমি যদি ফুল হয়ে রইলে বাহিরে আমিই তোমার ফল। ভগবানের সঙ্গে মানুষের এই যে ঐকান্তিক সাযুজ্য ও সাধর্ম্য, তা অপূর্ব কাব্যশ্রী গ্রহণ করে প্রকাশ পেয়েছে এই কবির মধ্যে; তিনি তাই উৎসাহে প্রায় প্রগলভ হয়ে বলে চলেছেন—

আজ তা হলে তোমার জন্যে হে আকাঙ্ক্ষিত
হে আকাঙ্ক্ষী ভগবান আমি হয়ে উঠেছি আমারই ফুলের ফল—
চিরসবুজ, চিরকুসুমিত, চিরফলবান,
আবার সোনালী আবার হিমশুভ্র আবার সবুজ
আর এক কালে· ·
ভগবান, আমি যে আমার নিজের মর্মকেন্দ্রের, অন্তঃস্থ তোমার
আবেষ্টন হয়ে উঠেছি।[৫]

বাহির অন্তর কি রকম এক হয়ে গিয়েছে, বাহির কি রকমে অন্তরে এসে প্রবেশ করেছে, অন্তরটাই যেন বাহিরের আবেষ্টন আবরণ হয়ে উঠেছে এই রতি-বৈপরীত্য আমাদের কবি বিশেষভাবে উপভোগ করেছেন। সাগরের আরাব শুনছেন যখন তিনি তখন কি শুনছেন?—

তোমার বাণী আমি শুনতে পাই, মহাসাগর,
নিজে তুমি যা শোন না—
আমি শুনি সেই শ্রবণ দিয়ে যা আমি পেয়েছি
আমার ভগবানের মধ্যে,
আমার বাঞ্ছিত বাঞ্ছাময় ভগবান;
তাঁর সঙ্গে, তাঁরই মত শুনি আমি· ·
ভগবানের শ্রবণ দিয়ে তোমাকে শুনি আমি, সাগর· ·
তোমার কথা আমি শুনতে পাই,
আমার অন্তরে ভাগবতী চেতনা আমার জন্যে সম্পূর্ণ খুলে ধরেছে তোমার সত্তা,
সেখানে তুমি এসে প্রবেশ করলে তোমার বিপুল আরাব নিয়ে,
তোমার প্রেমের সেই অসীম সংগীত নিয়ে—

---

৫ DIOS, YO SOY LA ENVOLTURA DE MI CENTRO
God, I am the envelope of my centre.
DE TI DENTRO
Of Thee within.

উপনিষদ যে বলছে—

যৎশ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্

সেই 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্র'ই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেন এখানে। আর চক্ষুর চক্ষু দিয়ে আমরা যখন দেখি, শ্রবণের শ্রবণ দিয়ে যখন শুনি তখনই আমাদের হয় দিব্যদৃষ্টি দিব্যশ্রুতি— বিশ্ব পরিবর্তিত রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেয় তার ভাগবত দিব্য কান্তি নিয়ে। কি রকম? সব আলো, সব আলো— আলোয় আলোময়— চিন্ময় জ্যোতির্ময়— অন্তরের অন্তরে সেখানে—

এই দেখ পৌঁছে গেলাম গন্তব্য দেশে
সেখানে তোমার লোকেরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল, হে বাঞ্ছিত ভগবান—
আমার জনেরাও অপেক্ষা করছিল,
তোমার এতবৎসর ধরে আমাকে চেয়ে,
অপেক্ষা করছিল তোমার সঙ্গে আমার জন্যে,
অপেক্ষা করছিল আমার সঙ্গে তোমার জন্যে;
আর, কি আলো কি আলো তাদের মধ্যে
মধ্যাহ্নের অপ্রত্যাশিত নির্ঝরিত সূর্যের নীচে,
লাল মিনার শোভিত উষার উপরে,. .
কি আলো তাদের চোখের মধ্যে, অধরোষ্ঠের মধ্যে, হাতের মধ্যে—
কি বসন্ত স্পন্দিত সেখানে,
কি তুমি তাদের অন্তরে, তুমি আমাদের মধ্যে—
কি আলো, কি প্রসারিত দৃশ্য—
বুকের, কপালের— তাদের যারা যুবক, সাবালক, শিশু—
কি গান, কি কথা
কি আলিঙ্গন কি চুম্বন
কি উত্তরণ তোমার আমাদের মধ্যে,
উঠে এলে যেখানে রয়েছ তুমি সেখানে অবধি,
এই যে তুমি, তোমার উপর তোমাকে স্থাপন করেছ,[৬]
যাতে সকলে সোপান বেয়ে উঠে আসতে পারে—
জড় দেহে আর আন্তর আত্মায়—
জাগ্রত চেতনা অবধি সেই ধ্রুবতারা অবধি
যেখানে সংগৃহীত পরিপূর্ণ একীভূত করেছে
বিশ্বের তারাপুঞ্জ, শাশ্বত সাকল্যের মধ্যে
শাশ্বত সাকল্য যা আবার আন্তর সাকল্য।[৭]

আধ্যাত্মিক অনুভূতির, ভগবানের সঙ্গে মিলনের বিশ্বের সঙ্গে মিলনের, এ এক অপরূপ বর্ণনা। বাহিরের

---

৬ স্মরণ করিয়ে দেয় চণ্ডীদাসের: ঢেউয়ের উপরে ঢেউএর বসতি।

৭ EL TODO ETERNO QUE ES EL TODO INTERNO
(The eternal All that is the internal All)

সঙ্গে ভিতরের, উপরের সঙ্গে নীচের সমীকরণ সমুচ্চতম চেতনায়, তারও কি মধুর চিত্র। আর এই বিশ্ব-সাধনায় মানুষের মত ভগবানেরও কি প্রয়াস (আকাঙ্ক্ষী যে ভগবান) এ রহস্য কেমন নিবিড় রহস্যময় ভঙ্গীতে প্রস্ফুট। দুয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ—দ্বৈতাদ্বৈত,—একদিকে বৈদান্তিক, অন্যদিকে বৈষ্ণব—যে অন্যোন্যাশ্রয় ও পারম্পর্য, পরম একাত্মতা ও একত্ব এবং তারই সঙ্গে উভয়ের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য পেয়েছে কবির ভাবে ও ভাষায় অদ্ভুত চমৎকারিত্ব।

কবি বলছেন সাকল্যের সামগ্র্যের কথা, জাগ্রত চেতনা আর জড় দেহের কথা অর্থাৎ এদের উন্নয়নের বা ঊর্ধ্বায়নের কথা। ফলত সমস্তের ঊর্ধ্বায়ন, মানুষের সাধনার মূল কথাই তো এই। ভূতলে রক্তমাংসের মধ্যে পাশবস্তরে মানুষ আছে পড়ে—সেখান থেকেই তো তার কণ্ঠ উঠেছে—গভীর অতলে অন্ধকারের মধ্যে পড়েই তো সে ডাকছে উপরের আলো—De profundis clamavi—Out of the depths have I cried unto Thee, O Lord![৮]

ফলত কবির পরিণতবয়সের যে গ্রন্থখানি থেকে আমি কবির পরিচয় দিয়েছি তার নামই হল ANIMAL DE FONDO (গভীরের বা অন্তস্তম পশু)। এই পশুর উদ্ধার, এই পশুর রূপান্তর মানুষের আন্তর জীবনের ইতিহাস। কবি বলেছেন, আমরা দেখেছি, প্রথম তাঁর দৃষ্টি ছিল বাইরে, ভগবানকে দেখলেন চারিদিকে বিশ্বের বহিরঙ্গণে—পরে সেসব গুটিয়ে যেন এল ভিতরে—"ঘর করিনু বাহির বাহির করিনু ঘর।" এই নীচের তলের কথাটা বলি তবে এখন, কি রকমে তা হয়ে উঠল উপরের তল—

তুমি ছিলে জাদুময় অতলের তলে নিয়তি হয়ে—
সৌন্দর্যময় ইন্দ্রিয়ালুতার নিয়তি যত, তাদের নিয়তি—
যে জানে মহাধর্ম হল প্রেমিক চেতনায়
পূর্ণ আনন্দ উপভোগ—
সে ধর্ম তবে রয়েছে আমাদের অতিক্রম করে;
তুমি ছিলে এ কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে
যে তুমি হলে তুমি,
আমি যাতে অনুভব করতে পারি যে আমি হলেম তুমি
আমি যাতে উপভোগ করতে পারি যে তুমি হলে আমি
আমি যাতে উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি আমি হলেম আমি
এই যে হাওয়ার অতলের মধ্যে রয়েছি সেখানে,
আমি যেখানে পশু হাওয়ার অতলে,
ডানা আছে যার কিন্তু বাতাসে ওড়ে না,
ওড়ে চেতনার আলোকে—
সকল অসীম সকল অনন্তের যে তৃপ্তি
তার চেয়েও বৃহত্তর···

এ সম্ভব হয়েছে, আমি উঠতে পেরেছি, পরে হয়ে যেতে পেরেছি আলোর জগতে; তার কারণ, আমি পশু

---

৮ Psalms cxxx

বটে এই পৃথিবীর পরে, গুহার মধ্যে, গহ্বরের মধ্যে—কিন্তু সেটি একান্ত মাটির নয়, হাওয়ার গহ্বর ; আর আসল কারণ, তুমিও রয়েছ সেখানে আমার সঙ্গে এক হয়ে—আলো হয়ে।

মানুষে ভগবানে, আত্মায় পরমাত্মায় এই যে মিলন এই যে ঐক্য ও একত্ব তা কেবল আলোর বা চৈতন্যের সম্বন্ধ নয়, বৈদান্তিক উপলব্ধি নয়— তা হল আবার একটা পরানুরক্তির সিদ্ধি। ভগবানে আর মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে একটিই হৃদয়—

গোলাপ ফুল দিয়ে একটি হৃদয় তৈরী
তোমাতে আমাতে, ভগবান
তুমি চাও আমার জীবন
আর আমি চাই তোমার জীবন[৯]

এ অপরূপ সম্বন্ধ কি শুধু তোমাতে আমাতে ? বিশ্বের সঙ্গেই তো তোমার সেই এক সম্বন্ধ

চিন্ময় ভগবান, তুমি জগতের উপর আনত হয়েছ
সমগ্র মুখের পরিপূর্ণ চুম্বনের মত[১০]

২

কবির এই প্রেম, এই ভাগবত প্রেম প্রেম বটে, গাঢ় গভীর এবং সমুন্নত প্রশান্ত— এখানে নাই হৃদয়ের সেই আবিল বিক্ষোভ যার বিরুদ্ধে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সাবধান করে দিয়েছেন—

The gods love not the tumult of the soul.

ফলতঃ এরই নাম আমরা যদি দেই amor intellectualis Dei তবে বোধ হয় বেশি ভুল হবে না। স্পিনোজার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি— তাঁর এই বাক্যটির সদর্থ নিষ্কাষণ করা একটু কঠিন। তিনি নিজে যে অর্থ করেছেন তা হল সাম্য, সমতা, সমদৃষ্টি— এর খুব বেশি কিছু নয়। বাক্যটির দুটি অঙ্গ পরস্পরবিরোধী বলেই তো আমরা বোধ করি। স্পিনোজার নিজের মধ্যেও intellectualis যতখানি পাই, amor ততখানি কিছু পাই কি ? ও দুটি কথা একসঙ্গে সোনার পাথরের বাটি বলেই বোধ হয়।

কিন্তু এ দুটির অপরূপ একীকরণ একাত্মতা হয়েছে দেখি এই স্পেনীয় কবির মধ্যে। স্পেন এক অদ্ভুত দেশ— তার জাতীয় চরিত্রে ঘটেছে একান্ত বৈপরীত্যের মিশ্রণ— পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের, খৃস্টান ও

---

৯ UN CORAZÓN DE ROSA CONSTRUÍDA
A heart of Rose built
ENTRE TO, DIOS DESEANE DE MI VIDA,
Between you, God desirous of my life
Y, DE ESANTE DE T½ VIDA, YO
And desirous of Thy life, me.

১০ DIOS EN CONCIENCIA CAES SOBRE EL MUNDO
God in consciousness thou fallest upon the world
COMO UN BESO COMPLETO DE UNA CARA ENTERA
Like a kiss complete of an entire face

মোসলেমের, কল্পনার ও বাস্তবের— এক দিকে matador (বৃষযোদ্ধা) আর-এক দিকে mystic (আধ্যাত্মিক সাধক)। হিমেনেথ সত্যই একটা চমৎকার রসায়ন— অ্যালকেমী— ঘটিয়েছেন; নীচেকার পশুকে যেমন ব্যোমচারী করে ধরেছেন, ভগবানকে যেমন মর্ত্যের মধ্যে অনুস্যূত করে ধরেছেন তেমনি প্রাণকে হৃদয়কে পরিস্রুত করে তুলে ধরেছেন বুদ্ধির প্রশান্ত স্বচ্ছ স্থৈর্য ও ঔদার্যের মধ্যে। বুদ্ধিকে নানা ভাবে ভঙ্গিতে প্রেমের সেবায় কবিরা ব্যবহার করেছেন। শেক্সপীয়র, মিসেস ব্রাউনিং ন্যূনাধিক পরিমাণে বুদ্ধিটিকে নামিয়ে প্রেমের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন; প্রেমাবেগে বৈচিত্র্য খেলিয়ে তুলবার জন্য বুদ্ধির চাতুর্যকে তার মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন— আমাদের চণ্ডীদাসে বা বিদ্যাপতিতে পৌঁছে গিয়েছি আর এক প্রান্তে যেখানে বুদ্ধির আলো প্রেমের মধ্যে প্রায় লীন হয়ে গিয়েছে। অন্য প্রান্তে উঠি যখন, বুদ্ধি ক্রমে আলাদা হয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে, প্রেমের অধিগত অধীন না হয়ে, প্রেমের সহযোগী— কমরেড— হয়ে উঠেছে, তার নিদর্শন ইংরেজ ডন (Donne)। কিন্তু প্রেমকে বুদ্ধির স্তরে তুলে ধরা, বুদ্ধিকে নামিয়ে নয়, প্রেমকেই তুলে ধরে বুদ্ধিগত বা বুদ্ধিময় করে তোলা, প্রেমকে প্রেম রেখেই, তাকে শুধু একটা নির্ব্যক্তিক স্নেহ স্নিগ্ধতায় পর্যবসিত না করে, এ ধরনের অবস্থান্তর বা রূপান্তর একান্ত দুর্লভ। হিমেনেথ যখন বলছেন— পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি—

গোলাপের গোলাপী হৃদয় তৈরী হল
ভগবান, তোমার আর আমার মধ্যে—
তুমি চাও আমার জীবন
আমি চাই তোমার জীবন—

কিম্বা

চিন্ময় হে ভগবান, জগতের উপর তুমি এসে পড়েছ
সারা মুখখানির উপর অনন্ত চুম্বন যেন এক—

প্রেমের সারাংশ ঘনীভূত হয়েছে মনে হয় জ্ঞান-গাঢ় চৈতন্যের মধ্যে। এ সম্ভব হয়েছে, কারণ বুদ্ধি বা মনঃশক্তিও উন্নীত হয়েছে এক অপরোক্ষ প্রতীতির মধ্যে। কাব্য-চেতনা কাব্য-রচনার উপর বুদ্ধি অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির প্রভাব ফরাসী কবিত্বের একটা বিশেষত্ব। অপেক্ষাকৃত আধুনিকদের মধ্যে Vale'ryএই এ ভাবের বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন—হয়তো সে প্রভাব আতিশয্যের দিকেই ঝুঁকেছে। হিমেনেথও যে সর্বদা তাঁর উভয়পদী স্থিতিকে সর্বোচ্চস্তরে রাখতে পেরেছেন তা নয়— বুদ্ধি তার চাতুর্য দেখাতে গিয়ে, সোনায় সোহাগা নয়, খাদে পরিণত হয়েছে। যা হোক, হিমেনেথের এই বুদ্ধিময়তাই খুব সম্ভব Vale'ryকে আকৃষ্ট করেছিল তাঁর দিকে।

আমাকে হিমেনেথ আকৃষ্ট করেছে, তাঁর বুদ্ধিগরিষ্ঠতার জন্য নয়, এমন কি তাঁর নিবিড় সমুচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা উপলব্ধি বা প্রেমতন্ময়তার জন্যও নয়— অন্ততঃ ততটা নয়, যতখানি তাঁর মন্ত্রশক্তির জন্য— অর্থাৎ তার উপচার-উপকরণকে তিনি দিয়েছেন একটা অপরূপ স্পষ্টতা, সংহতি, একটা নিরাভরণ পৌরুষ, প্রসন্ন-প্রখর তেজোময়তা, এবং অন্তঃশীল মাধুর্য।

DIOS, YO SOY LA ENVOLTURA DE MI CENTRO
DE TI DENTRO

কিম্বা

EL TODO ETERNO QUE ES EL TODO INTERNO

হিমেনেথের এ বাণীর মধ্যে আমি শুনি যেন দান্তে বা বেদব্যাসের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়েছে কোথাও—দান্তের

In la sua volontade è nostra pace [১১]

কিম্বা

Lasciatè ogni sperauza voi ch'entrate [১২]

আর বেদব্যাসের

য ইমাম্ পৃথিবীং কৃৎস্নাং সংক্ষিপ্য গ্রসতে পুনঃ
হুতাশমীশং দেবানাং। —নলোপাখ্যান [১৩]

কিম্বা

তাং তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা
ন কশ্চিদ্বরয়ামাস তেজসা প্রতিবারিতঃ। —সাবিত্রী উপাখ্যান [১৪]

অবশ্য আধুনিকের চিন্তা ঋদ্ধি যে রকম তাত্ত্বিক পর্যায়ের, প্রাচীনেরা তুলনায় বস্তুতন্ত্র এবং বহিঃপ্রজ্ঞ—তা হলেও যে রীতি উভয়কে অনুপ্রাণিত করেছে তার মধ্যে রয়েছে একটা আনুরূপ্য। কবি তাঁর নিজের রীতি তাঁর অন্তরাত্মার ছন্দ সম্বন্ধে নিজে বলছেন

The endless clarity of your beauty is,
as the sky in a fountain, limitless
Within the limitation of your borders [১৫]

হিমেনেথের স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা, ওজস্বিতা বা মন্ত্রশক্তির কথা বললাম। পরিণত বয়সের প্রজ্ঞা তাঁর দিয়েছে এই গুণ। তবে যৌবনে তত্ত্বদৃষ্টির সঙ্গে অনুভব-বিলাস বা হৃদয়ের উষ্ণতা যথেষ্ট ছিল তাঁর মধ্যে। শুনুন তাঁর আকুলতা—

Leave the doors open,
This night, so that he,
If he wish, this night, may come,
Who is dead
    Open entirely,
To see if we may resemble
His body; to see if we are
Something of his soul, being
Given up to space— [১৬]

---

১১ তাঁরই ইচ্ছার মধ্যে আমাদের শান্তি

১২ সব আশা ত্যাগ কর, কে তুমি এখানে আসতে চাও

১৩ এই সমস্ত পৃথিবীকে সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে গ্রাস করছে দেবতাদের রাজা যে হুতাশন

১৪ পদ্মপলাশাক্ষী সে তার তেজে জ্বলছে যেন
সে তেজে প্রতিহত হয়ে কেউ তাকে বরণ করতে পারে না।

১৫ W. S. Merwin কৃত অনুবাদ

কিম্বা আরো স্পষ্ট উদ্বেল কণ্ঠ

Whose is this voice? Whence sounds
This voice, celestial and silvery
Which with delicate leaf pierces lightly
The iron silence of my pain—

প্রায় তিনি রোমান্টিক কবি হয়ে উঠেছেন— কিন্তু ভাবোচ্ছলতা তাঁর দৃষ্টিকে উপলব্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি, তা রয়েছে তেমনি স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন; কারণ যৌবনের কামনার মধ্যেও স্পষ্ট প্রতিধ্বনিত পরিণত বয়সের আস্পৃহা— তার পরিণত বয়স হল যৌবনের পরিণতি—

প্রথম বয়সে ছিল

There, within doors, before,
The house was body
And the body was soul

আর এখন

Now on the path moving,
The soul is a body,
The house is the soul[১৬]

চৈতন্যের এই বিপ্লব ও বিপর্যয়ের উদাহরণ আমরা বহু সাধুসন্তদের জীবনে দেখে থাকি— অনেকেই বলেছেন— ভগবান তোমার খোঁজে বের হলাম, জগৎ ঘুরে এলাম— শেষে দেখি তুমি চিরকাল রয়েছ কাছে, অন্তরে, আমার আমিত্বের মধ্যে।

তবে হিমেনেথ যতই আধ্যাত্মিক হোন-না কেন, তিনি আধুনিক। আধুনিকের প্রধান ও প্রথম বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধি-প্রতিষ্ঠা অহং— অয়মহং ভোঃ। দ্বিতীয়ত, অহমিকার সঙ্গে বাহ্যজগতেরও কামনা করা প্রতিষ্ঠা করা শাশ্বত প্রয়োজন হিসাবেই। আধুনিকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল আত্মবিরোধ আত্মদ্রোহ আত্মপীড়ন অন্তর্বেদনা মর্মযন্ত্রণা ("angst"—auguish)। হিমেনেথ আধুনিকের তিনটি বৃত্তিকেই অপরূপ রসায়নে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। অহং বোধ তাঁকে আত্মসচেতনতা দিয়েছে কিন্তু দেয় নি আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মসর্বস্বতা। বৈষ্ণবের ভক্ত-প্রেমিকের একান্ত আত্মবিলুপ্তি নাই বটে কিন্তু প্রপত্তিরসার, আত্মসমর্পণ রয়েছে পূর্ণভাবে। জগতকে সৃষ্টিকে অবশ্যপ্রয়োজনীয় অথচ অস্বস্তিকর সঙ্গী হিসাবে, অলঙ্ঘনীয় বিপত্তি হিসাবে স্বীকার গ্রহণ করা নয়, তাকে লাভ করা হয়েছে আপন অন্তরতম অঙ্গ হিসাবেই, তার নিভৃত সত্যকে ধরে। আর শোকের তাপের পারে তিনি চলে গিয়েছেন কারণ তিনি তাঁর প্রাণকে সমর্পিত করতে পেরেছেন; অন্তরের অন্তরে, বাহিরেরও অন্তরে তিনি খোঁজ পেয়েছেন এক প্রেমাস্পদ সুন্দরকে, যিনি তাঁর কাব্যশ্রীর উৎস এবং জীবনবিভূতির অধ্যক্ষ। বুদ্ধির জিজ্ঞাসা ও তর্কবৃত্তি তাঁকে শুষ্কতার দিকে, অপসিদ্ধান্ত বা অসিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায় নি— কারণ তাকে তুলে ধরা হয়েছে অন্তর্হৃদয়ের সাক্ষাৎবোধ বা অনুভূতির মধ্যে— মনের অভিকল্পনের সঙ্গে রয়েছে যে "হৃদিপ্রতীষ্যা"— হৃদয়ের প্রত্যক্ষ বোধ। কবির পক্ষে যতখানি সম্ভব, এইভাবে তাঁর চেতনা আর্ষ চেতনারই সমগোত্র হয়ে উঠেছে।

---

১৬ W. S. Merwin কৃত অনুবাদ

হিমেনেথের কবিতার অনুবাদ

কবি তার আপন সত্তাকে

তুমি প্রতিদিন রাখো সতেজ নবীন সিক্ত শাখা
গোলাপ যদি-বা ধরে ; তুমি চলো সতর্ক সদাই
দিন থেকে দিন, আর ইন্দ্রিয়ের সিংহদ্বারে রাখা
তোমার শ্রবণ, যদি মায়াবী শায়ক আসে, তাই।

চিন্তার লহরী নেই যেখানে জড়ের আত্মশ্লাঘা,
বাহিরভুবন থেকে অপরূপ কোনো রোশনাই
কুড়াতে যেয়ো না তুমি। নিজের নক্ষত্র অনুযায়ী
তোমার তো সারারাত জীবনের ধৈর্যে জেগে থাকা।

বিষয়বস্তুতে রাখো অবিনাশী তোমার স্বাক্ষর,
তার পর তুমি যেই গিরিচূড়ে শেষরশ্মি-সোনা
তোমারি স্বাক্ষর হেরো বিষয়বস্তুতে সুপ্রভাস ;

তোমার গোলাপ সব গোলাপের পরশপাথর,
তোমার শ্রবণ, সুরসংহতির ; তোমার চেতনা
সব আলোকের ; সব নক্ষত্রের— তোমার আকাশ ॥

মন্দ্রস্বর

আমাদের শান্তি ভাঙে শুধু এক ঘণ্টা এক পাখির কূজন,
হয়তো-বা সমস্বর দুই ধ্বনি, উপনীত দিনান্তের ক্ষণ।

স্তব্ধতা অতল স্বর্ণ। রাত্রির প্রপাত ঝরে স্ফটিকনির্মল,
শ্বাসপুঞ্জ চারণের মতো এসে দোলায় নিথর তরুদল,
আর, এসবের দূরে আরো এক স্পষ্টভাষিণী স্রোতস্বিনী
মুক্তার ভিতর থেকে মুক্তা খুলে হয়ে যায় অনন্তবাহিনী।

নিরালায় নিরালায় সব বুঝি স্বচ্ছসচকিত হল ঐ,
আমাদের শান্তি ভাঙে শুধু এক ঘণ্টা এক পাখির মাভৈঃ।

প্রেম বুঝি দূরে থাকে ধ্রুবপদে প্রতিষ্ঠিত, শান্ত, অবিচল,
দয়িতহৃদয় মুক্ত সুখেদুঃখে, দুঃখেসুখে হয় না বিহ্বল,
বর্ণিকা যদিও তাকে সুখী করে, বায়ু, স্পর্শ, সুগন্ধিচন্দন ;
হ্রদ জুড়ে চলে এক মগ্নবোধি হৃদয়ের শান্তিরোমন্থন।

আমাদের শান্তি ভাঙে শুধু এক ঘণ্টা এক পাখির কাকলি,
হাতের পাতায় ধরি পূর্ণের অনন্ত পত্রাবলী ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রসাহিত্য ও বিজ্ঞান

আদিত্য ওহদেদার

রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনায় একটা প্রসঙ্গ আজও তেমনভাবে উত্থাপিত হয় নি। প্রসঙ্গটি হল রবীন্দ্র -মানস ও -সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যকর্ম বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প -প্রভাব পরিবেষ্টিত যুগ দ্বারা বিধৃত, সুতরাং বিজ্ঞানের প্রভাব ও প্রেরণা তাঁর চিন্তা ও কর্মের পিছনে কোনো কাজ করেছে কি না, এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগা স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে আর এক প্রশ্নও জাগে— রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় সাহিত্যের যে মূল্যায়ন করেছেন বিজ্ঞানের যুগে তার সার্থকতা ও উপযোগিতা কতখানি। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা এই দুটি প্রশ্ন নিয়ে কিছু বলব।

প্রথম প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা শুরু করি। বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিমনের যোগ কতখানি ছিল এ সম্পর্কে আমাদের কিছুমাত্র অনুমান করতে হয় না। কবি নিজেই এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে বলে গেছেন। তাঁর পরিণতবয়সে রচিত 'বিশ্ব-পরিচয়' নামক বিজ্ঞানগ্রন্থখানি স্বাক্ষর বহন করছে বিজ্ঞানের প্রতি কবিমানসের ঐকান্তিক অন্তরঙ্গতার। এই গ্রন্থের ভূমিকায় কবি জানিয়েছেন যে, বালককাল থেকেই তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ছেলেবেলায় কবি তাঁর পিতৃদেবের সঙ্গে ড্যালহৌসি পাহাড়ে যান, সেখানে ডাকবাংলার আঙিনায় বসে প্রত্যহ নক্ষত্রলোকের পরিচয় শুনতেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। পিতা যা বলে যেতেন সেদিনের বালক রবীন্দ্রনাথ তাই মনে ক'রে তখনকার কাঁচা হাতে একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কবি জানিয়েছেন, "জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।"

তিনি আরও জানিয়েছেন, "জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলই এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে।" কিন্তু বিজ্ঞানের শুধু এই দুটি বিশেষ বিভাগেই কবির অনুসন্ধিৎসা সীমিত থাকে নি, বিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগেও তাঁর গতিবিধি ছিল। এ সম্পর্কে তাঁর অধীত বিষয়ের একটি তালিকা দিয়েছিলেন কবির অন্তরঙ্গ ও সান্নিধ্যধন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবির জন্মতিথি উপলক্ষে এক রেডিয়ো-কথনে।[১] কবি শেষবয়সেও বিজ্ঞান গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। নিজ মুখেই জানিয়েছেন, "· · এই সব বইই আমার ভালো লাগে— সায়েন্সের বই।· · কী আশ্চর্য রহস্যময় এই জগৎ, আরো আশ্চর্য তার এতটুকু এতটুকু উদ্ঘাটন। কে মনে করতে পারে, এই যে হাতখানা এ খালি নৃত্যশীল অণুপরমাণুর সমষ্টি। এই সব বই আমার আরো ভালো লাগে এজন্য যে মনকে একটা ইম্পার্সনাল অস্তিত্বে, একটা মুক্তির মধ্যে নিয়ে যেতে খুব সাহায্য করে। তুমি আমি কিছু নয়, শুধু আছে নিয়ম আর সংখ্যা।"[২]

বিজ্ঞানচর্চাকে কবি কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত অনুশীলনে নিবদ্ধ রাখেন নি ; দেশে বিজ্ঞানচর্চা যাতে প্রসার লাভ করে সেদিকে তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন জীবনের প্রথম দিক থেকেই। কবির জীবনীকার

---

১ প্রবাসী ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ২৮৪

২ মৈত্রেয়ী দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, ১৯৪৩

জানিয়েছেন যে, বৌঠাকুরানীর হাট-এর যুগে কবি অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে পড়তেন বিজ্ঞানের গ্রন্থ। সদর স্ট্রীটের বাসায় থাকবার সময় হাকস্‌লি, লক্‌ইয়ার, নিউকোম্ব প্রভৃতি তৎকালীন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের গ্রন্থ পড়েন। ইংরেজিতে যা পড়েন তা বাংলায় লিখতে চান ; কিন্তু পরিভাষা অভাবে বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার করে বলতে বাধা পান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করেন— উভয়েই বোঝেন যে কোনো এক ব্যক্তির দ্বারা বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠন করা সম্ভব নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অমনি এক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব বিস্তৃতভাবে ভারতীতে প্রকাশ করেন।[৩] এই প্রস্তাবিত সভার নাম দেওয়া হয় 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন'। সভাপতি হন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র।[৪] অবশ্য এ প্রতিষ্ঠান বেশিদিন স্থায়ী হয় নি।

তার পর তের শ পাঁচ সালে কবি 'প্রসঙ্গকথা' শীর্ষক নিবন্ধে আমাদের দেশের বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের কাজ ইংরেজি মাধ্যমে নিষ্পন্ন করার ফলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারলাভ ঘটছে না, কবি এই মন্তব্য করেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞানচর্চার উপকারিতা কি, তার উল্লেখ করেন—"বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসাবৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণশক্তির সূক্ষ্মতা, এবং চিন্তনক্রিয়ার যাথাতথ্য জন্মে এবং সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধ সংস্কার সূর্যোদয়ের কুয়াসার মতো দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়।" দেশে বিজ্ঞানচর্চা কী ভাবে প্রসারিত করা যায় তার নির্দেশও দিয়েছিলেন—"বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে-উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়।· · বাংলায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার, সাময়িক পত্র প্রকাশ, স্থানে স্থানে যথানিয়মে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।"

বিজ্ঞানের প্রতি এই অনুরাগের জন্যেই আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে কবির অমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম লেখেন রবীন্দ্রনাথই। জড়ের মধ্যেও সজীব পদার্থের লক্ষণ বর্তমান, জগদীশচন্দ্রের এই গবেষণায় কবি উল্লসিত হয়ে "জড় কি সজীব?" প্রবন্ধটি লেখেন।[৫] কবি হয়ে রবীন্দ্রনাথ এই দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয় আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা করে লেখেন ; এই প্রবন্ধ পড়ে জগদীশচন্দ্র খুবই বিস্মিত হন। এখানে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার-তত্ত্বটি কবি আপন অনুভূতিবশে কয়েক বৎসর পূর্বেই উদ্ঘাটিত করেছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে লিখিত এক অপ্রকাশিত পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন, "· · যাকে আমরা অন্যায়পূর্বক জড় বলে থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে, নইলে কখনই নির্জীবের প্রতি জীবের, জড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য ভালোবাসার বন্ধন থাকতেই পারে না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোনো জাতিভেদ নেই, সেইজন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি, নইলে আমাদের উভয়ের জন্য দুই ভিন্ন জগত সৃজিত হয়ে উঠত।"[৬] তাঁর এই কথাই এবার তিনি প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন বিজ্ঞানের ভাষায়। জগদীশ-প্রশস্তি প্রসঙ্গে তিনি জানালেন,

৩ ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ।

৪ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৭-৮।

৫ বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ শ্রাবণ।

৬ কাব্যগ্রন্থ, মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা।

"আমাদের দেশে দর্শন যে পথে গিয়েছিল য়ুরোপে বিজ্ঞান সেই পথে চলিতেছে। তাহা ঐক্যের পথ। বিজ্ঞান এ পর্যন্ত এই ঐক্যের পথে গুরুতর যে কয়েকটি বাধা পাইয়াছে, তাহার মধ্যে জড় ও জীবের প্রভেদ একটি। অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় হাক্স্‌লি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রভেদ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। জীবতত্ত্ব এই প্রভেদের দোহাই দিয়া পদার্থতত্ত্ব হইতে বহুদূরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন।"[৭]

বিজ্ঞানের প্রতি কবির মন সংবেদনশীল ছিল বলেই বিজ্ঞানকে আমাদের দেশের শিক্ষার অন্তর্গত করতে আগ্রহশীল হন। কিছুকাল পরে এক বিখ্যাত ইংরেজি প্রবন্ধে তিনি লেখেন, আধুনিক বিজ্ঞান হল ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ দান মানবসমাজের প্রতি সর্বকালের জন্য। আমাদের উচিত এ দান কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করা, যাতে করে আমরা পিছিয়ে না পড়ে থাকি এবং নিষ্ফলতার অভিশাপে না পতিত হই। এই গ্রহণ করার কাজে দেরি করলে আমরা বর্তমান যুগ থেকে কোনো ফসল কাটতে পারব না।[৮] এ কথা বলার পনর বছর পরেও দেশে বিজ্ঞানচর্চার আশানুরূপ উন্নতি না দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, "বিজ্ঞান-চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"[৯]

নিজের বিজ্ঞানচর্চার সম্বন্ধে কবি বলেছেন যে, বিজ্ঞানের বিষয় ক্রমাগত পড়তে পড়তে তাঁর মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল যার ফলে অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা তাঁকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে রক্ষা করেছিল। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে কোনো লোকসান ঘটিয়েছিল বলে তিনি অনুভব করেন নি।[১০] বিজ্ঞানের মহলে ঘুরলে সাহিত্যকর্মের কোনো ক্ষতি হয় এ কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নি; বরং বিজ্ঞানের কাছ থেকে অনুকূল প্রেরণা পাওয়া যাবে, এই ধারণাই তাঁর ছিল।—"বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে।"[১১] সে পথ যে সত্যি আছে তা কবির কাব্যই প্রমাণ করে।

কবি লিখেছেন, "বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না।"[১২] এই লোভ গভীরভাবে ফলপ্রসূ হল সোনার তরী যুগে। ডারউইনের জীবতত্ত্ব রসসিঞ্চিত হয়ে কবিমানস অধিকার করে। তারই বশে কবি লিখলেন সমুদ্রের উদ্দেশে—

> আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
> শুনিতেছি ধ্বনি তব।...

---

৭ জড় কি সজীব?— বঙ্গদর্শন ১৩০৮ শ্রাবণ।

৮ ". . . modern Science is Europe's great gift to humanity for all time to come. We, in India; must claim it from her hands, and gratefully accept it in order to be saved from the curse of futility by lagging behind. We shall fail to reap the harvest of the present age if we delay."— Creative Unity, 1922, p. 193.

৯ বিশ্বপরিচয়, ১৩৪৪, পৃ, ৷৶০

১০ ঐ, পৃ, ।৵০

১১ ঐ,

১২ ঐ, পৃ, ৶০

মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী'-পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের— অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

— সমুদ্রের প্রতি

জীবতত্ত্ব, বিশেষ করে ডারউইনের মতবাদ প্রচারিত হবার পর পাশ্চাত্য জগতে মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন হয়। ইতিপূর্বে ধর্মের অনুশাসনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে মানুষ স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু, এই পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার কোনো নাড়ীর যোগ নেই। কিন্তু জীবতত্ত্ব এই নাড়ীর যোগ আবিষ্কার করাতে মানুষের মনে নিজের সত্তা সম্বন্ধে যে গরিমা-বোধ ছিল তাতে আঘাত লাগল। এই আঘাতের বেদনা সাহিত্যে একদা কী ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে কথা ইংরেজি সাহিত্য -পাঠকের কাছে অবিদিত নেই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সারা চিত্তকে বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার আনন্দে উদ্বেলিত করে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঐকাত্ম্যের কথা তাই তিনি বারে বারে এত করে বলেছেন। সোনার তরীতে বসুন্ধরাকে সম্বোধন করে আবেগভরে জানিয়েছেন—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু।· ·
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লবনিলয়ে
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার করে
সমস্ত ভুবন।

—বসুন্ধরা

অন্যত্র বলেছেন—

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে।

—প্রবাসী (উৎসর্গ)

জীবতত্ত্বের সঙ্গে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের আর একটা বিভাগ, তা হল মনস্তত্ত্ব। এ দুই বিদ্যা অতীতকে নূতন চোখে দেখেছে। অতীত ঘটনা ও বস্তু বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়েছে এমন মনে হলেও, সেটা সত্যি নয়— অতীতের প্রভাব অদৃশ্যভাবে বর্তমানের মধ্যে কাজ করে চলে। বংশগতি (heredity)-তত্ত্ব এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত করেছে। এই তত্ত্বটি রসঘন হয়ে কবির ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে—

স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও।
তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ ক'রে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে স্থির হয়ে তুমি রও।· ·

তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই।
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে রও।

বিজ্ঞানের যেসব তত্ত্ব জন্মবৃত্তান্তকে ব্যাখ্যা করেছে, সেগুলি কাব্যরূপ পেয়েছে কবির 'জন্মকথা' কবিতায়—

খোকা মাকে শুধায় ডেকে, "এলেম আমি কোথা থেকে,
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।"
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে খোকারে তার বুকে বেঁধে—
"ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।
আমার চিরকালের আশায়, আমার সকল ভালোবাসায়,
আমার মায়ের দিদিমায়ের পরানে,
পুরানো এই মোদের ঘরে গৃহদেবীর কোলের 'পরে
কতকাল যে লুকিয়ে ছিলি কে জানে।

যৌবনেতে যখন হিয়া উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।

আর কবির জীবনদেবতার আইডিয়া কতখানি জীবতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব তা অজিতকুমার চক্রবর্তী বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।[১৩] এখানে সে-কথার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

কবি বলেছেন জীববিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানের আর একটি বিভাগও তিনি আজীবন নাড়াচাড়া করেছেন—তা হল জ্যোতির্বিদ্যা। এই পরিচয় থাকার দরুনই তিনি এমন লিখতে পেরেছেন—

ঐ নির্মল নিঃশব্দ আকাশে
অসংখ্য কল্প-কল্পান্তরের
হয়েছে আবর্তন।
নূতন নূতন বিশ্ব
অন্ধকারের নাড়ী ছিঁড়ে
জন্ম নিয়েছে আলোকে,
ভেসে চলেছে আলোড়িত নক্ষত্রের ফেনপুঞ্জ;
অবশেষে যুগান্তে তারা তেমনি করেই গেছে
যেমন গেছে বর্ষণক্ষান্ত মেঘ,
যেমন গেছে ক্ষণজীবী পতঙ্গ। —শেষ সপ্তক : সাত সংখ্যক কবিতা

সোনার তরীর পর্বে কবি যেমন সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলিকে কল্পনাশ্রিত করেছিলেন, বলাকা পর্বে তেমনি পদার্থবিদ্যার নবাবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি, যথা পরমাণুবাদ ও গতিবাদকে, ভাবগম্ভীর কাব্যের উৎস করলেন। বলাকার 'চঞ্চলা' কবিতায় পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে বিজ্ঞানের এই নূতন তত্ত্বের মর্মকথা—

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্বুদের মতো।...

---

১৩ কাব্য-পরিক্রমা, জীবনদেবতা পরিচ্ছেদ।

যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছি্রয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।

বস্তু সম্বন্ধে বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্বটিই হল এই— বিরাম বলে কিছু নেই, আমাদের কঠিন ধরণীর প্রতিটি কণা অবিশ্রান্ত গতি-সমন্বিত।[১৪]

বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বগুলি ছাড়াও তার যেসব তত্ত্ব ও সৃষ্টবস্তু আমাদের কাছে অতি পরিচিত, তাদের অনেকে কিছু রসস্নিগ্ধ হয়ে কবির কাব্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। যেমন, নবজাতকের 'জবাবদিহি' কবিতায় রয়েছে বর্ণতত্ত্ব, যার ব্যাখ্যায় কালো রঙ সব রঙের শোষণে সৃষ্টি হয়।—

সকালবেলা বেড়াই খুঁজি খুঁজি
কোথা সে মোর গেল রঙের ডালা,
কালো এসে আজ লাগাল বুঝি
শেষপ্রহরে র-হরণের পালা।
ওরে কবি, ভয় কিছু নেই তোর
কালো রং যে সকল রঙের চোর।

'রাতের গাড়ি'-কবিতার ভাববস্তুকে প্রস্ফুট করেছে রেলগাড়ির চিত্রকল্প—

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি—
কামরায় গাড়িভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিমানসের এই সহযোগিতা দ্বারা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে গেছেন সাহিত্যকর্ম বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা কতখানি পুষ্ট হতে পারে।[১৫] প্রত্যেক কবিই আপন মানস-বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিজ্ঞানের

১৪ "... there is no such thing as nest. Every particle that goes to make up our solid earth is a state of perpetual unremitting vibration."

—The Outline of Science, ed. by J. A. Thomson, 1922, p. 267.

১৫ এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে কবি বিশ্বপরিচয় লেখেন ১৩৪৪ সালে, এবং ১৩৪৬-৪৭ সালের মধ্যে লিখিত তিনসঙ্গীর গল্পগুলির প্রধান ব্যক্তিদের সকলকেই বৈজ্ঞানিক অথবা বিজ্ঞানমনা করেছেন।

বিশেষ বিশেষ বিভাগ থেকে রসগ্রহণ করতে পারেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে আজীবন আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন ও তার চর্চা করেছিলেন, তার কারণ বোধ হয় এই যে, এ দুটি বিষয়ের মধ্যে কবির বিশিষ্ট মানসপ্রকৃতি সমৃদ্ধতর হতে সুযোগ পেয়েছিল। তাঁর ভূমাবোধ, প্রকৃতিপ্রেম, বিশ্বমৈত্রীর অনুভূতি বিজ্ঞানের এই দুই বিভাগ-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলির মধ্যে অনুকূল আশ্রয় পেয়েছিল।

বিজ্ঞানের যে মহলে শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা সেখানে গভীর কৌতূহল নিয়ে ঘোরাফেরা করতে প্রচুর আনন্দ পেয়েছেন কবি। সে মহলে তিনি দেখেছেন নব নব রহস্যের দিকে গবাক্ষ উন্মুক্ত হতে। সে-গবাক্ষের ধারে দাঁড়াতে কবির আগ্রহের অন্ত ছিল না, কারণ সেখানে দাঁড়িয়ে রহস্যের গভীরে দৃষ্টি সঞ্চালন করার সুযোগলাভ করেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের আর-একটা মহল আছে যেখানে তার অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটছে ব্যবহার-শিল্পে। সেখানে যন্ত্রের ভিড়— বিপুল যন্ত্রশক্তি দানবের রূপ নিয়ে মহলটার সবটা জুড়ে আছে। এ মহলটা কবি পছন্দ করেন নি। এর প্রতি তাঁর মনের বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটকে। প্রকৃতির সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে যন্ত্র যে বিরোধ সৃষ্টি করেছে তাতে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে কবি এ-দুটি নাটকের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। এই বিরূপতাই সাহিত্যের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে অতি স্পষ্ট হয়েছে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে। পশ্চিমের বিজ্ঞানসাধনাকে স্বাগত জানিয়েও কবি তার যন্ত্র-উপাসনার নিন্দা করেছেন। কারণ, "যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো করে তুলে পশ্চিম-সমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে। কেননা, স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান করে তুললে, অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায় সেই সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে।"

২

বিজ্ঞানের যুগে সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বারে বারে আত্মজিজ্ঞাসা করতে হয়েছে, বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের পার্থক্য কি? এবং বিজ্ঞান যেখানে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একচ্ছত্র বাহন হয়ে পড়েছে, সেখানে সাহিত্যকর্মের কোনো প্রয়োজন আছে কি? এককথায় প্রশ্নটা দাঁড়ায়, বিজ্ঞানের যুগে সাহিত্য-কর্মের ভিতর দিয়ে সাহিত্যিকগণ কোন্ দায়িত্ব পালন করতে পারেন? এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক রচনাগুলিতে দিতে চেষ্টা করেছেন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বহুপূর্বেই পাশ্চাত্যের সাহিত্যসেবীগণের মন এ প্রশ্নে উদ্বেজিত হয়েছে। কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও প্রতিপত্তি সেখানেই ঘটেছে, এবং তার প্রভাব তাঁদেরকে অনুভব করতে হয়েছে বহুপূর্বে। ইংরেজি সাহিত্যে তাই দেখি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ থেকেই নানা জন নানা ভাবে সাহিত্যকর্মের দায়িত্ব সম্বন্ধে অভিমত ঘোষিত করেছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ জানালেন, কবিকর্ম আপন সৃষ্ট আদর্শের দ্বারা মানুষের অবস্থা উন্নত করতে পারে, এবং জগতকে ঢেলে সাজাতে পারে।[১৬] শেলী ঘোষণা করলেন,

১৬ In framing models to improve the scheme
Of Man's existence, and recast the world.
—Excursion, III, 335-7.

কবিরাই জগতের অস্বীকৃত বিধায়ক।[১৭] আর একজন কবি গাইলেন, আমরা যারা গান গাই, স্বপ্ন দেখি, নির্জনে ঘুরে বেড়াই, আমরাই জগতকে নাড়াই দোলাই।[১৮]

কিন্তু এ সব কথায় যতটা জোর আছে ততটা যুক্তি নেই। আজ সমগ্র মনুষ্যসমাজ নিজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে বিজ্ঞানেরই মুখাপেক্ষী, কারণ বিজ্ঞানই তাকে সম্পদ-আহরণ ও আনন্দ-সম্ভোগের সকল ক্ষমতা দিতে পারে, সে দেখছে। এ অবস্থায় সাহিত্যসেবীগণ যদি জোর গলায় বলেন, "আমরাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষক, নিয়ন্ত্রক ও ত্রাণকর্তা", তা হলে তা শুধু অক্ষমের অহমিকা-প্রকাশই হয়ে দাঁড়ায়। এবং সেই কারণে কথাগুলি বরং কিছু হাস্যাস্পদও ঠেকে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ঘাড়ে এ জাতীয় দায়িত্ব চাপান নি। তাঁর কাছে কবিকর্মের ফলশ্রুতি হল—

না পারে বুঝতে, আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে—
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমন সুর।
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা
বিদায়ের আগে দুচারিটি কথা
রেখে যাব সুমধুর। —পুরস্কার (সোনার তরী)

স্পষ্টই দেখছি এখানে বিশ্বকে চালনা করা বা তাকে বিধান দেবার দাবি নেই। নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে মানুষ আকূতিভরে যে ভাষা খুঁজতে চায়, কবি সেই ভাষা কিছু যোগাতে পারবে— এই হল কবির কাজ।

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে মানবহৃদয়ের প্রকাশ রূপে দেখেছেন। তাঁর মতে সাহিত্যে থাকে মানুষের হৃদয়ের আবিষ্কারচিহ্ন।— "বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর-একটা-জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে— তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত— তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগতকে বিশেষ রূপে আপনার করিয়া লই।"[১৯]

---

১৭ Poets are the unacknowledged legislators of the world.

১৮ We are the music-makers,
And we are the dreamers of dreams,
Wandering by lone sea-breakers,
And sitting by desolate streams;
World-losers and world-forsakers,
On whom the pale moon gleams;
Yet we are the movers and shakers
Of the world for ever, it seems.
—A. W. E. O'Shaugnessy.

১৯ সাহিত্য, ১৩৬২ সং, পৃ. ১

জগৎকে এইভাবে জানাটাও একটা সত্য। এই সত্যের প্রকাশ হল সাহিত্য।— "সত্যকে যখন শুধু আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই, তখন নয়, কিন্তু যখন তাহাকে হৃদয় দিয়া পাই তখনই তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি।"[২০]

মানুষের জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগটা হল এই— "সত্যকে যেখানে মানুষ নিবিড়রূপে অর্থাৎ আনন্দরূপে অমৃতরূপে উপলব্ধি করিয়াছে সেইখানেই আপনার একটা চিহ্ন কাটিয়াছে। সেই চিহ্নই কোথাও বা মূর্তি, কোথাও বা মন্দির, কোথাও বা তীর্থ, কোথাও বা রাজধানী। সাহিত্যও এই চিহ্ন। বিশ্বজগতের যে-কোনো ঘাটেই মানুষের হৃদয় আসিয়া ঠেকিতেছে সেইখানেই সে ভাষা দিয়া একটা স্থায়ী তীর্থ বাঁধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে— এমনি করিয়া বিশ্বতটের সকল স্থানকেই সে মানবযাত্রীর হৃদয়ের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য উত্তরণযোগ্য করিয়া তুলিতেছে।· · জগতে সর্বত্রই মানুষ সাহিত্যের দ্বারা হৃদয়ের এই চিহ্নগুলি যদি না কাটিত তবে জগৎ আমাদের কাছে আজ কত সংকীর্ণ হইয়া থাকিত তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। আজ এই চোখে-দেখা কানে-শোনা জগৎ যে বহুলপরিমাণে আমাদের হৃদয়ের জগৎ হইয়া উঠিয়াছে ইহার প্রধান কারণ, মানুষের সাহিত্য হৃদয়ের আবিষ্কার-চিহ্নে জগৎকে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। সত্য যে পদার্থপুঞ্জের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সত্য যে কার্যকারণপরম্পরা, সে কথা জানাইবার অন্য শাস্ত্র আছে— কিন্তু, সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত।"[২১]

সাহিত্যকর্মের এই অনন্য বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল বলেই বিজ্ঞানের সঙ্গে মোকাবিলায় সাহিত্যের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছিল।— "মন দিয়ে এই জগৎটাকে কেবলই আমরা জানছি। সেই জানা দুই জাতের। জ্ঞানে জানি বিষয়কে এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে আর জ্ঞেয় তার লক্ষ্যরূপে সামনে। ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্য রূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।

"বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়।"[২২] তাই কবিরা যার পরে জোর করে ভর দিয়ে আছেন, অর্থাৎ তাঁদের অবলম্বন, তা হল অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ।[২৩]

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও ক্ষমতাপ্রাবল্য কোনদিক দিয়ে সাহিত্যের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে সেটা কবির কাছে ধরা পড়েছিল। একদা য়ুরোপে শাস্ত্রশাসন যা করেছিল আজ বিজ্ঞান তাই করতে উদ্যত। কবি বলেছেন, "মধ্যযুগে এক সময়ে য়ুরোপে শাস্ত্রশাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেছে। সূর্যের চারি দিকে পৃথিবী ঘোরে, এ কথা বলতে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল— ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য— তার সিংহাসন ধর্মের রাজত্বসীমার বাইরে। আজকের দিনে তার বিপরীত হল। বিজ্ঞান প্রবল হয়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মানতে চায় না। তার প্রভাব মানবমনের সকল বিভাগেই আপন পেয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তকমা পরে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না।"[২৪]

---

২০ সাহিত্য, ১৩৫২ সং, পৃ. ৫৩

২১ সাহিত্য, ১৩৫২ সং, পৃ. ৫৩-৫৪

২২ সাহিত্যের পথে, ১৩৫৬ সং, পৃ. ৭

২৩ সাহিত্যের পথে, ১৩৫৬ সং, পৃ. ২৪

২৪ সাহিত্যের পথে, ১৩৫৬ সং, পৃ. ৮২-৩

অনধিকারপ্রবেশ ঘটে তখনই যখন একের ধর্ম অন্যের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা চলে। বিজ্ঞানের ধর্ম ও সাহিত্যের ধর্ম আলাদা। সাহিত্য যদি বিজ্ঞানের শক্তিদর্শনে অভিভূত হয়ে বিজ্ঞানের ধর্ম গ্রহণ করতে চায় তা হলে সাহিত্য স্বধর্মভ্রষ্ট হবে, সাহিত্যকর্ম আপন বৈশিষ্ট্য হারাবে এবং সাহিত্যসেবীগণ নিজের মর্যাদা হারিয়ে বৃথা অভিমান ও ক্ষোভ দম্ভ প্রকাশ করবেন। বিজ্ঞানের ধর্ম ও সাহিত্যের ধর্মের পার্থক্যটা কবি স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন।— "বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তিস্বভাববর্জিত; তার ধর্মই হচ্ছে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরছে। অথচ সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্ছে তার পক্ষপাত ধর্ম; সাহিত্যের বাণী স্বয়ংবরা। বিজ্ঞানের নির্বিচার কৌতূহল সাহিত্যের সেই বরণ করে নেবার স্বভাবকে পরাস্ত করতে উদ্যত।"[২৫]

এই পরাজয় থেকে সাহিত্যকর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব সাহিত্যিকেরই। তিনি যেন এ কথা কখনই না ভুলে যান যে "যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞানির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্তভাবে বোধ করা যায়, তারই প্রকাশ সাহিত্যকলায়, রসকলায়।"[২৬] সত্যরূপী রাজকন্যাকে রাজপুত্র খোঁজেন জ্ঞানের জন্য না, ধনের জন্য না; রাজকন্যার জন্যই— "তুমি যে তুমিই, এই আমার যথেষ্ট," এই কথা তার কানে কানে বলবার জন্য। এই চাওয়া এই আকাজ্ক্ষা হল বিষয় সম্বন্ধে মূর্ত ধারণা, দার্শনিক হোয়াইট্‌হেড্ যাকে বলেছেন, "concrete appreciation of individual facts"। সাহিত্যই এই জিনিস পারে, বিজ্ঞান পারে না।

বিজ্ঞানের যুগে সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ মনীষী সম্প্রতি বলেছেন যে, সৃজনধর্মী লেখকদের স্থান সম্পর্কে নূতনভাবে সংজ্ঞানির্ণয় করা উচিত। সাহিত্যসৃষ্টি যাঁরা করেন তাঁদের ভূমিকা সংস্কারক বা ত্রাণকর্তার নয়, তাঁদের কাজ হল হৃদয়ের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মূল্য রূপায়িত করা।[২৭] এই কথাই যে রবীন্দ্রনাথ বারে বারে অনেক রকম করে বলে গেছেন তা উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি থেকেই বোঝা যায়।

এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, বিজ্ঞান নানা ভাবে আমাদের হিতসাধন করছে। কিন্তু বিজ্ঞানের হিতসাধন-ক্ষমতার মধ্যে যে ফাঁক আছে সেটা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিয়েছেন।— "বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল; অমনি মানুষের সত্যের সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেছে, তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল তো ভালোই নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহাদুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হু হু করে এগুল, এক করবার আন্তরশক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল।"[২৮]

---

২৫ সাহিত্যের পথে, পৃ. ৮৩

২৬ সাহিত্যের পথে, ১৩৫৬ সং, পৃ. ৭৫

২৭ "The place of the creative writer, therefore, needs redefinition. He will not reform the world, nor save it, but he can interpret whatever is valuable within human experience, extending beyond the range of the observed to all that imagination can achieve."

—Evans. B. Ifor. Literature and Science, 1954, p. 96.

২৮ শিক্ষার মিলন।

এই এক করবার আন্তরশক্তি বলবৎ করতে পারে সাহিত্য। কারণ, কবি বলেছেন, "তার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।"[২৮] সাহিত্যের এই ধর্ম, এই ক্ষমতার জন্য বিজ্ঞানের সকল আধিপত্যের মধ্যেও সাহিত্য নিজের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা উজ্জ্বল রাখতে পারে। এ কথার যাথার্থ্য নিজের আজীবন সাহিত্যকর্ম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে দেখিয়ে গেছেন।

য়োরুবা দেশে ॥ ইফে : পূর্বানুবৃত্তি
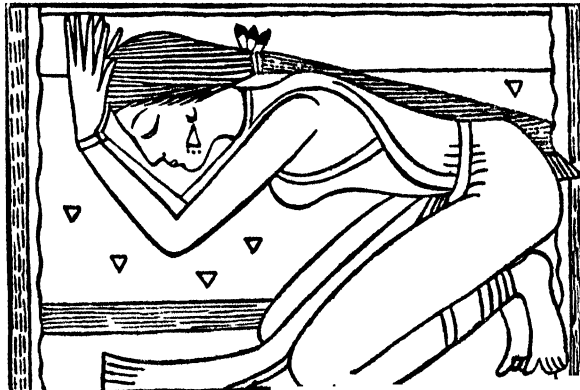
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

চেলারামদের আপিসেই যথাপূর্ব অতিথি হবার কথা ছিল। ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ঝমটমল দয়ারাম আসোয়ানী খুব আগ্রহের সঙ্গে আমায় স্বাগত ক'রলেন। আগেই ব'লেছি ওঁদের দোকান ইবাদান শহরের সবচেয়ে বড়ো রাস্তার উপরে। চেলারামদের দোকান, গুদাম এবং আপিস সব একই বাড়িতে। ওঁদের গাড়ি ক'রে ফিরে এসে দেখলুম, দোকানের সামনের সমস্ত দরজা বন্ধ, আর তার সামনে অগণতি মেয়ের ভিড়। অধিকাংশই পিঠে একটি ক'রে শিশু বেঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকে ওরা পিছনের দরজা দিয়ে উপরে যেখানে দোকানের সিন্ধী কর্মচারীরা থাকে, সেই দোতলায় ওদের বাসগৃহে নিয়ে গেল। এইখানে তখন মধ্যাহ্নভোজন আরম্ভ হবে, আমাকেও যত্ন করে খাওয়ালেন। ওদের ওখানেই এক রাত্রি কাটিয়ে' তার পরের দিন লেগসে ফিরে যাবো। দোকানের বাইরে এত মেয়ের ভিড় কেন জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, এইসব মেয়ে হ'চ্ছে মাদ্রাজি হাতে-বোনা কাপড়ের খরিদ্দার। কদিন পরেই মুসলমান পর্বদিন বকর-ঈদ আসছে, ইবাদান শহরে মুসলমানের সংখ্যা যথেষ্ট, শতকরা পঁচিশ-ত্রিশ কি তারও বেশি হ'তে পারে, বকর-ঈদ উপলক্ষে কোরবানির জন্য শহরের মধ্যে খোলা জায়গায় উত্তর থেকে আমদানি ভেড়া বিক্রি হচ্ছে, আর বকর-ঈদের দিন মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মের লোকেরাও নোতুন কাপড়চোপড় প'রবে, সেইজন্যে কাপড়ের দোকানেও ভিড়। শ্রীযুক্ত ঝমটমল আমাকে ব'ললেন যে এবার বকর-ঈদের ঠিক মাথায় মাথায় ভারতবর্ষ থেকে অনেক গাঁট মেয়েদের মাথায় রুমালের আকারে জড়াবার জন্য তাঁতে-বোনা নানা রঙে রঙিন কাপড় এসেছে। এইসব-মেয়েরা কেউ গ্রাহক কেউ পাইকিরি দরে এই আট-গজি থান কিনে নিয়ে যাবে, তার পরে বড়ো পসারী আর ছোটো পসারী মেয়ে-দোকানীদের হাতে মাথার রুমাল, দু'গজি ক'রে কাটা, বিক্রি হবে। ঈদের দিন মেয়েদের মধ্যে সকলেরই এইরকম একখানি নোতুন রুমাল জড়ানো চাই। য়োরুবা মেয়েরা যা-তা নকশায় খুশি হয় না। ভারতবর্ষ থেকে ওদের পছন্দমত নানা রঙের সমাবেশে তৈরি (নীলটাই এর মধ্যে বেশি) নোতুন রুমালের আমদানি যখন হয়, তখন এদের মধ্যে একটা কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। দোকানের ভিতরে এঁরা সমস্ত কাপড় গাঁট খুলে সাজিয়ে' রেখে দেন, আর দোকান খুললেই মেয়ে খ'দ্দেরের দল হুড়মুড় ক'রে ঢুকে দোকান ছেয়ে ফেলে, আর এইসব কাপড় আগ্রহের সঙ্গে টেনে নিয়ে রুচিমত বাছতে আরম্ভ করে। এদের উদ্দেশ্য, কে কত বেশি রকম নোতুন নোতুন ডিজাইন আগে থাকতেই সংগ্রহ ক'রে কিনে রাখতে পারে। অবশ্য চেলারামদের মাল আসে প্রচুর, তবে দেখা গেল, এই মাথায় রুমালের ব্যাপারে মেয়েদের মধ্যে ফ্যাশান-বোধ যথেষ্ট আছে। বেলা দুটোর সময় এঁরা দোকান খুলবেন, খরিদ্দারের আগ্রহকে সামলাবার জন্যে এঁদের সিন্ধী কর্মচারী আর আফ্রিকান চাকরেরা তৈরি হ'য়ে দাঁড়াল, আমাকেও শ্রীযুক্ত ঝমটমল নীচে ডেকে নিলেন এই দৃশ্য দেখবার জন্যে। যেমনি দরজা খুলে দেওয়া হ'ল, তেমনি এই মেয়ের দল একেবারে হুড়মুড় ক'রে দোকানের ভিতর ঢুকে প'ড়ল, আর যেখানে গাঁট-খোলা নোতুন কাপড় থরে থরে সাজানো আছে সেই দিকে ছুটল। পছন্দসই নকশার কাপড়ের কাজের জন্য টানাটানি কাড়াকাড়ি চ'লল। আগেই বলেছি, এদেশে মেয়েরাই হাট-বাজারে বিকি-কিনি করে, এরা সকলেই গৃহস্থ-ঘরের ঝী-

বউ, কচি ছেলে পিঠে বেঁধে এসেছে, যেমন এদেশের রেওয়াজ। একটা জিনিস দেখলুম, এরা কিন্তু বেশ discipline বা নিয়ম মেনে চলে। আপসে কলরব আছে, কিন্তু ঝগড়া নেই ; আর কাপড়চোপড় টানাটানি ক'রলেও বেছে নেবার পর সব গুছিয়ে রাখে। পিঠে বাঁধা শিশুরাও যেন কাঁদতে জানে না। এইভাবে এদের মধ্যে সকলেই নিজের পছন্দ-মতন আট-দশ থেকে দু-একখানা পর্য্যন্ত থান সংগ্রহ ক'রে এনে, টাকা দেবার টেবিলে টাকা দিয়ে রসিদ নিয়ে যে-যার যথাস্থানে চ'লে যেতে লাগ্‌ল। প্রায় একঘণ্টা ধ'রে এই কাপড় নিয়ে হৈ চৈ চ'লল। তার পরে ধীরে-সুস্থে বিক্রি চ'লতে লাগ্‌ল। চেলারামেরা আবার স্থানীয় আফ্রিকান রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নোতুন নোতুন নকশা করান। তাতে ওদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লাঞ্ছন বা রঙ বা বাণী থাকে, এগুলিরও বেশ চাহিদা হয়।

ইতিমধ্যে নাইজিরিয়া গভর্মেণ্টের প্রচার-বিভাগ থেকে খানদুই বই আমায় দিয়ে গেল।

চারটের সময় শ্রীযুক্ত ঝমটমল আর তাঁর সহকারীদের সঙ্গে ওঁদের দোকানেই চা-পান হ'ল। বেলা পাঁচটায় ছিল, নাইজিরিয়ার বিখ্যাত শিল্পী ভাস্কর Ben Enwonwu বেন্ এন্‌ৱোন্‌ৱু সঙ্গে দেখা করবার কথা। তাঁকে চেলারামদের দোকানে নিয়ে এল' Akenabor আকেনাবোর ব'লে যে ফোটোগ্রাফারটি আমার সঙ্গে ইফে গিয়েছিল সে। চেলারামদের বৈঠকখানা ঘরে ব'সে এন্‌ৱোন্‌ৱুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে আমার কথা হ'ল। এন্‌ৱোন্‌ৱুর কাজের সঙ্গে আমি ছবির মারফত আগে থেকেই কিছু পরিচিত ছিলুম। এঁর বাড়ি হ'চ্ছে Onitsha ওনিচা শহরে— জাতিতে Edo এদো, অর্থাৎ বেনিন নগরে যে জাতি বাস করে সেই জাতের মানুষ ইনি, য়োরুবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত তবে য়োরুবা জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়। এদের ভাষাও একটু আলাদা। এন্‌ৱোন্‌ৱু ছেলেবেলা থেকেই নিজের জাতির মধ্যে যে শিল্পশক্তি আছে তার প্রকাশ নিজের হাতের কাজে দেখাতে সমর্থ হন। প্রাচীন আফ্রিকান ধরনের মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে নোতুন চালের মূর্তিও তিনি তৈরি ক'রতে থাকেন। এঁর মূর্তিশিল্প বেশির ভাগই কাঠের, এই হিসেবে ইনি প্রাচীন আফ্রিকার শিল্পধারা বজায় রেখেছেন। কতকগুলো য়ুরোপীয় শিল্পরসিকের কাছে এন্‌ৱোন্‌ৱুর প্রতিভা আবিষ্কৃত হয় আর তাঁদের কাছ থেকে ইনি খুবই উৎসাহ পান। আফ্রিকার শিল্প সম্বন্ধে— বিশেষ ক'রে আধুনিক শিল্প সম্বন্ধে— এন্‌ৱোন্‌ৱুর কৃতিত্বের কথা আর তাঁর হাতের কাজ মূর্তির ছবি এখন দেখা যাচ্ছে। দেশে তাঁর নাম হবার পরে য়ুরোপে নানা জায়গায় শিল্পরসিক মহলে আহ্বান আসে, আর এন্‌ৱোন্‌ৱুর হাতের কাজের প্রদর্শনী ইউরোপে কয়েক স্থানে হয়। যারা প্রাচীন আফ্রিকার মূর্তিশিল্পের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সচেতন, তাঁরা একজন আধুনিক আফ্রিকান যুবকের হাতে আবার সেই মূর্তিশিল্পের পুনরুজ্জীবন হ'তে পারে এই আশা ক'রে পুলকিত হন। এন্‌ৱোন্‌ৱুর বয়স এখন বছর পঁয়ত্রিশ হবে, চেহারা লম্বা-চওড়া নয়, বরং একটু ক্ষীণকায় মনে হ'ল, একটু দাঁড়িগোফ রেখেছেন, তবে মুখখানা বুদ্ধিশ্রীমণ্ডিত, ধীরভাবে কথা কন চলাফেরা করেন। ধর্মে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান, আর মনে হ'ল বেশ বিশ্বাসী ভক্তপ্রাণ খ্রীষ্টান। বিদেশে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রে, কিছুটা সম্মানও পেয়ে এখন দেশে সরকারের অধীনে শিল্পকলাবিষয়ক প্রচারবিভাগে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ পেয়েছেন। আমি ওঁকে ব'ললুম যে আপনি আপনাদের জাতির প্রাচীন ইতিহাস যার স্মৃতি জনসমাজে এখনও বিদ্যমান আর প্রাচীন ধর্মের দেবদেবীর চরিত্র আর উপাখ্যান নিয়ে একটু রোমাণ্টিক ধরনের মূর্তি যদি করেন, তা হ'লে এই পথ দিয়ে আপনাদের আফ্রিকান শিক্ষিত লোককে আফ্রিকার নিজস্ব শিল্পধারার দিকে টানতে

পারবেন। আপনাদের শিল্পে বাস্তবানুকারিতার সঙ্গে সঙ্গে একটা অতীন্দ্রিয়তার আবেদনও আছে। সেই দুটোকেই বজায় রেখে আপনি নোতুন নোতুন জিনিস দেবার চেষ্টা ক'রবেন। এন্‌রোন্‌নু্‌র কাজ সাধারণতঃ বাস্তবানুসারী, আর আফ্রিকান জাতির পুরুষ আর নারীর মূর্তি নিয়েই তিনি বেশি রচনা ক'রেছেন। কিন্তু বাস্তবানুসারিতা ছাড়া বস্তুর অতীত অন্য জিনিসেরও একটু আভাস তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে পাওয়া যায়।

এন্‌রোন্‌নু্‌ তাঁদের দেশের অন্য কতকগুলি সমস্যার কথা ব'ললেন। শিক্ষিত আফ্রিকান আজকাল সাধারণতঃ শিল্পবোধহীন, যদিও তাদের মধ্যে একটা জাতিগত সৌন্দর্য্যবোধ এখনও লুপ্ত হয় নি। ইউরোপীয় রসিকজন আফ্রিকান শিল্পের যেটুকু সমাদর করেন, কেবল সেইটুকুর সাহায্যে এই শিল্পকে জীইয়ে রাখা আর তার উন্নতিবিধান করা চলে না। সরকারের এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত। এন্‌রোন্‌নু্‌র নাইজিরিয়াতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটা বড়ো আপত্তি এই যে, তাঁর মনে হয় যে ব্রিটিশ সরকার এখনও তাঁর গুণের কদর ক'রছেন না। নাইজিরিয়া দেশে শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য, আফ্রিকানদের মধ্যে শিল্পের প্রসারের জন্য মোটা মাইনে দিয়ে যে দু-চার জন ইংরেজ শিল্পীকে নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের অক্ষমতা আর শিল্পবিষয়ে বোধ বা ধারণার অভাব নিয়ে আমার কাছে খুব দুঃখের সঙ্গে তিনি অনুযোগ ক'রলেন। তাঁর নিজের গুণ সর্বত্র স্বীকৃত আর তিনি নিজেও এ সম্বন্ধে বেশ সচেতন, কিন্তু তাঁকে মাইনে দেয় এই নিরেস ইংরেজদের অর্ধেক। এর পরের দিন সকালে এন্‌রোন্‌নু্‌র সঙ্গে তাঁর গাড়িতে আমি খানিকটা পথ একত্র যাই, তখন তাঁর সঙ্গে আরও কথা হ'য়েছিল।

ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি ধর্মমন্দির সরকারের তরফ থেকে তৈরি করা হ'চ্ছে— খ্রীষ্টান ছেলেদের জন্যে একটি গির্জা, আর মুসলমান ছেলেদের জন্যে একটি মসজিদ (আমি এ বিষয়ে লিখেওছি আর দু-একজন আফ্রিকান সজ্জনের সঙ্গে কথাও ক'য়েছি— যারা খ্রীষ্টান বা মুসলমান নয় এমন ছাত্র, যারা প্রাচীন য়োরুবা ধর্মে এখনও বিশ্বাস করে বা সে ধর্ম এখনও ত্যাগ করে নি, তাদের জন্য একটি মন্দির বা সংস্কৃতি-কেন্দ্র কেন সরকার থেকে করা হয় না ?— এই য়োরুবা ধর্ম এখনও একেবারে মরে নি, এর মধ্যে যে-সমস্ত শাশ্বত সত্য আছে সেগুলিকে এদের জীবনে আরও ফুটিয়ে তোলবার জন্য, আর দরকার হ'লে এই য়োরুবা ধর্মের আধুনিক বিকাশের জন্য য়োরুবা চিন্তা-নেতা বা পুরোহিতদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটা Hall of Olorun অর্থাৎ য়োরুবা ধর্মের মতানুসারে, আদিদেব, বা সমস্ত দেবতার উর্দ্ধে অবস্থিত, সকল মানবের কাছে সুগম মূল দেবতা, যাঁকে এরা Olorun বলে, যিনি আমাদের পরব্রহ্মের মতো, তাঁর নামে য়োরুবা ধর্ম-সংস্কৃতির কেন্দ্র কেন হয় না।) এই গির্জার জন্য এন্‌রোন্‌নু্‌কে ভার দেওয়া হ'য়েছে যে, তিনি কাঠের বড়োগোছ দুটি মূর্তি নিজের হাতে ছেনি দিয়ে কেটে তৈরি ক'রবেন— মূর্তি দুটি হচ্ছে যীশুর আর তার ভক্ত মারিয়া মাগ-দালেনার (Mary Magdalene)। মাগ্‌দালেনা যৌবনে ছিলেন পতিতা নারী, কিন্তু যীশুর দর্শন-লাভে আর তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর চরিত্র একেবারে বদলে' যায়, আর তিনি যীশুর অন্যতম ভক্ত ব'লে পরিগণিত হন। এন্‌রোনন্‌নু্‌ দুখানি বড়ো গুঁড়িকাঠে এ দুটি মূর্তি কেটেছেন— আমি তো দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম। অদ্ভুত সুন্দর মূর্তি হয়েছে। যীশুর মূর্তিটি দেখে ইউরোপের গথিক শিল্পের—বিশেষতঃ জার্মানির প্রাচীন গির্জার গথিক মূর্তির— কথা মনে প'ড়ল। শীর্ণ তপঃক্লিষ্ট যীশু দাঁড়িয়ে আছেন, আর মেরি মাগ্‌দালেনার মূর্তি হ'য়েছে যেন একটি আফ্রিকান মেয়ের— মুখের আদল আফ্রিকান ধরনের, কিন্তু তার মধ্যে অদ্ভুতভাবে শিল্পী একটি ভক্তির আবেগ ও আকুলতা ফুটিয়ে তুলেছেন। আমি তো হৃদয় থেকে উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা ক'রলুম,

তাতে এন্‌রোনূর্‌ খুশি হ'লেন। ব'ললেন, যে কয়দিন এই মূর্তি নিয়ে তিনি কাজ ক'রছেন, রোমান কাথলিক ধর্মমতে তিনি কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন ক'রে আছেন— প্রায় তিন মাস ধ'রে। শুক্রবার মাংস খান না, যথারীতি গির্জায় যান, প্রার্থনা করেন, শুচিতার সঙ্গে থাকতে চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য— এইভাবে যাতে তিনি তাঁর উপাস্য যীশুর এবং ভক্তপ্রাণা মাগ্‌দালেনার মূর্তি তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন। এঁর এই সাত্ত্বিক ভাবটি আমার বড়ো ভালো লাগ্‌ল।

এদিকে সন্ধ্যা হয়-হয়, আকেনাবোর, এন্‌রোনূর্‌কে আর আমাকে, গতকাল যাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হ'য়েছিল সেই অধ্যাপক Ogunsheye ওগুন্‌শেয়ের বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেলেন। অধ্যাপক ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী আমাদের স্বাগত ক'রলেন। ভদ্রমহিলা ছিপ্‌ছিপে চেহারার, অতি সুশ্রী আফ্রিকান মেয়ে, অত্যন্ত লাজুকভাবে আর হৃদ্যতার সঙ্গে আমাদের চা খেতে অনুরোধ ক'রলেন, চায়ের সঙ্গে দিলেন তাঁর নিজের হাতে ঘরে তৈরি একরকম আফ্রিকান মিষ্টি পিঠা, স্বোয়াদটা একটু নোতুন লাগ্‌ল—ময়দা ডিম আর মিষ্টি দিয়ে তৈরি, আর চীনাবাদামের তেলে ভাজা, একটু আমাদের সরু-চাকলির আকারের।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, এন্‌রোনূর্‌র কাছ থেকে তখনকার মতো বিদায় নিলুম, ঠিক রইল' যে তার পরের দিন সকাল পৌনে-আটটায় তিনি আমাদের বাসায় এসে আমাকে তুলে নেবেন, আমরা দুজনে Abeokuta আবেওকুতা পর্যন্ত একসঙ্গে যাব, সেখানকার যিনি স্থানীয় জমিদার, যাঁর পদবী হ'চ্ছে Alake আলাকে, তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করবো, আর সেখানে শ্রীযুক্ত আরোলোরো আর আকিন্‌লোয়ে, এঁদের সঙ্গেও দেখা হবে।

চেলারামের আপিসে ফিরে এলুম। ওঁদের ঠাকুরঘরে আমাকে নিয়ে গেল। সেখানে শ্রীযুক্ত ঝমটমল এবং সমস্ত সিন্ধী কর্মচারী, ছেলেবুড়ো সকলে জড়ো হ'ল। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমাকে অনুরোধ ক'রলেন, ওঁদের সঙ্গে একটু সদালাপ ক'রতে, আমাদের ধর্ম আর সংস্কৃতি নিয়ে। যথাজ্ঞান এঁদের সঙ্গে কথা কইলুম, তার পরে এঁদের অনুরোধে কিছু সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ ক'রে শোনাতে হ'ল— গীতার কিছু কিছু, বিশেষ ক'রে একাদশ অধ্যায়, সুর ক'রে প'ড়ে শোনালুম। রাত্রির আহার চুকতে প্রায় সাড়ে-এগারোটা বাজল— অনেক পদের, নানারকম মাংসের খাওয়া। বারোটার দিকে শ্রান্ত দেহ আর মন নিয়ে শয্যা আশ্রয় ক'রলুম।

রবিবার, ৮ই আগস্ট, ১৯৫৪। সকালে মুখহাত ধুয়ে তৈরি হ'য়ে চেলারামের কর্মচারীদের বাসার ঠাকুরঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ বসলুম। সিন্ধী বণিক্‌দের দোকানের উপরে এই ঠাকুরঘরের রীতিটি আমার বড়ো ভালো লাগে। সকলেই দিনের কাজ আরম্ভ কর্‌বার পূর্বে এখানে এসে, বিভিন্ন হিন্দু দেবতার ছবি আছে সেইসব ছবির সামনে, আর গুরু নানকের মূর্তির ছবি থাকে, তার সামনে সেখানে প্রণাম করে; কেউ-কেউ গুরু-গ্রন্থ থেকে কিছু পড়ে, কেউ-বা সিন্ধী ভাষায় গীতা বা অন্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে। আমি চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে দেখলুম। প্রাতরাশ সেরে নেবার সঙ্গে-সঙ্গেই, প্রায় আটটার দিকে এন্‌রোনূর্‌ এসে উপস্থিত। সিন্ধী বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এন্‌রোনূর্‌র গাড়িতে উঠলুম, চেলারামের গাড়ি নিয়ে উইলিয়াম আমাদের পিছনে পিছনে চ'ল্‌ল। এন্‌রোনূর্‌ ইংরেজ রাজত্বে যে তাঁর গুণের অনুরূপ সম্মান পাচ্ছেন না, আর্থিক দিকেও তাঁর প্রতি অবিচার হচ্ছে, এ কথা আমাকে বললেন। এখন তাঁকে বছরে ৫৮০ পাউণ্ড বেতন দেওয়া হয়, কিন্তু কতকগুলি ইংরেজের নাম ক'রে ব'ললেন তারা পায় ১২০০ পাউণ্ডের

উপর। এন্‌রোন্‌রুর-মতো শিল্পী একটু বেশি খরুচে' হয়। এন্‌রোন্‌রু আমাকে জানালেন যে রাজধানী লেগস শহরে যে কাজ তিনি পেয়েছেন সে কাজ তাঁর মোটেই পছন্দসই নয়, সেখানে দপ্তরের কাজই বেশি। তিনি চান ইবাদানে থাকতে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব'সে তার শিল্পসাধনার কাজের জন্য অবকাশ তিনি কামনা করেন। আবেওকুতাতে গিয়ে তিনি পশ্চিম-নাইজিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত আরোলোয়োর সঙ্গে দেখা ক'রতে চান এ বিষয়ে তাঁর অনুকূল মত করাবার আশায়। প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা ক'রলেই তিনি ইবাদানে থাকতে পারবেন আর প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে একটু সুপারিশ করবার জন্য আমাকে এন্‌রোন্‌রু অনুরোধ ক'রলেন। ইংরেজ ভাস্কর ড্যানফোর্ড, যাঁর সঙ্গে দুদিন আগে ইবাদানে আমার দেখা হ'য়েছিল, তিনি বেনিন শহরে সেখানকার যে প্রাচীন যুগের এক রানীর ব্রঞ্জ মূর্তি ক'রেছেন আর সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, একথা আমার কাছে শুনে তাঁর ভালো লাগ্‌ল না। (আমি তখনও সেই মূর্তির ছবি দেখিনি, পরে লণ্ডনে গিয়ে সেই ছবি সংগ্রহ করি।) কণ্ঠস্বরে তাঁর তিক্ততার আভাস পাওয়া গেল, ব'ললেন— এই মূর্তি গড়ার কাজ আমার স্বজাতি আমাকে দিলে না, দিলে একজন ইংরেজকে। এ বিষয়ে আমি আর কী ব'লবো? এ-রকম ঘটনা আমাদের দেশেও এক সময়ে তো বিরল ছিল না। তার পরে এন্‌রোন্‌রু একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে আমার কাছে পরামর্শ চাইলেন। আমি বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে বিবাহ অনুমোদন করি কি না। একটু জিজ্ঞাসা ক'রতেই আমাকে জানালেন যে একটি ইউরোপীয় মেয়ে তাঁকে বিবাহ ক'রতে রাজি হ'য়েছে, মেয়েটি শিল্পপ্রাণ, এন্‌রোন্‌রুর শিল্পের অনুরাগী, বিবাহের পরে এন্‌রোন্‌রুকে তাঁর শিল্পকার্যে আর বই লেখার কাজে সাহায্য ক'রতে আগ্রহান্বিত, মেয়েটির বয়স উনত্রিশ আর এন্‌রোন্‌রুর বয়স পঁয়ত্রিশ। এই রকম বিবাহ পশ্চিম-আফ্রিকায় বিরল নয়, আর অনেক ক্ষেত্রে শ্বেতকায় ইউরোপীয় মেয়ে কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকান্‌কে বিয়ে ক'রে ঘরসংসার বেশ ক'রছে দেখা যায়। অবশ্য পয়সাওলা আফ্রিকানের ঘরেই এটা হয়। এ বিষয়ে আমি কী পরামর্শ দেবো? তাঁর দেশের আর সমাজের পারিপার্শ্বিক আর তাঁর প্রতি মেয়েটির টানের গভীরতা, এই দুটি বিচার ক'রে তাঁকে কর্তব্যনির্ণয় ক'রতে ব'ললুম।

আমরা ইবাদান থেকে আবেওকুতার দিকে অগ্রসর হ'লুম। আবেওকুতা শহরের বাইরে পথে ডক্টর আরোলোয়ো আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ, তাঁরা গাড়ি ক'রে আসছিলেন, আবেওকুতা থেকে ফিরছিলেন। আমাদের দেখে তিনিও গাড়ি থামালেন। আমি গাড়ি থেকে নেবে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলুম, আর ওরই মধ্যে এন্‌রোন্‌রুর মনোগত বাসনার কথা তাঁকে ব'ললুম। শ্রীযুক্ত আরোলোয়ো আমাদের এই অল্প সময়ের সাক্ষাতের জন্য একটু অনুযোগ ক'রলেন, আর ব'ললেন যে আমাকে নিয়ে যেসব ছবি তোলা হ'য়েছে তা আমার নাইজিরিয়া-ভ্রমণের স্মারক হিসেবে ক'লকাতায় পাঠিয়ে দেবেন।

আমি চেলারামদের ৯৯৯ নম্বর গাড়িতে উঠলুম, এন্‌রোন্‌রুও আমার সঙ্গে এলেন। উইলিয়াম আমাদের আলাকের প্রাসাদে নিয়ে গেল। কথা ছিল যে এই প্রাসাদেই শ্রীযুক্ত আরোলোয়োর সঙ্গে আমার দেখা হবে আর তিনি আলাকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন। কিন্তু কাজে তা হ'য়ে ওঠে নি, তিনি আগেই চ'লে যান, কিন্তু আমার কথা আলাকেকে তিনি জানিয়ে যান। সুতরাং আলাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে তৈরি ছিলেন। দোতলার বেশ বড়ো একটি বাড়ি এঁর প্রাসাদ— একটা ফটক দিয়ে ঢুকতে হয়, সামনে কতকটা খোলা জায়গা, আমাদের দেশের আঙিনার

ইফা-দেবের পুরোহিত : ভবিষ্যৎ-গণনায় রত

লেগন। শ্রীরূপচন্দ, যোকরা-শিল্পী ওবিশাদিকপে, লেখক

মতো। ভিতরে ঢুকে সামনেই আলাকের ইঁটে তৈরি আধুনিক প্রাসাদ, আর ডান দিকে তাঁর প্রাচীন প্রাসাদ। এই প্রাচীন প্রাসাদ মানে—একটি খুব বড়ো পাতায়-ঢাকা আটচালা বাড়ি, তার মধ্যে লক্ষণীয় জিনিস হ'চ্ছে কতকগুলো বড়ো বড়ো গুঁড়িকাঠের থাম বা খুঁটি, সেগুলোর গায়ে য়োরুবা দেবতা রাজা রানী সেপাই ও অন্য মেয়েপুরুষ প্রভৃতির মূর্তি খোদাই করা, আর মূর্তিগুলিতে আগে রঙ দেওয়া হ'য়েছিল, সে রঙ এখন উঠে যাচ্ছে। এই মূর্তিগুলি আমার কাছে প্রাচীন য়োরুবা শিল্পের খুব ভালো নিদর্শন ব'লে মনে হ'ল। আলাকের সঙ্গে দেখা ক'রে বাইরে এসে এই থামগুলির কারুকার্য্য বেশ খানিকক্ষণ ধ'রে দেখা গেল।

আমাদের নীচের তলায় ইউরোপীয় কায়দায় একটি বেশ সাজানো ঘরে বসিয়ে বাড়ির ভিতরে আলাককে খবর দিলে। খানিকক্ষণ পরে আমাদের দোতলায় ডেকে নিয়ে গেল। একটি লম্বা বারান্দা, সেটি জানলা-টানলা লাগিয়ে বৈঠকখানা-ঘর করা হয়েছে, সেইখানেই আমাদের আনলে। ঘরের মধ্যে নানা টুকিটাকি curio বা মণিহারী বস্তু। বেশির ভাগই ইউরোপীয়। তবে আবলুশ কাঠে তৈরি কতকগুলি য়োরুবা মূর্তিও দেখলুম, আর অন্য শিল্পসংগ্রহও কিছু কিছু ছিল। কিছুক্ষণ পরে আলাকে ঘরে এলেন, দীর্ঘকায় সৌম্য আকৃতির বৃদ্ধ, বয়স হ'য়েছে ৮২। বহু পূর্বে, ১৯০৪ সালে, যখন রুশ-জাপান যুদ্ধ চ'লছে সেই সময়ে, লণ্ডনের সচিত্র পত্রিকা Black & White-এ এই আলাকের ছবি দেখেছিলুম। আর তখনই আলাকের নামের সঙ্গে পরিচিত হই—ইনি নিজের রঙচঙে আফ্রিকান পোশাক প'রে ইংলাণ্ডে ভ্রমণ করেন। তখনকার দিনে এই অদ্ভুত পোশাক পরা কৃষ্ণকায় আফ্রিকান সর্দারকে নিয়ে ইংরেজদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। ওঁর একটা ছবিতে ছিল, আমার বেশ মনে ছিল, ইংলাণ্ডে এক কৃষিবিষয়ক প্রদর্শনীতে আলাকে লাঙল ধ'রে র'য়েছেন। এ-কথা শুনে ইনি খুব খুশি হ'লেন—পুরোনো দিনের কথা মনে প'ড়ে গেল। আলাকে বেশ ভালো ইংরিজি বলেন। তাঁদের জাতির সভ্যতা সম্বন্ধে প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে আলোচনা হ'ল। এন্‌রোন্‌রুও এই আলোচনায় অল্পস্বল্প যোগ দিলেন। ধর্মমত নিয়ে জিজ্ঞাসা করা অনুচিত, কিন্তু মনে হ'ল তিনি নামে খ্রীষ্টান, ভিতরে য়োরুবা। সব চেয়ে ভালো লাগ্‌ল তাঁর একটা সহজ আভিজাত্য, চলাফেরার ধরনে একটা মনে সম্ভ্রম জাগিয়ে দেওয়া ভাব ছিল। বোতলে জিঞ্জার-বিয়ার বা আদার শরবৎ আনিয়ে খাওয়ালেন, আর তাঁর বাড়িতে অতিথি কেউ এলে একখানি বইয়ে তাঁদের হস্তাক্ষর নেন, আমাকেও সেই বইয়ে নাম ধাম আর তারিখ লিখে দিতে হ'ল। এই ক্ষণিকের অতিথির জন্য আলাকে একটি আবলুশ কাঠের high relief-এ কাটা আবক্ষ পুরুষমূর্তি উপহার দিলেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে এলুম। এন্‌রোন্‌রু নিজের গাড়িতে ক'রে ইবাদানে ফিরে গেলেন, আর আমি লেগসের দিকে রওনা হ'লুম।

আলাকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে, আমরা আবেওকুতার বড়ো রাস্তা হ'য়ে একটি নদীর ধারে এলুম। সেই নদীর উপরে একটি নোতুন লোহার পোল তৈরি হ'য়েছে, পোল পেরিয়ে যেতে হবে। শহরে পোলের মাথায় কতকগুলি আফ্রিকান শিল্পদ্রব্যের দোকান পেলুম, শ্রীযুক্ত ড্যানফোর্ড ইবাদানে এই দোকানের কথা আমাকে বলেছিলেন। এখানে কিছু কিছু পিতলের কাজ—ছোটো ছোটো মূর্তি আর তৈজসপত্র, আর উত্তর-নাইজিরিয়ার কানো নগরে তৈরি সেখানকার বিখ্যাত চামড়ার কাজ, ছোটো ছোটো ব্যাগ, জুতো, বসবার আসন, টাকার থলি প্রভৃতি, আর calabash অর্থাৎ লাউয়ের খোলায় জালিকাটা নানা আফ্রিকান নকশা—এই জিনিস শ্রীযুক্ত ড্যানফোর্ডের সংগ্রহে দেখেছিলুম। আমাদের দেশে শোলায়-তৈরি চাঁদমালার

মতো অলংকরণ-কাজে এই নকশা-কাটা লাউয়ের খোলা এরা ব্যবহার করে। উত্তর আফ্রিকায় মরক্কো দেশে ভেড়ার চামড়া অতি মোলায়েম ক'রে নিয়ে তাতে পাকা লাল নীল হ'লদে কালো রঙ লাগিয়ে "মরক্কো লেদার" তৈরি করে। আরবদের কাছ থেকে এই শিল্প আফ্রিকায় মুসলমান নিগ্রো জাতির মধ্যেও প্রসারলাভ ক'রেছে, এই রকম চামড়ার জিনিসের জন্য কানোর হাউসা-জাতীয় কারিকরেরা বেশ সুনাম অর্জন ক'রেছে। আমি এই চামড়ার একটি ছোটো ব্যাগ কিনলুম, আর কতকগুলি লাউয়ের খোলার চাঁদমালা কিনলুম। দোকানী খাতির ক'রে চেয়ার আনিয়ে আমাকে বসিয়ে, তার জিনিস দেখাতে লাগ্ল। লোকটা জাতিতে য়োরুবা, ইংরেজি ভালো জানে না—কাছেই নদীর পোলের ধারে উর্দিপরা একটি পাহারওলা ছিল, তাকে ডাকলে। বেশ লম্বা ছিপ্ছিপে চেহারার যুবক, ফৌজি কায়দায় এসে দাঁড়াল', দেখলুম ইংরেজি বেশ ভালো জানে। এদের উর্দি হ'চ্ছে কালো গরম কাপড়ের কোট আর হাফপ্যান্ট, মাথায় ছাতাওয়ালা টুপি, পায়ে পটি আর বুটজুতো। আমার হ'য়ে জিনিসগুলি দর ক'রে আমায় কিনিয়ে দিলে। তার পরে এই য়োরুবা যুবক আমার সম্বন্ধে কৌতূহলী হ'য়ে, কোন্ দেশ থেকে আসছি, কী করি, এসব জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগ্ল। ভারতবর্ষ শুনে খুব খুশি হ'ল, শ্রীযুক্ত নেহরুর নামও জানে, আর ভারতবাসী সিন্ধী দোকানীদের প্রশংসা ক'রলে। তার নিজের দেশও স্বাধীন হবে, সেই আশায় আছে, আমাকে জানিয়ে দিলে। লোকটির সঙ্গে আলাপ ক'রে খুশিই হ'লুম।

বেলা পৌনে-একটায় লেগসে পৌছলুম, Hagley Road হ্যাগলি রোডে শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্-এর বাসভবনে হাজির হ'লুম। খবর পেলুম যে নাইজিরিয়ার লাট-সাহেব Sir James Macpherson জেম্স্ ম্যাক্ফারসন্ বিলেত থেকে লেগসে ফিরে এসেছেন, তাঁর সেক্রেটারি খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন যে আমি ফিরলে বিকেল পাঁচটায় তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে কথা কইবেন। আমার লেগস থেকে কানো, কানো থেকে আক্রা, হাওয়াই-জাহাজের টিকেট গভর্মেণ্ট থেকে কিনে শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্-এর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, আর এর দাম আমাকে আক্রা থেকে ভারতীয় প্রতিনিধির দপ্তরের মারফত পাঠাতে হবে। আমি আবলুশ কাঠের ছোট একটি আফ্রিকান মা আর শিশুর মূর্তি তৈরি করবার যে অর্ডার দিয়ে গিয়েছিলুম, সেটিও কারিগর পাঠিয়ে দিয়েছে। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্-এর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন সেরে একটু বিশ্রাম ক'রে, সাড়ে-চারটের সময় তাঁরই সঙ্গে লাটবাড়িতে গেলুম। এটা একটা আনুষ্ঠানিকভাবে লাট-দর্শন, তাই সাদা শেরওয়ানী আর চুড়িদার পাজামা প'রে নিলুম। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্ আর আমাকে লাটসাহেবের খাস-মুনশির ঘরে নিয়ে গেল, তিনি আমাদের ব'ললেন যে লাটসাহেবের শরীর অসুস্থ, আমি যেন দশ-পোনেরো মিনিটের বেশি সময় না নিই। একটু পরেই ডাক প'ড়্ল। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্ নীচে প্রাইভেট সেক্রেটারির ঘরেই রইলেন, রূপচন্দ্ এঁর পরিচিত।

স্যার জেম্স্ ম্যাক্ফার্সন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় এসেছেন, বেশ দিল-খোলা হৃদ্যতাপূর্ণ মানুষ ব'লে মনে হ'ল, বেশ সরল হাসি। নিজের সম্বন্ধে কিছু ব'লে আমার পরিচয় দিলুম, তিনিও নানা কথা নিজের থেকেই আমাকে ব'লে যেতে লাগ্লেন। তাঁর কথায় বুঝলুম যে তিনি সত্যিই নাইজিরিয়ার অধিবাসীদের মঙ্গল কামনা করেন—এটি তাঁর প্রার্থিত যে, আফ্রিকার কালো মানুষ উন্নত মস্তকে পৃথিবীর আর পাঁচটি জাতির সামনে দাঁড়ায়, তাদের অন্তর্নিহিত গুণ আবিষ্কার ক'রে সমগ্র মানবসমাজের সেবায় লেগে যায়। এদের মধ্যে যে সমস্ত অনৈক্য আছে, অপরিপূর্ণতা আছে, তার সম্বন্ধেও ইনি সচেতন। যখন মুসলমান-বহুল

উত্তর-নাইজিরিয়ার হাউসা আর অন্য জাতির লোক, দক্ষিণ-নাইজিরিয়ায় ইংরেজি বিদ্যায় অগ্রসর ইবো আর য়োরুবাদের সঙ্গে কিছুতেই মিলবে না—অন্ততঃ তখনও মিলতে চাচ্ছে না—তখন, তাঁর মতে, নাইজিরিয়া দেশকে তিন ভাগে ভাগ ক'রে (উত্তর, পশ্চিম আর পূর্ব) একটি ফেডারেশন বা সমবায়-রাষ্ট্র করাই ভালো হবে। মোটামুটিভাবে, নাইজিরিয়ার লোকেরা এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। নাইজিরিয়া ভারতবর্ষের মতো নয়, এখানে লোকেরা এখনও অনেক বিষয়ে আদিম অবস্থায় প'ড়ে আছে। রাজ্য চালাবার মতো যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত দেশী লোক নেই, বিশেষতঃ অনগ্রসর মুসলমান-বহুল উত্তর-নাইজিরিয়ায়। কতকগুলি উচ্চশিক্ষিত ইবো আর য়োরুবা রাজনৈতিক নেতা জোর গলায় চাচ্ছেন যে, এখনই ইংরেজ রাজকর্মচারীদের বিদেয় ক'রে দিয়ে বা তাদের ভবিষ্যতে আর নিযুক্ত না ক'রে, সব ছোটো-বড়ো কাজ দেশের লোকদেরই দেওয়া হোক। মনোভাবে আর চিন্তার ধারায় এরা এখনও একটু অপরিপক্ব, কতকটা শিশুর মতন। তাড়াতাড়ি এই ধরনের সমস্ত লোককে সব কাজে বসিয়ে দিলে রাজ্যচালনার পক্ষে বিপদ ঘ'টবে, আর তা ছাড়া এদের মধ্যে এখনও tribal consciousness অর্থাৎ উপজাতিনিষ্ঠ চিত্তবৃত্তি প্রবলভাবে বিদ্যমান, সকলে মিলে national consciousness বা রাষ্ট্রীয় চেতনা গ'ড়ে তোলবার অবসর এরা এখনও পায় নি। সেইজন্যে, প্রান্তীয় ভাষা আর প্রান্তীয় রীতিনীতি আর ধর্ম অবলম্বন ক'রে এদের মধ্যে একটা পরস্পরের প্রতি বিরোধ-ভাব ফুটে উঠছে। (আমাদের দেশের সুপ্ত আর পুনর্জাগ্রত casteism বা স্ববর্ণাধিমুখিতার মতন এটা একটা বড়ো জটিল ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।) ক্রমে ক্রমে দেশের লোকের হাতে সব বিভাগে সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে দেওয়াই হ'চ্ছে ব্রিটিশ সরকারের মূল আদর্শ, আর সার জন ম্যাক্‌ফারসন নিজেও সেই আদর্শের সমর্থন করেন। কিন্তু এখনই সমস্ত ইংরেজ কর্মচারী সরালে চ'লবে না। তবে তিনি এই চেষ্টা ক'রছেন যে ইংরেজ রাজকর্মচারী যারা আছে এবং যারা আসবে, তাদের মনে দেশের লোকের প্রতি যাতে সত্যকার সেবার ভাব জেগে ওঠে। আমার নিজের মনে হয়, এই লাট-সাহেবের ভাবে অনুপ্রাণিত ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট-জাতীয় কর্মচারী, যেমন গোল্ডকোস্টে দেখেছি, এখানেও সে-রকম আছে। অবশ্য সকলেরই মন থেকে যে প্রভুভাব মুছে গিয়ে পুরোপুরি সেবকভাব এসেছে, অতটা আশা করা অনুচিত হবে, মানুষের মনের দৌর্বল্য আর তার স্বার্থপ্রিয়তা, এ তো থাকবেই। তবে সামনে ধ'রে রাখা একটা বড়ো আদর্শের মূল্য আছে বৈকি ? যাই হোক, সব অসুবিধে সত্ত্বেও, সার জন ম্যাক্‌ফারসন স্পষ্ট ক'রেই আমাকে ব'ললেন যে "Self-government is better than any other form of government। লাট-সাহেব ভারতবাসীদেরও খুব তারিফ ক'রলেন, আর আমাদের ভারতীয় পররাষ্ট্র বিভাগের কর্মচারী মহারাষ্ট্রের ঔন্ধ-রাজ্যের রাজকুমার শ্রীযুক্ত আপা ব. পন্ত, যিনি কয়েক বৎসর ধ'রে মধ্য-আফ্রিকার কেনিয়া-দেশে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন, আর পশ্চিম-আফ্রিকা ঘুরে গিয়েছেন, তাঁরও খুব প্রশংসা ক'রলেন। এখন আক্রা নগরে স্থিত পশ্চিম-আফ্রিকার জন্য নিযুক্ত ভারতীয় প্রতিনিধি রাজা শ্রীরামেশ্বর রাও-এরও বেশ সুখ্যাতি ক'রলেন। (শ্রীআপা ব. পন্ত-এর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বিশেষ পরিচয়ের সুযোগ হ'য়েছে। এক কথায় বলা যায় যে, এইরূপ শিক্ষিত ও উদার-মনোভাব-যুক্ত প্রতিনিধি দেশের গৌরবই বর্ধন করেন। ইনি কেনিয়া-অঞ্চলে ও ব্রিটিশ পূর্ব-আফ্রিকায় উপনিবিষ্ট ভারতবাসীদের মনের গতির মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন— আগে এই-সমস্ত ভারতবাসী ঐ অঞ্চলের আফ্রিকানদের সম্বন্ধে প্রীতি বা সহানুভূতির ভাব দেখাত না, তারা ইংরেজদেরই গোড়ে গোড় মেলাত,

আর তার ফল দাঁড়াচ্ছিল যে, একদিকে যেমন ইংরেজরা ভারতবাসীদের ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে কখনই তাদের পক্ষে হবে না, বরং তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রবে, তেমনি অন্য দিকে স্থানীয় আফ্রিকানরাও স্বভাবতই এই সহানুভূতিবিহীন ভারতবাসীদের ছোটোদরের শোষক ব'লে মনে ক'রে বিরূপ ভাব পোষণ ক'রবে। এখন শ্রীযুক্ত পন্তের চেষ্টার ফলে সাধারণভাবে ভারতবর্ষীয় ঔপনিবেশিক আর স্থানীয় আফ্রিকান জনসাধারণের মধ্যে একটা পারস্পরিক সহযোগের আর সম্প্রীতির ভাব এসে যাচ্ছে। এটাতে ইংরেজরা আশঙ্কিত হ'য়ে প'ড়েছে, আর তারা এইজন্য শ্রীযুক্ত পন্ত-এর উপর ভীষণ নারাজ, তাঁকে persona non grata অর্থাৎ "অপ্রার্থিত ব্যক্তি" ব'লে দেশ থেকে বহিষ্কার করবার চেষ্টায় ছিল, শেষটায় তা ক'রতে পারে নি, শ্রীযুক্ত পন্ত যথারীতি তিন বৎসর গৌরবের সঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধির কাজ ক'রে দেশে প্রত্যাবর্তন ক'রেছেন)।

নাইজিরিয়ার গভর্নর-সাহেব আফ্রিকান মানুষের প্রতি, তাদের সভ্যতা আর সংস্কৃতির প্রতি আমার আগ্রহ আর সহানুভূতি দেখে খুশি হ'লেন। একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম— ভদ্রলোক যখন আমার সঙ্গে আলাপ ক'রছিলেন তখন লেখবার প্যাড আর পেনসিল নিয়ে আমার বক্তব্য নোট ক'রে নিচ্ছিলেন। আমার কথার তেমন কিছু গুরুত্ব ছিল না, কিন্তু মনে হ'ল ভদ্রলোক একটু exact অর্থাৎ হিসেবি মানুষ— যদি ভবিষ্যতে কখনও এই সাক্ষাৎকারের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ ক'রতে হয় তা হ'লে তাঁর নেওয়া এই noteগুলি কার্য্যকর হবে। সকলে সব সময়ে এরকম খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি রেখে চ'ল্‌তে পারে না। এঁর সঙ্গে দশ-পোনেরো মিনিটের বেশি যাতে আলাপ-আলোচনা না চালাই, ওঁর শরীর-গতিকের কথা উল্লেখ করে ওঁর সেক্রেটারি আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, কিন্তু ইনি ৪৫ মিনিট সময় নিলেন। এঁর শিষ্টাচার বিশেষ meticulous অর্থাৎ খুবই সূক্ষ্মতার সঙ্গে পরিপালিত, কিন্তু তাতে একটি সরল হৃদ্যতাও ছিল, শিষ্টাচারের ভান ব'লে মোটেই মনে হ'ল না। বেশ উঁচুদরের ইংরেজ, সাক্ষাৎকারের অবসানে সহজ আভিজাত্যের সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে ঘরের বাইরে সিঁড়ি পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্‌গমন ক'রলেন।

শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্‌-এর অতিথি এইরকমভাবে নাইজিরিয়ার গভর্নরের সঙ্গে ৪৫মিঃ ধ'রে কথা ক'য়ে এলেন, এতে তিনি একটু খুশি হ'য়েছেন ব'লেই মনে হ'ল। তিনি এতক্ষণ সেক্রেটারির সঙ্গে কথাবার্তা কইছিলেন। এঁদের ব্যবসায়-সংক্রান্ত ব্যাপারে নাইজিরিয়ার ইংরেজ সরকারের কাছে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আর প্রতিপত্তি আছে।

শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্‌ আমাকে লেগসের সমুদ্রতীরে ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। নাইজিরিয়া আর্ট সেণ্টার দোকানের মালিক, শিল্পী Ajidasile Orishadikpe আজিদাসিলে ওরিশাদিক্‌পে, তাঁর দোকানে আমাকে আসতে অনুরোধ ক'রেছিলেন, সেখানে শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্‌-এর সঙ্গে আমার কতকগুলি ছবি তোলালেন। আর আমাকে নিজের হাতে ছোট্ট কাঠে-খোদা বুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্তি উপহার দিলেন। আমাকে পরে অনুরোধ ক'রলেন, তাঁর শিল্পভাণ্ডার সম্বন্ধে আর তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমার অভিমত আমি যেন লিখে দিই। বলা বাহুল্য আমি বাসায় ফিরে গিয়ে তাঁর কাজের প্রশস্তি ক'রে আমার চিঠির কাগজে লিখে তাঁকে পাঠাই। যে কাঠের মূর্তি তিনি আমাকে দেন, সেটি বাস্তবিকই খুব উঁচুদরের একটি শিল্পদ্রব্য, সেটিকে আমার শিল্প-সংগ্রহের মধ্যে রেখে দিয়েছি।

অ্যামেরিকার জনৈক চিন্তা-নেতা Dr. Buchman ডাক্তার বুক্‌মান্ যে একটি নূতন আন্দোলন আরম্ভ ক'রেছেন— Moral Re-armament, অর্থাৎ চরিত্রনৈতিক সজ্জীকরণ বা সশস্ত্রীকরণ— প্রচুর অর্থব্যয়ে নানা দেশে এখন সেই আন্দোলনের প্রচার ক'রছেন। এঁরা চান যে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সেবার ভাব, ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হয় ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আধারে। এই আন্দোলন মূলে অ্যামেরিকার কতকগুলি আদিম ধরনের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার অনুরূপ। ইংরিজিতে নাটক রচনা ক'রে, সেই নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে, নানা দেশে এঁরা M.R.A. বা Moral Re-Armament-এর প্রচার করেন। আমি ক'লকাতায় এরূপ নাটক দেখেছিলুম। আমার কাছে এই নাটক একটু crude বা স্থূল আদর্শের ব'লে মনে হ'য়েছিল। কিন্তু তা হ'লেও, আর মুখ্যতঃ কমুনিস্ট-বিরোধী আন্দোলন-রূপে অনেকে এটাকে দেখলেও, এই M.R.A.-র কতকগুলি সত্যকার গুণ আছে। বিশেষ ক'রে এই M.R.A. জাতিগত বর্ণবিদ্বেষ দূর করবার কাজও গ্রহণ ক'রেছে, আর এমনকি বর্বর Apartheid-এর দেশ দক্ষিণ-আফ্রিকাতেও এরা প্রচার চালিয়েছে। এদের কর্মীরা বহু বিষয়ে খোঁজখবর রাখেন। ক'লকাতায় এদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল, কোথা থেকে এখানে লেগসে এঁরা শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্-এর গৃহে আমার অবস্থানের খবর পান, আর টেলিফোনে আমাকে লাটবাড়ি আসবার আগেই জানিয়ে দেন যে, 1, Agarde Street-এ এঁদের আপিসে এঁদের স্থানীয় পরিচালক আর কতকগুলি সদস্যের সঙ্গে যদি আমি মিলিত হই, এঁরা খুব খুশি হবেন। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্ এঁদের বাড়ি খুঁজে বা'র ক'রলেন, আমার সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন। এঁরা ছয়-সাত জন লোক উপস্থিত ছিলেন, আমেরিকান ও আফ্রিকান, আর সাউথ-আফ্রিকা থেকে আগত একটি শ্বেতাঙ্গও ছিল। আমার সঙ্গে বিশ্বমানবিকতার আদর্শ নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা হ'ল। মোটের উপর এঁদের এই চেষ্টা ভালোই লাগ্‌ল।

বাসায় ফিরে কতকগুলি চিঠি লিখে ফেললুম। তার পরে ছিল একটি ডিনার বা বড়ো খানা, শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্ আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে স্থানীয় কতকগুলি য়োরুবা ভদ্রলোককে এই ডিনারে আহ্বান করেন। এঁরা রাত্রি সাড়ে-আটটার পর হাজির হ'লেন। যথারীতি সিন্ধী মতে মদ্যপান ও টুকিটাকি ভোজন চ'ল্‌ল, খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে উঠতে রাত্রি প্রায় এগারোটা হ'য়ে গেল। অভ্যাগত যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন Dr. A. Maja ডক্টর এ. মাজা, ইনি ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছেন; Dr. O. A. Amalulu ডক্টর ও. এ. আমালুলু, ইনি একজন প্রবীণ ব্যক্তি, ব্যবহারজীবী; শ্রীযুক্ত A. B. Oyediran এ. বি. ওয়েডিরান, ইনি স্থানীয় এক মেথডিস্ট স্কুলের প্রধান-শিক্ষক; আর ছিলেন শ্রীযুক্ত S. O. Gbadamosi এস্. ও. গ্বাদামোসি— ইনি নাইজিরিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী, নিজেই মুসলমান ব'লে নিজের ধর্মের পরিচয় জাহির ক'রলেন। এঁরা সকলেই বেশ শিক্ষিত লোক, তবে এই মুসলমান মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এঁদের সমাজের পরিস্থিতির একটু আভাস পাওয়া গেল। ইনি ব'ললেন যে ইনি কয় ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো, আর য়োরুবা সামাজিক রীতি অনুসারে সেইজন্য ইনিই বাড়ির কর্তা, সব কথা এঁর হুকুমেই চ'লবে, যতদিন ভাইয়েরা এক বাড়িতে এক অন্নে থাকবে। ইনি নিজে মুসলমান হ'য়েছেন, কিন্তু এঁর এক ছোটো ভাই ইংলাণ্ড থেকে ব্যারিস্টার হ'য়ে এসেছে সে খ্রীষ্টান, আর তাঁর স্ত্রীও খ্রীষ্টান মেয়ে। ইনি ব'ললেন, "দেখুন মিস্টার চ্যাটার্জি, আমি মুসলমান হ'লেও খুব উদার। আমার ভাই খ্রীষ্টান, সে শুয়োর খায়— আর আপনি জানেন শূকর-মাংস

মুসলমান ব'লে আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু আমি ভাইকে অনুমতি দিয়েছি, সে শূকর-মাংস এনে বাড়ির খাবার রাখবার refrigerator-এ রাখতে পারবে। সে refrigerator-এর মধ্যে আমার খাবারও থাকে। কিন্তু তাকে ব'লে দিয়েছি যে, এই পর্যন্ত আমি উদারতা দেখালুম— অন্য সব বিষয়ে আমার হুকুম চ'লবে— এদের ছেলেপুলে হ'লে মুসলমান মতে তাদের baptise ক'রতে হবে (খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা অর্থে এই শব্দটি মুসলমান ধর্মে দীক্ষার পর্যায়-বাচক ব'লেই ইনি ব্যবহার ক'রলেন। আমার ভাই আমার সঙ্গে আছে ব'লে এই কথা মেনে নিয়েছে।" দেখা গেল যে এঁর এই উদারতার বহুদূরপ্রসারী দৃষ্টি— এদেশে মুসলমান ধর্মের প্রসার না হ'য়ে পারে না।

সোমবার ৯ই আগস্ট, ১৯৫৪। লেগস ত্যাগ। সকালে আমার গৃহপতি শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্ সামতানী আর তাঁর সহকর্মী শ্রীযুক্ত নারায়নদাস ও কৃষ্ণদাস মেজ্যানী, এঁদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া গেল। এঁদের চাকর-বাকরকে যৎকিঞ্চিৎ বখশিশ দেওয়া গেল। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্ সৌজন্য ক'রে আমাকে হাওয়াই জাহাজের আড্ডায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন। দেখলুম, এখানে সকলেই এঁকে চেনেন। চট্‌পট্ আমার মাল ওজন প্রভৃতির ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। ইনি আমার চিঠি ছাড়বার ভার নিলেন। কানোতে আমার আগমনের কথা এঁদের প্রতিভূদের জানিয়ে দিয়েছেন ব'ললেন। তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ আর তাঁর সহকর্মীদের মতন সহৃদয় অতিথি-বৎসল স্বদেশবন্ধু পেয়ে আমার এই দেশ দেখার যে কত সুবিধে হ'য়েছিল, তা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। এঁদের ঋণ শোধ করবার নয়।

সকাল সাড়ে-ন'টায় আমাদের প্লেন উত্তরমুখো হ'য়ে যাত্রা ক'রলে ॥

—

স্বীকৃতি

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'নিচু বাংলা' চিত্রের এবং বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত 'দিনান্ত' ও 'পত্রলেখা' চিত্রের ব্লক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির ব্লক শ্রীসুপ্রিয় সরকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত। সাড়ে পাঁচ টাকা
কঙ্কাবতী। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। পাঁচ টাকা
মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১২।

সাহিত্যপ্রসঙ্গে কোনো কথা বলতে গেলেই রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ এসে যায়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোথাও কোনো মিল নেই তথাপি ত্রৈলোক্যনাথের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কেন এসে যাচ্ছেন সেই কথাটি গোড়ায় বলে নিলে আমার বক্তব্য অধিকতর স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যে এবং জীবনে এত জায়গা জুড়ে আছেন যে তার ফলে অন্যান্য সাহিত্যরথীরা সকলেই অল্পবিস্তর নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন। পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো সাহিত্যে ঠিক এ ব্যাপারটি ঘটে নি। কোনো একজন প্রতিভাশালী সাহিত্যিক অপরাপর সাহিত্যপ্রতিভাকে এতখানি আচ্ছন্ন করেছেন এমন দৃষ্টান্ত অন্যত্র দেখা যায় না। এই ক্ষেত্রে কেমন করে তা সম্ভব হল সেই কথাটি ভেবে দেখা প্রয়োজন। একথা সকলেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘজীবনে এমন অনেক জিনিস রচনা করেছেন যা ঠিক সাহিত্যের আওতায় আসে না। শিশুর বিদ্যারম্ভের জন্য ‘সহজপাঠ’ থেকে শুরু করে শিশু কিশোর যুবক বৃদ্ধ সকলের জন্যে গদ্যে পদ্যে ভূরি পরিমাণ জিনিস তো লিখেছেনই তা ছাড়া শখ করে ইস্কুলমাস্টার হয়েছিলেন বলে ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা এবং ইংরেজি অনুবাদচর্চার বইও তাঁকে লিখতে হয়েছে। কাব্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাচর্চার বই লিখেছেন, সেটা উচ্চতর ব্যাকরণ ছাড়া আর কি? শেষ জীবনে বিজ্ঞানের বইও লিখে গিয়েছেন। ধর্মালোচনা এবং জীবন-দর্শনের চর্চা তো জীবনভোর করেছেন। তার ফল হয়েছে এই যে বাংলা দেশের একটি বিদ্যার্থী আর সব কিছু বেমালুম বাদ দিয়ে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ অধ্যয়ন করেই মোটামুটি বিদ্যালাভ সমাধা করতে পারে। এই উক্তির মধ্যে হয়তো খানিকটা অত্যুক্তি আছে কিন্তু একথা নিশ্চিত যে অন্যান্য ব্যাপারে যাই হোক বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের অনেকের জ্ঞান অতিমাত্রায় রবীন্দ্র-নির্ভর। তার ফলে আর কিছু না হোক অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে আমরা অন্যান্য সাহিত্যিকের প্রতি অল্পবিস্তর অবিচার করে থাকি। এটাকে শিক্ষার ত্রুটি বলে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বিদ্যা এক জিনিস, শিক্ষা আর। বিদ্যা জিনিসটা প্রয়োজননিরপেক্ষ, সে আপন রুচির বসে চলে। স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী বিদ্যা অর্জন করেন বলে বিদ্বান মানুষ বেশির ভাগ সময়েই একটু একপেশে ধরনের হয়ে থাকেন। শিক্ষা একেবারেই ভিন্নজাতীয় বস্তু। শিক্ষাকে সমাজের দাবিদাওয়া মেনে চলতে হয়। সমাজের প্রয়োজনে যে মানুষকে তৈরি করা হয়েছে শিক্ষিত আখ্যা তাকেই খাটে। যে মানুষ সমাজ-সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে বিদ্যাচর্চায় নিযুক্ত হন তাঁকে বিদ্বান বলা যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত বলা চলে না।

এদিক থেকে দেখতে গেলে সমাজে থেকেও আমরা বেশির ভাগ লোকই বন্য অর্থাৎ অশিক্ষিত (অবশ্য তাই বলে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে আমরা সবাই বিদ্বান লোক)। অশিক্ষিত বলছি এই কারণে যে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, আমাদের শিক্ষায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফাঁক থেকে গিয়েছে।

আমি নিজেকে সাহিত্যের ছাত্র বলে পরিচয় দিয়ে থাকি কিন্তু শুনে অনেকে বিস্মিত হবেন যে, জীবনের চল্লিশ বছর পার করে দিয়ে তবে আমি ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। অথচ ভদ্রসমাজে যে আমাকে এই নিয়ে লজ্জা পেতে হয় নি তার কারণ নিশ্চয় এই যে ভদ্রসমাজের অধিকাংশ লোক আমার মতোই ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে অজ্ঞ কিম্বা উদাসীন ছিলেন। আমরা যখন ইস্কুল-কলেজে পড়েছি তখন বাংলা সাহিত্যটা শিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আপন আপন গৃহের আবহাওয়ার উপরে নির্ভর করত। সেখানে কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রাধান্য, কোথাও রবীন্দ্রনাথ একচ্ছত্র অধিপতি। শরৎচন্দ্র সবে আসর জমিয়ে বসেছেন। আমাদের বাংলাসাহিত্য-পরিচয় এই তিনের মধ্যেই মোটামুটি আবদ্ধ ছিল। ব্যক্তিগত রুচিভেদে একজনের প্রাধান্য যদি দশ আনা হত তো বাকী দুজন মিলে ছ' আনার অংশীদার হতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়িয়ে পশ্চাদ্‌ভূমিতে পদার্পণ করবার প্রয়োজন বড় একটা হত না। এমন-কি মাইকেল যে মধুচক্র রচনা করেছিলেন আমরা গৌড়জনেরা স্কুলপাঠ্য সংকলনগ্রন্থে তার দু-একটি উদ্‌ধৃত অংশ পাঠ করেই সে সুধারসের আস্বাদ গ্রহণ করেছি। মেঘনাদ-বধ আদ্যোপান্ত পাঠ করেছেন এমন ব্যক্তি আমাদের কালে খুব বেশি দেখা যেত না, আজকালও দেখা যায় এমন মনে করি না। প্রাচীনের প্রতি আমাদের ভক্তি সহজাত কিন্তু তাও আবার অল্পস্বল্প প্রাচীন হলে চলে না। অন্তত দু-চার শ বছরের ব্যবধান হলে তবে প্রাচীনের প্রতি আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মায়। যাঁরা অত্যল্পকালের পূর্বগামী তাঁদের প্রতি আমরা উদাসীন। জীবিত অথবা সাম্প্রতিক কালের মানুষ সম্পর্কে আমাদের মনে একটি স্বাভাবিক কার্পণ্য আছে। এই সেদিন একজন মহামান্য ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, বঙ্কিমচন্দ্র এখন আর পড়া যায় না। আর কিছুদিন অপেক্ষা করলেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এরূপ আপ্তবাক্য শোনা যাবে। অবশ্য এই ব্যাধি সব দেশেই অল্পবিস্তর দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ ভিক্টোরীয় সাহিত্য সম্বন্ধে যত অবজ্ঞা প্রকাশ করেছে এমন আর কারো সম্পর্কে নয়।

অবজ্ঞাত হওয়া এক কথা, আর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকা অন্য কথা। সৎসাহিত্য লোপ পেয়ে যাওয়ার মতো দুর্দৈব আর হতে পারে না। কোনো জাতির পক্ষেই সেটা গৌরবের কথা নয়। বিশেষ করে আমাদের সাহিত্য এমন অপর্যাপ্ত পরিমাণের নয় যে আমরা হেলাফেলা করে ফেলে ছড়িয়ে তার ব্যবহার করতে পারি। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে সসম্মানে স্থান দিয়ে আমরা তাঁকে সিকেয় তুলে রেখেছি। ইতিহাস এবং মিউজিয়াম একই বস্তু— দুটোই কবরখানা। পাঠকমহলে বেঁচে থাকাই সাহিত্যিকের পক্ষে সত্যিকারের বেঁচে থাকা। এ কালের পাঠকমহলে ত্রৈলোক্যনাথ সম্পূর্ণ অপরিচিত। বহুকাল অজ্ঞাতবাসের পরে ত্রৈলোক্যনাথ আবার বাঙালী পাঠকের দরবারে হাজির হয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থের সংকলনকর্তা প্রমথনাথ বিশী এবং প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বাঙালী পাঠক তার এতকালের অজ্ঞতা এবং তজ্জনিত লজ্জা মোচনের সুযোগ পেল। অপরদিকে এঁদের কল্যাণে ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ও বলতে গেলে পুনর্জীবন লাভ করলেন।

ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের সব চেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ কঙ্কাবতী প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। মিত্র ও ঘোষ উক্ত গ্রন্থের একটি সচিত্র এবং সুদৃশ্য সংস্করণ প্রকাশ করে প্রশংসনীয় উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন।

কঙ্কাবতী অতিশয় সুখপাঠ্য গ্রন্থ। ভালো জিনিসের স্বভাবই এই যে সকলকেই তা অল্পবিস্তর আনন্দ দিতে পারে। আমার নয় বৎসর বয়স্কা কন্যা থেকে শুরু করে পরিবারস্থ সকলেই আমরা উক্ত গ্রন্থের স্বাদ গ্রহণ করেছি এবং তৃপ্তি লাভ করেছি। শিশু যুবক বৃদ্ধ সকলের মনোহরণ করতে পারে সমাজে এমন মানুষ যেমন বিরল, ছোট বড় সকলকে আনন্দ দিতে পারে এমন গ্রন্থও আমাদের সাহিত্যে বিরল। এ বইএর মস্ত বড় সুবিধা পাঠকের কাছ থেকে এ কিছুই দাবি করে না, খুব সামান্য শিক্ষা এবং জ্ঞানগম্যি নিয়ে এ বই পড়া যায় এবং রস পাওয়া যায়। এই গল্পবলার রীতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। আয়াসহীন জলহাওয়ার মতো অবাধগতি। অসাধারণ শক্তি বলতেই হবে। কিন্তু প্রকাশক যখন তাঁর ভূমিকায় কঙ্কাবতীকে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে দাবি করেন তখন বুদ্ধিমান পাঠকের মনে নিঃসন্দেহে কৌতুকের উদ্রেক হয়। প্রশংসনীয় বস্তুকে প্রশংসা করা ভালো, কিন্তু প্রশংসা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন সেটা নিন্দায় পর্যবসিত হয়। ইংরেজিতে বলে praise undeserved is scandal in disguise। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বিশ্ব জিনিসটা অতি বৃহৎ এবং বিশ্বসাহিত্য অতিশয় বিস্তীর্ণ। বিরাট বিশ্বসাহিত্যের কতটুকু সন্ধান আমরা রাখি? যাঁর যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু দেওয়াই বিধেয়। তার বেশি দিতে গেলে সেটা হিসাবের খাতায় জমা হয় না। আমরা আমাদের একজন খ্যাতনামা লেখককে বহুকাল অবহেলা করে এসেছি, সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা। বোধ করি সেই লজ্জা মোচনের জন্যেই প্রকাশক এই অতিশয়োক্তিটি করেছেন।

সাহিত্যবিচারে মানুষ যতখানি অস্থিরমতিত্ব দেখিয়েছে এমন আর কিছুতে নয়; এককালে যাঁরা নাম করেছিলেন পরবর্তী কাল তাঁদের মান রাখে নি, একদা যাকে অমান্য করেছে পরে তাকেই আবার মান্য করতে শিখেছে। কোনো জনপ্রিয় লেখকের জনপ্রিয়তা হঠাৎ কি কারণে নষ্ট হয়ে যায় কিংবা দীর্ঘকাল অনাদৃত থাকার পরে হঠাৎ কোনো লেখক কি কারণে সমাদর লাভ করেন, এই রহস্য উদ্ঘাটন সাহিত্য-সমালোচকের অন্যতম কর্তব্য। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের গুণগ্রাহীর সংখ্যা একদা আমাদের দেশে কম ছিল না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'কঙ্কাবতী'র গুণকীর্তন করেছিলেন। সেই ত্রৈলোক্যনাথ আজ বিস্মৃতপ্রায় লেখক। অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার হলেও এরূপ ঘটনা অকারণে ঘটে না। গল্পসংকলন গ্রন্থটির ভূমিকায় সংকলনকর্তা প্রমথনাথ বিশী এই বিস্মৃতির মূল কারণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন, সেটি প্রণিধানযোগ্য। এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ আছে। প্রমথবাবু বলেছেন ত্রৈলোক্য-নাথের যখন তিরোভাব ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁর মতে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ জনপ্রিয়তাই ত্রৈলোক্যনাথের বিলোপসাধন ঘটিয়েছে। এর মধ্যে অনেকখানি সত্যতা আছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তথাপি বলব এটি অন্যতম কারণ, একমাত্র কারণ নয়। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, যিনি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের আমলেও আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি কি এক শরৎচন্দ্রের আঘাতেই ধরাশায়ী হলেন? আমার মনে হয় ব্যাপারটা অমন অকস্মাৎ ঘটে নি। শিকড় আগে থেকেই ক্ষয়ে এসেছিল। শুধু তাই নয়, আমি বলব ত্রৈলোক্যনাথ আমাদের সাহিত্যে তেমন পাকা ভাবে আসন গেড়ে বসবার অবকাশই পান নি। তিনি যখন লিখতে শুরু করেছেন তখন আমাদের কথাসাহিত্যের সবে জন্ম হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাঙালীর মন তখন মশগুল হয়ে আছে। তার পরে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙালী পাঠকের সমস্ত মনোযোগ এঁরা দুজনেই আত্মসাৎ

করেছেন। এই দুই বিরাট সাহিত্যকীর্তির মাঝখানে পড়ে ত্রৈলোক্যনাথ শুধু স্বল্পস্থায়ী বিনোদনপর্ব অর্থাৎ ইণ্টারলিয়ুড্ হিসাবে বিরাজ করেছেন। তার বেশি গুরুত্ব তিনি প্রথমাবধিই পান নি।

আধুনিক যুগের দৃষ্টিতে ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের লেখায় একটি দুর্বলতা আছে। সেটি হচ্ছে, তিনি তাঁর কাহিনীকে সম্ভাব্যতার পরিধির মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। সাহিত্যের আদিকাণ্ডে ছিল অসম্ভবের কল্পনা, সুন্দরকাণ্ডে অর্থাৎ সাহিত্যের পরিণত যুগে সেই প্রগল্‌ভ কল্পনাকে বাগ মানানো হয়েছে। গোড়ার দিকে দেবতা দানবে মানুষে রাক্ষসে ভেদ ছিল না। পরবর্তীকালে মানুষের কল্পনা আকাশ ছেড়ে মাটিতে নেবেছে। গপ্প ছেড়ে গল্পে এসে পৌচেছে। দেবতা দানব তো নয়ই এমন-কি রাজা রাজড়া উজীর নাজিরও নয়, আমাদের চেনা জানা রাম শ্যাম যদু মধুর কাহিনী। ত্রৈলোক্যনাথ প্রথম আঘাত পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে, সাহিত্য যেখানে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত মহলে এসে পৌচেছে। শরৎচন্দ্র সেই সব ঘরোয়া মানুষের কথা আরো বেশি ঘরোয়াভাবে লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের তবু কিঞ্চিৎ মিল ছিল। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় ভূত প্রেত এবং অন্যান্য সূক্ষ্মদেহী জীবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, আর বঙ্কিমবাবু আমাদের টেনে নিয়ে গিয়েছেন মোগল-অন্তঃপুরে কিংবা রাজপুত-শিবিরে। আমাদের কাছে দুইই সমান অবাস্তব। ভূত সম্বন্ধে যতটুকু জানি মোগল-অন্তঃপুর সম্বন্ধে তার চেয়ে কম ছাড়া বেশি জানি নে। ভূত এবং অতীত সমার্থবোধক এবং আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া উভয়ের প্রতি সমতুল্য। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও সম্ভাব্যতার গণ্ডীকে অতিক্রম করেন নি। আমি যাকে অবাস্তব বলেছি সে আর কিছু নয়, আমাদের সঙ্গে ছিন্ন-সম্পর্ক অতীত। প্রত্যক্ষপরিচয়ের অভাবেই আমরা অতীতকে অবাস্তব বলে মনে করি। প্রতিভার জাদুস্পর্শ পেলে ঘুমন্ত অতীতও মেধের সুমুখে জীবন্ত হয়ে ওঠে, বঙ্কিমচন্দ্রের বেলায় তাই হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের ভূত অতীতের ভূত নয়, চিরকেলে ভূত অর্থাৎ যে ভূতকে আমরা অসম্ভব বলে জানি কিন্তু মনে মনে সম্ভব বলে মানি। অসম্ভবকে আশ্রয় করেও চমৎকার রসসৃষ্টি হতে পারে, দেশবিদেশের সাহিত্যে তার নিদর্শন আছে। আমাদের সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ তার প্রমাণ রেখেছেন। তিনি বিশেষ করে যে রসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তাকে বলা চলে উদ্ভট রস, ইংরেজিতে যাকে বলে grotesque। কিন্তু আগেই বলেছি অকস্মাৎ মানসিক হাওয়াবদলের দরুন যতখানি তাঁর সমাদর হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। মনোরঞ্জনের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন হয়ত-বা গ্রাহ্য হত কিন্তু প্রকৃতকে ছেড়ে অতিপ্রাকৃতের প্রশ্রয় দিতে পাঠকসম্প্রদায় তখন রাজি হয় নি। ইতিমধ্যে বাস্তব সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে, সাহিত্যও নানাদিক থেকে পরিপুষ্ট হয়েছে। তার ফলে আমাদের রুচি বদলেছে, রসজ্ঞান উদারতর এবং ব্যাপকতর হয়েছে। এখন উদ্ভট রস সম্বন্ধে আমাদের মনে আর সেই অসহিষ্ণুতা নেই বরং আগ্রহ আছে। প্রমাণ— পরশুরামের জনপ্রিয়তা। উদ্ভট রস তিনিও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন এবং সে রস যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের বাহন হতে পারে তাঁর লেখায় তার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ রয়েছে। ভুষণ্ডীর মাঠ, হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্পের রসগ্রহণে আমরা যদি বিমুখ না হই তবে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের প্রতি বিমুখ থাকব কেন? এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের পরাক্রমে যদি ত্রৈলোক্যনাথ একদিন রাজ্যচ্যুত হয়ে থাকেন তবে বলব এ যুগের পরশুরাম আপন বিক্রমে তাঁকে আবার রাজ্যপাটে ফিরিয়ে এনেছেন। পরশুরামের কল্যাণে ত্রৈলোক্যনাথের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের গল্প আপাতদৃষ্টিতে একান্ত 'উদ্ভট কল্পনা প্রসূত মনে হলেও তা নিতান্ত বাস্তবসম্পর্করহিত নয়। গল্পের খাতিরে তাঁর চরিত্র সূক্ষ্মদেহে কখনো আকাশে উড্ডীন কখনো পাতালমুখীন, কিন্তু কোনো সময়েই মনুষ্যসমাজ থেকে ছিন্ন-সম্পর্ক নয়। তাঁর অধিকাংশ গল্প ভূত-গ্রস্ত; কিন্তু সে ভূত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সজ্ঞান। এ কথা অনায়াসে বলা চলে যে আপাত-উদ্ভটের অন্তরালে তাঁর মন অতিশয় সমাজসচেতন। সমাজসচেতন কথাটা ইদানীং আমরা অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করছি। শ্রেণীসচেতন না হলে আমরা এখন কাউকে সমাজসচেতন বলে স্বীকার করি না। সমাজের যাবতীয় বিকৃতি এবং অসংগতি সম্বন্ধে যিনি সচেতন তাঁকেই ব্যাপক অর্থে সমাজসচেতন বলা উচিত। যে স্বার্থান্বেষীর দল সমাজকে শোষণ করেছে এবং নানাবিধ অনাচারকে পোষণ করেছে ত্রৈলোক্যনাথ সেই সমাজদ্রোহীদের নির্মমভাবে কশাঘাত করেছেন। সমাজশোধনের উদ্দেশ্যেই তাঁর লেখনীধারণ এবং এ কার্যে তাঁর প্রধান অস্ত্র ব্যঙ্গ। সে অস্ত্র তিনি খুব নিপুণভাবেই ব্যবহার করেছেন। প্রমথবাবু ত্রৈলোক্যনাথকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্যাটায়ারিস্ট বা ব্যঙ্গরসিক আখ্যা দিয়েছেন। এ বিষয়ে অবশ্যই তর্কের অবকাশ আছে। বর্তমানের চেয়ে অতীতের প্রতি অধিক মমতা আমাদের মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। এই কারণেই বোধ করি প্রমথবাবু ত্রৈলোক্যনাথের প্রতি একটু অত্যধিক মমত্ব প্রকাশ করেছেন। পরশুরাম বাঙালী জীবনের বহু বিকৃতিকে খণ্ড খণ্ড চিত্রের সাহায্যে ব্যঙ্গ করেছেন। সেসব চিত্র অতুলনীয়। আরেকটু ধৈর্য সহকারে ব্যাপকতর ক্যানভাস বা পটভূমিকা নিয়ে সমগ্র বাঙালী-জীবনের আলেখ্য যদি তিনি রচনা করতেন তবে তিনি যে শক্তির অধিকারী সেই শক্তির বলে জগৎসাহিত্যে পরশুরামের স্থলে Cervantesএর সমতুল্য হতে পারতেন। প্রমথবাবু নিজেই একজন স্যাটায়ারিস্ট এবং বড় নীচু দরেরও নন। স্যাটায়ারের গুণগ্রাম তিনি আমার চেয়ে ঢের বেশি বোঝেন। আমার মতামত তাঁর বিবেচনা-গ্রাহ্য হবে কি না আমি জানি না। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। আমাদের স্যাটায়ার-সাহিত্য পরিমাণে সামান্য কিন্তু গুণপনায় তুচ্ছ নয়। যে সাহিত্যে হিং টিং ছট্, তোতাকাহিনী এবং তাসের দেশ লেখা হয়েছে সে সাহিত্যে স্যাটায়ারের দারিদ্র্য নিঃসন্দেহে ঘুচে গিয়েছে।

পূর্বেই বলেছি এবং আবার বলছি, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের প্রধান গুণ— গল্প বলায় তাঁর অনায়াস-নৈপুণ্য। গল্প তো নয়, গল্পের জাল— একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে রীতিমত গল্পের জাল বুনে গিয়েছেন। এ ধরনের গল্পের মালা গাঁথা আমরা দেখেছি আরব্যোপন্যাসে। আরব্য-রজনীর গল্পের মতো একে বলা যেতে পারে ত্রৈলোক্য-রজনীর গল্প। সত্যি বলতে কি, ত্রৈলোক্যনাথের গল্প দিনের বেলার চেয়ে রাতের বেলায় পড়তে বেশি ভালো লাগে। আরো কি, নিজে পড়ার চেয়ে অপরে পড়ে শোনালে এ গল্পের রস বাড়ে। ইংরেজ কবি কোলরিজ্ তাঁর কবিতা সম্বন্ধে পাঠকদের কাছে একটি শর্ত দাবি করেছিলেন— wilful suspension of disbelief বলেছিলেন, অবিশ্বাসীর মন নিয়ে এ জিনিস পড়া চলবে না। ত্রৈলোক্যনাথেরও সেই দাবি। তিনি যখন চড়ুই পাখির ন্যায় বৃহৎ মশার কথা বলেন তখন তা বিনা তর্কে বিশ্বাস করে নেওয়াই শ্রেয়। আর, সেটি মেনে নিলে মশার শুঁড় পচে' যে জোঁক হয় সে কথা বিশ্বাস করতেও আর বেগ পেতে হয় না। কোলরিজ আফিং খেতেন। সেটা তাঁর মাথা থেকে মন থেকে উপচে তাঁর কবিতায় প্রবেশ করেছিল। ত্রৈলোক্য মুখুজ্জে আফিং খেতেন কি না আমি জানি নে। কিন্তু তাঁর গল্পে যে প্রচুর পরিমাণে আফিঙের মৌতাত প্রবেশ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। আফিঙের নেশায়

পেয়ে সভ্য ভব্য নব্য ভূত লুল্লুর যে দশা হয়েছিল ত্রৈলোক্য-রজনীর গল্পে একবার প্রবেশ করলে তেমন তেমন নব্য পাঠকদেরও নেশায় পেয়ে বসবে।

ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের আরেকটি গুণের উল্লেখ করে বক্তব্য শেষ করছি। সেটি তাঁর ভাষা সম্পর্কে। এ ভাষার বিশেষ একটি চরিত্র আছে। অত্যন্ত নিরলংকার কারুকার্যহীন ভাষা; কিন্তু এর প্রধান গুণ এই ভাষা সম্পূর্ণরূপে ন্যাকামি-বর্জিত। এর মধ্যে একটুও জলীয় অংশ নেই। কোনো বস্তুর জলীয় অংশ শুষে নিয়ে যেমন dehydrate করা হয় এই ভাষা তেমনি dehydrated ভাষা। উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা আমাদের গদ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন তাঁরা প্রথমাবধিই একে একটি বলিষ্ঠতা দান করেছিলেন। বিশেষ করে বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির ভাষা এর উদাহরণস্থল। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় এঁদের ভাষার প্রসাদগুণ হয়তো নেই কিন্তু এঁদের ভাষার ঋজুতা এবং বলিষ্ঠতা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। জলীয় অংশ নেই বলেই এঁদের ভাষায় পচনশীলতা নেই। তার ফলে দূর-ভবিষ্যতেও এঁদের লেখা লোকে আগ্রহ করে পড়বে। সাময়িকভাবে রাহুগ্রস্ত হলেও ভবিষ্যতের পাঠক এঁদেরকে বারংবার আবিষ্কার করবে।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

কাব্য-কৌতুক। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২। পাঁচ টাকা

সমীক্ষা। ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১২। পাঁচ টাকা

সংস্কৃত-বিষয়ে বাংলায় চর্চা বড় কম। তাহার একটা প্রধান কারণ, যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ 'ভাষা'র প্রতি তাঁহাদের একটা সহজাত অবজ্ঞা বা ঔদাসীন্য। সাহিত্য এবং সাহিত্যের বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে সংস্কৃতের যে সমৃদ্ধি সে সম্বন্ধে আমরা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবহিত না হইলেও আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষিত হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টি এবং সমালোচন উভয় ক্ষেত্রেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা একান্তভাবেই উচিত এ কথাটাও আমাদের মনকে আজকাল নাড়া দিতেছে। এই ঔচিত্যের চেতনা লইয়া অথবা একটা বিশেষ অনুরক্তি লইয়া আমরা যাহারা যাহারা আবার সংস্কৃত-চর্চায় একটু-আধটু হাত দিই তাহারাও সব সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে অধিকারী নই। কারণ সংস্কৃত হইল এমন-একটি ভাষা যাহাকে মোটামুটি একটু বুঝিয়া লইলে কাজ চলে না; শুধু সৃষ্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে ও বচন-ভঙ্গির মধ্যে অনেক স্থলে এমন সূক্ষ্মতা নিহিত থাকে যাহা সতর্ক দৃষ্টি এবং পরিচ্ছন্ন বোধ ব্যতীত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

আলোচ্য 'কাব্য-কৌতুক' গ্রন্থের লেখক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের এই জাতীয় আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অধিকার রহিয়াছে। সংস্কৃতকে তিনি মোটামুটি জানেন না, ইহার ভাষা ও সাহিত্যের ভিতরে তাঁহার সহজ প্রবেশ আছে; অন্য দিকে তিনি বাংলা সাহিত্যের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত— বাংলা ভাষার উপরেও তাঁহার দখল আছে। সংস্কৃত-বাংলা ব্যতীত কিছু কিছু ইউরোপীয় ভাষা ও সাহিত্যের সহিতও তাঁহার কিছু কিছু পরিচয় আছে; এইসব মিলিয়া সংস্কৃত সাহিত্য এবং সংস্কৃত

সাহিত্যালোচনা বিষয়ে বাংলায় তিনি যে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সে বিষয়ে তাঁহার একটি বিশেষ অধিকার আছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। গ্রন্থের নামটি গ্রহণ করিয়াছেন লেখক আচার্য অভিনব গুপ্তের সাহিত্যগুরু ভট্টতৌতের নিকট হইতে, প্রস্তাবনায় তাহার স্বীকৃতি আছে। প্রথম প্রবন্ধে লেখক প্রাচীন ভারতে কবিচর্যার একটি সাধারণ পরিচয় দিয়াছেন; দ্বিতীয় প্রবন্ধ হইল হালকবি রচিত 'গাহা-সত্তসঈ' সম্বন্ধে; প্রবন্ধটিতে লেখক হাল-কর্তৃক সংগৃহীত এই প্রাকৃত গাথাগুলি সম্বন্ধে তথ্যগত পরিচয়ই বেশি দিয়াছেন, কাব্য-পরিচয়ের আভাসমাত্র দিয়াছেন। এই অংশের আলোচনা আমরা আর-একটু বিস্তৃত আশা করিয়াছিলাম, তাহাতে গাথাগুলির কাব্যমাধুর্য সম্বন্ধে আর-একটু স্পষ্ট ধারণা হইতে পারিত। গ্রন্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ হইল 'বাল্মীকি ও কালিদাস' শীর্ষক আলোচনাটি। প্রবন্ধটিতে মহাকবি কালিদাসের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এবং মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই কবিগুরু বাল্মীকির নিকট তাঁহার ঋণের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে লেখক কাব্যের ক্ষেত্রে এই ঋণের তাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যা লেখকের শুধুমাত্র স্বকপোলকল্পিত নয়, সে ব্যাখ্যা সর্বত্রই সংস্কৃত কাব্য-বিচার-শাস্ত্র কর্তৃক সমর্থিত। ইহার পরে বিস্তৃত উদ্ধৃতি ও আলোচনার সাহায্যে লেখক কালিদাস ও বাল্মীকির কাব্য পাশাপাশি রাখিয়া উভয়ের সাধর্ম্য সাদৃশ্য এবং পরবর্তীর উপরে পূর্ববর্তীর প্রভাব লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'ত্রয়ী' নামক আমার এক গ্রন্থে আমিও পূর্বে এ-বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু আমাদের উভয়ের আলোচনা সর্বত্র এক ধরনের নহে; লেখক এখানে সব জিনিসটিকে অনেকখানি স্বতন্ত্রভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। উদ্ধৃতি ও আলোচনার কিছু কিছু মিল অবশ্য অপরিহার্য। এই প্রবন্ধে লেখক শুধু বাল্মীকির নিকট কালিদাসের ঋণের কথাই আলোচনা করেন নাই, 'মহাভারত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের নিকটও কালিদাসের সাহিত্যিক ঋণ যে নিতান্ত যৎসামান্য নহে' এ বিষয়েও তিনি প্রাসঙ্গিক ভাবে একটি আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী সংস্কৃত কবিগণের নিকটে কালিদাসের ঋণের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া লেখক রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত-সাহিত্য ও বৌদ্ধ সাহিত্যের নিকট ঋণের কথা আলোচনা করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী মূলকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী শাখাপল্লব-ফুলফলের সৌন্দর্য মাধুর্য যে কতখানি স্বাস্থ্য হইয়া উঠিয়াছে এ বিষয়ের প্রতি লেখকের ইঙ্গিত রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' ও 'বিদায়-অভিশাপ' নাট্য-কবিতা মহাভারতের উপরেই গ্রথিত; 'পরিশোধ' কবিতাটি (রূপান্তরিত 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য) বৌদ্ধ অবদানগ্রন্থ 'মহাবস্তু'র শ্যামা-জাতকের ভিত্তিতে রচিত। লেখক রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি কাব্যকৃতিকেই মূলের পাশাপাশি রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিবর্তন ও পরিবধন লক্ষ্য করিয়াছেন। এইসব আলোচনার ভিতরে লেখকের পাণ্ডিত্য এবং কাব্যবোধ উভয়ই সমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

মিল-অমিলের প্রশ্নের প্রসঙ্গেই আমরা লেখকের পরবর্তী প্রবন্ধ 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' লক্ষ্য করিতে পারি; এবং আরও লক্ষ্য করিতে পারি যে, আপাতদৃষ্টিতে গ্রন্থখানিকে বিভিন্ন বিষয়ক কতগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি বলিয়া মনে হইলেও সব প্রবন্ধের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত সাজাত্য রহিয়াছে এবং এই সাজাত্যই গ্রন্থখানির লেখাগুলির মধ্যে একটা অস্পষ্ট ঐক্যও দান করিয়াছে। 'কাব্যের আত্মা' 'মেঘদূতে চিত্রসম্পদ্' 'আনন্দবর্ধন ও ধ্বন্যালোক' 'সাহিত্যে ধ্বনিবাদ' প্রভৃতি সাহিত্যবিচার-বিষয়ক

কতগুলি তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুলিখিত প্রবন্ধও গ্রন্থখানির উপযোগিতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এইসব বিষয়েই লেখকের আলোচনার বিশেষাধিকার পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমরা পাঠক-সাধারণের পক্ষ হইতে লেখকের নিকট এইজাতীয় আরও অনেক আলোচনার দাবি জানাইয়া রাখিতেছি।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানি 'সমীক্ষা' লেখকের বিভিন্ন বিষয়ক কতগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলি সাহিত্য-বিষয়কও আছে, ব্যক্তি-বিষয়কও আছে, আবার সমাজসংস্কৃতি-বিষয়কও আছে। প্রথম প্রবন্ধটি 'ব্রতের ফল' বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। এ-জাতীয় কিছু কিছু ব্রতসংক্রান্ত ছড়া আমাদেরও হয়তো জানা আছে; কিন্তু অনেকগুলি একসঙ্গে সন্নিবিষ্ট পাইয়া এগুলিকে আরও উপভোগ করিবার সুযোগ পাইলাম। শুধু সংগ্রহ এবং সন্নিবেশই এখানে বড় কথা নয়, লেখক যে দরদ লইয়া তাহাদিগকে বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং নিজের প্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্বারা তাহাদের স্নিগ্ধ মাধুর্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাতেই ছড়াগুলি স্নিগ্ধোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা দেশের— শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র ভারতবর্ষের— মেয়েলি ব্রতকথা অবলম্বন করিয়া যে ছড়াগান আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের একটি নিখুঁত ছবি ও স্নেহপ্রীতির একটি কমনীয় পরিবেশ, তাহার মধ্যে অনাড়ম্বর প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া কুমারী-মনের অস্ফুট-অর্ধোস্ফুট কামনাগুলি এখানে একটা সহজ-প্রকাশের ভিতরে অত্যন্ত হৃদ্য। লেখক তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধটিতে এই সূক্ষ্মচারুতার পরিচয় আমাদের সামনে ফুটাইয়া তুলিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রাম্য ছড়া'তেও তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কতগুলি ছড়া উদ্ধৃত করিয়া ঐসব অঞ্চলের পল্লীজীবনের টুকরা টুকরা কয়েকটি চিত্র আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করিয়াছেন। বাংলার গ্রাম্য ছড়াগুলির সঙ্গেও অনেক স্থলে ইহাদের সাদৃশ্য বা একটা সাজাত্যের প্রতিও লেখক স্থানে স্থানে ইঙ্গিত করিয়াছেন। লেখক এখানে যে সত্যের আভাসমাত্র দিয়াছেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া বহু সংগ্রহ বিচারবিশ্লেষণ ও আলোচনার অবকাশ আছে।

অন্যান্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে হাস্যরস বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা আছে; এ ক্ষেত্রে লেখকের তথ্যসম্পদ্ এবং তাহার পরিবেশন-কৌশল উভয়ই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে কয়েকটি প্রবন্ধ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে 'পরীক্ষক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; অন্ততঃ পরীক্ষাকার্যের সঙ্গে নিজে দীর্ঘদিন যুক্ত বলিয়া রবীন্দ্রনাথের এই অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত পরীক্ষক-রূপটি আমাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্ন আমারাও হরহামেশাই করিয়া থাকি; নিজেদের সেই প্রশ্নগুলি স্মরণ-ভূমিকায় যখন মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ-কাব্য' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রশ্ন দেখিলাম তখন প্রশ্ন করিবার ভিতরেও দুই জাতীয় মনের মধ্যে যে কতখানি আকাশপাতাল পার্থক্য থাকিতে পারে তাহা নিজের নিকটে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ-রচিত এ-জাতীয় একটি প্রশ্নের খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। প্রশ্নটি জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ১৯০৬ সালের পঞ্চম শ্রেণীর জন্য (Fifth Standard) রচিত হইয়াছিল। প্রথম প্রশ্ন হইল প্রবন্ধ-লেখা; রবীন্দ্রনাথ তিনটি প্রবন্ধ লিখিতে দিয়াছিলেন—

১. ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরীতীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে সুরবন সম।

গোদাবরীতীরে স্থিত রাম ও সীতার কুটীর এমন বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা কর, যেন তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছ; অর্থাৎ কুটীরের সম্মুখবর্তী নদীর তটভাগ কিরূপ, তাহার সমীপবর্তী বনে কি কি গাছ কিরূপে অবস্থিত, কুটীরের মধ্যে কোথায় কি আছে তাহা প্রত্যক্ষবৎ লিখ।

অথবা

২. পুরাণে বা ইতিহাসে যাঁহার চরিতে তোমার চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

অথবা

৩. যে-কোনো বাল্যপরিচিত প্রিয় আত্মীয় বন্ধুর বা পুরাতন ভৃত্যের বা পোষা প্রাণীর কথা ও তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া লিখ।

উপরে উদ্ধৃত প্রবন্ধ তিনটি লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইবে আমরা সাধারণতঃ পরীক্ষামার্কা যেসব প্রবন্ধবাণ কিশোরদের প্রতি নিক্ষেপ করি এগুলি তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে পৃথক্। সে পার্থক্য কোথায়, প্রবন্ধের লেখক বিজনবাবুই তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখান হইতেই পাঠককে আলোচনাটি দেখিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি।

সাধারণ বিষয় লইয়া লেখার মধ্যেও লেখকের বাচনভঙ্গির একটি সরসতা লক্ষ্য করিতে পারি। স্থানে স্থানে একটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গপ্রিয়তা লেখাগুলিকে সুখপাঠ্য করিয়াছে।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত। রাজনারায়ণ বসু। শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, কলিকাতা ১২। এক টাকা

ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ ও ইতিবৃত্ত। রাজনারায়ণ বসু। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা ৬। ২৫ নয়া পয়সা

সে কাল আর এ কাল। রাজনারায়ণ বসু। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ৬। এক টাকা

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, পদে পদে তাঁদের দুষ্প্রাপ্য 'out of print' বইয়ের বাধা অতিক্রম করতে হয়। অনেক সময় এই বাধার জন্য অনুসন্ধানের একাগ্রতা ব্যাহত হয় এবং যে-কাজ যে-সময়ের মধ্যে করা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে তা শেষ করতে। সমস্ত বই সব সময় 'মুদ্রিত' অবস্থায় পাওয়া সম্ভব নয়, এবং যে-কোনো পুরনো বই পুনর্মুদ্রণ করলেই যে প্রকাশক লাভবান হবেন, তাও সত্য নয়। যেমন আপজন-কৃত ১৭৯৩ সালের প্রথম বাংলা-ইংরেজি অভিধান, অথবা জোনাথান ডানকান অনূদিত দেওয়ানী আদালতের বাংলা আইনের বই, এখন পুনর্মুদ্রিত হলেও, কৌতূহলী গবেষকগোষ্ঠীর বাইরে তার চাহিদা বাড়বে বলে মনে হয় না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অনেক গবেষণালব্ধ তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস পরবর্তীকালে রচিত হলেও, আজও যে হারাণচন্দ্র রক্ষিতের "ভিক্টোরিয়া-যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য" বা রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য

বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে কোনো লাভ নেই, এমন কথা বলা যায় না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-সাহিত্যে এই বই দুখানির একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে, গুরুত্বের দিক দিয়ে ; এবং সাধারণ পাঠক-ছাত্রসমাজে তার সমাদর একেবারে হবে না বলে মনে হয় না। এ রকম আরো অনেক বই এবং অনেকের রচনা আছে, বাংলার সমাজের ও সাহিত্যের ইতিহাস অনুশীলনের জন্য যেগুলির পুনর্মুদ্রণ বিশেষ প্রয়োজন। রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির রচনাবলী দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

মুষ্টিমেয় গবেষকগোষ্ঠীর বাইরেও বৃহত্তর শিক্ষিত পাঠকসমাজে রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ বাংলার মনীষীদের রচনাবলী পাঠের আগ্রহ আজ অনেক বেড়েছে আগের তুলনায় এবং ক্রমেই বাড়ছে। দু-এক জন প্রকাশক তাই এঁদের দু-একখানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিতও করেছেন। কিন্তু এইসব রচনা পুনর্মুদ্রণের সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সকলে সমানভাবে পালন করেন নি। পর্যাপ্ত 'সম্পাদকীয় টীকা' ও 'গ্রন্থনির্দেশিকা' না থাকায় কয়েকটি পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থের উপযোগিতা কমে গিয়েছে। আমাদের আলোচ্য তিনখানি বই ঠিক 'পূর্ণাঙ্গ' গ্রন্থ নয়, 'পুস্তিকা' বলা যায়। প্রথমটি একটি বক্তৃতা, দ্বিতীয়টিও দুটি বক্তৃতা, এবং তৃতীয়টিও একটি বক্তৃতার 'নোট' থেকে লিখিত। সব কটি রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ও রচনা। নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা ও প্রবন্ধ হলেও, বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে এগুলির পুনর্মুদ্রণের সার্থকতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' নামের মধ্যেই বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। ১৮৭৫ সালের প্রথম কলেজ সম্মিলনে রাজনারায়ণ বসু এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ইতিহাসের দিক থেকে তো বটেই, ছোটখাটো স্মৃতিকথার দিক থেকেও, রাজনারায়ণ বসুর এই প্রবন্ধটি মূল্যবান। কিন্তু প্রধানত স্মৃতিনির্ভর রচনা বলে, সন-তারিখের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রচনার মধ্যে রয়ে গিয়েছে। শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য সযত্নে, ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে, গোড়াতে তাঁর সম্পাদকীয় টীকা 'গ্রন্থ-পরিচয়'এর মধ্যে সেগুলি সংশোধন করে দিয়েছেন। 'গ্রন্থ-পরিচয়'এর মধ্যে (পৃ ৫) একটি তারিখের ভুল (ছাপার ভুল?) নজরে পড়ল, যা উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লেখা আছে— '১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে ২০শে আগস্ট রামমোহন রায় ঐ বাড়ী ভাড়া নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন'। ৬ ভাদ্র ১৮৫০ শক, ২০ আগস্ট ১৮২৮ সালে ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুব বেশি বলে তার পরিচয় সম্পাদকীয় টীকায় আরো কিছুটা দিতে পারলে ভালো হত। প্রসঙ্গত এই গৃহ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র উক্তি মনে পড়ছে: "This house is a historical one, as it is associated with the educational and religious reform of the people of Bengal. It was in this house that the Hindu College was held for some time. It was in this house that Ram Mohan Raya inaugurated his reforms in the national system of religion by the establishment of the Brahmo Samaj. And it was in this house, too, that Alexander Duff laid the foundation of Christian education in India."—*Recollections of Alexander Duff*, London 1879, p. 47.

বিনয়কৃষ্ণ দেব রচিত *Early History and Growth of Calcutta* খুব নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ নয়। 'আরাতুন পিক্রস' সম্বন্ধে বা আদিকালের ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক বিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে

পরিচয় দেওয়া যেত এবং দিলে আরো ভাল হত। যেমন Lushingtonএর *History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions founded by the British in Calcutta and its Vicinity* (1824)। রামকমল সেনের *Dictionary in English and Bengalee*-গ্রন্থের ভূমিকাতেও (পৃ ১৬-১৭) এ বিষয়ে উল্লেখ আছে।

একটি প্রবন্ধের জন্য মোটামুটি যতখানি 'পরিচয়' দেওয়া প্রয়োজন তা দেবীপদবাবু দিয়েছেন এবং তার জন্য এই মূল্যবান ঐতিহাসিক রচনাটির উপযোগিতাও বেড়েছে।

'ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ' ও 'ব্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত' নামে দুটি বক্তৃতা 'ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ ও ইতিবৃত্ত' পুস্তিকায় সংকলিত হয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের আদিযুগের নেতাদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু অন্যতম। ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতাগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে যথেষ্ট। প্রথম বক্তৃতাটি মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত। এই বক্তৃতায় ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। আত্মচরিতে রাজনারায়ণ লিখেছেন যে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর এই বক্তৃতা পাঠ করে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। দ্বিতীয় বক্তৃতা 'ব্রাহ্মধর্মের ইতিবৃত্ত' ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত। এই বক্তৃতায় ব্রাহ্মসমাজের আদিযুগের বিবরণ আছে। পুস্তিকার শেষে বক্তৃতায় উল্লিখিত ব্যক্তি বিষয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 'নোট' সংযোজিত হয়েছে। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আরো একটু বিস্তারিত পরিচয় দিতে পারলে ভাল হত, বিশেষ করে দ্বিতীয় বক্তৃতার। আফসোসের কথা এই যে বাংলা ভাষায় আজও 'ব্রাহ্মসমাজে'র কোনো প্রামাণিক ইতিহাস রচিত হয় নি। ইয়োরোপের 'রিফর্মেশন' ও 'প্রটেস্টান্ট ধর্ম' সম্বন্ধে অনেক ইতিহাস লেখা হয়েছে। বাংলাদেশে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, অথচ আজও তার কোনো প্রামাণিক ইতিহাস লেখা হল না। এ যদি আমাদের ইতিহাসচেতনার অভাব হয় তা হলে তা লজ্জার কথা। আপাতত রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতার মত কিছু রচনা পুনর্মুদ্রিত করে কাজ চালানো ছাড়া হয়তো উপায় নেই।

'সে কাল আর এ কাল' রাজনারায়ণ বসুর সুপরিচিত রচনা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই রচনাটি পুনর্মুদ্রিত করে অনেকের উপকার করেছেন। প্রবন্ধের মধ্যে যেসব ভুল সন-তারিখ ছিল, সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয় তা সংশোধন করে দিয়েছেন, কিন্তু মূল রচনাতে না করে সম্পাদকীয় টীকায় করলে বোধ হয় ভাল হত। প্রবন্ধের মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যার ঐতিহাসিক পটভূমি সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকরা অবহিত নাও থাকতে পারেন। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস যদি এই সকল টীকা যোগ দেন তা হলে রচনাটির উপযোগিতা আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে।

বিনয় ঘোষ

—

সংশোধন : গত সংখ্যায় মুদ্রিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' প্রবন্ধে কতকগুলি নামের শুদ্ধ বানান হইবে—
পৃ. ৫ Carroll, Bashkirtseff ; পৃ. ৬ Ouida ; পৃ. ৭ Andersen ; পৃ. ৮ Lalla।
বর্তমান সংখ্যার পৃ. ১২২ ছত্র ২৭ 'ধনতিমির' স্থলে 'ঘনতিমির' হবে।

তুমি খুশি থাক আমার পানে চেয়ে চেয়ে
তোমার আঙিনাতে বেড়াই যখন গেয়ে গেয়ে ॥
তোমার পরশ আমার মাঝে সুরে সুরে বুকে বাজে,
সেই আনন্দ নাচায় ছন্দ বিশ্বভুবন ছেয়ে ছেয়ে ॥
ফিরে ফিরে চিত্তবীণায় দাও যে নাড়া,
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া দেয় সে সাড়া।
তোমার আঁধার তোমার আলো দুই আমারি লাগল ভালো—
আমার হাসি বেড়ায় ভাসি তোমার হাসি বেয়ে বেয়ে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

সা সা -া II সা সা -ধা । ধা ধা -া I -া -া -া । -নধা -পা -া I
তু মি ০ খু শি ০ থা কো ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০

I পনা না -া । ধা ধা -না I পধা পা -া । মগা রা -গা I
আ মা র্ পা নে ০ চে০ য়ে ০ চে০ য়ে ০

I সা সা -রা । রা গা -া I -া -া -া । পা পা -া I
খু শি ০ থা কো ০ ০ ০ ০ তো মা র্

I পা ধা -র্সা । র্সা র্সা -া I সর্রা র্সা -া । না ধা -না I
আ ঙি ০ না তে ০ বে০ ড়া ই য খ ন্

I ধপা -া -ধা । না -া -া I না না -া । ধা ধা -না I
বে ০ ০ ড়া ০ ই গে য়ে ০ গে য়ে ০

I পধা পা -া । মগা রা -গা I সা সা -রা । রা গা -া I
বে০ ড়া ই য০ খ ন্ খু শি ০ থা কো ০

I -া -া -া । সা সা -া II
০ ০ ০ "তু মি ০"

পা পা -া II পা গা -া । পা পা -ধা I ধর্সা র্সা -া । র্সা র্সা -র্রা I
তো মা র্ প র শ আ মা র্ মা০ ঝে -০ সু রে ০

I র্সা -া -া । -র্রা -র্গা -র্রা I র্সা -া -া । র্সা র্সা -র্রা I
স্ব ০ ০ ০ ০ ০ রে ০ ০ বু কে ০

I র্সা -া -া । -র্রা -র্গা -র্রা I র্সা -া -া । -া -া -া I
বা ০ ০ ০ ০ ০ জে ০ ০ ০ ০ ০

I র্গা -া র্গা । র্রা -া র্রর্সা I র্সর্রা র্সা -া । না -া ধা I
সে ই আ ন ন্ দ০ না০ চা য়্ ছ ন্ দ

I না -া না । ধা ধা -না I পধা পা -া । মগা রা -গা I
বি শ্ শ ভু ব ন্ ছে০ য়ে ০ ছে০ য়ে ০

I সা সা -রা । রা গা -া I -া -া -া । সা সা -া II
খু শি ০ থা কো ০ ০ ০ ০ "তু মি ০"

-া -া -া II { সা সা -া । সা সা -রা I রা -া গা । গা রা -গা I
০ ০ ০ ফি রে ০ ফি রে ০ চি ৎ ত বী ণা য়্

I সা -া রা । রা গা -া I -া -া -া । -া -া -া I
দা ও যে না ড়া ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -া ধা । র্সা না -া I পা -া -ধা । না ধা -না I
গু ন্ জ রি য়া ০ গু ০ ন্ জ রি ০

I ধপা -া -া । -ধা -না -ধপা I পনা -া না । ধা ধা -না I
য়া০ ০ ০ ০ ০ ০০ দে য়্ সে সা ড়া ০

I ধা -া পা । মগা রা -গা I সা -া রা । রা গা -া I
চি ৎ ত বী০ ণা য়্ দা ও যে না ড়া ০

I -া -া -া । -া -া -া } I পা গা -া । পা পা -ধা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ তো মা র্ আঁ ধা র্

I ধর্সা র্সা -া । র্সা র্সা -া I র্সা -র্রা -া । র্রা র্সর্রা -র্গর্রা I
তো০ মা র্ আ লো ০ দু ই ০ আ মা০ ০০

I র্সর্া -া -া । -া -া -া I র্সা -া র্রা । র্সর্রা -র্গর্রা -া I
রি • • • • • লা গ্ ল ভা• •• •

I র্সর্া -া -া । -া -া -া I র্গা র্গা -া । র্রা র্রা -র্সা I
লো • • • • • আ মা র্ হা সি •

I র্সর্রা র্সা -া । না ধা -না I না না -া । ধা ধা -না I
বে• ড়া য়্ ভা সি • তো মা র্ হা সি •

I পধা পা -া । মগা রা -গা I সা সা -রা । রা গা -া I
বে • য়ে • বে• য়ে • খু শি • থা কো •

I -া -া -া । সা সা -া II II
• • • "তু মি •"

দোলনচাঁপা

শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্দশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮০ শক

চিঠিপত্র

শ্রীঅমল হোমকে লিখিত পত্রাবলী হইতে নির্বাচিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

Shillong

[Postmark : 8 May 27]

কল্যাণীয়েষু

অমল, শিলঙে এসে পৌঁছেচি।

কাল এল আমার জন্মদিনে তোমার প্রণাম। আমি আনন্দিত।

নতুন বাসা গাছের ডালের মতো, মন তার উপরে নিজের কাঠিকুটি দিয়ে বাসাটি বাঁধে, তবে সেখানে স্থির হয়ে বসতে পারে। তাতে একটু সময় লাগে। এখানে কোটর পেয়েছি কুলায় পাইনি এখনও। এখানে বাসা বাঁধা হলেই তোমার গল্প সুরু করবার চেষ্টা করব।

আত্মশক্তিওয়ালারা আমার চন্দননগরের সেই বক্তৃতার একটি প্রতিলিখন আমাকে দিয়েছিল। সেটা আমার নয়— সেটা তাদেরই রিপোর্ট— বোধহয় স্মৃতি অনুসরণ করে লিখেছিল। কিন্তু স্মৃতি জিনিষটা লিপিকারের নিজের মনের জিনিষ, এই জন্যে আমার মনের জিনিষকে সে আপন গড়ন দিয়েছে। অগত্যা নিজে মনে করে করে লিখলুম। যা বলেছিলুম এটা তার সম্পূর্ণ প্রতিরূপ হতে পারে নি— কেননা স্মৃতি বলে কোনো বালাই আমার নেই। এর একটি মাত্র সাফাই জবাব এই যে, বক্তৃতাটা যেমন আমার ছিল এটাও তেমনি আমারই। কিন্তু এর পরে আত্মশক্তির আত্মীয়তার দাবী চলবে না, তুমি কি তাদের জানাবে এ কথাটা ?

কিছুদিন আগে বঙ্গবাণী একটা লেখা আমার কাছে দাবী করেছিল। এইটে কপি করে অবিলম্বে যদি তাদের কাছে পাঠাতে পারো তাহলে জ্যৈষ্ঠের গাড়ি হয়ত miss করবে না।[১] যাই হোক আমার কর্ত্তব্য সমাধা হবে, তুমি অর্জ্জন করবে আমার সাধুবাদ। নির্ভুল কপির জন্য তোমার পরে নির্ভর করতে পারি বলেই এ অত্যাচার।

সাহিত্যধর্ম্মের একটা কপি করে সুরেনকে দিয়েচ কি ? পাণ্ডুলেখ্যটি তোমারি প্রাপ্য একাধিক কারণে। কিন্তু পিতামহ যখন শরশয্যা গ্রহণ করবেন সে অন্তিমকালে কোথায় থাকবে ভাবচি।

খবর যদি কিছু থাকে তো জানিয়ো। নাও যদি থাকে তবু চিঠি লিখতে দোষ নেই। তবে তোমার পত্র এখন সবই চলেচে হিমালয়ের বুকে। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৩৪

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ সংখ্যা বঙ্গবাণী হইতে রচনাটি ("সম্মান") বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইল।

২

Asantuli
Darjeeling

কল্যাণীয়েষু

বরাহনগরের অন্নগ্রহণের জন্যে তোমার ঔৎসুক্য এত বেশি যে ফরাসী পাচক আমদানীর অপেক্ষা করতেও তর সইচে না। তোমার এই বুভুক্ষার সংবাদ রানীকে জানাবার ভার আমাকে দিয়েছ। কিন্তু শশিভূষণ ভিলা থেকে তোমার হোম ভিলার যে দূরত্ব হিমাচলের দূরত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি। তবুও তোমার হয়ে মোক্তারি করবার চেষ্টা করব কিন্তু আতিথ্যের ক্রুটি হলে আমাকে অপরাধী কোরো না।

ছোট্ট একটা জ্বর আমার বিরুদ্ধে এমন উঠে পড়ে লাগল যে শান্তিনিকেতনের বাসা থেকে আমাকে খেদিয়ে নিয়ে এল এই সমুচ্চ মেঘলোকে। জ্বর ছাড়ল কিন্তু জনতায় ধরেচে।

রাজবন্দীদের কৃত অভিনন্দনের বিবরণ পড়ে খুব আনন্দ লাভ করেছি— প্রত্যুত্তরে দুচার কথা লিখে দেবার ইচ্ছা রইল।

স্বাস্থ্যসন্ধানের প্রত্যাশায় গিরিশৃঙ্গের চেয়ে গিরিডি তোমার কাছে শ্রেয়স্কর কেন মনে হোলো? তুমি রইলে জলধারার ধারে, আমরা আছি জলধরের বক্ষে— লক্ষ্য একই— স্বাস্থ্যসাধনা,— কিন্তু ক্ষেত্রের মধ্যে এত পার্থক্য। পরিবর্ত্তন করতে ক্ষতি কি— এখানে বর্ষণ সুরুর আগেই? ইতি ৩১ মে, ১৯৩১

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

ওঁ

আসানটুলি
দার্জ্জিলিং

কল্যাণীয়েষু

অমল, রাজবন্দীদের একটি প্রত্যভিনন্দন লিখে তোমাকে পাঠালুম। যথাস্থানে পৌঁছবে কিনা সন্দেহ— চেষ্টা কোরো। ওদের অভিনন্দন এবং আমার এই লেখাটা প্রবাসীতে পাঠালে দোষ কি? তুমি কপি করে পাঠিয়ে দিও। রাজবন্দীদের মূল লিপিটা যথাযোগ্য স্থানে রক্ষিত হবে আশা করি। রানীকে তোমার দরবার জানিয়েছি— এই উপলক্ষ্যে পাচকের সুব্যবস্থা যদি হয় তবে ভবিষ্যতে এই নজীর আমিও ব্যবহার করতে পারবো। শরীর ভালই আছে কিন্তু লেখা বা আঁকা বন্ধ— ঘনঘোর কুঁড়েমিতে আমার মাথা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

অমল, জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমাকে পার্স্ দেবার সংকল্প ত্যাগ কর। সে টাকা তোমরা বন্যার্ত্তদের দিও। আমি শরৎকে লিখলুম। চিঠিখানা তাকে পৌঁছে দিও। সে সামতা না আমতা কোথায় আত্মগোপন

করে আছে, তার পাত্তা পাওয়া কঠিন। ঠিকানা ভুলে গেচি, লেখা আছে কোথাও। আপাতত হাতের কাছে অমিয়ও নেই। অতএব— ত্রুটি মার্জ্জনীয়। ১২ ভাদ্র ১৩৩৮

শুভার্থী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

Uttarayan
Santiniketan, Birbhum.

কল্যাণীয়েষু,

অমল, পারস্যে যাবার বেশি দেরি নেই আর। তার আগেই যদি দেখা দাও এখানে মন্দ কী ?

আজকাল পোষ্টকার্ড ধরেচি, এক পয়সা বাঁচাবার জন্য নয়— আমাদের ডাকঘরের দারোগা চিঠিপত্র বৃথা খোলাখুলি করে হয়রাণ হয়— তার দুঃখ নিবারণ করা কর্ত্তব্য মনে করি। ইতি ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু

অমল, সাধু, তোমার চুষি কাগজগুলো আমার রচনাপত্রীর আকস্মিক কলঙ্কলাঘবে নিযুক্ত হোলো। তাদের জন্যে যে চর্ম্মকোষ নির্ম্মাণ করেছ সেটাতেও তোমার সুবিবেচনা প্রকাশ পাচ্চে। নইলে "প্রভাত হইলে দশদিকেতে গমন।" তোমার যে এত পূর্ব্বকালের এত ক্ষুদ্র কথাটি মনে আছে এতে আমি বিস্মিত। সাধারণত যে মানুষ দেবে স্বীকার করে, তার চেয়ে প্রবলতর স্মরণশক্তি যে মানুষ পাবে আশা করে তারই। এক্ষেত্রে তার উল্টো ঘটল।

পারস্য অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্চি। পাখা মেলবার পূর্ব্বে তোমাদের করস্পর্শ নিয়ে যাব। কেদারায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আছি। লেখা দেখেই বুঝতে পারবে। ইতি ৩ চৈত্র ১৩৩৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু

আজকাল দুর্বল শরীর বাঁধা থাকে লম্বা কেদারায়, নিষ্কর্মা মনটা দৌড় দেয় দূর শূন্যপথে, কর্ত্তব্যের দাবী কানে এসে পৌঁছয় না। তোমার চিঠিখানি পড়েছিল টেবিলে তার এবং আমার মাঝখানে ছিল অগাধ

বিস্মৃতি। অকস্মাৎ এইমাত্র আমার চোখে পড়ল— দ্বিতীয়বার ভোলবার পূর্বেই তোমাকে তোমার জন্মদিনের আশীর্বাদ পাঠাচ্চি— শত জন্মদিনের অধিকার লাভ কর। ইতি ১৪।১১।৩৭

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়েষু

অমলিনা যদি দাদুর মিলন-প্রয়াসিনী হন তাহলে তাঁকে বোলপুর অভিমুখে অভিসারে বেরতে হবে এই কথা জানিয়ে রেখে দিলুম। সামনে অনেকগুলো ব্যাঘাত আছে সেগুলো পেরিয়ে কলকাতায় কবে পৌঁছতে পারব নিশ্চিত বলতে পারচিনে। আপাতত চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের রচনা ও রিহর্সল নিয়ে পড়েছি— কাজটা সহজ নয় কিন্তু ফলটা অকিঞ্চিৎকর হবে বলেই মনে করি— কারণ বাংলাদেশে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মুরুব্বির সংখ্যা এ প্রদেশের জনসংখ্যার প্রায় সমান্তরালেই চলে— ভাগ্যবিধাতা আমাকে ভুল ঠিকানায় চালান করে দিয়ে এখন ফেরাবার পথ পাচ্চেন না। ইতিমধ্যে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দড়িটানা ব্যায়ামে ডাক্তারেরই জিত হোলো। ইতি ২০ মাঘ ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯ ওঁ

Gouripur Lodge.
Kalimpong.

কল্যাণীয়েষু

আমার জন্মদিনে কবীন্দ্র কবিসম্রাট প্রভৃতি নানা মোটা ভাষায় অনেকে আমার কবিত্বের গুণগরিমা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তুমি ইসারায় বলে নিয়েছ কলম আর ফুল একসঙ্গে দিয়ে। এ হোলো প্রতীক দিয়ে বলা, ভাষায় বলার সেরা। তোমার আরবারকার দেওয়া কলমকে, ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার মতো, আকাশবাণী সংগ্রহের কাজে এ পর্যন্ত অনেক ছুটিয়েছি। মাঝে মাঝে ছবি আঁকার কঠিন রাস্তায় চালিয়ে জখম করেছিলুম, কিন্তু মায়া ছাড়তে পারি নি, চিকিৎসা করে খাড়া করেছি। এখন তার দশা কতকটা আমারি মতো, পঙ্গু অথচ কাজও চালায়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কলমটি আসাতে পূর্বোক্তটিকে বিশ্রাম দেবার সুযোগ হোলো— এর নাম দেবো ঐরাবত— উচ্চৈঃশ্রবার চেয়ে এর আয়তনের গৌরব আছে।

কাল আমার জন্মদিনের বাণী আকাশ থেকে বর্ষণ করেছিলুম রেডিয়োযোগে— আমার বোধ হয় ছাপার অক্ষরের জড় শৃঙ্খলে কবিতাকে না বেঁধে সঞ্চরণ করতে দেওয়া উচিত সেই আকাশপথে যেখান থেকে আসে আলো, সমীরিত হয় প্রাণবায়ু। আমার স্বনামধারী যিনি মিতা তাঁর বাণীও তো ঐ দিক থেকেই আসে।

আমার আশীর্বাদ তোমরা তিন জনে ভাগ করে নিয়ো, ভাগ হলেও কারো ভাগে কম পড়বে না। ২৬শে বৈশাখ ১৩৪৫

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০ ওঁ

গৌরীপুর ভবন

কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু

তোমার ম্যুনিসিপ্যাল গেজেটের স্বাস্থ্যসংখ্যা আমার পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়। এ সম্বন্ধে তোমার তথ্য-সংগ্রহ এবং আলোচনা বিশেষ প্রশংসনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার দৃষ্টিশক্তি এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে যে চোখকে পীড়িত করতে কুণ্ঠিত হই। আমার বিশ্বাস ঐ সংখ্যা না পড়তে পারার দরুণ আমি নিজেকে বঞ্চিত করেছি। কোনো অনুকূল অবকাশে চেষ্টা করে দেখব।

সুরেনের মৃত্যু যে কত শোচনীয় সংসারে তার সম্পূর্ণ প্রমাণ রইল না। অবস্থানির্বিচারে সর্বজনের প্রতি এমন অকৃত্রিম সৌজন্য, স্বার্থবিস্মৃত এমন উদার মনুষ্যত্ব, দুর্ব্যবহারে এমন অবিচলিত ধৈর্য, এমন ক্ষমা আমি আর কারো চরিত্রে দেখিনি। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ছিল অসামান্য কিন্তু তার প্রয়োগ ছিল নেপথ্যে। আমার জীবনে এমন ক্ষতি, এমন বেদনা আর কখনো অনুভব করিনি। দীর্ঘায়ুর পথ বিচ্ছেদকণ্টকিত, বিশেষত যাত্রার পশ্চিম প্রান্তে, যখন আলোক ক্ষীণ হয়ে আসে— নিজের হয়ে বা অন্যের হয়ে এ কি কামনা করবার বিষয়? ১৬।৫।[১৯]৪০

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ

১১ জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়েষু,

অমল, বৃহৎ সুখ ও মহৎ দুঃখের সমযোগ্য হও তুমি— তোমার জন্মদিনে এই আমার আশীর্ব্বাদ। ২৪ কার্ত্তিক, ১৩৪৭

স্নেহাসক্ত

রবীন্দ্রনাথ

পত্রপরিচয়

পত্র

১

"তোমার গল্প" ॥ যোগাযোগ উপন্যাস। গত সংখ্যায় প্রকাশিত ১১-সংখ্যক পত্রের টীকা ও ১৩-সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

আত্মশক্তি ॥ তৎকালীন অন্যতম সাপ্তাহিক পত্র।

বঙ্গবাণী ॥ বিজয়চন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত অধুনালুপ্ত মাসিকপত্র।

"সাহিত্যধর্ম··· শরশয্যা গ্রহণ করবেন" ॥ গত সংখ্যায় প্রকাশিত ১৮ সংখ্যক পত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

২

শশিভূষণ ভিলা ॥ বরাহনগরে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের তৎকালীন আবাস।

রাণী ॥ শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশের পত্নী।

হোম ভিলা। গিরিডিতে শ্রীঅমল হোমের বাসভবন।

রাজবন্দীদের কৃত অভিনন্দন ॥ কবির ৭০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্যে আলিপুর-ডুয়ার্সের বক্সাদুর্গে বন্দী বাঙালী যুবকদের অভিনন্দন-পত্র শ্রীভূপতি মজুমদার কবির হাতে দিবার জন্য শ্রীঅমল হোমের নিকট, জন্মোৎসবের বিবরণসহ, পাঠাইয়া দেন।

১৩৩৮ আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ ৪২৩) "বক্সাদুর্গে রবীন্দ্র-জয়ন্তী" দ্রষ্টব্য— ইহাতে 'নির্বাসনের বন্দীদের কবিবন্দনা'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অভিনন্দন-পত্র ও প্রত্যাভিনন্দন-স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুদ্রিত আছে। কবিতাটি 'পরিশেষ' কাব্যে "বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি" নামে মুদ্রিত।

৩

রাজবন্দীদের প্রত্যভিনন্দন ॥ কবির আশঙ্কা সত্য হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ সেটি বন্দীদের হাতে পৌঁছিতে দেন নাই। "Not passed by censor" ছাপ লইয়া কবিতাটি শ্রীঅমল হোমের নিকট ফেরত আসে। দ্রষ্টব্য "Calcutta Municipal Gazette"এর Tagore Memorial Number, Sept. 1941.

৪

জয়ন্তী-উপলক্ষ্যে পার্স ॥ ১৯৩১।১৩৩৮ সনে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্বভারতীর সহায়তাকল্পে কবিকে অর্থ-অর্ঘ্যপ্রদানের প্রস্তাব করেন। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ বন্যাবিধ্বস্ত হওয়ায় কবি শরৎচন্দ্রকে সংগৃহীত অর্থ বন্যাদুর্গতদের দুঃখহরণে ব্যয় করিতে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রখানি নিম্নে পুনর্মুদ্রিত হইল।—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

শরৎ, শুনেছি তোমরা আমার অর্ঘ্যরূপে কিছু টাকা সংগ্রহের সংকল্প করেচ। দেশে এখন দারুণ দুর্দিন, এসময়ে অন্য কোনো ব্যাপারের জন্যে অর্থের দাবী করা বিহিত হবে না। যদি আমার হাতে কিছু

দিতে চাও তবে সেটার লক্ষ্য হবে দুর্গতদের দুঃখহরণ। আমিও স্বতন্ত্রভাবে সে জন্য চেষ্টা করচি— কলকাতায় এই উদ্দেশে একটা কিছু পালাগানের কথা চলচে— এই উপায়ে কিছু কুড়োনো যাবে আশা করি। তোমরা জয়ন্তী-উপলক্ষ্যে অল্পস্বল্প যা কিছু একত্র করতে পারবে আমার হাতে দিলে এই পুণ্যকর্ম্মে আমার সহায়তা করা হবে। নিজের শক্তিতে কিছু করতে পারি এই বন্যাতে সে উপায় রাখিনি। ইতি ১২ ভাদ্র ১৩৩৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাম্‌তা না আমতা॥ শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া জেলায় রূপনারায়ণনদ-উপকূলে সামতাবেড় গ্রামে বাস করিতেন।

অমিয়॥ কবির তৎকালীন একান্তসচিব শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী।

৫

কবি পারস্যে যান ১৯৩২-এর এপ্রিল মাসে। বাংলাদেশে এই সময়ে ‘অ্যাণ্ডারসনী রাজত্ব’। সরকারী তৎপরতা বাড়িয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রও ডাকঘরে খোলা হইত এরূপ মনে করিবার কারণ ছিল।

৬

চুষি কাগজগুলো॥ শ্রীঅমল হোম একবার শান্তিনিকেতনে গিয়া দেখেন যে কবি ব্লটিং পেপারের পরিবর্তে ছোটো ছোটো বালির পুঁটুলি ব্যবহার করিতেছেন। কিছুদিন পরে তিনি একটি চামড়ার কেসে নানা রঙের ও আকারের ব্লটিং পেপার কবিকে পাঠাইয়া দেন।

৮

অমলিনা॥ শ্রীঅমল হোমের কন্যা। কবিপ্রদত্ত নাম। ‘পরিশেষ’ কাব্যে ‘কল্যাণীয়া অমলিনার প্রথম বার্ষিক জন্মদিনে’ (৩০ আশ্বিন ১৩৩৮) রচিত “আশীর্বাদী” কবিতা দ্রষ্টব্য।

৯

জন্মদিনের বাণী॥ ‘সেঁজুতি’ কাব্যের প্রথম কবিতা “জন্মদিন” দ্রষ্টব্য।

তোমরা তিনজনে॥ শ্রীঅমল হোম, তাঁহার পত্নী, ও কন্যা।

১০

সুরেন॥ কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

২৪ কার্তিক ১৩৪৭॥ কালিম্পং হইতে অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতায় আনীত হইয়া কবি এই সময়ে জোড়াসাঁকো ভবনে শয্যাশায়ী ছিলেন।

সাহিত্যালোচনায় ইতিহাস-চেতনা

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

তুলসীদাস ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের একটি তুলনাত্মক হিন্দী নিবন্ধ পড়িতেছিলাম। লেখক দেখিলাম নানা ঐতিহাসিক তথ্য এবং যুক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়া একটি কথাকে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এই যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে বর্ণিত যাগ-যজ্ঞাদি-ধর্মানুষ্ঠানের বিরোধী রাক্ষসগণ হইল আসলে কৃত্তিবাসের সময়কার ব্রাহ্মণ্যধর্ম-বিরোধী বিদেশী শাসক-শক্তি। বুঝিলাম, তুলসীদাসের সহিত কৃত্তিবাসকে তুলনায় আলোচনা করিতে গিয়াই কথাটা এমন জোরালো হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সংস্কারবর্জিতভাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর-একবার স্মরণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম, রাক্ষসদের যেখানে যাহা বর্ণনা আছে তাহার কোথাও পূর্বোক্ত কথার কোনও আভাস আছে কি না; যতদূর মনে পড়িল তাহাতে এ জাতীয় কথার কোনও আভাস পাইলাম না; মনে করিলাম, এ-জাতীয় আলোচনা আমাদের বর্তমান কালের একটা যুগোচিত ঝোঁক মাত্র।

ইহার পরে একদিন একটি বিশেষ পরীক্ষার বাঙলার কাগজ দেখিতে বসিলাম, দেখিলাম লেখক 'কৃষ্ণকীর্তনে'র কবি বড়ু চণ্ডীদাসের একটি অপূর্ব 'সমাজচেতনা' আবিষ্কার করিয়াছেন। লেখকের বক্তব্য এই, বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তনে' বর্ণিত কৃষ্ণ কোনও আধ্যাত্মিক তত্ত্বেরও বিষয়ীকৃত রূপ নহেন, মানবীয় প্রেমেরও মূর্ত বিগ্রহ নহেন— তিনি হইলেন চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাচারী শাসক ও শোষকশ্রেণীরই প্রতিভূ— শক্তিমান্, ক্রূর এবং কৌশলী; অশেষরূপে প্রলুব্ধা, হীনরূপে অত্যাচারিতা এবং লাঞ্ছিতা এবং সর্বশেষে নিষ্ঠুররূপে প্রবঞ্চিতা রাধা হইল তৎকালীন নিরীহ অত্যাচারিত এবং প্রবঞ্চিত বাঙলার জনগণেরই প্রতীক।

খাতাখানি পড়িয়া প্রথমে মনের মধ্যে প্রবল একটা ঝাঁকুনি অনুভব করিলাম— প্রথমতঃ, বহুদিনের স্থিরবদ্ধ সংস্কারে আকস্মিক আঘাতলাভের জন্য, দ্বিতীয়তঃ, বক্তব্যের অপ্রত্যাশিত অভিনবত্বের জন্যও। কিন্তু মনে ঝাঁকুনি লাগা তো ভালোই, নতুবা পাশ ফিরিয়া নূতন কথা শিখিবার বুঝিবার তাগিদ আসিবে কেন? তাই কথাটাকে হাসিয়া উড়াইয়া না দিয়া গম্ভীরভাবে ভাবিয়া বুঝিতেই চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

প্রথমেই আমার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল, পূর্বোক্ত পরীক্ষার্থী তাঁহার খাতায় পরবর্তী কালের বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধেও দু-একটি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়াছেন; সে ক্ষেত্রে তাঁহার রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মনে আসে নাই কেন— শুধু বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তনে'র ক্ষেত্রেই এই সত্যের আবিষ্কার কেন? ভাবিয়া একটা সম্ভাব্য কারণও মনে হইল; মনে হইল, রাধা-কৃষ্ণের এই সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার জন্য মুখ্যভাবে দায়ী হইল 'কৃষ্ণকীর্তনে'র 'বড়ায়ি বুড়ী'। শোষক ও শোষিত, অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত, বঞ্চক এবং বঞ্চিতের ভিতরকার যে অভিনব ক্রূর প্রেমাভিনয় তাহা কখনই জমিয়া ওঠে না যতক্ষণ আবার তাহার মাঝখানে একটি দালাল-শ্রেণী আসিয়া না জোটে; এই দালাল-শ্রেণীর প্রতিভূ বড়ায়ি বুড়ী। এই দালালের সাহায্যে কৃষ্ণ রাধাকে কতবার কত প্রলোভন দেখাইয়াছেন— কতবার তাম্বুলাদির দাদন পাঠাইয়াছেন; আবার এ-সকল ক্রূর কৌশল যখন ব্যর্থ হইয়াছে তখন ঐশ্বর্য ও বলের হুমকি

দেখাইয়াছেন; তাহাতেও যখন কাজ হয় নাই তখন নির্লজ্জভাবে বল প্রয়োগ করিয়াছেন। সর্বত্রই কৌশল-অপকৌশল সমস্তের সহায় কে? ঐ দালাল বড়ায়ি বুড়ী। সত্য সত্যই রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেমের বালাই কিছুই ছিল না; সকল অত্যাচারী শোষকের ন্যায় কৃষ্ণের প্রেমের বুলি শুধু মুখে— অন্তরে বিশুদ্ধ এবং উদগ্র ভোগকামনা— রাধার নবযৌবনের পসরা ছলে বলে কৌশলে সবটুকু করায়ত্ত করিতে হইবে— তাহার দেহ-মনের সমস্ত সম্পদ্‌কে নিঃশেষে এবং নিষ্ঠুরভাবে ভোগ করিতে হইবে— এবং এই ভোগ শেষ হইয়া গেলে একদিন বৃন্দাবন ছাড়িয়া চলিয়া গিয়া নূতন করিয়া মথুরার রাজা হইয়া জমাইয়া বসিতে হইবে, নতুবা রাতারাতি একেবারে ভোল বদলাইয়া যোগী সাজিয়া বলিতে হইবে—

অহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই॥
মুল কমলে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইএঁা আহ্মে ব্রহ্ম গেআন॥…
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগ বাট॥
গেআন বাণে ছেদিলোঁ মদন বাণ।
তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন॥

বুঝিলাম, বড়ায়ি বুড়ীর অতিরিক্ত দালালির ফলেই রাধা-কৃষ্ণের আসল স্বরূপ বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে ধরা পড়িয়া গিয়াছে; কারণ এখন আমরা আর যাহা চিনি আর না-ই চিনি, দালাল চিনিয়া ফেলিতে আমাদের আর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না, আর একবার দালাল চিনিয়া ফেলিতে পারিলে ভিতরের ফাঁক ধরিয়া ফেলিতে কতক্ষণ?

সব জিনিসটিকে আমি সস্তা রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহি না। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাধা-কৃষ্ণের স্বরূপ আমরা যেরূপ বলিয়া জানিতে বুঝিতে অভ্যস্ত তাহা হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপে যদি আবিষ্কৃত বা ব্যাখ্যাত হয় আমাদের তাহাতে কোনও আপত্তি নাই; আমাদের শুধু এই আবিষ্কার ও ব্যাখ্যাকে একটু যাচাই করিয়া লইতে হইবে।

আমি উপরে কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' সম্বন্ধে যে দুইটি মতের উল্লেখ করিলাম এ-জাতীয় মত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নহে, সাহিত্যের আলোচনায় এ-জাতীয় মত আমরা আজকাল খুবই লক্ষ্য করিতে পারি। এই-জাতীয় মতের পশ্চাতে আমাদের একটি নব প্রত্যয় আছে, সে প্রত্যয় প্রত্যক্ষভাবে মার্ক্সবাদ হইতে গৃহীত; এবং মার্ক্সবাদ আজ আর একটি সাম্প্রদায়িক মতবাদমাত্র নহে— তাহা আজ যুগবাদের মহিমা লাভ করিয়া অল্পবিস্তর আমাদের সকলের চিন্তাধারাকেই প্রভাবিত করিতেছে। সাহিত্যের সহিত তৎকালীন সামগ্রিক ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গিযোগকে আজ আর আমরা কেহই অস্বীকার করি না; সুতরাং সাহিত্যের আলোচনায় ইতিহাসের আলোচনা আজ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে আমরা সাধারণ নাম দিয়াছি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমাজচেতনা। এই সমাজচেতনার আলোকে শিল্পি-মানসের পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করিয়া সাহিত্য-আলোচনার পদ্ধতির দিকেই সাম্প্রতিক সাধারণ ঝোঁক।

মার্ক্সবাদের প্রতি এই সাধারণ আনুগত্য ব্যতীত কাঁহারও কাঁহারও একটা বিশেষ আনুগত্যও লক্ষিত হইতেছে। ইঁহাদের মতে সাহিত্য বা শিল্প কোনও ব্যক্তি-কর্ম নয়, ইহা একটা সামাজিক কর্ম। আমাদের

ব্যক্তিজীবন একটা বৃহৎ সমাজজীবনেরই অচ্ছেদ্য অংশ মাত্র, এই কারণে আমাদের ব্যক্তি-চৈতন্যের বৃহৎ পরিমণ্ডলে সক্রিয় রহিয়াছে একটি সমাজ-চৈতন্য ; শিল্প এবং সাহিত্যের উৎসারণ এই সমাজ-চৈতন্য হইতে ; সুতরাং কোনও বিশেষ কাব্যসৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রকাশ কবির সমাজসত্তার ; সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ না করিলে এই সমাজ-সত্তার পরিচয় মেলে না— কবিসৃষ্ট কাব্যেরও সম্যক্ পরিচয় মেলে না।

এই বিশেষ প্রত্যয় লইয়া বাঙলা-সাহিত্যের আলোচনা এখন পর্যন্ত খুব ব্যাপকভাবে না হইলেও কিছু কিছু চেষ্টা ইতঃপূর্বে হইয়াছে। যাঁহারা কোনও বিশেষ যুগের বিশেষ সাহিত্য সম্বন্ধে বা বিশেষ কবি সম্বন্ধে এই দৃষ্টিতে সুশৃঙ্খলিত আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের আলোচনা ব্যতীত ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রবন্ধে এ-জাতীয় আলোচনা অনেক দেখিতে পাই। এই-জাতীয় আলোচনাকে শ্রদ্ধা ও যুক্তির সঙ্গে গ্রহণ করিবার সুযোগও যেমন লাভ করিয়াছি, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা কথাও অনেকসময় মনে হইয়াছে, সে কথাটিকেও এই প্রসঙ্গে অকপটে স্বীকার করিতেছি। মনে হইয়াছে, বিশেষ মতবাদের প্রতি আনুগত্য মানুষের চিন্তাকে যেমন একটা প্রত্যয়জনিত বলিষ্ঠতা দান করে, তেমনই আবার এই-জাতীয় মতানুগত্য মানুষের চিন্তাকে সময়ে সময়ে আচ্ছন্ন করিয়াও ফেলে। মনের মধ্যে একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের দোষগুণ দুই-ই আছে। গুণ এই, চিন্তা এখানে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া একাগ্র হইবার সুযোগ লাভ করে। আবার দোষ এই, আমাদের চিত্তের মধ্যে থাকিয়া প্রত্যয় একটা অন্ধ আবেগ এবং আকর্ষণ সৃষ্টি করে ; সেই আকর্ষণে চিত্তের সকল চিন্তারই একটি প্রত্যয়-কেন্দ্রিক হইয়া উঠিবার প্রবণতা দেখা দেয়— আশপাশে ঘুরিয়া সত্যনির্ধারণের সম্ভাবনা তখন চাপা পড়িতে চায়। এই একই প্রত্যয় লইয়া বহুদিন একভাবে চিন্তা করিতে করিতে মানসিক সংগঠনই তখন তাহার স্থিতি-স্থাপকতা হারাইয়া ফেলিয়া একটা অনড়ত্ব লাভ করে। মনে তখন থিওরির শক্ত এবং সুস্পষ্ট ছক গড়িয়া ওঠে, তখন দেখা দেয় কেবল সেই ছকে ফেলিয়া ফেলিয়া সব জিনিসকে যাচাই করিবার চেষ্টা। মনের মধ্যে একবার ছক গড়িয়া উঠিতে পারিলেই বিপদ্— ঘুরিয়া-ফিরিয়া নড়িয়া-চড়িয়া কিছু জানা-বোঝার পথটাই তাহাতে আস্তে আস্তে বন্ধ হইয়া আসে।

২

মনের মধ্যে এইরূপ স্পষ্টভাবে কোনও থিওরির ছক না লইয়া মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতে যাঁহারা বাঙলা সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার মহাশয়ের কিছু মতামত উদ্ধৃত করিয়া প্রত্যয়ানুগত্য আমাদের চিন্তার উপরে কিরূপ পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে তাহাই লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার লিখিত 'মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ' গ্রন্থখানিতে তিনি 'চর্যাগীতিতে মানবতা' নামে একটি আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। এই আলোচনায় তিনি তৎকালীন বঙ্গের সমাজ-জীবনকে মুখ্যতঃ দুইটি কোটিতে ভাগ করিয়াছেন, একটি হইল ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি- পুষ্ট বা সমর্থিত সামন্ততন্ত্রীয় আওতায় পরিবর্ধিত বিলাস-ব্যসন-মগ্ন অভিজাত কোটি, অপরটি হইল অন্ত্যজস্তরের লোকায়ত-সংস্কৃতি-পুষ্ট একটি সঙ্কর-সমাজ— কায়িকশ্রমনির্ভর সংসারযাত্রায় যাহারা সম্পদ্‌হীন ও আশাহীন— ব্যাবহারিক জীবনের পরমনিঃস্বতায় যাহারা জীবনে চরম শূন্যতার পথের পথিক। চর্যাপদের কবিগণ লেখকের মতে, সমাজ-জীবনের এই দ্বিতীয় কোটি হইতেই উদ্ভূত ; তাঁহাদের বাস্তব সমাজ-জীবনের কঠোর দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যজনিত শূন্যতাবোধই নানাভাবে রূপপরিগ্রহ করিয়াছে তাঁহাদের বহু আধ্যাত্মিক

তত্ত্বের রূপায়ণে। চর্যাপদে বর্ণিত 'শূন্যতা'র আধিক্যের লেখক ইহাই মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কবিগণের বাস্তব সমাজ-জীবনের এই যে গভীর শূন্যতা, ইহা ছিল তাঁহাদের জীবনের চরম অপমান ; আসল অভাব-অভিযোগ হইতে না হোক, এই চরম অপমান হইতে তাঁহাদিগকে মুক্তি লাভ করিতে হইবেই— তখনই তাঁহারা ভিড়িলেন এই শূন্যতা-ধর্মের পথে। শূন্যতাকে তত্ত্বের আলোকে প্রকৃতি-প্রভাস্বর করিয়া মহিমান্বিত করিয়া তুলিলেন এবং নির্বাণের পথে তখন শূন্যতা-লাভই তাঁহাদের পরম কাম্য হইয়া উঠিল। ভোগস্পৃহা পূরণের যখন বাস্তব সম্ভাবনা কিছুই নাই তখন কঠোর বৈরাগ্যের পথকেই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়া সেইদিকে ভিড়িয়া পড়া ছাড়া আর গতি কি ?

চর্যাপদের মধ্যে সাধনতত্ত্ব ব্যাখা করিতে গিয়া অনেকগুলি রূপক এবং চিত্রকল্প ব্যবহার করা হইয়াছে। এগুলির প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন, "এই চিত্রগুলিকে যে অখণ্ড ভাবের কাঠামো রূপেই শুধু ব্যবহার করা হয়েছে তা নয় ; এর সঙ্গে মিশে রয়েছে গীতিকারের মনোগত দুঃখ ও নিরানন্দের চেতনা। এই দুঃখ ও নিরানন্দের চেতনা গীতিকারের মনে কি ভাবে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, তা বিচার করে দেখা যেতে পারে ; কাহ্নপাদ তাঁর একটি চর্যায় বলেছেন :

মন তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল পাত ফলবাহা ॥

মন যেন একটি বর্ধিষ্ণু বৃক্ষ, পাঁচটি ইন্দ্রিয় তার শাখা, আশা অর্থাৎ বাসনা তার নানাবিধ বিচিত্র পাতা ও ফল। গীতিকার পরে বলেছেন, এই বৃক্ষকে ছেদন করতে হবে যেন সে আর পল্লবিত না হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন, গীতিকার এই বৃক্ষকে ছেদন করার প্রয়োজন অনুভব করলেন কেন ? কেনই বা তাঁর বাসনাকে বিনষ্ট করার প্রেরণা ? কেনই বা তাঁর জীবনে শূন্যতার বেদনা ? কারণ, গীতিকারের ইন্দ্রিয়শাসিত মন সর্বদাই বাইরের দিকে অর্থাৎ দৃশ্যমান সংসার ও তার অন্তর্গত ভোগসামগ্রীর দিকে প্রসারিত হতে চাইছে। ইন্দ্রিয়ের তাগিদই বাঁচার তাগিদ, জীবনেরই তাগিদ। অসাম্যের আদর্শে গঠিত সমাজে জীবনকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করার অবকাশ কোথায় ? নিজেকে সৃষ্টি করার পথ কোথায় ?" এই কারণে চর্যাকারেরা ঠিক করিলেন, ইন্দ্রিয় ও মনের সব আপদ-বালাই মারিয়া ফেলিয়া একেবারে নিঃশেষে উৎপাটিত করিয়া ফেলাই সাধু কর্ম। যখন বিভিন্ন স্তর-উপস্তরে বিভক্ত এমন একটা প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তাঁহাদিগকে বাস করিতে হইতেছে যেখানে তাঁহাদের সুস্থ স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ের তাগিদ— তাঁহাদের মনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা— কাহারওই কোনও সার্থকতা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই— তখন এইগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া নিরন্তর অতৃপ্তি ও ব্যর্থতার অপমান সহ্য করিয়া লাভ কি ? অতএব এ-গুলিকে শুকাইয়া মারিতে বৈরাগ্যের পথ গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ— জীবনকে ভোগ করিবার পথ সমাজ-ব্যবস্থায় যখন একেবারেই বন্ধ— তখন নির্বাণের তত্ত্বই আসলতত্ত্ব বলিয়া ধরা যাক। "সমাজকে, সহানুভূতিহীন সামাজিক পরিবেশকে, আঘাত করতে না পেরে সে আঘাত করল নিজেকেই ; শক্তিমানের শক্তিকে খর্ব করতে না পেরে সে খর্ব করল নিজেরই শক্তিকে। সমাজকে শাসন করতে না পেরে সে শাসন করতে চাইল তার চিত্তকে।" চর্যাপদের মধ্যে মনকে মারিয়া ফেলা, চিত্তকে শাসন করা, এবং সঙ্গে সঙ্গে শূন্যতার আদর্শকেই বড় করিয়া ধরা— ইহার সকলেরই মূলে আসলে হইল বিষম শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলে জীবনসংগ্রামে পরাভূত একটি সমাজস্তরের আত্মহননের প্রবৃত্তি।

এই বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিবার পক্ষে আমাদের দিক হইতে অনেক অন্তরায় দেখিতেছি ; সেইগুলিকেই একে একে উপস্থাপিত করিতেছি।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, যে চর্যাপদগুলি অবলম্বন করিয়া আমরা এত সমাজবিশ্লেষণ করিয়া এত কথা বলিতেছি, সেই চর্যাপদ আমরা কয়টি পাইয়াছি ? মোটে পঞ্চাশটি— তাহাও পুরা নয়। এই চর্যাপদগুলির অনুপূরকভাবে তাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয় ঐ যুগে চর্যাপদের কবিগণ কর্তৃক রচিত দোঁহাগুলিকে এবং অসংখ্য বৌদ্ধতন্ত্রকে। এই বৌদ্ধতন্ত্র, দোঁহা এবং চর্যাগানগুলিকে একত্র করিয়া অধ্যয়ন করিলে তবে তৎকালীন এই একটি বিশেষ গোষ্ঠী দ্বারা রচিত ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতির আমরা একটা ধারণা করিয়া লইতে পারি। চর্যাগানগুলির মধ্যে যে দার্শনিকতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্বকে রূপায়িত করা হইয়াছে খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত অসংখ্য বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে তাহারই প্রচার ও ব্যাখ্যা। এই অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, নেপাল, তিব্বত জুড়িয়া একটি বিরাট ভূভাগে যে এত বৌদ্ধতন্ত্র গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা কি সবই শুধু প্রতিকূল সমাজের নিষ্পেষণে পরাভূত একটি বিশেষ শ্রেণীর দ্বারা ? চর্যাপদের দার্শনিক মত বা সাধন-পথ একদিনে বাঙলাদেশের বিশেষ কোনও একটি কবিগোষ্ঠীর মধ্যে গড়িয়া ওঠে নাই— অন্ততঃ পাঁচটি শতক ধরিয়া এগুলি আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া শুধু কতগুলি নিষ্পেষিত শ্রেণীর দুঃখ-দারিদ্র্য— চরম নিঃস্বতা এবং পরাভবচেতনাই কি এই শূন্যতত্ত্ব এবং চিত্তহনন রূপ আত্মহননের সাধনতত্ত্ব গড়িয়া তুলিতেছিল ? এই শূন্যতত্ত্ব প্রথম যে লোকটির চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল তিনি তো রাজার দুলাল ছিলেন— সামাজিক জীবনে তাঁহার তো কোথাও শূন্যতা ছিল না— তাঁহার চিত্তে এত শূন্যতা কোথা হইতে আসিয়াছিল ? তিনি তো সারাজীবন বাসনাক্ষয় এবং চিত্ত-শাসনের কথাই বলিয়া গিয়াছেন ; ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতার কোন্ প্রতিবন্ধক মনের বাসনা পূর্ণ করার পথে কোন্ সর্বাতিশয়ী নৈরাশ্য তাঁহাকে এমন করিয়া আত্মঘাতী সত্য আবিষ্কারের প্রেরণা বা প্ররোচনা দান করিয়াছিল ? তাহার পরে, বুদ্ধের আবির্ভাবকাল এবং খ্রীষ্ট-পরবর্তী দশম শতক ইহার মাঝখানে প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া শুধু ভারতবর্ষে নয়— জগতের এক-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়িয়া এই শূন্যতাবাদ যে কত ব্যাখ্যা ও রূপান্তর লাভ করিতেছিল তাহার পিছনে কোন্ সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য এবং নৈরাশ্যের ইতিহাস কাজ করিতেছিল তাহার কোনও আভাস আমরা লাভ করিয়াছি কি ?

চর্যাপদের মধ্যে যে শূন্যতাবাদ ও চিত্ত-শাসনের কথা পাইতেছি তাহা তো চর্যাকারগণের নিজস্ব কোনও কথা নয়— তাহা তাঁহাদের সামাজিক উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া কথা। চিত্ত-শাসনের কথা তো ভারতীয় সকল ধর্মেরই কথা, অবিদ্যাগ্রস্ত চঞ্চল চিত্ত-মূষিককে তো সবাই মারিয়া ফেলিতে বলিয়াছেন ; বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, বেদান্ত— সবাই তো এই এক কথায় সায় দিয়াছেন ; চিত্তবৃত্তির নিরোধই যে যোগ— এই কথা বলিয়াই তো পতঞ্জলি তাঁহার যোগশাস্ত্র আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল ধর্ম ও দার্শনিক মতে যে-কথা বার বার করিয়া সাধনার মূল সত্য বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে চর্যাপদে তো শুধু তাহারই লোকায়ত প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। চিত্ত-শাসনের পথ যদি শ্রেণীবিরোধের ফলে জীবন-সংগ্রামে অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের লাঞ্ছনা ঢাকিবার জন্য আত্মঘাতের পথই হয় তবে সে সিদ্ধান্ত এবং মন্তব্য তো শুধু ভারতবর্ষের নয়— জগতের সকল যুগের সকল ধর্মমতের প্রতিই প্রযোজ্য— কারণ, ধর্মপথও অবলম্বন করিব, ইন্দ্রিয়ভোগের পথও ত্যাগ

করিব না— এরূপ কোথায় পাওয়া যাইবে ? মূলে তাহা হইলে একটি কথা বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়— ধর্মের পথটাই হইল জীবনসংগ্রামে পরাজয়ীর অভিমানে আত্মহত্যার পথ। সে ক্ষেত্রে চর্যাপদের কবিগোষ্ঠী সম্বন্ধে এই অভিমতটি বিশেষ করিয়া প্রয়োগ করিবার কোনও সার্থকতা আছে কি ?

চর্যাপদের শূন্যতাবাদ সম্বন্ধে আরও একটি কথা লক্ষ্য করিতে হইবে। বৌদ্ধধর্মে শূন্যতাবাদের বিবর্তনের যে একটি দীর্ঘ ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিলাম, এই দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারি, মোটামুটি ভাবে পালিবৌদ্ধশাস্ত্রের বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত শূন্যতা অসদর্থক ; মহাযান বৌদ্ধধর্মে শূন্যতা ক্রমে সদর্থক হইয়া উঠিবার প্রবণতা প্রকাশ করিয়াছে ; তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে শূন্যতা স্পষ্ট সদর্থক হইয়া উঠিয়াছে। চর্যার যুগের শূন্যতা তাই শূন্যতা নয়, তাহাই যথার্থ পূর্ণতা— নির্বাণ হইয়া উঠিয়াছে 'পরম স্থখ' বা মহাস্থখের নামান্তর। এই জন্যই চর্যাপদের বর্ণনায় দেখি, শূন্যতা-আশ্রয়কেই 'সোনা-ভরতি' নৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে— যেখানে 'রূপে'র 'রূপা' রাখিবার আর স্থান নাই (৮ সং) ; শূন্যতা-করুণার অদ্বয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত প্রভাস্বর চিত্তকে আসবমত্ত সহজনলিনীবনে বিলাসকারী মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে (৯ সং) ; নির্বাণে প্রবিষ্ট চিত্তকে 'মহারস-পানে মাতেল রে' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (১৬ সং) ; বাদ্য-বাজনের ঘনঘটায় সহজানন্দরূপিণী ডোম্বিনীর সঙ্গে বিবাহের বর্ণনা করা হইয়াছে (১৯ সং) ; ভবকূল ছাড়িয়া গগনের 'পারিম কুলে' গিয়া আনন্দ-বিলাসের কথা বার বার বলা হইয়াছে (৩৪ সং) ; চিত্তকে সহজ-শূন্যে সম্পূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (৪২ সং)।

চর্যাকারগণ এইভাবে শূন্যকেই কেন বার বার পূর্ণ বলিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, "বাস্তব পৃথিবীর আস্বাদনলিপ্সু তাঁদের মন পৃথিবীর মধ্যে তার চরিতার্থতা খুঁজে পায় নি ; পৃথিবীর অর্থাৎ সমাজ সংগঠনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে না পেরে তাঁরা তাঁদের মনকে সরিয়ে আনলেন পৃথিবীর কোল থেকে, এবং স্থাপন করলেন এক আদর্শ ভাব-জগতে, যেখানে সর্ব-শূন্যতা বিলুপ্ত হয়ে বিরাজ করছে অনাবিল নির্মল আনন্দ। সংসারের সমস্ত তুচ্ছতা খর্বতা ও কলুষকে পরিশুদ্ধ করে তাঁরা সৃষ্টি করলেন এক আদর্শ মনোজগৎ।" আমি বলি, বেদান্ত যখন বলে যে বিষয়ানন্দ কিছুই নয়, ব্রহ্মানন্দই পরমার্থ— তখনও তো ঠিক ঐ একই কথা বলা যায়— বাস্তবে বিষয়ানন্দ লাভ করার যেখানে সম্ভাবনা নাই, তখন কল্পনায় মনোজগতে তাহাকে ভোগ করিবার অসহায় চেষ্টা। এবং সাধারণীকৃত ভাবে সকল ধর্মচেষ্টাকেই তো সেই একই চেষ্টা বলা যাইতে পারে— বাহ্যজগতে প্রতিহত হইয়া আত্মারাম হইবার চেষ্টা, বা কোনও কাল্পনিক আদর্শ জগতে প্রতিহত বৃত্তির চরিতার্থতা লাভের চেষ্টা !

তাহা ছাড়া আরও লক্ষ্য করিতে হইবে, নিজেদের স্থবিধার জন্য শূন্যতাকে পূর্ণতা চর্যাকারগণই রাতারাতি করিয়া তোলেন নাই— শূন্যতাকে পূর্ণতা করিয়া তুলিবার প্রবণতা ও চেষ্টা বহুদিনের ; সেই বহুশতাব্দী জুড়িয়া বিবর্তনধারারই চর্যাপদে দেখিতে পাই একটি জনপ্রিয় সাহিত্যিক রূপ। সাধনার ক্ষেত্রে চর্যাকারগণের যে দেহাশ্রয়, তাহাও তাঁহাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব কিছু নয় ; বহু যুগ ধরিয়া বৃহত্তর ভারতবর্ষে আবর্তিত যে তন্ত্রমত তাহার ভিতরেই রহিয়াছে এই দেহাশ্রয়ের ইতিহাস।

তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, যে সকল বৈশিষ্ট্যকে চর্যাপদের বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হইতেছে তাহা শুধুমাত্র চর্যাপদের বৈশিষ্ট্য নহে, আশপাশের কালের একটি ব্যাপক-সাহিত্য ও শাস্ত্রের ভিতরে লক্ষণীয়

বৈশিষ্ট্য ; আর এই বৈশিষ্ট্যগুলির ইতিহাসও সুদূর অতীত হইতে আবর্তিত ; সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া চর্যাকারগণের সমাজচৈতন্য ও তৎপশ্চাদ্বর্তী সমাজ-জীবনের সত্যলাভের চেষ্টা আমাদিগকে ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে।

৩

চর্যাপদের পরে 'কৃষ্ণকীর্তনে'র কথায় ফিরিয়া আসিতেছি এবং ধর্মের সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া সত্যকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। বড়ু চণ্ডীদাসের সম্ভাব্য কাল চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ হইতে পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগ। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পযন্ত কালকে আমরা আমাদের সাহিত্যের তথা সমাজ-জীবনের একটা অন্ধকার যুগ বলি। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমের যে তুর্কী-বিজয় তাহা বাঙলায় সেনযুগের অবসান ঘটাইয়াছিল বটে, কিন্তু নূতন কোনও শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রব্যবস্থার দিক হইতে ইহা সম্পূর্ণ একটা অরাজকতার যুগ ; চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগের কাছাকাছি হইতে ইলিয়াস্‌শাহী শাসনের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। নবাগত বিদেশী এবং স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তি এবং তাহা হইতে ছিট্‌কাইয়া-পড়া স্ফুলিঙ্গসমূহের দ্বারা দেশবাসীর জীবন যে নানাভাবে অসহনীয়রূপে তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহার প্রসার ও পরিধি কতখানি ছিল তাহাই চিন্তনীয়। আমরা রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা সমাজ-জীবনের সর্বস্তরের উপরে যে ব্যাপক প্রভাবের কথা আজকাল ভাবি তাহাতে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বর্তমান যুগজীবনের সত্যকেই পাঁচ-ছয় শত বৎসরের পূর্ববর্তী সমাজ-জীবনের উপরে আরোপ করিয়া বসি। আজ বাঙলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেখানে যে নীতি গৃহীত হইতেছে তাহা সম্বন্ধে দুরাঞ্চলের গ্রামবাসিগণও অনেকখানি সচেতন হইয়া উঠিতেছেন ; তাহার কারণ, হয় তাহা দ্বারা তাঁহাদের সুদূর গ্রামাঞ্চলবর্তী জীবনধারাও নিয়ন্ত্রিত বা ব্যাহত হইয়াছে ; অথবা তাহা দ্বারা অন্য কোনও শ্রেণীর কি লাভ-লোকসান ঘটিয়াছে তাহা বিবিধ প্রচার-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিত্য তাহাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বেও দেখিয়াছি, কলিকাতার বিধানসভায় বসিয়া ব্রিটিশ সরকার কখন কি সর্বনাশা বিধান পাস করাইয়া লইয়াছেন তাহা সম্বন্ধে সুদূর গ্রামাঞ্চলের লোকের তেমন কোনও ভ্রূক্ষেপই ছিল না— কারণ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের যে রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে তাহাদের যোগ ছিল তাহা প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যতন্ত্র ছিল না— তাহা ছিল জমিদারী সামন্ততন্ত্র।

ইলিয়াস্‌শাহী শাসনব্যবস্থা তৎকালীন বাঙলার রাজধানী গৌড়ে যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন তাহার প্রভাব বাঁকুড়া জিলার ছাতনা গ্রামবাসী বা বীরভূম জিলার নান্নুর গ্রামবাসী বড়ু চণ্ডীদাসের উপরে কি হইয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে জানিবার তথ্য এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। কিন্তু সংস্কারবর্জিত ভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' বার বার পাঠ করিয়াও কোথাও এ-কথার আভাস পাই না যে, গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত ইস্‌লামী শাসনতন্ত্র এবং তৎসহচরিত অত্যাচার-উৎপীড়ন বড়ু চণ্ডীদাসের সমাজ-জীবনকে এমনভাবে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল যে, তাহার ব্যক্তিচৈতন্যের কেন্দ্রের ভিতর দিয়া সমাজ-চৈতন্য প্রতিফলিত হইয়া অত্যাচারী শাসনতন্ত্রকে কৃষ্ণতন্ত্রে রূপায়িত করিয়াছে এবং অত্যাচারিত 'অবলা অখলা' বাঙালীজাতিকে রাধাতন্ত্রে পর্যবসিত করিয়াছে। বড়ায়ি বুড়ীর দালালির কথাটা আমি অবশ্য জিনিসটিকে জমাইয়া তুলিবার জন্য নিজে যোগ করিয়া দিয়াছিলাম। আমাদের দিনে যে 'দালালতন্ত্র' বলিয়া জিনিসটি

গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার বিবর্তনের সঙ্গে ধনিকবাদ বা পুঁজিবাদের অনেকখানি বিবর্তন সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে, বড়ায়ি বুড়ীর পরিকল্পনার বিবর্তন তাহার বহুশত বৎসর পূর্ব হইতে।

ইহা ছাড়াও লক্ষ্য করি, বড়ু চণ্ডীদাস 'কৃষ্ণকীর্তন' কাব্যরচনা করিয়াছেন মূলতঃ পুরাণাদি বর্ণিত কৃষ্ণলীলার কাঠামোকে অবলম্বন করিয়া, পৌরাণিক কাঠামোর উপরে অবশ্য তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টিই বেশি, কিন্তু সে নিজস্ব সৃষ্টি হইল পৌরাণিক কাহিনীর লৌকিক বিস্তার, সেই লৌকিক বিস্তারের বেগকেন্দ্র হইল আদিরস। একদিকে অস্পষ্ট এবং সংশয়িত ধর্মের যোগ— অন্যদিকে সাহিত্যে রূপায়িত আদিরসের যোগ ছাড়া এই কাহিনীর সমাজ-জীবনের সহিত অন্য কোনও যোগ ছিল না।

৪

বড়ু চণ্ডীদাসের পরে ঐতিহাসিক ক্রমে কৃত্তিবাসের পালা। পূর্বেই বলিয়াছি, কৃত্তিবাসের রামায়ণ (অবশ্য বাজারে যাহা প্রচলিত আছে) নূতন করিয়া খুঁটাইয়া পড়িয়াও ইহার মধ্যে কৃত্তিবাসের রাষ্ট্রচেতনার কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত লক্ষ্য করিতে পারি নাই। অথচ কৃত্তিবাসের মধ্যে ইহার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী অবলম্বন করিয়া তাঁহার যে গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের কথা আজ সুপরিচিত সে গৌড়েশ্বর হিন্দুরাজা গণেশ বলিয়াই অনেকের অনুমান। এই গণেশের আমলে বিদেশী এবং বিধর্মী রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে হিন্দুসমাজের বৈরিতা তীব্র রূপ ধারণ করিয়াছিল। কি করিয়া যে হিন্দুরাজা গণেশ সাময়িক ভাবে ইলিয়াস্‌শাহী সুলতানদের হাত হইতে রাষ্ট্রশক্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন তাহার ইতিহাস এখনও স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু রাজা গণেশের রাষ্ট্রাধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে দরবেশগণের সঙ্গে তাঁহার প্রবল বিরোধ বাধিয়া ওঠে, রাজা গণেশ অনেক মুসলমান দরবেশকে বধ করেন; দরবেশগণ তখন জৌনপুরের রাজা ইব্রাহিম শার্কীর শরণাপন্ন হন, ইব্রাহিম শার্কী সসৈন্যে রাজা গণেশকে আক্রমণ করেন; রাজা গণেশকে তখন নিজের পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া আপস-মীমাংসা করিতে হয়; যদুই তখন জালালুদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া গৌড়েশ্বর হন।

নিজের পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বরকে অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি বিধর্মী প্রবল ঐস্লামিক শক্তির যে উৎপীড়ন তাহার কিছু আভাস কৃত্তিবাসের রামায়ণে থাকা স্বাভাবিকই ছিল। রাক্ষসদের সম্বন্ধে তাই প্রবলপ্রতাপী হিংস্র ব্রাহ্মণ্যবিরোধী বিধর্মীর একটা রূপ ফুটিয়া ওঠার সুযোগ ছিল। তুলসীদাসের 'রামচরিত-মানসে' কিন্তু এ-সত্যের আভাস আছে। রাবণ ও রাক্ষসদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বালকাণ্ডে বলা হইয়াছে—

ভুজবল বিশ্ববশ্য করি রাখেসি কোউ ন স্বতন্ত্র।
মণ্ডলীকমনি রাবণ রাজ করই নিজ মন্ত্র॥

'রাবণ ভুজবলে বিশ্বকে বশ্য করিয়াছিল— কাহাকেও রাখে নাই স্বতন্ত্র (স্বাধীন); মণ্ডলীর মণি (রাজমণ্ডলীর মণি) হইয়া রাবণরাজ নিজের মন্ত্র (মত) অনুসারে সব কিছু করিতেছিল।'

রাবণের সামাজিক অত্যাচার আরও ঘৃণ্য এবং অসহনীয় ছিল— কাহারও ঘরে কোনও সুন্দরী নারী রাখিবার উপায় ছিল না।—

দেব যক্ষ গন্ধর্ব নরকিন্নর নাগকুমারি।
জীতি বরী নিজ বাহুবল বহু সুন্দর বর নারি॥

রাক্ষসদের সম্বন্ধে তুলসীদাস বলিয়াছেন—

দেখত ভীমরূপ সব পাপী।
নিশিচর নিকর দেবপরিতাপী॥
করহিঁ উপদ্রব অসুরনিকায়া।
নানারূপ ধরহিঁ করি মায়া॥
জেহি বিধি হোই ধরম নির্মূলা।
সো সব করহিঁ বেদপ্রতিকূলা॥
জেহি জেহি দেখ ধেনু দ্বিজ পারহি।
নগর গাউঁ পুর আগি লগারহিঁ॥
সুভ আচরন কতহুঁ নহিঁ হোঈ।
দেব বিপ্র গুরু মান ন কোঈ।
নহিঁ হরভগতি জজ্ঞ রূপ দানা।
সপনেহুঁ সুনিয় ন বেদ পুরানা॥
জপ জোগ বিরাগা তপ মখভগা শ্রবন সুনই দসসীসা।
আপুনি উঠি ধাৱই রহই ন পাৱই ধরি সব ঘালই খীসা॥
অস ভ্রষ্ট অপরা ভা সংসারা ধরম সুনিয় নহিঁ কানা।
তেহি বহু বিধি ত্রাসই দেস নিকাসই জো কহ বেদ পুরাণা॥
বরনি ন জাই অনীতি ঘোর নিসাচর জো করহিঁ।
হিংসা পর অতি প্রীতি তিন্হ কে পাপহিঁ করনি মিতি॥
বাঢ়ে খল বহু চোর জুআরা।
যে লম্পট পর ধন পর দারা।
মানহিঁ মাতু পিতা নহিঁ দেৱা।
সাধুন্হ সন করৱারহিঁ সেৱা॥

'ভীমরূপ সব পাপী নিশাচরেরা দেবতাগণকে দিত পরিতাপ। অসুর সমূহ উপদ্রব করিতেছিল— মায়া করিয়া নানা রূপ ধরিতেছিল। যাহাতে ধর্ম নির্মূল হয়— বেদপ্রতিকূল সেই সবই তাহারা করিতেছিল। যেই যেই দেশে ধেনু ও দ্বিজ পাইতেছিল— সেই নগর গ্রাম পুরীতে আগুন লাগাইতেছিল। কোথাও ছিল না শুভ আচরণ, দেব বিপ্র গুরু কেহই মানিত না। না ছিল হরিভক্তি— যজ্ঞ জপ দান, স্বপ্নেও শোনা যাইত না বেদ পুরাণ। দশশীর্ষ রাবণ যদি জপ যোগ বিরাগ তপ বা যজ্ঞের কথা শোনে তবে নিজে উঠিয়া ধায়—কিছুই থাকিতে পারে না—সব ধরিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। সংসার এমন ভ্রষ্টাচার হইয়াছে যে ধর্মের কথা আর কানেই শোনা যায় না; আর বেদ-পুরাণের কথা যাহারা বলে তাহাদিগকে বহুবিধ ভয় দেখায়— দেশ হইতে দেয় তাড়াইয়া। ঘোর নিশাচরেরা যে অনীতি (দুর্নীতি) করিতেছিল তাহা আর বর্ণনা করা যায় না; হিংসার উপরেই যেখানে অতিপ্রীতি সেখানে পাপের আর সীমা কোথায়? খল ও বহু চোর-জুয়াচোর বাড়িয়াছে—যাহারা লম্পট—পরধন ও পরদারায় (লোভী); তাহারা মানে না মাতা পিতা দেবতা—সাধুগণকে দিয়া করাইয়া লইতেছে সেবা।'

রাবণ ও তাহার অনুচর নিশাচরগণের এই বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন বলদৃপ্ত স্বেচ্ছাচারী নৃশংস বিধর্মী

শাসক এবং তদনুবর্তী রাজকর্মচারী বা রাজানুচরগণের বর্ণনা লুক্কায়িত আছে—এ-কথা অস্বীকার করিতে পারি না। আরও স্পষ্ট করিয়া কথাটা বলা হইয়াছে পরের একটি পদে—

জিন্হকে ইহ আচরন ভবানী।
তে জানহু নিসিচর সব প্রাণী।

অর্থাৎ এইরূপ ব্রাহ্মণ্যধর্ম-বিরোধী হিংসাত্মক আচরণ যাহাদের তাহারাই নিশিচর আখ্যায় অভিহিত হইবার যোগ্য।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে রাবণ এবং ঋষিদের যজ্ঞধ্বংসকারী অন্যান্য রাক্ষস-রাক্ষসীগণের বর্ণনার মধ্যে সমসাময়িক হিন্দুসমাজের প্রতি অত্যাচারের এবং সেই অত্যাচারের ফলে ধর্মবিপ্লবের কোনও ইঙ্গিত নাই। এক তাড়কা রাক্ষসীর বর্ণনায় দেখিতে পাই, বাল্মীকি-রামায়ণে তাহাকে গো-ব্রাহ্মণ-বিরোধী বলা হইয়াছে, কৃত্তিবাস আর-একটু বাড়াইয়া বর্ণনা দিয়াছেন—

ব্রাহ্মণের চর্ম্ম তার গায়ের কাপড়।
চলিতে তাহার বস্ত্র করে হড়মড়॥
ব্রাহ্মণের মুণ্ড তার কর্ণের কুণ্ডল।
মনুষ্যের মুণ্ডমালা গলার উপর॥

ইহা লৌকিক বর্ণনা মাত্র, সমসাময়িক ব্রাহ্মণ্য-বিরোধিতার কোনও উল্লেখ বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করা চলে না। অন্যত্র রাক্ষসদের যত বর্ণনা পাই তাহাতে তাহারা সাধারণভাবে ঋষিদের প্রতি উপদ্রব করে এবং যাগ-যজ্ঞ নষ্ট করে—ইহা ব্যতীত অন্য কোনও ইঙ্গিতময় বর্ণনা লাভ করি না।

কৃত্তিবাসের মধ্যে এই সমাজচেতনা নাই কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, একই সময়ে এক বিরাট সমাজদেহের মধ্যে বহুপ্রকারের সমাজশক্তি কাজ করে; সেই সবপ্রকারের শক্তিই যে তৎকালীন প্রতিভাবান্গণের চিত্তে সমভাবে স্পন্দন তোলে তাহা সত্য বলিয়া মনে হয় না; মানসিক সংগঠন-বৈশিষ্ট্য এবং সহজাত প্রবণতা-বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনও একটি বিশেষ সমাজশক্তির কাজই বিশেষ চিত্তে বড় হইয়া দেখা দেয়। তুলসীদাসও মুখ্যতঃ ধর্মপ্রেরণা লইয়া 'রামচরিত-মানস' কাব্য রচনা করিতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখে ধর্মকে অবলম্বন করিয়া তৎকালীন সমাজবিপ্লবের কথাটাও বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল—'রামচরিত-মানসে' তাহার বহু চিত্র ফুটিয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে তৎকালীন সমাজজীবনের যে পরিচয়টা বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইল তৎকালীন ভক্তিধর্মের বিবর্তনের পরিচয়। ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নামজপ-নামকীর্তনকে কেন্দ্র করিয়া যে প্রেমধর্মের প্রবর্তন করিলেন তাহার বিবর্তনের ইতিহাস ফুটিয়া উঠিয়াছে কৃত্তিবাসের রামায়ণে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে দেখিতে পাই শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাও রামনামের অধিক মহিমা-প্রতিষ্ঠা। এই নাম-মাহাত্ম্যে অটুট বিশ্বাসের ধর্মপ্রবণতাই কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রারম্ভে রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকি-মুনিত্ব লাভের উপাখ্যান গড়িয়া তুলিবার প্রেরণা দিয়াছে। এই উপাখ্যানটি বাল্মীকি-রামায়ণে নাই—বিন্দুমাত্র আভাসও নাই। আছে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অধ্যাত্ম-রামায়ণে ও আনন্দ-রামায়ণে।[১] অধ্যাত্ম-রামায়ণে উপাখ্যানটি ভাষা-রামায়ণ হইতে গৃহীত হইয়াছে এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। রত্নাকর দস্যুর উপাখ্যানে দেখি, রত্নাকর এতবড় পাপীই ছিল যে

১ রামকথা (হিন্দী)—বুল্কে

'রাম' নাম সে উচ্চারণ করিতেই পারে নাই। নরঘাতী দস্যুর পক্ষে সম্ভব ছিল 'মরা' উচ্চারণ করা। এই 'মরা' 'মরা' জপেই উন্টা রামনাম জপ হইয়া গেল—তাহাতেই রত্নাকরের পরিণতি বাল্মীকিতে। কৃত্তিবাসে ইহার বিশদ বর্ণনা আছে। অধ্যাত্ম-রামায়ণেও দেখি, মুনি-ঋষিরা রত্নাকর দস্যুকে বলিলেন,—'মরেতি জপ সর্বদা।' মৃত অর্থে 'মরা' কথাটি কখনই সংস্কৃত নয়, সুতরাং অধ্যাত্ম-রামায়ণকার 'মরা' কথা অবলম্বনে যে উপাখ্যান তাহা ভাষা-রামায়ণ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন, আশা করি এরূপ অনুমান অযৌক্তিক হইবে না। বাল্মীকি যে উন্টা রামনাম জপ করিয়া 'ব্রহ্মসমান' হইয়াছিলেন তুলসীদাসের 'রামচরিত-মানসে' দুইবার তাহার উল্লেখ আছে।

উন্টা নাম জপত জগু জানা।
বাল্মীকি ভয়ে ব্রহ্মসমানা॥

কিন্তু এই উল্লেখটুকু মাত্র—'রামচরিত-মানসে' এবিষয়ে আর কোনও উপাখ্যান বা আলোচনা দেখিতে পাই না; সম্পূর্ণাঙ্গ উপাখ্যানটি পাই কৃত্তিবাসে, কৃত্তিবাস তুলসীদাস অপেক্ষা কিছু প্রাচীনও বটেন; সব বিবেচনা করিয়া মনে হয়, টুকরা টুকরা কিছু প্রাচীন উপাখ্যানাংশকে অবলম্বন করিয়া রামনামের মহিমা-খ্যাপক এই উপাখ্যান রচনার কৃতিত্ব কৃত্তিবাসেরই প্রাপ্য। কিন্তু মনে হয়, কৃত্তিবাসের এ প্রেরণা আসিয়াছিল তৎকালীন সমাজজীবনে প্রবহিত ধর্মের ধারা হইতেই। নাম হেলায় অশ্রদ্ধায় উন্টা-পান্টা যেমন করিয়াই গ্রহণ করা হোক, নামের অন্তর্নিহিত অনন্ত অমোঘ শক্তির বলে মুক্তি অবধার্য। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই নাম-মহিমা প্রসারিত হইয়াছে বহু স্থানে বহু ভাবে। অন্ধমুনির পুত্রহত্যার পর রাজা দশরথ পাপ-মোচনের ব্যবস্থার জন্য বশিষ্ঠের আশ্রমে গেলেন; বশিষ্ঠের অনুপস্থিতিতে বশিষ্ঠ পুত্র বামদেব রাজাকে পাপ-বিমোচনের জন্য তিনবার রামনাম উচ্চারণ করাইলেন। বশিষ্ঠ ফিরিয়া আসিয়া এ-কথা জানিতে পারিয়া পুত্রকে অভিশাপ দিলেন; যে রামনাম একবারমাত্র উচ্চারণ করিলে কোটি কোটি জন্মের কৃত পাপ মুহূর্তে ক্ষয় হইয়া যায় সেই রামনাম তিনবার রাজাকে দিয়া উচ্চারণ করাইবার অপরাধে বামদেবকে পিতৃশাপে চণ্ডালযোনিতে গুহক চণ্ডাল হইয়া জন্মাইতে হইয়াছিল। হনুমান্ একবার বুক ছিঁড়িয়া লক্ষ্মণকে বুকের মধ্যে রামনাম দেখাইয়াছিল। সবচেয়ে মজা হইয়াছিল ভক্ত বিভীষণের পুত্র ভক্ত তরণীসেনকে লইয়া। রাক্ষস হইলেও সারা গায়ে রামনামের ছাপ মারিয়া তিনি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন; রামচন্দ্র স্বয়ং তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়িয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না—কারণ নামী হইতেও যে নাম বড়। এই সব উপাখ্যানই তৎকালীন ভক্তিধর্মের প্রকৃতি ও প্রবণতার পরিচয় দেয়। এই প্রবণতাই চৈতন্যযুগে আসিয়া নামসর্বস্ব ভক্তিধর্মের বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিল। সমাজের এই ধর্মপ্রবণতার পরিচয় এবং কিছু কিছু গার্হস্থ্য চিত্র ব্যতীত তৎকালীন বাঙলার সমাজ-বিপ্লবের অন্য কোনও তথ্যই কৃত্তিবাসের রামায়ণে পাওয়া যায় বলিয়া আমার মনে হয় না।

প্রসঙ্গক্রমে একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে পারি। মধ্যযুগের বাঙলার সমাজ-জীবনের পরিচয় বাঙলা রামায়ণ-মহাভারতের ভিতর দিয়া তেমন পাই না, সমৃদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্যেও কিছু কিছু পাইলেও বিশেষ কিছু পাই না— সবচেয়ে বেশি পাই মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে। তাহার কারণ চিন্তা করিতে গিয়া এই কথা মনে হইয়াছে, রামায়ণ-মহাভারত বা কৃষ্ণ-কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বাঙলা দেশের জল-মাটির ফসল নয়— বাহির হইতে প্রাপ্ত বীজ বা চারাগাছকে দেশী জলমাটিতে নূতন করিয়া বপন করিয়া তাহাদিগকে

স্বীকরণের চেষ্টা। আর মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে (শিবায়ন সহ) যত দেবদেবীর কথা আছে বাঙলার জল-মাটিতে তাঁহাদের একেবারে নবজন্ম লাভ ঘটিয়াছিল; তাঁহারা তাই সর্বতোভাবে মধ্যযুগের বাঙলার সমাজ-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া পড়িলেন; তাঁহাদের কাহিনী তাই প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে বাঙলার সমাজ-জীবনের অনেকখানি সামগ্রিক কাহিনীরূপেই প্রকাশ পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

৫

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাস এবং তৎপূর্ববর্তী বাঙলার ইতিহাসের মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থার দিক্ হইতে একটা বড় তফাত আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা মোটামুটিভাবে গোটা বাঙলাদেশের যে একটা রূপ পাইলাম এই রূপ ইহার পূর্বে এমন ভাবে ছিল না; আর এই একটি গোটা দেশের উপরে যে একটি একরাষ্ট্রব্যবস্থা দেখিতে পাইলাম, পূর্বে তাহা বিরল। দিল্লীর বাদশাহী-তন্ত্রের সহিত একটা যোগ থাকা সত্ত্বেও চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সর্বত্র প্রচলিত কোনও সুসংহত রাষ্ট্রব্যবস্থা দেখিতে পাই না। দিল্লীর কেন্দ্রীয় ক্ষমতার আওতায় যে-সব গৌড়েশ্বর বা নবাবদের কথা আমরা জানি তাঁহাদের ক্ষমতা প্রসারের বহু সীমাবদ্ধতা ও স্তরভাগ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলার বহু অঞ্চলে ভুক্তি-বিভক্তির এবং অন্যত্র ভূঞা-বিবক্তির ইতিহাস জানিতে পাই। উনবিংশ শতাব্দীতে জমিদারীপ্রথা দেশের শাসন-ব্যবস্থা এবং আর্থিক ব্যবস্থাকে নানাখানা করিয়া রাখিলেও উভয়ক্ষেত্রেই একটা ঐক্যের প্রভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিকে অবলম্বন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর আমাদের জাতীয় জীবনের যে বিবর্তন তাহার সম্বন্ধে তথ্য ও তত্ত্ব আজ আমাদের অনেকখানি গোচর হইয়া উঠিতেছে। এই বস্তুগত তথ্য ও বাস্তব অভিজ্ঞতানির্ভর তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের নূতন করিয়া বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন হইতেছে। এই দৃষ্টিতে মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যেসব আলোচনা হইতেছে তাহার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে করি; কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি অবশ্যস্বীকার্য মৌলিক সত্য আছে, তাহা হইল তাঁহার প্রথমাবধি আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত একটা অধ্যাত্ম-বিশ্বাস। এই অধ্যাত্ম-বিশ্বাস পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ ঔপনিষদিক প্রভাবরূপেও দেখা দিয়াছে, ভক্তিভাবাশ্রিত প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসরূপেও দেখা দিয়াছে, একটা গভীর রহস্যবোধের পরিণতিরূপেও দেখা দিয়াছে, বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতাজাত সংশয়াচ্ছন্ন চিন্তারূপেও দেখা দিয়াছে—আবার বিজ্ঞানবুদ্ধির সহিত সমন্বিত রূপেও দেখা দিয়াছে; কিন্তু যে-যুগে যে-রূপেই দেখা দিক তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের একটা সাধারণ ব্যাখ্যা লক্ষ্য করিয়াছি; সংক্ষেপে সে ব্যাখ্যা এই যে, এই আধ্যাত্মিকতা মূলতঃ একটা বাস্তব হইতে পলায়নীবৃত্তি হইতে জাত। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের দুইটি মেরু রহিয়াছে, এক মেরুতে ভৌম-আকর্ষণ, অপর মেরুতে ভৌমাতীতে উত্তরণ। পৃথিবীকে তিনি জীবনের প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত অত্যন্তভাবে ভালো বাসিয়াছেন—এই সত্য আকর্ষণ তাঁহাকে বস্তুনিষ্ঠ করিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতায় অনন্যসম্পদ্‌বান্ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বন্দ্ব-সংশয়-বেদনা-সমাকুল ছিল; বস্তুনিষ্ঠরূপেই তাহার সমাধান লাভের প্রবণতা এবং সাধনা ছিল না

রবীন্দ্রনাথের। ফলে তাঁহার স্পর্শকাতরচিত্তে বিবিধ বাস্তব অভিজ্ঞতা নিরন্তর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে; সেই দ্বন্দ্বের সমাধান তিনি নিরন্তর খুঁজিয়াছেন বস্তু-অতিক্রমের মধ্যে। মৃত্যু যখন জীবনের ব্যর্থতা ও অপমানের বার্তা বহন করিয়াছে তিনি তখন অমৃতের সন্ধানের দ্বারা সংকট অতিক্রম করিতে চাহিয়াছেন, অন্ততঃ চিত্তের সান্ত্বনা খুঁজিয়াছেন; সীমা যখন দুর্বিষহ বেদনা সৃষ্টি করিয়াছে তিনি অসীমের গান করিয়া আত্ম-ভোলানো আত্ম-তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, বাস্তব ইতিহাসের বিবর্তনে প্রলুব্ধ প্রমত্ত হিংস্র মানবের বীভৎস চক্রান্তে যেখানে রূঢ়ভাবে আহত হইয়াছেন তখন বিশ্ববিবর্তনের পিছনকার একটি মঙ্গলচৈতন্যের আত্মপ্রকাশ ও আত্মরতির পরিকল্পনাকে মহিমান্বিত করিয়া ইতিহাসের সংকটকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবে যাহা অলভ্য অসম্ভাব্য বলিয়া মনে হইয়াছে সকল বাস্তব বাধা অতিক্রম করিয়া তাহাকে লভ্য এবং সম্ভাব্য করিয়া তুলিবার বলিষ্ঠতা তাঁহার ছিল না—অধ্যাত্মমননের মধ্যে তাহার একটা পরিপূর্ণতা আস্বাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একদিক হইতে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা যে ব্যাপক এবং তীব্র ছিল তাহার কারণ, পৃথিবীর প্রতি বস্তুনিষ্ঠ আকর্ষণও তাহার অত্যন্তভাবে সত্য ছিল। সেই সত্যই নিরন্তর ক্ষোভ আনিয়াছে, আত্মপ্রতিক্রিয়া আনিয়াছে, অভিজ্ঞতার দুর্বিষহতা আনিয়াছে—তাহাই প্রেরণা দিয়াছে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ধ্যান-মননের মধ্যে জীবনের সংগতি ও তথাকথিত একটা সুষমা আবিষ্কার করিতে।

মূলতঃ যে প্রত্যয়টিকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাহা হইল এই যে বস্তুনিষ্ঠা এবং সেই বস্তুনিষ্ঠাজাত জীবনের যে প্রেয়ো-শ্রেয়ো-বোধ তাহাই হইল পরম সত্য—'সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।' পরমপ্রেয়ঃ এবং শ্রেয়ের এই আদর্শ এখন পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য নহে; কিন্তু বস্তুবাদ ও ভাববাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ লইয়া সমান্তরাল রেখায় কতখানি তর্ক করিয়া কোনও লাভ নাই। তবে চর্যাপদের ক্ষেত্রে আমার যাহা জিজ্ঞাস্য ছিল রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আমার প্রায় সেই একই জিজ্ঞাস্য। ধর্মের পথ যে বস্তুজগৎ হইতে পলায়নের পথ—আধ্যাত্মিকতা যে বস্তুদ্বন্দ্বের চাপে পড়িয়া শূন্যে পূর্ণতার সৌধনির্মাণের চেষ্টা—এ-কথা তো শুধু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই সত্য নয়—ইহা তো সর্বজনীনন এবং সর্বকালিক সত্য; রবীন্দ্রনাথের সমাজ-জীবনের পারিপার্শ্বিক বিশেষ কতকগুলি বস্তুদ্বন্দ্বই যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ কতগুলি অধ্যাত্মপ্রবণতা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে এ-কথা বলিবার তাৎপর্য কি? রবীন্দ্রনাথের যুগের সমস্ত পারিপার্শ্বিক ইতিহাসের অত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবৃতি এবং বিশ্লেষণ না দিয়া মোটের উপর এই কথা বলিয়া দিলেও তো চলিতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ জীবনের ক্ষেত্রে বস্তুসত্যকে কোনও দিন বলিষ্ঠভাবে পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি দুর্বলভাবে চিরজীবনই অলীক 'আত্মা' এবং 'ব্রহ্মে' বিশ্বাসী রহিয়া গেলেন।

আমি এ-ক্ষেত্রে দেখিতেছি পরস্পরবিরোধী দুইটি বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব— বস্তুবিশ্বাস এবং অধ্যাত্মবিশ্বাস। বিশ্বাস লইয়াও কোনও তর্ক চলে না; আসলে এখানে দেখা দিয়াছে পরস্পরবিরোধী দুইটি জীবনদর্শনের দ্বন্দ্ব।

এ-দ্বন্দ্বের কথা ছাড়িয়া দিতেছি। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম, কোনও বিশেষ মতবাদে আত্যন্তিক আস্থা লইয়া মনের মধ্যে একটা ছক গড়িয়া উঠিবার কথা। রবীন্দ্রচর্চাকে অবলম্বন করিয়া তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদনে'র একটি মার্ক্সপন্থীর ব্যাখ্যা। 'গান্ধারীর আবেদনে'র রচনার যুগটি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, বাঙলাদেশের ইতিহাসে ইহা হইল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের

সহিত ধনতান্ত্রিক স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবল দ্বন্দ্বের যুগ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই বাঙলাদেশে এই দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যাইতে পারে। ধনতন্ত্রই হইল মাতা গান্ধারী; সাম্রাজ্যবাদ এই ধনতন্ত্রেরই সন্তান— সুতরাং সাম্রাজ্যবাদই হইল উদ্ধত প্রমত্ত পুত্র দুর্যোধন। কিন্তু গান্ধারী অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর গোড়াকার বাঙলা দেশের ধনতন্ত্রবাদ স্বভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী— সে দণ্ডদাতা ও দণ্ডিতের জন্য সমান বিচারের মানদণ্ড দাবি করে এবং ন্যায়নীতি লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া পুত্র সাম্রাজ্যবাদের সে নির্বাসন কামনা করে; তৎকালীন বাঙালী ধনতান্ত্রিকগণ প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশসাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বদেশী আন্দোলন এবং কংগ্রেস আন্দোলনের· ইহাই গোড়ার কথা— মাতা ধনিকতন্ত্রের সহিত পরসুখে এবং পরযশে অসহিষ্ণু পুত্র সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ। রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদনে'র ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে বিংশ শতাব্দীর গোড়াকার এই যুগ-সত্য।

রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদনে'র এই জাতীয় বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিবার পূর্বে কতগুলি তথ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন মনে করি। 'গান্ধারীর আবেদনে'র বিষয়বস্তুই যে রবীন্দ্রনাথ মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, প্রেরণাও মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতা হইয়া গান্ধারী যে বার বার 'ত্যাগ কর পুত্র দুর্যোধনে' বলিয়াছেন, এ-উক্তি হুবহু মহাভারত হইতে গৃহীত। অবশ্য এই তথ্যের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর আবেদনের আবেদন বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়া মনে করি না। আমাদের প্রচলিত ধারণা, রবীন্দ্রনাথ এ-ক্ষেত্রে মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া ধর্মশীলা জননী গান্ধারীকে অনেকখানি মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ গান্ধারীচরিত্রকে মহিমান্বিত করিয়া আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন সন্দেহ নাই, মহাভারতের বিপুল পরিধির মধ্যে ছড়াইয়া থাকা এই বলিষ্ঠ চরিত্রটিকে তিনি সংহত করিয়া স্পর্শযোগ্য একটি সজীব মূর্তি দান করিয়াছেন; মহাভারতের চরিত্রের ভিড়ে যাঁহাকে অনেকেই হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অব্যর্থভাবে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু গান্ধারীর মূল চরিত্র-বিষয়ে মহাভারতের অনুবর্তনই করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি: কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের প্রথম দিনে অতি প্রত্যূষে শুচিস্নাত হইয়া দুর্যোধন প্রথম গিয়া উপস্থিত জননী গান্ধারীর নিকট; মাতার চরণস্পর্শ করিয়া দুর্যোধন জয়ের জন্য মায়ের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছিল, পুত্রস্নেহের দাবি লইয়া সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিল, 'জয়মম্বা ব্রবীতু মে'— 'আমার জয় হোক, মা তুমি এই কথা বল'; জননী গান্ধারী গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, 'যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ'— 'যেখানে ধর্ম তাহারই জয় হোক।' একদিন নয় দুইদিন নয়— যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসই দুর্যোধন মায়ের নিকট আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে গিয়া ঐ এক আশীর্বাদই শুনিয়া আসিয়াছিল— 'যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়'। অতএব রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের উপযোগী করিয়া গান্ধারীর সহিত পুত্র দুর্যোধনের বিরোধকে এমন বড় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এমন কথা মনে করিবার কোনও কারণই দেখিতে পাইতেছি না। মূল মহাভারতে বর্ণিত মাতাপুত্রের দ্বন্দ্বই রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যে নবপ্রকাশ লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই-জাতীয় ব্যাখ্যাকে 'গান্ধারীর আবেদনে'র যুগোপযোগী ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয় না, ইহাকে মনে হয়, একটি বিশেষ প্রত্যয় লইয়া যুগের ইতিহাসের বিশ্লেষণ-আশ্লেষণ-জাত একটি ছকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন'কে যেমন করিয়া হোক ঠেলিয়া পুরিয়া মানাইয়া লইবার চেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক শিক্ষাচিন্তা

সুনীলচন্দ্র সরকার

রুশো

রুশোই আধুনিক শিক্ষাচিন্তার প্রথম প্রবর্তক বলা যায়। ফরাসী বিপ্লবের সময় যে সভ্যতার সংকট তিনি দেখেছিলেন তার সমাধান খুঁজেছিলেন শিক্ষার মধ্যে। তাঁর নূতন শিক্ষার আদর্শ ও পরিকল্পনা তিনি কাহিনী আকারে লিখেছিলেন তাঁর এমিল গ্রন্থে। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রে যেন একটি পটপরিবর্তন ঘটল। পরবর্তী শিক্ষাচার্যরা— যথা পেস্টালট্‌জি, হার্বার্ট, ফ্রোয়েবেল, ডিউই— সকলেই তাঁদের নিজস্ব দানের মৌলিকতা সত্ত্বেও রুশোর মূল দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত।

রুশো প্রচলিত শিক্ষাকে তার সংকীর্ণ বিচরণপথ থেকে উদ্ধার করে তাকে ব্যাপ্ত করে দিতে চাইলেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে। তাঁর মতে শুধু বৃত্তির জন্যে, কোনো বিশেষ নৈপুণ্যের জন্যে, বা প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যে, বা সামাজিক জীবনে কোনো বিশেষ ধরনের সফলতা লাভের জন্যেই শিক্ষা নয়। শিক্ষা মানবজীবনকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করবার জন্যে। সমস্ত মানবসন্তানেরই এই রকমের শিক্ষায় আছে জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্র সমাজ বা সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির কোনো দাবিকেই এই স্বাধীন নিরঙ্কুশ শিক্ষার অন্তরায় হতে দেওয়া চলে না। রুশো তাই সমাজের প্রয়োজন ও দাবিকে তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় খুব গৌণ স্থান দিলেন। শিশুকে ও তার জগৎকে তিনি অব্যবহিতভাবে পরস্পরের সম্মুখীন করে দিতে চাইলেন— তাদের মধ্যে আর কোনো মধ্যবর্তীকে— রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতা, ধর্মনেতা, অভিভাবক, গুরু কাউকে— দাঁড়াতে দিতে চাইলেন না। স্বাধীন স্বচ্ছন্দ শিশুমন তার প্রকৃতির সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে বহির্জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুক, তবেই সে সম্পূর্ণ বেড়ে উঠে পুষ্পিত সফল হয়ে উঠবে যেমন প্রকৃতির কোলে গাছটি হয়। এইভাবে তৈরি হয়ে ওঠা মানুষই হতে পারে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এরাই সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে যুগে যুগে তার সংকট থেকে।

রুশোর এই নূতন শিক্ষাচেতনা একটা মুক্তির প্রেরণা, একটা বিস্তৃতির আবেগ এনে দিল শিক্ষাক্ষেত্রে। কিন্তু যাঁরা এগিয়ে এলেন এই প্রেরণা অনুসারে নূতন প্রতিষ্ঠান, নূতন বিধিবিধান রচনায়, তাঁদের সামনে একে একে জেগে উঠল কতকগুলি দুরূহ সমস্যা।

প্রথম সমস্যা : জীবনাদর্শ নির্বাচন

পরিপূর্ণ মানবজীবন কাকে বলব? এক হিসাবে বলা যায় প্রতিটি মানুষের জীবনের প্যাটার্ন স্বতন্ত্র, unique। কিন্তু তা হলেও আধুনিক জগতে চার-পাঁচ রকমের জীবনাদর্শের বিস্তৃত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে অধিকাংশ লোকই এর একটি না হয় আর-একটির বশবর্তী হয়।

ক. Utilitarian বা প্রয়োজনসিদ্ধির আদর্শ। এই ধরনের জীবনের আশ্রয় বস্তুবাদ, এর মূল

প্রেরণা জৈব প্রয়োজন, কামনা-বাসনা, অহংবিলাস। লক্ষ্য : অর্থ, সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি, জৈব সন্তোষ ও ব্যক্তিগত সম্ভোগ। এই আদর্শচালিত ব্যক্তি নিজের বাইরে দেখতে পায় দুটি মাত্র সত্তা, এক : বস্তুগজৎ, যা তার কাছে শুধু একটা প্রকাণ্ড উপাদানভাণ্ডার, এবং হয়তো তা ছাড়াও দেহ ও ইন্দ্রিয়সন্তোষের একটা বিরাট ক্ষেত্র। দুই : পরস্পরের প্রয়োজনসিদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি মানবসমাজ যাকে সে দেখে একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে।

সে দেখে এই দুই প্রতিপক্ষ সত্তাকে নিজের প্রয়োজন ও সাধ্য অনুযায়ী ব্যবহার করতে হলে বিশেষ ধরনের কতকগুলি জ্ঞান বিজ্ঞান কর্মনৈপুণ্য যথাসম্ভব অর্জন করতে পারলে ভালো হয়। নিজের প্রকৃতির অন্যান্য গুণ, প্রবণতা, ক্ষমতা— যা ঐ ব্যাবহারিক জগতে কাজ দেয় না— সেইগুলিকে ফুটিয়ে তোলার তাগিদ সে অনুভব করে না। কিংবা গৌণ শখ হিসাবে সেগুলির চর্চা করতে গেলেও দেখে যে সেগুলি তার অভিপ্রেত সার্থকতার পক্ষে শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, অবাঞ্ছিত। প্রয়োজন প্রতিযোগিতার রাজ্যে তারা অনাবশ্যক বাধা ও আড়ষ্টতার সৃষ্টি করে। কাজেই যদি কখনো সে কোনো উচ্চ বিদ্যা বা চর্যাকে গ্রহণ করে তবে সে তা ঐগুলির নিজস্ব মূল্যের জন্যে নয়, সংস্কারমুগ্ধ সমাজের সামনে ঐগুলিকে দেখিয়ে তার মর্যাদামূল্য আদায় করবার জন্যে।

বলা বাহুল্য পৃথিবীর মানুষ স্থান কাল ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাবের দরুন কিছু কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে আজ পর্যন্ত মোটামুটি এই জীবনাদর্শের বশ্যতাই স্বীকার করেছে। এই আদর্শ পূরণের জন্যই তারা আধুনিক বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছে, কিন্তু বিজ্ঞান যে নূতন আদর্শ নিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিল সে আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পরে সেই আদর্শের আলোচনা করা হচ্ছে।

খ. Cultural বা সাংস্কৃতিক জীবনাদর্শ। যদিও মানুষ প্রধানতঃ প্রয়োজনবাদী, তবু মাঝে মাঝে কি পূর্বে কি পাশ্চাত্যে এক-একটি সাংস্কৃতিক আদর্শ সমাজের রথরশ্মি ধারণ করেছে। এই আদর্শের জগতে একদিকে ব্যক্তি ও অন্যদিকে একটি ঐতিহ্য এই দুই ব্যাপারের প্রতিক্রিয়ার আয়োজন। বহিঃপ্রকৃতি বা মানবসমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সরাসরি কোনো সম্পর্কস্থাপন এখানে অভিপ্রেত নয়। অতীতকালের স্বীকৃত মহাজনদের চারিত্রিক সম্পদ শিল্প সাহিত্য-কৃতি, মানসিক ব্যাবহারিক নানা রকমের সিদ্ধিকে আদর্শ বলে ধরে নিয়ে তার অনুসরণই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে ধর্মগোষ্ঠীগুলিও প্রায়ই কোনো-না-কোনো অনুবর্তী সংস্কৃতির প্রবর্তন বা লালন করে। কিন্তু ধর্মের কাছে সংস্কৃতি উচ্চতর গ্রামে ওঠার সোপান মাত্র, কাজেই তার শীলাভ্যাস তপশ্চর্যার পক্ষে বাধাস্বরূপ বোধ হলেই সংস্কৃতিকে সে পদদলিত করে। সংস্কৃতিগুলিও অপ্রতিরোধ্যভাবে ধর্মের অন্তঃস্থ সংহতি ও শক্তির দিকে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যে কোনো উপাদানই সে গ্রহণ করে তাকে নামিয়ে আনে অনম্য উচ্চাভিমুখিতা থেকে সমাজ-জীবনের আপোসের রাজ্যে। ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সমাজের সীমান্তপ্রদেশে চিরকাল চলেছে এই হাতকাড়াকাড়ি, এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা। ধর্মের আতিশয্যগুলি থেকে, তার অভীপ্সার নির্মমতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সংস্কৃতিকে আশ্রয় নিতে হয়েছে humanism বা মানবতাবাদে। তার মানে মানুষের উৎকর্ষের সাধ্যের একটা উচ্চতম মান অতীত কৃতিত্বের নজীরে স্থির করে নিয়ে বলা— বাস্, এই পর্যন্ত এর ওপারে আর নয়। কারণ ওপারে কিছু আছে কি না তাই সন্দেহ, আর যদি থাকেই তবে তার পিছনে অতীন্দ্রিয় অতিযৌক্তিক (suprarational) শক্তির সাহায্যে

অনুধাবনের চেষ্টাটা মানুষের কর্তব্য নয়। অস্বাভাবিক হওয়ায় মানুষের কল্যাণ নেই। নিজস্ব স্বভাব-সম্ভাবনার পরিধির মধ্যেই তার ইষ্টসিদ্ধি হতে পারে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' ইত্যাদি। হিউম্যানিজ্‌ম্ সাধারণতঃ ভবিষ্যৎমুখী নয়, প্রগতিতে বিশ্বাসী নয়, তার মুখ অতীত কীর্তিকলাপের দিকে ফিরোনো। তা ছাড়া আত্মোৎকর্ষের একটা স্বনির্বাচিত উচ্চমান সে রক্ষা করতে চায়—তার চেয়ে উপরে যেতে বা নীচে নামতে তার আপত্তি।

গ. Rationalistic বা বুদ্ধিবিবেকবাদশাসিত জীবনাদর্শ। প্লেটো অ্যারিস্টট্‌ল্ বুদ্ধিবিবেকের (Reason) দ্বারা শাসিত সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন। উনবিংশ শতকে বিজ্ঞানের কৃতিত্বে আশান্বিত মনীষীরা স্বপ্ন দেখেছিলেন মানবিক সমস্যার সমূহ সমাধানের। বুদ্ধিবিবেককে দেশকাল-নিরপেক্ষ এক সার্বিক (Universal) শক্তি হিসাবে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের একমাত্র প্রয়াস ছিল এই Reasonএর প্রয়োগপথের সমস্ত বাধামোচন, সমস্ত সংস্কার মোহ অক্ষমতা পক্ষপাত দূর করে এর নৈর্ব্যক্তিক আলোয় সব কিছু প্লাবিত করে দেওয়া। নূতনভাবে ব্যক্তিজীবন-সংগঠন, সামাজিক রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান সংগঠন সবই এই বুদ্ধিবিবেকবাদের উপর নির্ভরশীল। স্বল্পস্থায়ী হলেও এই আদর্শানুযায়ী বেশ কিছুটা চিন্তা ও কর্মব্যস্ততা উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়টা ইয়োরোপকে মুখরচঞ্চল করে রেখেছিল। এই আদর্শ ভবিষ্যৎমুখী, ক্রমবিবর্তনবাদকে কাজে লাগাতে উৎসাহী। কিন্তু স্বভাবতঃই অতীন্দ্রিয় বা অতি-যৌক্তিক কোনো শক্তি বা সিদ্ধিতে এ বিশ্বাসী নয়।

এই আদর্শে ব্যক্তিকে তার বহির্বিশ্বের সঙ্গে অবাধ পরিচয় ও আবিষ্কারের অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু এই পরিচয় শুধু বুদ্ধির দৌত্যে। হৃদয় কল্পনা নীতি বা সৌন্দর্যজ্ঞান বা উচ্চতর আত্মিক ভাবনা এখানে অবান্তর। প্রয়োজনসিদ্ধির জগতে দরকার নিম্নতর Practical Reason বা ব্যাবহারিক বুদ্ধি যার কোনো নিশ্চিত মাপকাঠি নেই, অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে যা পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই উচ্চতর আদর্শের জন্য ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজন কঠোর আত্মসংযম করে, স্বভাবের চিত্তের সমস্ত বিরুদ্ধভাব ও প্রবৃত্তিগুলিকে দমিত করে শুদ্ধ মার্জিত নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধির পথ মোচন।

বলাবাহুল্য এই Reason, যাকে সার্বিকশক্তির আসনে বসানো হয়েছিল, অতিশীঘ্রই তার জায়গায় আমদানি করা হয়েছিল স্বার্থান্বেষী rationalisation— যা একটি দু-মুখো ছুরি, দুই বিরোধী পক্ষের প্রত্যেকেরই সপক্ষে যা সমানসাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে।

বিশুদ্ধভাবে পালিত হলে এই আদর্শ এখনো মানুষের অনেক উপকার করতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক দুটি বিশ্বযুদ্ধ সে সম্ভাবনাকে ব্যাহত করেছে। বোঝা গেছে Reasonএর সঙ্গে অন্য কোনো সর্বজনমান্য শক্তি বা প্রেরণা চাই।

ঘ. Romantic, আত্মবিকাশ বা ব্যঞ্জনামূলক জীবনাদর্শ। এতে ব্যক্তিসত্তাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। শুধু তার প্রয়োজনকে নয়, তার সমস্ত স্বভাব ও সম্ভাবনাকে মুক্ত করে বহির্বিশ্বের সামনে খাড়া করে দেবার এই চেষ্টা। শুদ্ধ বুদ্ধির ক্রিয়া ছাড়াও ব্যক্তির অন্য সবরকমের অনুভূতি আবেগ ও সংবেদনক্ষমতার মধ্য দিয়েও মিলনের পথকে প্রশস্ত করে দেওয়া এর উদ্দেশ্য। পুরো মানুষটার সর্বাঙ্গীণ স্ফুরণটাই এখানে বিশেষ একটা লাভ বলে স্বীকৃত। বুদ্ধিবিবেকবাদের আওতায় মানুষের ব্যক্তিত্বটা অবহেলিত এমন-কি সম্পূর্ণ নিষ্পিষ্ট হবার সম্ভাবনা। রোমান্টিক ব্যক্তিত্ববাদ বুদ্ধির কাছে ব্যক্তিত্বকে বলি

দিতে রাজি নয়। বুদ্ধিকে সে কাজে লাগিয়ে নিতে চায় ব্যক্তিত্বের সমস্ত উপাদানগুলিকে শোধিত ও সুসমঞ্জসভাবে সজ্জিত করে নেবার জন্যে। যদিও রুশো ক্রীশ্চান ছিলেন তবু তিনি মানবস্বভাবের মধ্যে নিহিত আদিঅশুদ্ধতায় (original sin) বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে মানবস্বভাব শুদ্ধ সক্ষম, স্বতঃই সিদ্ধির অধিকারী। শুধু তাকে অবারিত অভিজ্ঞতার সুযোগ দেওয়া দরকার। এইজন্য রুশোর উদ্ভাবিত এই আদর্শকে রোমান্টিক প্রকৃতিবাদ (Romantic naturalism) আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। রুশো ব্যক্তিমানুষকে যতটা মর্যাদা দিয়েছেন তাতে তাঁর মতকেই মানবতাবাদ বললে মানাত। কিন্তু রুশোর রোমান্টিক কল্পনা মানুষের ভবিষ্যৎকে সীমাবদ্ধ করে নি, এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে তিনি ব্যক্তিমানসকে একেবারে মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর ভরসা পূর্বপুরুষদের দৃষ্টান্তের উপর নয়, মনুষ্য-প্রকৃতির উপর। তাই তাঁর মতকে বলা হয় naturalism। এই মানবপ্রকৃতি (original nature of man)কে রুশো প্রায় একটি দ্বিতীয় সার্বিক তত্ত্বের মর্যাদা দিয়েছেন, সার্বিক বুদ্ধিবিবেককে যার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। এর থেকেই আসে দ্বিতীয় প্রশ্ন।

দ্বিতীয় সমস্যা : মানবপ্রকৃতির মূলতত্ত্ব

ব্যক্তিগত স্বভাবের ভেদবৈচিত্র্য সত্ত্বেও আদি মানবপ্রকৃতি বলে এমন কোনো একটি তত্ত্ব বা তত্ত্বসমষ্টি আছে কিনা যা সর্বকালে সর্বজনের পক্ষে সত্য, যাকে গ্রহণ করা যায় সার্বিক তত্ত্ব হিসাবে? যদি তা থাকে তবে জীবপ্রকৃতির নিম্নগ্রাম থেকে উপর দিকে কতটা তার বিস্তার? কোন্ কোন্ উপাদানে এই স্বভাব গঠিত? প্রয়োজনবাদীরা মানবপ্রকৃতিতে ব্যবহারবাদের (behaviourism) কল্যাণে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতার আরোপ করতে চায়, তার ফলে বহিঃপ্রকৃতি, নিম্নতর জীবের প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি, সবই একই রকম নিয়মের সূত্রে বাঁধা পড়ে। মানুষের বৈশিষ্ট্যের আর কোনো অবসর থাকে না। এই প্রসঙ্গে মানবচেতনার নিম্নতর স্তরগুলির আবিষ্কার স্মরণীয়। তার ঊর্ধ্বতম আরোহণ সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল থেকে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবৃতি ইত্যাদি জমা হয়ে উঠেছে তা অনেক পরিমাণে কল্পনা ও অতিরঞ্জনদোষে দুষিত হলেও উপেক্ষণীয় নয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সমাজে সুচিরলালিত চারিত্রিক গুণ, হৃদয়বৃত্তিগুলির, বিশেষতঃ সত্য সুন্দর শুভ, ন্যায্য বা উচিত (just), অহিংসা মৈত্রী প্রেম ইত্যাদি ভাবাদর্শগুলির মানবপ্রকৃতির মধ্যে কোনো নিত্য আসনের দাবী আছে কি না।

শেষ কথা এই যে, মানবপ্রকৃতিতে এমন কিছু সার্বিক তত্ত্ব বা প্রবেগ বা প্রবণতা আছে কি না যার উপর ভিত্তি করে শুধু ব্যক্তিজীবনই নয়, স্থায়ী ও প্রগতিশীল মানবসমাজ গঠন করা যায়।

তৃতীয় সমস্যা : ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার সম্বন্ধ

এর থেকেই তৃতীয় প্রশ্ন এসে পড়ে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সম্বন্ধ কি, বা কি হওয়া উচিত? ব্যক্তিসত্যই একমাত্র সত্য, সমাজ শুধু সেই সত্যস্ফূরণের উপযুক্ত অঙ্গন? এই হল ব্যক্তিত্ববাদ (individualism)। অমিশ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রুশোর রোমান্টিকতা থেকে নীট্‌শের অতিমানবতার অভীপ্সা পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

কিংবা সমাজসত্তাই সত্য, ব্যক্তি শুধু তার অনুবর্তী দাস, তার আত্মবিস্তারের উপায়? হেগেলের

রাষ্ট্রিকসমাজবাদ (state socialism)কে মনোমত ভাবে রূপান্তরিত করে নিয়ে আধুনিক যুগের বিভিন্ন পর্যায়ের সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি।

এ বিষয়ে বর্তমানযুগে সুচিরস্থায়ী তর্কবিতর্কে প্রবেশ না করে মোটামুটি স্বীকার করে নেওয়াই ভালো যে ব্যক্তিসত্তাও যেমন সত্য, সমাজসত্তাও তেমনি একটি স্বতন্ত্র সত্য। এবং কোনো রকমে এই দুই সত্যের মিলনেই মঙ্গল। কিন্তু কি হবে সেই মিলনের নীতি? দুই সত্যই সমান প্রধান এবং পরস্পরের সঙ্গে বিধিবদ্ধভাবে প্রতিক্রিয়াশীল? কিংবা এর কোনো একটি কিছু পরিমাণে বা কোনো কোনো বিশেষ ব্যাপারে অপরটির বাধ্য?

সবচেয়ে বিভ্রান্তিজনক সমস্যা এই যে, যে সমাজসত্তাকে স্বীকার করতে হবে কোথায় তার দেখা পাওয়া যাবে? সে কি আছে রাষ্ট্রিক বা নাগরিক বিধি-বিধানে, সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্যে, মনীষী ও শিক্ষাচার্যদের ধ্যানে ধারণায়, না কম্যুনিজ্‌ম্ ডেমোক্রেসি প্রভৃতি কোনো রাজনৈতিক সমবায় সংগঠনের রীতিনীতিতে? ব্যক্তি তার স্থানীয় আঞ্চলিক যে কোনো দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে হবে প্রতিক্রিয়াশীল? কিংবা সমাজ বলতে সে বুঝবে এমন একটি মনগড়া সত্তা যা দিনে দিনে তৈরি করতে হয় অন্যান্য ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে দিনানুদিন পরিচয়ে, সাধারন লোকের জীবনধারা-সমস্যা ও ক্রিয়াকর্মের দীর্ঘ ও সতর্ক অনুধাবনে, গ্রন্থ ও সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে লোকচরিত্র লোকযাত্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাব চিন্তা সংবাদ আহরণে? তাই যদি হয় তা হলে প্রত্যেক ব্যক্তিই তো পাবে শুধু তার মনগড়া সমাজকে। কাজেই সেই দুরূহ প্রশ্ন আবার ফিরে আসে সমাজসত্তা, ব্যক্তিগত মানুষ নয় মানবসত্তা, men নয় Man বলে কোনো সার্বিক তত্ত্ব আছে কি না যার মধ্যেই ফুটে ওঠে স্থান কাল উদ্দেশ্য ভেদে বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর সমাজ বা গোষ্ঠী, যার মধ্যে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও সমস্ত ক্ষুদ্রতর অংশগত গোষ্ঠী বা সমাজ পূর্ণ বিস্তৃতি ও সার্থকতা লাভ করতে পারে? প্রতিটি ব্যক্তির সম্পূর্ণ প্রস্ফুটন যার মধ্যে সম্ভব, এবং সকলের দান আত্মসাৎ করে সকল জীবনকে সুসমঞ্জস ভাবে সাজিয়ে নিয়ে যে বৃহৎ সত্তা এগিয়ে যেতে সক্ষম? এমন কোনো বৃহৎ সত্তা থাকলে তার শক্তিকেন্দ্র কোথায়, কর্মকৌশল (dynamism) কি?

শিক্ষাবিদের দায়িত্ব

যে সমস্যাগুলি বিবৃত হল তা যে শিক্ষাচিন্তার পক্ষে অবান্তর নয়, বরং আবশ্যিক সেই হল আধুনিক শিক্ষাচার্যদের বিশ্বাস। জীবনদর্শন, মনস্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের মূল চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে পরিচয় এবং মানবজীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা না থাকলে শিক্ষাচিন্তার রাজ্যে পথ পাওয়া শক্ত। ডিউইর মতে একমাত্র সম্ভবপর ও কার্যকর দর্শনশাস্ত্র পাওয়া যাবে শিক্ষাচিন্তার মধ্যেই। রুশোর পরে এমন মানুষরাই এগিয়ে এলেন শিক্ষার আসরে যাঁদের প্রধান প্রস্তুতি তাঁদের ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নয়, বিভিন্ন জীবনব্যাপারে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি, মানুষ ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে ভাববার ক্ষমতা, মহৎ হৃদয়। পেস্টালট্‌জি ধর্মপ্রাণ মহাত্মা, অনেকাংশে আমাদের মহাত্মা গান্ধীর মতো; ফ্রোয়েবেলও ধর্মপ্রাণ ও কবিহৃদয়; হার্বার্ট ও ডিউই দুই বিখ্যাত মনীষী ও দার্শনিক এবং রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, দার্শনিক, দ্রষ্টা, মনীষী, জীবনরসিক, সমাজকর্মী ইত্যাদি।

রুশো পরিকল্পনাই করেছিলেন, কোনো পরীক্ষা করেন নি। পেস্টালট্জি পরীক্ষা করে দেখালেন কেমন করে একটা বিশেষ জীবনাদর্শে গঠিত একটি অন্তরঙ্গ পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, নানা রকম কাজকর্ম ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিশুপ্রকৃতির শিশুচিত্তের ভিতরের শক্তি ও সম্ভাবনাগুলিকে স্পর্শ করা যায়, জাগিয়ে দেওয়া যায়। পেস্টালট্জি প্রমাণ করলেন মানবচরিত্রের মধ্যে হৃদয়ের ও তার বৃত্তিগুলির যে স্থান আছে তাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে শিক্ষা সেই পরিমাণে নীরস অগভীর ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তিনি করে তুলেছেন একটি স্নেহপরিবার, ঘরোয়া অন্তরঙ্গ একটি মিলনক্ষেত্র। Home Schoolএর ধারণা তাঁরই দান। এবং এই রকমের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে তিনি চেয়েছেন তাঁর গ্রন্থে বর্ণিত গেট্রুডের মতো একজন স্নেহশীলা যাকে যাঁর অন্তর্দৃষ্টি নিমেষের মধ্যে প্রতিটি শিশুর সুবিধা-অসুবিধা আবিষ্কার করে, যাঁর শুভবুদ্ধি সহজেই প্রত্যেককে ঠিক তার যেমন ও যতটুকু সাহায্যের দরকার তা দিতে পারে। কিন্তু পেস্টালট্জি যে জীবনাদর্শের উপর নির্ভর করলেন তা হল ক্রীশ্চান চ্যারিটির দ্বারা প্রভাবান্বিত। এই ধরনের নৈতিক আদর্শ সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির দিকে না গিয়ে ক্রমশঃ একধরনের আনুষ্ঠানিক তপশ্চর্যায় প্রায়ই স্খলিত হয়ে পড়ে। তা ছাড়া অন্যান্য জীবনাদর্শের মধ্যেও যেসব সম্ভাবনা আছে তা এ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। গান্ধীজীর রামরাজ্যের মতো একটা ভাবাদর্শ আজকের দিনে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে একমাত্র যদি তা নিজের মধ্যে মানুষের সমস্ত সম্ভাবনার স্থান করে দিতে পারে।

ফ্রোয়েবেল মানবপ্রকৃতির মধ্যে তার হৃদয়বৃত্তি ও নৈতিক গুণগুলি ছাড়াও আবিষ্কার করলেন তার বিশুদ্ধ আনন্দপ্রেরণা। প্রয়োজনভারমুক্ত এই আনন্দ-আবেগ। এরই সাহায্যে তিনি গড়তে চাইলেন এক উৎসব-পরিবেশ, এক দায়মুক্ত সমাজ। রুশোর মতোই সাহসে ব্যক্তি ও বিশ্বকে দিলেন মুখোমুখি করে, কিন্তু এই মিলনের সার্থকতার জন্য রুশোর রোমাণ্টিকতা অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করলেন। এ জগৎই একটা সৃষ্টিলীলা, এর মধ্যে ঐ রকম স্বতঃস্ফূর্ত খেলা, ভাঙাগড়া নাচগানের মধ্য দিয়ে শিশু গভীর ভাবে জানবে নিজেকে, তার জগৎকে। আনন্দকে প্রায় একটা সার্বিক তত্ত্বের মর্যাদা দিয়ে ফ্রোয়েবেল আনলেন শিক্ষার আসরে, কিন্তু কেমন করে স্বভাব ও মনের অন্যান্য বৃত্তিগুলির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হবে, কেমন করে শুধু শৈশবে নয় শৈশবোত্তর শিক্ষাতেও জীবনের অন্য নানা উদ্দেশ্য ও দায়িত্বকে তা নিয়ন্ত্রিত করবে সে চিন্তা ও পরীক্ষা ফ্রোয়েবেল করেন নি।

রুশো পেস্টালট্জি ফ্রোয়েবেল তিনজনই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। শিক্ষকের শিক্ষাদান ও গ্রন্থপাঠ গৌণ হয়ে গেছে। হার্বার্ট এর বিরোধিতা করে গুরুত্ব আরোপ করলেন ব্যক্তির সঙ্গে শুধু বর্তমান সমাজের নয়, সমাজচিত্তের পরিচয়ের উপর। ঐতিহ্যের মধ্যেই থাকে এই চিত্তের সুচির-সঞ্চিত পরিচয়। শিক্ষকের কাজ এই অতীত অভিজ্ঞতা এমন সুসম্বদ্ধ ও বর্তমান জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে ছাত্রের সামনে উপস্থিত করা যাতে সে তাকে জীবন্ত অভিজ্ঞতা হিসাবেই গ্রহণ করতে পারে।

এর পরেও অনেকে পরীক্ষা করেছেন, এবং এখনও করছেন। শিক্ষাবিৎ ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে এখনও যথেষ্ট মতান্তর। শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লিখিত জীবনাদর্শের মধ্যে কোনো একটিকে— সাধারণতঃ ঐ

ইউটিলিটেরিয়্যান আদর্শটিকেই— আরোপ করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি সাম্প্রতিকতম মতবাদ হল essentialism, অর্থাৎ জীবনে সাফল্যের জন্যে যা যা দরকার সেই শিক্ষাগুলিকেই স্কুল-প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করা এবং ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ছাত্রদের সেইগুলি শিখতে বাধ্য করা।

হয় উদাসীনতা নয় নূতন শিক্ষার সমস্যা ও প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আংশিক বা অস্পষ্টজ্ঞান— এই সব কারণে অহেতুক মতবিরোধে, প্রচুর বৃথা বাক্য ও কর্মে আজ পৃথিবীর শিক্ষাজগৎ চঞ্চল। তবু কয়েকটি মূলনীতি সর্বজনগ্রাহ্যতার পদবী পেয়েছে, কিংবা পাবার যোগ্য এ কথা বললে হয়তো ভুল হবে না। এগুলি শিক্ষাজগতের শ্রেষ্ঠমনীষীদের অনুমোদিত, যুক্তির দ্বারা সমর্থিত। নীতিগুলি এই :

স্বভাব ও মনের সমস্ত বৃত্তি ও শক্তিগুলি ফুটিয়ে তোলা, সমস্ত মানুষটার পূর্ণ প্রবৃদ্ধি (growth)ই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এর যে-কোনো দিক অবহেলা করলেই শিক্ষায় তার দরুন কিছুটা ব্যর্থতা আসবেই।

একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ— যা বিভিন্ন মানুষচরিত্রের এবং অতীতের বিভিন্ন জীবনাদর্শের সমন্বয়ে তৈরি— তুলে ধরতে হবে শিশুর সামনে। এই হবে তার সমস্ত কর্মের চেষ্টার প্রেরণা, তার সমস্ত আহরণ উপার্জন সংগঠনের কষ্টিপাথর।

এই আদর্শে রচনা করতে হবে একটি বিশেষ সমাজ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে। এই সমাজে আয়োজন থাকবে নানা স্বতঃস্ফূর্ত বা বিশেষভাবে পরিকল্পিত অভিজ্ঞতা ও কর্মধারার। এই অভিজ্ঞতা ও কর্মপ্রবাহকে কাজে লাগাতে হবে ছাত্রের স্বভাব ও চিত্ত-স্ফুরণে, তার শিক্ষাকে অর্থপূর্ণ ও সত্য করবার জন্যে, তার আহৃতজ্ঞানকে ক্রিয়াশীল সমাজের মধ্যে সফল করে তোলবার জন্যে।

এই সমস্ত সমস্যা সামগ্রিকদৃষ্টির মধ্যে গ্রহণ করে সবকটি সূত্র একসঙ্গে অনুসরণ করা, অবশ্যম্ভাবী বিক্ষেপ বিচ্ছেদ এড়িয়ে সুসংগত কোনো সমন্বয়ে পৌছানোর মতো মানসিক প্রসার ও শক্তি এই বিংশ শতাব্দীতে মাত্র দুইজন মনীষীর মধ্যে দেখা গিয়েছে : জন ডিউই ও রবীন্দ্রনাথ। এবং দুজনই, তাঁদের পরিকল্পনার বাস্তবরূপ গঠন করে দেখিয়েছেন। ডিউইর ল্যাবরেটরি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৬ সালে চিকাগোতে ; আর শান্তিনিকেতন হয় ১৯০১এ।

রবীন্দ্রনাথ-ডিউই

অতি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেকের সাহায্যে পূর্বগুরুদের কাছ থেকে উপাদান বা প্রেরণাটুকু বেছে নেওয়ার বিচক্ষণতায় ডিউই ও রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য মিল আছে। সমস্যায় কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁদের সতর্ক সঞ্চারপথ বহুদূর পর্যন্ত চলেছে সমান্তরাল রেখায়। রুশোর শিশুকে সবচেয়ে আগে মানুষ হতে দেওয়ার প্রস্তাব, যথা : "All men being equal, their common vocation is the profession of humanity,···Let him first be a man ; he will on occasion as soon become anything else···" অনুসৃত হয়েছে ডিউইর পরিকল্পনায় growth বা প্রবৃদ্ধির ধারণায়। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শকে শুধু গ্রহণই করেন নি, বিস্তৃততর মহত্তর করেছেন : "The best function of education is to enable us to realise that to live as a man is great, requiring profound philosophy for its ideal, poetry for its expression and heroism in its conduct." শিক্ষাজগতে ইউটিলিটির চেয়ে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাধীন আবিষ্কারের প্রতি পক্ষপাতিত্বে তিনজনই একপ্রাণ। রবিন্‌সন ক্রুশো-প্রীতি তিনজনের মধ্যেই লক্ষ্যণীয়।

তিনজনেই অসীম সাহসে মানবজীবনের-বিপুল বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতিকেই শিক্ষাকর্মের আয়তন বলে ধরে নিয়েছেন, তাই শিক্ষার্থীকে— তার সত্যকার প্রবণতা ও ক্ষমতা যাই হোক না— স্বাধীনতা দিতে তাঁদের আপত্তি নেই। যার যা সম্ভাবনা সেইটুকুই সত্য হয়ে উঠুক এই হল অভিপ্রায়। রুশো এ বিষয়ে চরমপন্থীসমাজের কোনো অনুশাসন, কর্তৃত্বপ্রয়োগের কোনো রূঢ় স্পর্শ লাগতে দিতে রাজি নন শিক্ষার্থীর গায়ে। ডিউই ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই শিক্ষাপরিবেশের মধ্যে একটি বিশেষভাবে গঠিত সমাজের স্থান রেখেছেন। এই সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াই স্বাধীনতাকে যেটুকু দরকার নিয়মিত করবে এই তাঁদের দু'জনেরই প্রত্যাশা। রবীন্দ্রনাথ তা ছাড়া শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাকে লাঘব না করেও গুরুর ব্যক্তিত্বকে একটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, ডিউইর activity programme ও project -এর প্রযোজনায় শিক্ষক নিজের মর্যাদা ও প্রভাব বরং গোপনই রাখতে চান।

এ বিষয়ে পেস্টালট্‌জি ও ফ্রোয়েবেলের সঙ্গে এঁদের প্রভেদ লক্ষ্যণীয়। পেস্টালট্‌জির স্নেহকর্তৃত্বময় পরিবেশে স্বাধীনতার অবসর কম, বরং একটি নম্র সচ্ছল বাধ্যতা ও দায়িত্বপালনের রূপ ফুটে উঠেছে। ফ্রোয়েবেলের উঁচুসুরে বাঁধা পরিবেশের মধ্যে খেলার সৃষ্টিমূলক কাজের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তাঁর আয়োজিত অভিজ্ঞতা ও কাজগুলি সকল শিশুকে একটা উন্নয়ন ও ঐক্যের দিকে নিয়ে যাবার মতো করে তৈরি, বৈচিত্র্যের দিকে তাদের মুখ নয়। কাজেই তাঁর দেওয়া স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা বলা যায় না— ও হল এক আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রভাবে সীমিত স্বাধীনতা। রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যকে স্বীকার করে তাঁর জীবনাদর্শের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন, কিন্তু তার ফলে জীবনের অন্যান্য ভূমির ফসলগুলিকে ব্যাহত হতে দেন নি।

বরং রবীন্দ্রনাথ একদিকে শিক্ষার্থীকে এমন-একটি মুক্তির অন্তর্লোক দেখিয়ে দিয়েছেন যা ডিউইর কল্পনায় নেই। সেখানে সেই মুক্তিকে সফল করে তোলবার জন্যে বন্ধু পথপ্রদর্শক হিসাবে গুরুর উপস্থিতি।

এই স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণার তফাতের জন্যই রুশোর কাছ থেকে গৃহীত অভিজ্ঞতা ও কর্ম, experience ও activity-র ধারণা বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। পেস্টালট্‌জির শিক্ষার্থী সুতোকাটা রাস্তামেরামত প্রভৃতি সেবা ও কল্যাণকর্মে নিয়োজিত, কিণ্ডারগার্টেনের শিশু 'জগৎপারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা।' অর্থাৎ ব্যাপ্ত উদার এক পরিবেশে নিজ নিজ তীক্ষ্ণতা ও স্বাতন্ত্র্য খুইয়ে এক সাম্য ও ঐক্যের দিকে, সার্বজনীন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির দিকে অগ্রসর। হার্বার্ট উপস্থিত করেছেন অবহেলিত অন্তর্মুখী অভিজ্ঞতার দাবী। ডিউই ও রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতা ও কর্মের স্থান সম্বন্ধে রুশোর সঙ্গে একাত্ম, শুধু সেইগুলির নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষাজীবনের মধ্যে সেইগুলির প্রয়োগবিধি উদ্ভাবনেই তাঁদের মৌলিক দান।

যে অভিজ্ঞতার নিমন্ত্রণে সকল রকমের শিক্ষার্থীকেই ডাকতে হবে তা হওয়া চাই বিচিত্র অথচ ব্যক্তিগত সমস্ত বিভেদ সত্ত্বেও প্রত্যেকের আত্মগঠনের পক্ষেই উপযোগী। তার মানেই হল এই অভিজ্ঞতাগুলি এমন উপাদানে তৈরি হওয়া দরকার যা সার্বজনীন, অথচ যার নূতন নূতন বিন্যাসে কেবলই নূতন নূতন প্যাটার্ন গড়ে তোলা যায়। দয়া, ন্যায়পরতা, সাধুতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি নৈতিক সদ্‌গুণগুলি ও ধর্মপ্রবর্তিত ত্যাগ শুচিতা ক্ষমা অহিংসা প্রভৃতির আদর্শগুলি প্রায়ই ক্রিস্ট্যালকঠিন হয়ে অন্যান্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশতে চায় না, সংঘাত সৃষ্টি করে। বিরোধ বাধে নীতির সঙ্গে নীতির, হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধির,

একজনের সঙ্গে আর-এক জনের, এক ক্ষেত্রে লাভের সঙ্গে অপর ক্ষেত্রে ক্ষতির। পদার্থতত্ত্বে যেমন অ্যাটমে পৌঁছোলে ইলেক্‌ট্রন প্রোটন আয়ত্ত করলে তার ফলে স্বাধীন বিচিত্র সৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে, তেমনি মানবচরিত্রের মূল সার্বজনীন উপাদানগুলি দিয়েই শিক্ষাজগতের অভিজ্ঞতাগুলিকে গড়তে হবে। ডিউই ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই সে সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন।

ডিউই বেছে নিলেন প্রধানতঃ (১) কথাবার্তা বা আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা, (২) পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতূহল ও জানবার চেষ্টা, (৩) কিছু তৈরি করা— গড়ে তোলা, (৪) বিভিন্ন আর্টের মধ্য দিয়ে ভাব প্রকাশের চেষ্টা। এ ছাড়া নৈতিক পর্যায়ে তিনি চাইলেন শুধু একটি গণতান্ত্রিক সমাজে একত্র থাকতে ও সমাজের জীবনের পথে প্রয়োজনীয় কাজগুলি করতে হলে যে সহানুভূতি সদিচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাব একান্ত দরকার সেইটুকু। তা হলেই সেই সমাজে বাসের ফলে আপনা থেকে সমস্ত বাঞ্ছনীয় চারিত্রিক গুণগুলির ক্রিয়াশীল রূপ আপনি ফুটে উঠবে, ধারকরা আদর্শকে অনুসরণ করে চলার বিড়ম্বনা বাঁচবে। এইজন্য ডেমোক্রেটিক সমাজ ডিউইর জীবনাদর্শ ও শিক্ষাদর্শের একেবারে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এই উপাদান বা অস্ত্রগুলির সাহায্যে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা আহরণ করে ব্যবহার করে এবং চিন্তা ও বিচারের সাহায্যে সেগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে যেতে হবে। সমাজ-জীবনে আবশ্যিক বা স্বাভাবিক নানারকম কাজের মধ্য দিয়ে— যাকে ডিউই নাম দিয়েছেন life activities— এই অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যগুলি বারবার যাচাই করা হবে। এইভাবে একটু একটু করে গড়ে উঠবে জ্ঞানের এক এক শাখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। ঐতিহ্য ততটুকুই ব্যবহার করা হবে যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খায়, কার্যক্ষেত্রে ভালো ফল দিতে পারে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও রিসার্চের এই ভঙ্গি। যা কাজ দেয়, ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা ও সন্ধানের পথ মুক্ত করে, তাকেই আপাততঃ সত্য বলে স্বীকার করতে হবে। এই হল ডিউইর pragmatism।

একত্রিত জীবনের নানা প্রয়োজনপূরণ, স্বাচ্ছন্দ্যবিধান, হৃদয়মনবুদ্ধির স্বাভাবিক ক্ষুধাগুলি মিটানো এবং তার জন্যে সেই সমাজের সাধারণ ভোগ্য জ্ঞান ও সংস্কৃতিসম্পদ্ রচনা করা এসবই ডিউইর জীবন কর্ম বা life activities-এর অন্তর্গত। এইগুলি করতে হলে শরীর মন হৃদয় বুদ্ধির যে ব্যবহার ও স্ফুরণ প্রয়োজন তা তাঁর কাম্য। ব্যক্তি সত্তা ও সেই সমাজের পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা ও প্রতিক্রিয়ার সমস্ত উপায় ও সুযোগকে সহজলভ্য করে দেওয়া এবং তার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীকে নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিজের দৃষ্টিভঙ্গি কর্মকুশলতা ও ব্যবহার-প্যাটার্নগুলি গড়ে তুলতে পারার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া এই তাঁর ব্যবস্থা। সমাজচিত্ত ও কর্মরূপ থেকে অবাধ গ্রহণশীলতা আবার সেই উপাদান নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে আপন করে সম্ভব হলে সমৃদ্ধতর করে তুলে আবার সমাজচিত্তকে প্রত্যর্পণ। এইরকম একটা আঘাত প্রত্যাঘাত stimulus responseএর জগতের বাইরে ব্যক্তিসত্তাকে যেতে দিতে তাঁর ইচ্ছা নেই। তাঁর দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও সমাজ এমন-একটি অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা পরস্পরের অন্তর্ভুক্ত সত্য যে তাঁর মতে সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তির আত্মানুসন্ধান শুধু ব্যক্তিসম্পদের অপব্যয়ই নয়, সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। আবার যে সমাজ ব্যক্তিচিত্তের পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়াশীল অন্তরঙ্গ স্পর্শের দ্বারা সম্পূর্ণ সঞ্জীবিত আত্মচেতন নয়, শুধু বাঁধাধরা সংস্কার চিন্তা আবেগের দ্বারা তাড়িত তাকে তিনি সমাজই বলতে রাজি নন। শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তিসম্ভাবনাকে তিনি সমাজের সমষ্টিগত সমস্ত সম্ভাবনার যন্ত্র হিসাবে গড়ে তুলতে চান। এই হল ডিউইর যন্ত্র বা করণবাদ, instrumentalism। মানুষের বিবর্তনের প্রত্যাশা সফল হবার যদি কোনো উপায় থাকে তো সে হল

এই : (ক) ব্যক্তির অভিজ্ঞতাগুলিকে জীবনপরিস্থিতি ও সমাজচিত্তপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে না দিয়ে আদানপ্রদান ও সদাজাগ্রত স্বাধীন নির্বাচন ও চিন্তার সাহায্যে সত্য ও ব্যবহারযোগ্য হতে দেওয়া। (খ) এই ব্যক্তিগত উপার্জনগুলি থেকে রিসার্চ ও এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের ক্রিয়া কৌশলের দ্বারা সকলের পক্ষে গ্রহিতব্য ধারণা দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তাসূত্র কর্মনীতি ইত্যাদি গড়ে তোলা।

এই বিবরণ থেকে বোঝা যাবে পাশ্চাত্য জগতের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যাপকতম যা জীবনাদর্শ তাইই ডিউই গ্রহণ করেছেন। যথা : বস্তুজগতের সম্পদ্ ও সম্ভোগের অপক্ষপাত বণ্টন, বুদ্ধিপ্রয়োগে সেই সম্পদ্ ও সুবিধাসুযোগের বৃদ্ধি, এবং হৃদয়ানুভূতির একটি বিস্তৃত সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শে (সাম্য সহানুভূতি সহযোগিতা শেষপর্যন্ত ডেমোক্রেসি) উক্ত দুই কাজের জন্য নানারকম জ্ঞান বিদ্যা ক্রিয়াকৌশল প্রভৃতির বহুলবিস্তারের দ্বারা নানারকমের সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলা। এই আদর্শসাধনের পক্ষে উপযোগী সার্বজনীন উপাদান তিনি মানবচরিত্র থেকে অত্যাশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারশক্তির বলে আহরণ করেছেন। ঠিকমত কাজে লাগিয়েছেন, খেলা কাজের মিল ঘটিয়েছেন, স্বাধীনতা ও দায়িত্বের আপোস করেছেন, ব্যক্তির পূর্ণপরিণতির (সমাজের মধ্যে) সঙ্গে সমাজের প্রগতির গাঁঠছাড়া বাঁধবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর স্বনির্বাচিত সীমার মধ্যে তাঁর পরিকল্পনা প্রতিটি পুঙ্খে (detail) যথাযথ ও সার্থক। পাশ্চাত্য-শিক্ষার জগতে ডিউইর ভাবধারার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নি এমন শিক্ষাবিৎ বা শিক্ষাকর্মী বিরল। কিন্তু ডিউইর পরিকল্পনাটিকে সামগ্রিকভাবে বোঝবার ও প্রয়োগ করবার ক্ষমতা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দেখিয়েছেন কিনা জানি না। আংশিক এমন-কি ভ্রান্ত অনুবর্তন-চেষ্টারই উদাহরণ দেখা যায়।

শিক্ষার অনুকূল জীবনপরিবেশ-রচনার পদ্ধতি উদ্ভাবনে এতদূর পর্যন্ত ডিউই ও রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হবার পর তার পরিচালনা যে এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেবের হাতে তুলে দেওয়া হয় তার কারণই এই যে ডিউই-প্রভাবিত এল্‌ম্‌হার্স্টের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারণা ও শান্তিনিকেতনে পরীক্ষালব্ধ ফলের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল প্রচুর পরিমাণে। তা ছাড়া যেটুকু বেশি সে হল অন্তর্লোকের সাধন, অন্তর্জগতের মধ্য দিয়ে বিশ্বসত্য এমন-কি সমাজচিত্তের সত্যগুলিকেও চিনতে শেখা, ব্যবহার করতে শেখা। শুধু ডিউইর কর্মযোগ নয়, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ, কিংবা বলা যায়, দুই মিলিয়ে এক ধরনের আনন্দযোগ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপরিকল্পনার দুটি প্রধান অঙ্গ— বাম দক্ষিণ পদপাত— হল Love and Action, যা এর আগের প্রবন্ধে ("রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন"। দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে ঐ Actionটি ডিউইর প্ল্যানের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত, যদিও অপর অঙ্গ অর্থাৎ অন্তর্লোকজয়ের ফলে লব্ধ শক্তির ক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের বহির্জীবনের সম্ভাবনাও বিস্তৃততর। অন্তর্জীবনকে কেমন করে সার্বজনীন শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে তাই করে দেখিয়ে দেওয়াই রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দান।

ইন্দ্রিয়বোধের সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর বিজ্ঞানবুদ্ধিকে কাজ করতে দিয়ে আধুনিক পজিটিভিজ্‌মের যে জগৎ পাওয়া যায় সেই খাঁচার মধ্যে মানুষকে বন্দী থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। হৃদয়সংবেদন দিয়ে এমন-সব রসকণা রসমূর্তি পাওয়া যায় যা ঐ বুদ্ধিলভ্য জিনিসের মতই কাজে লাগে, যা সার্বজনীন, যা অবস্থা হিসাবে অবাধে পুনর্গঠনের উপযুক্ত উপাদান। ইউটিলিটির সংকীর্ণ সংজ্ঞাটার হাত এড়ালেই দেখা যায় সমস্ত অস্তিত্বকে হৃদয়বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দিয়ে সত্য করে চেনা, বোঝা, তাই নিয়ে আনন্দ করা, ঐতিহ্যের কোনো নীতি

আদর্শ বা রসবিগ্রহের দাসত্ব স্বীকার না করে মুক্ত সম্বন্ধসূত্রে বিশ্বপ্রকৃতি ও সমাজকে আপন করতে পারা একটা সার্বজনীন সম্ভাবনা। Reasonএর যেমন একটা সার্বজনীনতা কল্পনা করা হয়, হৃদয়ের ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন সম্বন্ধ ও সংবেদনরসেরও তার চেয়ে কম সার্বজনীনতা নেই। সেগুলিরও সনাতন নিয়ম বা সূত্র থাকা খুবই সম্ভব। আর্টিস্ট কবি শিল্পকার প্রেমিক দার্শনিক যোগীরা যার কষ্টিপাথরে নিজেদের উপলব্ধি আবিষ্কার ও সৃষ্টিকে যাচাই করে নিয়ে নিশ্চিন্ত হন! পৃথিবীজীবনের এতদিনের সঞ্চিত সাক্ষ্য উপেক্ষা করা শুধু গায়ের জোরের কথা, নইলে বুঝতে বাকি থাকে না Reason ছাড়াও মানবপ্রকৃতির অন্যান্য সার্বিক দিক আছে। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জীবনে, মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন সম্বন্ধমালা গ্রন্থন শিল্পে, শুদ্ধ সমাজনিরপেক্ষ বুদ্ধি ও ধ্যানকেও গ্রহণে, উৎসব ও কল্যাণকর্মের মধ্য দিয়ে সেই সার্বিক শক্তিগুলির উন্মোচনের প্রয়াস আছে। তাকেই রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে আখ্যা দিয়েছেন: freedom of mind, freedom of heart and freedom of will। ডিউই আদর্শসমন্বয়ের কাজে লাগিয়েছেন হিংসামুক্ত ইউটিলিটি, practical reason (শুদ্ধ reasonকে বাদ), সুবিন্যস্ত অন্তরঙ্গ সমাজের স্বতঃউৎসারিত— শিলীভূত নয়, প্লব ও বহমান— সংস্কৃতি। সভ্যতার সংকট মোচনের জন্যে রুশো যে মানুষকে চেয়েছিলেন তার আবির্ভাবের জন্য এ ছাড়াও চাই শুদ্ধ বুদ্ধি হৃদয় বোধি রসবিবেক কল্পনা প্রভৃতি সার্বিক তত্ত্বের আবিষ্কার ও ব্যবহার। সেই কৃতিত্বই রবীন্দ্রনাথের।

বাঙলায় পরিভাষা-সংকলনের রীতিনীতি

পুণ্যশ্লোক রায়

আমাদের জীবনে যখন বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি চর্চার স্থান ছিল না, তখন তাদের উপযোগী পরিভাষা গড়বার তাগিদও ছিল না। এখন পর্যন্ত গ্রাম্য ও শহুরে মজলিশের উপযুক্ত কথায় ঠাট্টায় গল্পে কাব্যে বাঙলা ভাষার যা জোর ও ঐশ্বর্য, জ্ঞান ও মননের ভাষাতে তার তুলনায় তেমন কিছু নেই। ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচবে মনের দারিদ্র্য ঘোচার সঙ্গেসঙ্গেই। বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বিদ্যার ব্যাপক চেষ্টা ঘটলেই। পরিভাষা গড়ার কাজটা এগোবে। তার আগে আগে পরিভাষা গড়তে যাওয়া পণ্ডশ্রম। অনেক গবেষক ভাবুক ও শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন অনেক দিকে কাজ করছেন বা করবেন। তাঁরা নিজের নিজের ক্ষেত্র ও কাজ বুঝে যথাযোগ্য পরিভাষা গড়ে নেবেন। তাঁদের হাতে একরাশ রেডিমেড পরিভাষা ধরিয়ে দেওয়ার চেয়ে বেশী কাজ হবে যদি পরিভাষা-সংকলনের মৌলিক রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা পরিষ্কার করতে সাহায্য করি। রীতিনীতি জানা থাকলে যে-কোনো জন চলনসই পরিভাষা বানিয়ে নিতে পারবেন। পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসেছি বাঙলাভাষীদের মধ্যে জ্ঞান ও মননের চর্চাতে জোয়ার আসছে এরকম একটা আশা নিয়ে।

ঋণ

যেসব জিনিস বা অভিজ্ঞতা বাঙালীদের জীবনে নতুন এসেছে সেসবের নামও অন্যান্য ভাষা থেকে বাঙলাভাষায় চলে আসাটাই স্বাভাবিক। 'চেয়ার' 'টেবিল' 'অফিস' 'কমিশন' 'ফস্‌ফরাস' 'প্রোটিন' 'ট্র্যাজেডী' ইত্যাদি শব্দ এমনি করে ভাষায় এসে গেছে। আংশিক ঋণের উদাহরণ 'রেলগাড়ি' 'গাধাবোট' 'জেলখানা' ইত্যাদি।

যন্ত্রসভ্যতা ও বিজ্ঞানের যেগুলি একেবারে টেকনিকাল টার্মস্‌ সেগুলি সংখ্যায় বেশ কয়েক লাখ। অত শব্দ নতুন করে বানানো সম্ভব নয়, উচিতও নয়, কেননা যন্ত্রসভ্যতা তথা বিজ্ঞানের ভাষা প্রত্যহ সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছে, কিছু কিছু করে বদলেও যাচ্ছে। তা ছাড়া যন্ত্রসভ্যতা তথা বিজ্ঞান ব্যাপারটাই স্বরূপত আন্তর্জাতিক। তাই ওর পরিভাষাও ইংরেজী ফরাসী জার্মান রাশিয়ানের মতো ভিন্ন ভাষাতেও মোটামুটি অভিন্ন। এসব শব্দ নতুন করে বানাতে গেলে আমরা যে শুধু বরাবরকার মতো পিছিয়েই থাকব তা নয়, বিশ্ববিজ্ঞানের খোলা রাস্তাতে আরও একলষেঁড়ে হয়ে পড়ব। তার পর, আইন ও প্রশাসনের ব্যাপারে আমরা পশ্চিম-ইউরোপ ও আমেরিকার গণতন্ত্রের ঐতিহ্য আপন করে নিয়েছি। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি আমাদের যত প্রেমই থাক্‌, মনু এবং কৌটিল্যের ব্যবস্থার প্রতি নেই। তেমনি রুশ-চীনের সামাজিক বিপ্লব ও এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে গভীর সহানুভূতি থাকলেও ওদের আইনপ্রশাসন তো পছন্দ হয় না। যে ঐতিহ্য আমরা মেনেই নিয়েছি তার কাছ থেকে ধারণা ও বিচার হরদম ধার করছি। শব্দ ধার করায় আর কি আপত্তি থাকতে পারে? যে যে উৎস থেকে আমাদের ভাবনা-প্রেরণা সেই সেই উৎস থেকেই আমাদের ভাষাও ঐশ্বর্য সংগ্রহ করতে পারে। ইংরেজী ভাষাটার সমুন্নতির প্রধান কারণ

তার অসামান্য ঋণপটুতা। তার ভাণ্ডারে বিশুদ্ধ স্বদেশী শব্দের সংখ্যা একতৃতীয়াংশের বেশী নয়। সংস্কৃত ভাষাতেও যতদূর বোঝা যায় অনার্যসম্ভূত শব্দ সংখ্যায় কম নয়।

যন্ত্রসভ্যতা বিজ্ঞান বা আইনপ্রশাসনের পরিভাষা ছাড়াও 'পোজিশান' 'আইডিয়া' 'সাইড' জাতীয় অনেক শব্দ সাধারণ পাড়াগাঁয়ের লোকের মুখে খুবই শোনা যায়। ইংরেজীতে এগুলি অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট শব্দ, এক-একটা শব্দের অনেক রকম মানে। কিন্তু আমাদের সাধারণ লোকে এ ধরনের এক-একটা শব্দ এক-একটা বিশেষ বিষয় বা পরিস্থিতি ছাড়া প্রয়োগ করে না। ঋণলব্ধ শব্দের অর্থ উত্তমর্ণ ভাষার তুলনায় অধমর্ণভাষায় অনেক কম ব্যাপক হয়েই থাকে।

ঋণলব্ধ শব্দ সাধারণের মুখেমুখে আবার প্রায়ই একটু-আধটু বদলে যায়। ভাষার সঙ্গে ভালোভাবে মিশতে গেলে অমন অল্পস্বল্প বদল কাম্য। কোনো ইংরেজী শব্দ ভাষায় চালু হয়ে গেলে কেমন চেহারা নেবে সেটা অবশ্য আগে থেকেই কিছু কিছু আন্দাজ করা যায় যদি ইংরেজী আর বাঙলা এ দুই ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও লিপিতত্ত্ব জানা থাকে। বাঙালীর মুখে [e ei ɛ] এই তিনটি ইংরেজী ধ্বনিই হয়ে যায় 'এ'; যেমন 'বেড', 'মেল ট্রেন', 'কেয়ার'। [ə əː ʌ a ɑː] পাঁচটিই হয়ে যায় 'আ', যেমন 'প্রোমোশান', 'গার্ল', 'কাট', 'ফাদার' 'পাম'। [o ou w] তিনটিই হয়ে যায় 'ও'; যেমন 'প্রোটেকশান', 'বোর্ড', 'ওয়ার'। [ɔ] হয়ে যায় 'অ'; যেমন 'ল'। [j] অর্থাৎ y হয়ে যায় 'ই'; যেমন 'ইয়ার্ড'। [juw] হয়ে যায় 'ইউ' বা কখনো কখনো 'উ', যেমন 'নিউ', 'স্টুডেণ্ট'। [z ʒ dʒ] তিনটিই হয়ে যায় 'জ', 'জু', 'ট্রেজার', 'জন'। [ə] -এর বাঙলা প্রতিনিধি সাধারণত 'আ' হলেও কখনো কখনো অবশ্য লিখিত ইংরেজী অক্ষর দেখাদেখি অন্য কোনো বাঙলা ধ্বনি তার প্রতিনিধি হয়ে পড়ে; যেমন 'এলিয়ট'। প্রতিবর্ণীকরণ কিন্তু লিপি দেখে নয়, উচ্চারণ ধরেই করতে হবে। কেননা শুধু লিপি দেখে কোনো ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ বোঝা শক্ত। অর্থাৎ ড্যানিয়েল জোন্‌সের ইংরেজী উচ্চারণকোষটি দেখে নিয়ে তবেই বাঙলা লিপিতে কিভাবে লিখব সেটা ভাবা উচিত।

ঋণ অনুবাদ

পুরনো অপ্রচলিত অর্ধবিস্মৃত শব্দ খুঁজে এনে তাই দিয়ে নতুন চেনা নতুন জানা ব্যাপারের একরকম নামকরণ করা যায়। শব্দটা বা শব্দের অংশগুলি পুরনো হলেও শব্দের অর্থটা নতুনই হয়। এই ঋণ-অনুবাদের দুটি ধরণ। সংস্কৃত বা দেশী প্রয়োগে প্রায় একই অর্থে বহু শব্দ ব্যবহার হত। তাদের মধ্যে থেকে কিছু শব্দ আমরা কমবেশী ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে নতুন ভাবে কাজে লাগাতে পারি। 'বিজ্ঞান', 'ইতিহাস', 'পদার্থ' প্রভৃতি শব্দ এধরনের ঋণ-অনুবাদ। দেশী শব্দের উদাহরণ 'খড়' (মানে ছিল মাঝখানে গভীর ও সংকীর্ণ উপত্যকা নিয়ে দুপাশে উঁচু খাড়া পাহাড়, এখন দাঁড়িয়েছে সাইকেলের u fork), 'টান' (tension অর্থে) ইত্যাদি। অথবা আমরা পুরনো উপাদান নিয়ে নতুন অর্থের সঙ্গে মিলিয়ে আক্ষরিক অনুবাদ করতে পারি, যেমন 'অপিনিহিতি' (epenthesis, epi = অপি, en = নি, thesis = হিতি), 'ঋণ-অনুবাদ' (loan-translation) ইত্যাদি।

ঋণ-অনুবাদের কাজে আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য আধুনিক ভাষার কাছ থেকে অনেক শিখতে পারি।

ধরুন, কন্নাড ভাষায় ওরা executive-এর অনুবাদ করেছে 'কার্যাঙ্গ' আর judiciary-এর 'ন্যায়াঙ্গ'। 'অতি সুন্দর অনুবাদ, যেমন যথাযথ তেমনি মিষ্টি। অসমীয়া ভাষাতে notice-কে বলে 'জাননী'; লেখা সম্ভব হয় যা দিয়ে তা 'লেখনী' আর জানা সম্ভব হয় যা দিয়ে তা 'জাননী'। সংস্কৃত শব্দ ও উপাদানের ব্যবহার ভারতব্যাপী হলেও সব প্রদেশে একধরনের নয়। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন প্রয়োগ তুলনা করে পছন্দমত বেছে নেওয়া যায়।

নির্মাণ

বাঙলায় শব্দনির্মাণের রীতি মূলত চার রকম— ফ্রেজ, সমাস, প্রত্যয়যোগ আর থাকবদল। বাঙলাভাষা সংস্কৃত বা জার্মানের মতো সংশ্লেষণপটু নয়, ফরাসীরই মতো বিশ্লেষণপ্রিয় ভাষা। তাই 'কাষ্ঠঘোটক' বলার চেয়ে 'কাঠের ঘোড়া' বলা অনেক সহজ। তেমনি 'মনস্বিতাংশ' না বলে সোজাসুজি 'বুদ্ধির আঁক' (Intelligence Quotient), 'বক্তব্য' না বলে 'বলবার কথা', 'অন্ধপ্রক্ষেপ' না বলে 'আঁধারে ঝাঁপ' বলাটা বাঙলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে ঢের বেশী মেলে। ইংরেজীতে যা একটি শব্দ বা একটি সমাসবদ্ধ পদ বাঙলায় সেটাকে এইভাবে ফ্রেজ করে বলা যেতে পারে। যেমন "সব পেয়েছির দেশ" "আস্‌ছে বছর"। পারিভাষিক শব্দের মতো পরিভাষাধর্মী ফ্রেজও ভাষার জোর বাড়ায়।

সমাস গড়ার পদ্ধতি বাঙলায় চারটি। তৎপুরুষ জাতীয় সমাসে কারকবিভক্তি বা অনুসর্গের লোপ ঘটে; যেমন 'বিলেতফেরত' (বিলেত থেকে ফেরত), 'নাচঘর' (নাচের জন্যে ঘর), 'মিশকালো' (মিশির মতো কালো), 'হুকুমদখল' (হুকুম দ্বারা দখল) ইত্যাদি। কর্মধারয় জাতীয় সমাসে পূর্বপদ পরপদের বিশেষণ; যেমন 'ওবাড়ি' (ওই অথবা অন্য যে বাড়ি), 'ঘননীল' (ঘন যে নীল) ইত্যাদি। বহুব্রীহি জাতীয় সমাসটা সমাসবদ্ধ পদদ্বয় ছাড়া অন্য কোনো পদের বিশেষণ বা স্থানগ্রাহী হিসেবে গড়া হয়; যেমন 'লালপাগড়ী' (লাল পাগড়ী পরে যে)। এ ছাড়া আরেক জাতের সমাস হয়, তাতে পরপদ কোনো ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপ; যেমন 'হাতীকাঁদা' (হাতীকেও কাঁদায় যে মাঠ), 'ছেলেধরা' (ছেলেকে ধরে যে লোক) ইত্যাদি।

প্রত্যয়গুলির মধ্যে পূর্বপ্রত্যয় (prefix)-এর সংখ্যা কম। পরপ্রত্যয় (suffix)-এর সংখ্যা ও গুরুত্ব অনেক বেশী। পূর্বপ্রত্যয়ের উদাহরণ 'সু' 'অতি' 'বে' 'হেড' ইত্যাদি; যেমন 'সুগুণ' (virtue, excellence), 'অতিমানব' (superman), 'বেটাইম' (unpunctual)। সংস্কৃত উপসর্গগুলি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরো 'পূর্ব' 'উভ' 'অর্ধ' 'নব' 'সর্ব' এমনি বেশ কিছু সংস্কৃত উপাদান দিয়ে বহু নতুন শব্দ গড়া হয়; যেমন 'পূর্বানুরূপ' 'অর্ধসভ্য' 'নবযুগ' 'উভচর'। এই পূর্বপ্রত্যয়গুলির প্রয়োগ ভালো করে শিখতে হলে বেদ ও উপনিষদের ভাষা একটু আলাদা করে অধ্যয়ন করতে হবে। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষার ইডিয়ম ও সংবিন্যাস বদলে যাওয়াতে ও ধরনের প্রয়োগ আর জীবন্ত থাকে নি। অর্বাচীন সংস্কৃত এবং আধুনিক তৎসম শব্দগুলিতে উপসর্গ নিয়ে, বিশেষ করে 'বি' এবং 'প্র'-কে নিয়ে যে যথেচ্ছাচার চলেছে সেটা বৈদিক ভাষার সঙ্গে কোনো যোগ না রাখার ফল। যদিও 'প্র'-র অর্থ— অগ্রবর্তী, সম্মুখীন, শ্রেষ্ঠ,— Reader (সহকারী অধ্যাপক)-এর অনুবাদ দেখেছি 'প্রাধ্যাপক'!

বাঙলার নিজস্ব এবং পরবর্তী সংস্কৃত উভয় রীতিরই বৈশিষ্ট্য পরপ্রত্যয়ের ব্যবহারে। এদের মধ্যে

কিছু শুধু দেশী শব্দের সঙ্গেই সম্ভব ; যেমন 'লা' (চাকলা, গাছলা, সয়লা, ডগলা), 'চি' (ঘুরচি, ভেঙচি, ভাঙচি), 'অৎ' (জানত, ফেরত, পরত)। আবার এক শ্রেণীর প্রত্যয় আছে যেগুলিকে দেখে প্রথমটা মনে হয় এ তো সমাসে বাঁধা আলাদা শব্দ, কিন্তু কার্যত সেগুলি বহুল ব্যবহৃত প্রত্যয়ই। এগুলির প্রয়োগে একটা বড় সুবিধে এই যে, মূল শব্দের বীজধাতু জানতে বা তার কোনো পরিবর্তন করতে হয় না। যেমন 'প্রদ' (আরামপ্রদ, দুঃখপ্রদ), 'আত্মক' (ভাবাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক), 'মূলক' (বাধ্যতামূলক, অভিসন্ধি-মূলক), 'শীল' (বিচারশীল, যুক্তিশীল), 'বান্' (হৃদয়বান্, ইচ্ছাবান্) এমনি গুনলে এক শ'র উপর, কার্যত অসংখ্য প্রত্যয়।

থাকবদল বলছি তাকে যে প্রক্রিয়াতে ক্রিয়াপদ হয়ে যায় বিশেষ্য, বিশেষ্য হয়ে যায় বিশেষণ ইত্যাদি। যেমন 'শয়তান ছেলে', 'কাপ্তেন লোক' (বিশেষ্য হচ্ছে বিশেষণ), 'টক' 'ঝাল' (বিশেষণ হচ্ছে বিশেষ্য), 'ফের' 'ঝুল' 'টানা' 'বেড়া' 'লড়াই' (ক্রিয়াপদ হচ্ছে বিশেষ্য)।

নীতি

পরিভাষা সংকলনের পদ্ধতিগুলি জানা থাকলেও যথাযথ ও সুষ্ঠু পরিভাষা জোগাড় করা যাবে না, যদি নীতি সম্বন্ধে ধারণা স্বচ্ছ না হয়। নিজের ও অপরের অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে আমি দুটি মূল নীতি মোটামুটি ধরতে পারছি।

প্রথম কথা পরিভাষা হবে চিন্তার সংকেত, চিন্তার বাহন। যে গণিত ভালো জানে না, গণিতশাস্ত্রের অগ্রগতিতে অংশ নেয় নি, সে গণিতের পরিভাষা করতে পারবে না। এই একই কথা যে-কোনো বিদ্যার ক্ষেত্রে। রঘুবীরজীর সৃষ্ট পরিভাষা যে এত হাস্যকর রকম তুচ্ছ তার একটা কারণ, তিনি যে যে বিষয়ে আধুনিক ও জীবন্ত মননের অংশী নন সেই সেই বিষয়েও পরিভাষা বানিয়ে দিতে চেয়েছেন। ইংরেজী থেকে কোনো একটা শব্দ আলাদা করে ধরে তার মাছিমারা অনুবাদ করে দিলেই বাজীমাৎ হয় না। সেই শব্দটির পিছনে যে দীর্ঘ ও ব্যাপক মনন রয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে শব্দটির যথার্থ বোধ হতে পারে না। কোনো শব্দ অনুবাদ করতে গেলে তার ইতিহাসগত এবং ক্ষেত্রগত পটভূমিকা জেনে নিয়ে তুল্য শব্দগুলির সঙ্গে তার মিল ও অমিল সব বুঝে নিতে হবে। বিষয় না বুঝে অনুবাদ করা যায় না।

দ্বিতীয় কথা শব্দচয়নে জাতি ও কুল বিচার তুলে দিতে হবে। যা সহজে মুখে আসে আর লোকেও সহজে বোঝে তা সবই মানতে হবে। মুনসেফকে 'ন্যায়াধীশ', পুলিসকে 'আরক্ষা' করার মতো দাম্ভিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে একটা মহৎ ভাষা গড়া যায় না। যা বর্তমানে প্রচলিত ও বহুজনবোধ্য সেসব শব্দকে বর্জন করতে গেলে পরিশ্রম তো অযথা বাড়বেই, উপরন্তু বাঙলাভাষার স্বাভাবিক উদারতাকে অস্বীকার করা হবে। চিন্তাকে সংকেতযোগে অপরের কাছে পৌঁছে দিলেই, মনের সঙ্গে মনের যোগ ঘটালেই ভাষা। তাতে ব্যাঘাত করে যা তৈরি হবে সেটা ভাষা নয়।

স্বাধীনতালাভের পর প্রথম উৎসাহে যেসব এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে সেগুলি একান্তভাবে সংস্কৃতভাষার মুখাপেক্ষী। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আধুনিক চিন্তার আধুনিক ধারণার কাছাকাছি আসে এমন-সব শব্দ জোগাড় করে চালাতে হবে। উপরন্তু সংস্কৃত ধাতু প্রত্যয় উপসর্গ নিয়ে নতুন শব্দ বানাতে হবে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মেনে। এগুলি সাধারণ লোকের কাছে প্রচলিত বিদেশী শব্দগুলির চেয়ে অনেক

বেশী নতুন ঠেকবে, তবে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে এদের গঠনের ধরন পরিচিত লাগবে। এসব পরিভাষা কয়েকজন পণ্ডিত এক সঙ্গে বসে পাইকিরীভাবে তৈরি করে দেবেন। তার পর সেই তৈরি ভাষা নিয়ে নতুন চিন্তা নতুন জ্ঞান গড়ে উঠবে।

এই যে নীতি এর জবাব আমি দিতে চাই একজন বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিকের মত উদ্ধৃত করে। A. H. Sayce তাঁর *Introduction to the Study of Languages* (4th edition. p. 100.)-এ বলছেন—"A paternal Government may compel the acceptance of a foreign speech, in place of the familiar mother tongue, like the rulers of Japan, who were said, a short time ago, to be meditating the substitution of English for the native language under pain of death. But even a Government of this kind cannot invent a new grammar and a new dictionary ; it can only borrow from others." কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর যেদিকে চেষ্টা হয়েছে দেখে আমার তো শঙ্কা হচ্ছে যে শীগগিরই, আমাদের মানুষগুলির যেমন দুটো করে নাম, পোষাকী নাম আর ডাক নাম, আমাদের রাজধানীর রাস্তাগুলির যেমন দুটো করে নাম, তেমনি প্রত্যেক চেনাজানা জিনিসের দুটো করে নাম হয়ে যাবে, একটা বিশুদ্ধ সংস্কৃত আর একটা নেহাত মূর্খপ্রয়োগ। আশার কথা এই যে Sayce বলছেন, ইতিহাস থেকে নজীর দেখিয়ে, এ ধরনের চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য।

বাঙলাভাষার বিকাশে চারটি উৎস থেকে ভাবনা আর কথা এসে মিশেছে। দেশী, হিন্দুস্থানী (সায় ফার্সী), সংস্কৃত আর ইংরেজী। এদের কোনো একটির প্রতি অনাদর করলে বাঙলাভাষার জোর আর ঐশ্বর্য দুইই কমে যাবে। শব্দগঠনের দেশী ও হিন্দুস্থানী (ফার্সী নয়) রীতি আর দেশী ও হিন্দুস্থানী উপাদান (ফার্সী সমেত) সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এগুলির ব্যবহার যে কত চমৎকার হতে পারে তার আরো কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। 'হাল' কথাটা ফার্সী (মূলে আরবী), মানে বর্তমান অবস্থা, আর 'নাগাত' কথাটা (খুব সম্ভব) দেশী, জানত ফেরত বসত পরতের মতোই লাগাত বা নাগাত ; দুই মিলে সমাস 'হালনাগাত', মানে up to date। 'জোরদার' কথাটা অর্থে 'শক্তিশালী'র সমান, কিন্তু ব্যঞ্জনায় আরো অনেক ধারালো। হাইহিল শু'র পুরনো নাম 'গোড়তোলা জুতো'। 'কারদার' মানে যে কাজের ভার নেয়, charge d'affaire। 'কারিন্দা' মানে agent। ছাঁকনী ঢাকনীর মতোই ফুঁকনী, মানে blow-pipe, 'রীতরাখানি' কাজ হচ্ছে formality, 'যাচনদার' সেই যে যাচাই করতে পারে।

ঋণ, ঋণ-অনুবাদ এবং নির্মাণ তিনটিই করতে হবে বাঙলা ভাষার চারটি উৎসের প্রত্যেকটির কাছ থেকে যথাসম্ভব বেশী করে ধন ও বল সংগ্রহ করে। বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া জিনিস মেশাতেও হবে প্রয়োজন মতো। গুরুচণ্ডালী একটা কথার কথা, জুজুবুড়ি বিশেষ। 'জরুরী' যখন বলতে পারছি 'জরুরীতর' বলতে পারব না কেন? নীলিমা কালিমার মতো 'লালিমা' দিব্যি চলছে, যদিচ 'লাল' কথাটা অনার্য। 'বিকেন্দ্রীকরণ' কথাটা দেখতে খুবই জমকালোরকম সংস্কৃত, তবুও 'কেন্দ্র' কথাটা মূলে গ্রীক। নজীর রয়েছে, দরকারও রয়েছে নানা উৎসের নানান্ কথা মেশানোর। বাঙলা মরলেও সংস্কৃত হবে না, সংস্কৃত বাঁচলেও বাঙলা হবে না। ও দুই ভাষার ব্যাকরণ আলাদা, ঐতিহাসিক দায় আলাদা।

সংস্কৃতের কাছ থেকে দু হাতে নেওয়া ছাড়াও তাই আমাদের অন্যান্য ভাষা থেকে ধার করতে হবে এবং একটু বেশী করেই সাধারণ লোকের মুখের কথা অবধান করে শুনতে হবে।

পরিশিষ্ট

তৎসম পূর্বপ্রত্যয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু খুঁটিনাটি দিচ্ছি। উপসর্গগুলি আগে ছিল ইংরেজীতে ব্যবহৃত prepositionগুলির তুলনীয়। অর্বাচীন সংস্কৃতে বা বাঙলায় অবশ্য খাঁটি উপসর্গ নেই, যা আছে তার নাম পরসর্গ (postposition)—যেমন 'দরুন' 'দিয়ে' 'জন্যে' 'কাছে' ইত্যাদি। বৈদিকে বলত 'অধি গঙ্গায়াং বসতি', অর্বাচীন সংস্কৃতে 'গঙ্গোপরি বসতি', বাঙলায় 'গঙ্গার উপরে বাস করে' বৈদিক ভাষাতে যেগুলি উপসর্গ ছিল সেগুলি আজকের ভাষাতে ব্যবহার হয় শুধু পূর্বপ্রত্যয় হিসেবেই।

উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ
অতি	অতিক্রান্ত, অতিরিক্ত	অতিবাদী, অতিমানী, অতিক্রম।
অধি	উপরের, অধিকারী	অধিরাজ, অধিত্যকা, অধিষ্ঠান।
অনু	সঙ্গে সঙ্গে, পরে পরে, সেইমত	অনুগমন, অনুক্রম, অনুজ্ঞা।
অপ	অপগামী, অযোগ্য	অপনয়ন, অপকার।
অপি	মধ্যে, ভিতরে, অংশী	অপিধান, অপিনিহিতি।
অভি	সেই দিকে, সেই পর্যন্ত, তার মতো	অভিবাদন, অভিযান, অভিরূপ।
অব	নীচে, পাশে	অবর, অবয়ব, অবক্ষয়।
আ	এই দিকে, এই পর্যন্ত, এর মতো	আকর্ষণ, আকণ্ঠ, আকৃতি, আচার।
উদ্	উপরের দিকে, বাইরের দিকে	উদ্‌ভাবন, উন্নতি, উৎস।
উপ	কাছাকাছি, কিছু কম, কিছু বেশী	উপধান, উপর, উপক্রম, উপদেবতা
নি	ভিতরের দিকে, একসঙ্গে হবার দিকে, নীচের দিকে	নিজ, নীচ, নিকর, নিগম।
নিঃ	বের করা, বের হওয়া	নির্বাচন, নিষ্কাশন, নির্ণয়।
পরা	দিক ফিরিয়ে, এদিক ওদিক, চরম	পরাবর্তন, পরাকাষ্ঠা।
পরি	চারিদিক, পুরোপুরি, ঘুরিয়ে, সীমায়	পরিক্রমা, পরিবেশ, পরিধি।
প্র	সামনের দিকে, কোনোকিছুর উপরে	প্রপাত, প্রক্ষেপ, প্রবেশ।
প্রতি	জবাবী, যথাযোগ্য, পুনরায়	প্রতিপক্ষ, প্রতিবেদন, প্রতিযোজন
বি	তফাত, আলাদা, ব্যতীত	বিদেশ, বিতরণ, বিচ্যুত, বিপক্ষ।
বিপরি	উলটো, একেবারে অন্যরকম	বিপরীত, বিপর্যয়, বিপরিণাম।
বিপ্র	কোথাও থেকে দূরে	বিপ্রয়োগ, বিপ্রবাদ, বিপ্রলব্ধ।
ব্যব	কোনো কিছুর মধ্যে তফাত	ব্যবচ্ছেদ, ব্যবধি, ব্যবস্থা, ব্যবপাদ।
সম্	মুখোমুখি, একসঙ্গে	সংঘাত, সংগঠন।
সমা	একসঙ্গে কোনো দিকে	সমাগম, সমাবেশ, সমাধান।

হাউসা দেশে

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৯ অগষ্ট সোমবার ১৯৫৪। সকালবেলা সাড়ে নটায় আমাদের প্লেন লেগস্ ছেড়ে উত্তরমুখো চ'ল্‌ল। এ অঞ্চলে West Africa Airlines Corporation— ইংরেজ কোম্পানি— এদেরই হাওয়াই-জাহাজ চলে। আগে যেখানে জাহাজে ক'রে অথবা ট্রেনে বা মোটরে যাওয়া আসা ক'রতে হ'ত, এখন হাওয়াই-জাহাজ হওয়ায় অনেক সময়-সংক্ষেপ হয়। এই কোম্পানির প্লেনগুলি ছোটো আকারের। আর একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম— এদের চালকরা সবাই ইংরেজ, কিন্তু বেছে বেছে যেন বেঁটে-খাটো মানুষকেই ওরা এই অঞ্চলের এইসব ছোটো প্লেন চালাবার জন্য পাঠায়। প্লেনের খানসামা স্থানীয় আফ্রিকান, উদিপরা। প্রচুর মাল এইসব প্লেনে ক'রে নানা জায়গায় পাঠানো হয়।

আমাদের প্লেন এই ক'টা জায়গায় ছুঁয়ে গেল— প্রথম Benin বেনিন, তারপরে Enugu এনুগু, তার পরে Jos জোস, তার পরে Kano কানো। বেনিন শহরটী দেখবার জন্যে অনেকদিন ধরে আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু এযাত্রা দেখা হ'ল না। এই শহরটী পশ্চিম আফ্রিকার একটী প্রধান শিল্প-কেন্দ্র। প্রায় ছ-সাত শ' বছর ধ'রে এখানে বিশুদ্ধ আফ্রিকান শিল্পের একটী ধারা গ'ড়ে উঠেছে, যেটি ব্রঞ্জে-ঢালা মূর্তি আর চিত্রফলকে, হাতির দাঁতের কাজে, মাটির মূর্তিতে, কাঠের কাজে আর ছাপা কাপড়ে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। বেনিনের শিল্পই আমাকে প্রথম আফ্রিকার শিল্প আর সভ্যতা সম্বন্ধে সচেতন ক'রেছিল। এই শিল্পের নানা নিদর্শন এখন ইউরোপে আর আমেরিকায় বহু সংগ্রহশালায়, মানুষের শিল্পসৃষ্টির একটি বিশিষ্ট লক্ষণীয় নিদর্শন হিসাবে, যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত হ'য়ে আছে। বড়ো বড়ো ছবিওয়ালা বইও ইংরেজি আর জার্মান ভাষায় এই শিল্প-সম্বন্ধে লেখা হ'য়েছে। বেনিন শহরের পতনের পরে যখন ইংরেজেরা ১৮৯৭ সালে এই শহর দখল করে, তখন এখানকার বহু ব্রঞ্জের মূর্তি আর চিত্রফলক, বড়ো বড়ো আস্ত হাতির দাঁতের উপরে খোদাই কাজ, ছোটো ছোটো হাতির দাঁতে খোদা মূর্তি, কৌটা প্রভৃতি, আবলুস আর অন্য কাঠে খোদা মূর্তি আর কাঠের আসবাব-পত্র— এই সমস্ত লুঠ ক'রে ইংলণ্ডে আনা হয়। এখন এইসব শিল্পদ্রব্য লণ্ডনে বার্লিনে এবং অন্যত্র ছড়িয়ে' আছে। এখনও বেনিনে ব্রঞ্জের মূর্তি প্রভৃতি তৈরী হয়, কারিগরেরা এখনও এই কলা কোনো রকমে জীইয়ে রেখেছে। আর বেনিনের আবলুস কাঠের খোদাইয়ের কথা আগে ব'লেছি। এহেন বেনিন শহরে নামতে পেলুম না। এখানকার Bini বিনি বা Edo এডো জাতীয় আফ্রিকানরা একটা বেশ উন্নত ধরণের জাতি।

বেনিনে অল্পক্ষণ মাত্র আমাদের প্লেন দাঁড়াল'। এখানকার হাওয়াই জাহাজের স্টেশনগুলিও ক্ষুদে' ব্যাপার— একটু ছোট্ট হল্, আর দুপাশে দুতিনটে ছোটো ছোটো ঘর, বাস্। এনুগু স্টেশনে দুপুর বেলা মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে পৌছলুম, কিন্তু তখনও সেইখানে কোনো রেস্তোরাঁও পেলুম না, আর খাবারের ভাল ব্যবস্থাও নেই। কেবল এই হাওয়াই-আড্ডার বাড়ির ভিতরেই একজন আফ্রিকান যুবক— উদিপরা দেখে বুঝলুম যে, হাওয়াই-জাহাজ-কোম্পানির লোক— একটা টেবিলে কিছু সসেজ্-রোল অর্থাৎ পাউরুটির ভিতরে সসেজের টুকরো দিয়ে স্যাণ্ডউইচ, কিছু বিস্কুট, চকোলেটের Bar বা তক্তি, Butter Scotch নামে মিষ্টি,

আর গরম গরম কফি বিক্রি ক'রছে। অন্য যাত্রীদের দেখাদেখি আমি দুটো সসেজ-রোল আর বিস্কুট আর কফি নিয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা ক'রলুম। তার পরে উত্তরের দিকে আমাদের প্লেন চ'ল্‌ল। কেন জানি না, প্লেনের ভিতরে বড্ড ক্লান্তি বোধ ক'রছিলুম, আর ঘুমে চোখ জড়িয়ে আস্‌ছিল। আমরা বিশাল Niger নাইগার নদী পেরিয়ে পশ্চিম-নাইজিরিয়া থেকে উত্তর-নাইজিরিয়া প্রদেশে এসে প'ড়লুম। এই অঞ্চলের অনেকখানিটা মনোরম সবুজ রঙে ভরা— নীচে সমতল ভূমির উপর সবুজ ঘাস আর গাছপালার ঢেউ। এখন এদেশে বর্ষার সময়, সারা বছর ভারতবর্ষের বহু স্থানের মতো এই দেশ রুখো থাকে, কিন্তু বর্ষার দুই-তিন মাস সবুজে অতি মনোরম হ'য়ে দাঁড়ায়, যাকে বলে "হরা-ভরা" অবস্থা। জোস শহরে প্লেন নামলো, এই শহর টিনের খনির জন্য বিখ্যাত, নাইজিরিয়ার ধাতুসম্পদ অনেকটা এই টিন নিয়ে। এখানে জনকতক ইউরোপীয় আর সিরিয়াদেশীয় যাত্রী নেমে গেল। এরা এঞ্জিনিয়র আর ব্যবসায়ী, এই টিনের খনির দেশে এরা নিজ নিজ ব্যবসায় জাঁকিয়ে তুলেছে। জোস শহর হ'চ্ছে Bauchi বাউচি মালভূমির মধ্যে অবস্থিত। এখানে চাষবাসের চেয়ে পশুপালনই বেশি প্রচলিত।

চারটে পঞ্চাশে আমরা কানো শহরে পৌছলুম। কানো হ'চ্ছে একটি আন্তর্জাতিক হাওয়াই বন্দর, পশ্চিম-আফ্রিকায় ত্রিপলি থেকে আসবার সময় কানো হ'য়ে Accra আক্রা গিয়েছিলুম। এই হাওয়াই বন্দরটা অপেক্ষাকৃত বড়। আমাকে নিতে এসেছিলেন লেগসের K. Chellaram চেলারাম কোম্পানির এখানকার শাখা অফিসের তরফ থেকে এঁদের প্রধান কর্তা শ্রীযুক্ত পরশুরাম মনসুখানি আর দুজন ভদ্রলোক। এঁদের নামে লেগস্‌ থেকে শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ নবলরায় জরুরী তার পাঠিয়েছিলেন, যাতে আমাকে অতিথি-রূপে স্বাগত করেন। এখানকার রেসিডেণ্ট অর্থাৎ স্থানীয় মুসলমান রাজার কাছে ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত H. A. S. Johnston জন্‌স্টন, লেগসের ইংরেজ সরকারের দপ্তর থেকে আমাকে স্বগৃহে অতিথি ক'রে রাখবার জন্য নির্দেশ পান, তিনি তাঁরই অধীনস্থ একজন কর্মচারী শ্রীযুক্ত মূর Moore ব'লে একজন ইংরেজকে পাঠান। শ্রীযুক্ত মনসুখানি রেসিডেন্সি গৃহে অর্থাৎ এঁর আবাসে আমার মালপত্র নিয়ে এলেন, আমাকে শ্রীযুক্ত মূরের সঙ্গে রেসিডেণ্টের গাড়িতে ক'রে যেতে হ'ল। শ্রীযুক্ত জন্‌স্টন বেশ ভদ্র এবং মিশুক ব্যক্তি ব'লে মনে হ'ল, বেশ দিলখোলা ভাবে আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ ক'রলেন। এখানে শ্রীযুক্ত জন্‌স্টনের গৃহিণী ও তাঁদের একটী শিশু পুত্রকে দেখলুম, শ্রীমতী জন্‌স্টনকেও স্বামীরই মতন বিশেষ ভদ্র আর অমায়িক ব'লে মনে হ'ল। শ্রীযুক্ত মূর কিন্তু একটুখানি চুপচাপ ধরণের মানুষ। কানোতে আমার কার্য্যক্রম যেমন ঠিক করা হয়েছে, শ্রীযুক্ত জন্‌স্টন আমাকে তা জানিয়ে দিলেন। কালকে হচ্ছে ঈদের দিন, কানোর মুসলমান আমীর আর তাঁর দরবারকে অবলম্বন করে নানা ঘটার ব্যাপার হয়, ঘোড়-সওয়ারের মিছিল বেরোয়, আর অন্য অন্য অনুষ্ঠান হয়— সকালে আমাদের সে সব দেখাবার ঠিক হয়েছে। বেলা সাড়ে-নটা দশটাতে ফিরে তবে আমাদের প্রাতরাশ হবে। তারপরে আমার ভারতীয় বন্ধুরা এসে আমাকে সারাদিনের জন্য নিয়ে যাবেন তাঁদের মহলে, তাঁরা আমাকে শহর দেখাবেন, আর দুপুরে তাঁদের সঙ্গেই মধ্যাহ্ন-ভোজন হবে। বিকেলের দিকে রেসিডেন্সিতে ফিরে আস্‌বো, আর আজকের রাত্রের মতন কাল রাত্রেও রেসিডেন্সিতে কাটিয়ে, পরশু দিন ভোর চারটের দিকে উঠে, প্লেনে ক'রে কানো থেকে আক্রায় প্রত্যাবর্তন ক'র্‌বো।

রেসিডেন্সিতে অধিষ্ঠিত হওয়া গেল। চমৎকার বাড়ি, চার দিকে বড়ো বড়ো গাছ-সমেত একটী বিরাট

বাগান, এ ভারতবর্ষে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের লাট-বেলাটের উপযোগী বাগানবাড়ির মতন। আমার থাকবার জন্যে এঁরা একটী সুইট অর্থাৎ তিন চারখানা ঘর নিয়ে একটা বাজু নির্দিষ্ট ক'রে দেন— দোতলায় বিরাট এক শোবার ঘর, তদুপযোগী বিরাট পালঙ্কের উপরে বিছানা, মশারি বিছানার উপর খুব উঁচুতে এক বিতান থেকে নেমে মেজে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছে, মশারি তো নয়, বিরাট এক তাঁবু। সঙ্গে লাগোয়া আরো দু-তিনটী ঘর, আর প্রশস্ত বারান্দা। সেই বারান্দায় ব'সে বাগানের শোভা দেখা যায়।

সব গুছিয়ে' নিয়ে ব'সতে আর স্নান ক'রতে প্রায় ছটা বেজে গেল। ইতিমধ্যে আকাশ ঘনঘটায় ছেয়ে গেল, চার দিকে অদ্ভুত গাঢ় কালো রঙের মেঘ, দেশটাকে আঁধারে ভ'রে দিলে। তার পরে সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বারিপাত আর মাঝে মাঝে বজ্রপাতের বিকট আওয়াজ, তা ছাড়া সমস্তক্ষণ বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি। ভারতবর্ষের বাইরে আফ্রিকায়, তাও আবার সাহারা মরুর ঠিক দক্ষিণে, এরকম প্রাবৃট্ বা ঘটা ক'রে বর্ষা যে পাবো, সে ধারণাই আমার ছিল না। খানিকক্ষণ ধরে বারান্দায় ব'সে সে বর্ষা উপভোগ করা গেল। তার পর নীচে এসে গৃহকর্তা শ্রীযুক্ত জন্‌স্টন ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করা গেল। জন্‌স্টন দম্পতী অতি সজ্জন, আর এঁদের সঙ্গে নানা কথাবার্তা হ'ল। জন্‌স্টনের কাছে শুনলুম যে তিনি কেনিয়াতে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আপা পন্থ মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন অক্সফোর্ডে, আর ইনি পন্থের অনেক সুখ্যাতি ক'রলেন। পন্থ এ অঞ্চলে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সব দেখে যাবার জন্যে এসেছিলেন, তখন কানোতে এঁর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এখন সর্বত্র আমরা একটা সম্মানের আর হৃদ্যতার সঙ্গে ব্যবহারের অধিকারী হয়েছি। স্বাধীনতা জিনিসই আলাদা। সেই সম্মান আর হৃদ্যতার উপযোগী সজ্জনতা আর সংস্কৃতির পরিচয় ভারতবাসীও প্রায় সব ক্ষেত্রেই দিতে পারছে— এজন্য সেই সম্মানের হানি এখনও হয় নি— যদিও কোথাও-কোথাও আমাদের কেউ-কেউ কখনো-কখনো একটু inferiority complex অর্থাৎ আত্মলাঘবের মনোভাব প্রকাশ ক'রে ফেলেন।

রাত্রি সাড়ে-আটটায় এঁদের সঙ্গে সায়মাশ খাওয়া গেল। ভাষার বিষয়ে আমার কৌতূহল আছে জেনে, এঁরা ডক্টর G. P. Bargery বার্জারি ব'লে একটী প্রবীণ ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার একত্র আহারের বন্দোবস্ত করেছিলেন। ইনি ১৯০২ থেকে ১৯৩১ পর্য্যন্ত ২৯ বছর হাউসাদের দেশে খ্রীষ্টান মিশনরি হিসাবে কাটিয়ে' যান। এই দীর্ঘকাল ধ'রে এই অঞ্চলের নানা বিপর্য্যয়মূলক ইতিহাসের খবর ইনি রাখেন, যে সব ঘটনা এঁর চোখের সামনে ঘটেছিল অথবা অবস্থাগতিকে পড়ে এঁকে যাতে অংশ নিতে হয়েছিল। হাউসা ভাষায় খ্রীষ্টান বাইবেল শাস্ত্রের অনুবাদ এই বার্জারি সাহেব-ই করেছিলেন। আবার ২৩ বৎসর পরে এদেশে ফিরেছেন, কানোতে কিছুকাল ধ'রে থেকে, এই বাইবেলের হাউসা-অনুবাদের সংশোধন ক'রে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বা'র ক'রবেন এই উদ্দেশ্যে। ডক্টর বার্জারি চমৎকার মানুষ, একাধারে পণ্ডিত আর ভক্ত, সকলেরই প্রতি তাঁর একটা সহৃদয় মনোভাব সহজেই দেখা যায়। ইনি হাউসা ভাষার প্রকৃতির সম্বন্ধে কতকগুলি কথা আমায় ব'ললেন— তবে এই ভাষাতত্ত্ব-গত আলোচনা ভোজন-সভায় উপযুক্ত হবে না জেনে শ্রীযুক্ত বার্জারির সঙ্গে কথা ক'য়ে ঠিক ক'রলুম, আগামী কাল সন্ধ্যায় তাঁর বাসায় গিয়ে এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আরো খুঁটিনাটি আলোচনা ক'র্‌বো। আজ সন্ধ্যের কথাবার্তা অন্য নানা প্রসঙ্গেই হ'ল। বার্জারি সাহেবকে পেয়ে জন্‌স্টন-দম্পতী এই দেশে ব্রিটিশ যুগের প্রতিষ্ঠার কালের নানা খবর শুনলেন, আমারও বেশ লাগ্‌ছিল। এখানকার বড়ো বড়ো ইংরেজ রাজ্য-প্রতিষ্ঠাপক নেতাদের কথা, কি ক'রে Maloney

ম্যালোনি ব'লে এক ব্রিটিশ অফিসারকে হত্যা করে হাউসারা তার কথা, কি ক'রে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব এরা আস্তে-আস্তে দমন করে, এমন-কি পরিবর্তনও ক'রে দেয়, এই-সব বিষয়ে আলোচনা হ'ল। রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত আহারের পরে এই-সব পুরোনো কথার আলোচনা চ'ল্‌ল। বাইরে এদিকে বৃষ্টি খুব চলেছে। তারই মধ্যে বার্জারি বিদায় নিলেন।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হ'ল না, চার দিকে যে প্রবল বর্ষা আর মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি চ'লছিল, বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা-এলিয়ে দিয়ে তা উপভাগ ক'রতে লাগ্‌লুম ; আর মনে সংস্কৃত, বাঙলা, হিন্দী কবিতার নানা ছত্র এসে প'ড়তে লাগ্‌ল— বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতার— 'নিশীথরাতের বাদলধারা' প্রভৃতি। মন প্রাণ দিয়ে যেন আমাদের বর্ষাকে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে উপভোগ করবার এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ মিল্‌ল।

কানো, মঙ্গলবার, ১০ই অগষ্ট ১৯৫৪। আগেই বলেছি, এই অঞ্চলটা হ'চ্ছে পশ্চিম আফ্রিকার একটী বিশিষ্ট জাতি হাউসাদের বাসভূমি। হাউসারা সংখ্যায় য়োরুবা অথবা ইবোদের চেয়েও কম। বোধ হয় এরা ৩৫।৪০ লক্ষের বেশি হবে না। কিন্তু নানা সদ্‌গুণের জন্য আর একটা লড়াকিয়া জাতির উপযোগী কতগুলি শক্তির জন্য, এরা নিজেদের দেশের বাইরে নানা স্থানে এক দিকে যোদ্ধা আর অন্য দিকে বণিক্ রূপে নিজেদের মর্য্যাদাপূর্ণ স্থান ক'রে নিয়েছিল। সমগ্র নাইজিরিয়াতে আর ফরাসীদের অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকায় গোল্ড কোস্ট বা গানা রাজ্য পর্য্যন্ত সব জায়গায় হাউসা দোকানদার সাহুকার এমন-কি শেঠ জোরের সঙ্গে ব্যবসায় চালাচ্ছে দেখা যায় ; আর হাউসা সেপাইদের ইংরেজ আর ফরাসী কালো ফৌজে একটা সমাদরের স্থান দেয়। হাউসারা জাতি-কে-জাতি মুসলমান। আর কানো কাডুনা আর কাট্‌সিনা হ'চ্ছে হাউসাদের তিনটী মুখ্য কেন্দ্র। এরা সম্ভবতঃ হামাইট অথবা শ্বেতকায় হামীয় জাতির মানুষের সঙ্গে বিশুদ্ধ কৃষ্ণকায় নিগ্রো আফ্রিকান জাতির মিশ্রণের ফল। সম্ভবতঃ আজ থেকে পাঁচ শ' বৎসর পূর্ব থেকেই এরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ ক'রতে থাকে ; আর এদের উত্তরে আর পূর্বে যে সমস্ত পুরো আফ্রিকান বা আধা আফ্রিকান জাতি বাস করে, যেমন Songhoi সংঘোই, Mali মালি, Mossi মোসি, Bambara বাম্বারা প্রভৃতি, তাদের সঙ্গে এদের শান্তিপূর্ণ অথবা সংঘাতময় যোগাযোগ ছিল। এরা কিন্তু নিজেরা নিজেদের পৃথক্ অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেশ সচেতন, আর এদের মধ্যে বিভিন্ন খণ্ডরাজ্য থাকা সত্ত্বেও এরা এক-জাতীয়তা অনুভব করে। হাউসাদের ভাষা আমাদের হিন্দুস্থানীভাষার মতন অনেকটা, পশ্চিম আফ্রিকার ব্রিটিশ কালো ফৌজের ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গিয়েছে। হাউসাদের রাজাদের মধ্যে কানোরে আমীর-ই প্রধান, আর এই আমীরের দরবার ঘিরে মুসলমান হাউসা সংস্কৃতি নিজের বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে। কানোর আমীর এখন ইংরেজদেরই তাঁবেদার, কার্য্যতঃ ইংরেজ রেসিডেণ্টই এঁকে চালিয়ে নেন। তাহ'লেও, শুনলুম যে আমীরের বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, এবং তিনি স্বজাতির মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত প্রধান ব্যক্তি। হাউসারা ঢিলে আলখাল্লার মত একটা পোশাক পরে, ভিতরে ঢিলে পায়জামা। এই পোশাকের উপরে নানা রঙিন সুতো বা জরির কিছু কিছু নকশা থাকে। নীল আর সাদা এই দুটো রঙেরই প্রাধান্য। পুরুষেরা মাথায় পাগড়ি পরে, আর পাগড়িরই একটা অংশ দিয়ে মুখের নিচু ভাগটা ঢেকে রাখে। মেয়েদের পোশাকও বেশ সৌষ্ঠবময়। এদের মধ্যে পর্দা নেই। হাউসারা খুব ভালো ঘোড়-সওয়ার হয়, আর সেজন্যে এদের অভিজাতবর্গ প্রায় সকলেই দক্ষ অশ্বারোহী। সামাজিক বা ধার্মিক অনুষ্ঠানে ঘোড়ায় চ'ড়ে যাওয়াই

নিয়ম। হাউসাদের আর একটা লক্ষণীয় জিনিষ হ'চ্ছে এদের বাস্তু-রীতি। বর্ষায় প্রচণ্ড বারিপাত হ'লেও, আর তখন দেশটা দুই-এক মাসের জন্য সবুজে ভ'রে গেলেও, প্রায় সারা বছর এখানে অনাবৃষ্টি। এরা এখানকার লাল্চে রঙের শক্ত মাটি দিয়ে বড়ো বড়ো বাড়ি, মসজিদ, সমাধিস্থান গড়ে। পশ্চিম আফ্রিকা জুড়ে সাহারার দক্ষিণে আর নিচেকার জঙ্গলপূর্ণ স্থানের উত্তরে সর্বত্র এই বিশিষ্ট মৃন্ময় বাস্তুশিল্পের প্রাসাদ। Zinder জিন্দের, Gao গাও, Segu সেগু, Jenne জেন্নে, Timboctu তিম্বোক্তু, Wagudugu ওয়াগুডুগু প্রভৃতি স্থানের মতন, কানোতে এই রকম বাস্তুশিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করেছে। বাড়িগুলি আমাদের পশ্চিম-বাঙলার বা বিহারের বা ভারতের অন্যত্র যেমন শুখনো মাটির বাড়ি হয়, সেই রকম। কিন্তু এই মাটির দেওয়ালের, আর যাকে বাঙলায় "ঢাবার ছাত" বলে সেই ঢাবার ছাতের বড়ো বড়ো প্রাসাদও এরা বানায় (কাঠ বা বাঁশ প্রভৃতির পাটাতনকে কড়ি বর্গার মতন ব্যবহার ক'রে তার উপরে মাটি জমিয়ে এই "ঢাবার ছাত" তৈরী হয়)। বাড়িগুলি লাল রঙের মাটি গোলা দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার করা হয়। আর দেওয়ালে আর জানলাগুলিতে নানা রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত ধরণের নক্শা, যেগুলো bas-relief অর্থাৎ একটু উঁচু ক'রে মাটি জমিয়ে করা হয়, এই সব বাড়ির বৈশিষ্ট্য। গ্রীষ্মকালে এইসব বাড়ি শক্ত, দুর্ভেদ্য, আর মাটির বাড়ি ব'লে ঠাণ্ডা, আর আরামে এখানে থাকা যায়। বাড়ির ভিতরটা নানারকমে সজ্জিত থাকে, আর রঙীন সতরঞ্চি কম্বল প্রভৃতি পেতে বা দেওয়ালে টাঙিয়ে বেশ মনোরম ক'রে নেয়। কিন্তু ঐ সব বাড়ি বেশি বৃষ্টি সহ্য ক'রতে পারে না। জোর বৃষ্টি হ'লে দেওয়াল ভিজে নরম হ'য়ে খ'সে পড়ে, ঢাবার ছাতে ধ্বস দেখা যায়।

গত রাত্রে সারাক্ষণ মুষল ধারে জল পড়েছে, আজ তার ক্রিয়া শহরের মধ্যে দেখা গেল। কাল সন্ধ্যায় এসেছি, শহর দেখা হয় নি। আজকে পূর্ব দিনের ব্যবস্থা-মত পৌনে-আটটার মধ্যেই তৈরী হয়ে নীচে এসে হাজির হ'লুম। আজ বকর-ঈদ, মুসলমান হাউসাজাতির প্রধানতম উৎসব। আমীর শহরের মধ্যে থাকেন তাঁর পুরাতন প্রাসাদে, সেটা মুখ্যত মাটির বাড়ি, আর ঢাবার ছাত যদিও বাড়িটী মস্ত বড়ো। আধুনিক ধরনের নতুন বাড়িও ক'রেছেন। তিনি সকালে বেরোবেন ঘোড়-সওয়ারের মিছিল নিয়ে। তিনি এই মিছিল নিয়ে কানো শহরের মধ্যে একটী প্রশস্ত খোলা জায়গায় আসবেন, সেখানে অপেক্ষমান রেসিডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে শিষ্টাচার করবেন। শহরে কয়েক বছর হ'ল একটা বিরাট্ মিসরীয় ধরণের মসজিদ স্থাপিত হয়েছে, তার গম্বুজটা নীল মীনা-করা টালির। এই মসজিদ হাউসা আর পশ্চিম আফ্রিকার অন্য মুসলমান আফ্রিকান জাতির মৃন্ময় বাস্তুরীতির মতন মোটেই নয়। কিন্তু এই বাড়ি এখন কানো শহরকে যেন দাবিয়ে' রেখেছে। আমীর তার পরে মসজিদে স্বহস্তে কতকগুলি ভেড়া কোরবানী ক'রবেন, আর লাউড-স্পীকারের মারফত নিজের প্রজাদের কিছু উপদেশ দেবেন।

রেসিডেণ্টের বাড়ি থেকে একখানি বড়ো স্টেশন-ওয়াগনে রেসিডেণ্টের অতিথি হিসাবে আমরা যাত্রা ক'রলুম। আমাদের দলে ছিলেন ইয়োরোপিয়ান তিনটী মহিলা, একটী বালিকা তিনটী পুরুষ আর রেসিডেণ্টের একজন এডিকং। এই ইউরোপীয় ভদ্রলোকের মধ্যে একজন ছিলেন দক্ষিণ নাইজিরিয়ার লেগস্ শহরের পশ্চিম-জর্মান গণতন্ত্রের প্রতিনিধি, আর বাকি মেয়ে পুরুষ এখানকারই ইংরেজ কর্মচারী আর তাদের পরিবার। আমরা শহরটায় রওয়ানা হ'লুম। রেসিডেণ্ট সাহেব পরে তাঁর নিজের খাস গাড়ি ক'রে দরবার স্থলে আসলেন। আমরা শহরতলি ছেড়ে পুরোনো কানো শহরে ঢুকলুম। পথে দুধারে কানোর বিশিষ্ট

ধরণের সব মাটির বাড়ি, অনেক বাড়িতেই বৃষ্টির জল মাটির দেয়ালে ঢুকে যেন সেগুলিকে নরম ক'রে দিয়েছে। রাস্তার মাঝে মাঝে জল জমে গিয়েছে। এটা রাঙা মাটির দেশ। বাড়িগুলির মধ্যে বেশ একটু নূতনত্বও দেখলুম। বহুস্থানে বাড়ি তৈরির বিষয় বেশ প্রগতিও দেখলুম। এই মৃন্ময় বাস্তুরীতির নকলে সিমেণ্টের নোতুন নোতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে— বর্ষার হাত থেকে বাড়ি রক্ষা করবার এই এক নোতুন পদ্ধতি এদেশে এল। চওড়া বড়ো রাস্তা কিন্তু পাশে সরু সরু গলি। ঈদের উৎসবের জন্য মেয়ে পুরুষ আর শিশুরা নানা উজ্জ্বল রঙের কাপড়-চোপড় প'রে বেরিয়েছে। জায়গায় জায়গায় ঘন নীল আলখাল্লা-পরা মাথায় সাদা পাগড়ি আর নাকের নীচেটা সব কাপড় জড়িয়ে ঢাকা, হাউসা ঘোড়-সওয়ারেরা জড়ো হ'চ্ছে। এরা মিছিলে যোগ দেবে। ঘোড়াগুলি অতি সুন্দর। মনে হ'ল আরবজাতীয় ঘোড়া, সুঠাম দেহ আর রকমারী রঙিন চামড়ার সাজ-পরা। লাল কালো রেশমের থোকা পুঁতির মালা দিয়ে সাজানো।

পথে যত আমরা দরবারের স্থানের দিকে এগোতে লাগ্‌লুম, ভিড় ততই বাড়তে লাগ্‌ল। এক চৌমাথায় এসে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। সেখানে কালো উর্দি পরা এক কৃষ্ণকায় পুলিস অফিসার হাত দেখিয়ে গাড়ির চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ ক'রছে। আমাদের গাড়ি লাইন ছেড়ে একটু এগিয়ে আসে, তাতে এই আফ্রিকান পাহারাওয়ালা আমাদের গাড়ির কাছে এসে গাড়ি-ভরতি ইউরোপীয়দের উপেক্ষা ক'রে আর এডিকং সাহেবের সাদা উর্দি না মেনে, বেশ একটু রূঢ়ভাবে আমাদের গাড়ির আফ্রিকান চালককে চেঁচিয়ে ইংরেজীতে ব'ললে—"আমি হাত দেখিয়ে বারণ করা সত্ত্বেও তুমি এগিয়ে এলে কেন? এই ভাবে তুমি ট্রাফিক আটকাচ্ছ? তোমায় ব'লে দিলুম— বার-দিগর এরকম ক'রবে না।" চালক ইংরেজিতে জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু এডিকং সাহেব তাকে ব'ললেন, "চুপ করো, তুমি কিছু ব'লো না। গাড়ি একটু পিছে হটিয়ে নাও।" তখন পাহারাওয়ালা দু'তিন সেকেণ্ড গাড়ির দিকে চেয়ে যেন দয়া ক'রে হুকুম দিলেন— আচ্ছা যাও, এগোও, এরকমটা আর কখনো ক'রো না।"

ব্যাপারটা কি-রকম লাগ্‌ল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজদের প্রতিনিধি। তাঁর এডিকং, মিলিটারী পোশাক-পরা, সরকারের অতিথি ইউরোপীয় নিয়ে যাচ্ছেন দরবার-স্থানে, এদের আটকালে; এদের সঙ্গে 'তেরিয়া' হ'য়ে কথা কইলে কিনা একজন কালো আফ্রিকান পাহারাওয়ালা! আর তার কথা মেনে নিলেন এই শ্বেতকায় এডিকং। শুনলুম, এখানকার পাহারাওয়ালা আর অন্য কর্মচারী, যাদের মধ্যে ইংরেজির জ্ঞান থাকা চাই বা থাকা ভালো— তারা হয় য়োরুবা নয় ইবো, আর এরা খুবই দাপের সঙ্গে নিজেদের জাহির ক'রে সরকারী কাজ ক'রে যায়। মুসলমান হাউসারা, আর অন্য জাতির লোকেরাও, এইজন্য এদের একটু ভয়ও ক'রে সঙ্গে-সঙ্গে, এদের প্রতি আক্রোশও পোষণ করে, আর ঘৃণাও করে।

যাই হ'ক, আমরা ক্রমে গন্তব্যস্থলে পৌছলুম। একটী মাটির তৈরি পুরাতন প্রাসাদের দোতলায় খোলা ছাতে শামিয়ানা খাটানো হয়েছে, তার তলায় গালিচার উপর সারি সারি চেয়ার পাতা, সেখানে আমাদের বসবার জায়গা হয়েছে। আমরা একটা সরু গলির মুখে গাড়ি থেকে নামলুম, তারপরে সদলে ভিড় ঠেলে ঠেলে এ-গলি সে-গলি ক'রে এই মাটির প্রাসাদের সদর দরজায় এসে দাঁড়ালুম। গৃহকর্তা বাইরে ছিলেন। তিনি সাদরে এডিকং মহাশয়কে স্বাগত ক'রে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। সামনে একটা আঙিনা, তার উপর একটা মাটির ঘরের ভিতর দিয়ে একটা সরু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলুম। তারপর এ-ছাত ও-ছাত ক'রে আমাদের বসবার জায়গায় এনে উপস্থিত ক'রলে। এখানে দুটো

জায়গায় কতকগুলি চেয়ার পাতা, একটী জায়গা হ'চ্ছে সম্মানের জায়গা, সেখানে চারখানি চেয়ার সাজানো। এই চারখানি চেয়ারে বসবেন স্বয়ং রেসিডেণ্ট সাহেব, কানোর প্রধান বিচারপতি একজন ইংরেজ ভদ্রলোক (তিনি অনুপস্থিত ছিলেন), একজন এডিকং, এবং সম্মানিত ভারতীয় অতিথি হিসাবে আমি। আমি সাদা রেশমের শেরোয়ানী, সাদা টুপি আর চুড়িদার পায়জামা প'রে গিয়েছিলুম, ভারতীয়ত্ব জাহির করবার জন্য। অন্য অতিথিরা অন্য ছাতে ব'সলেন। আমাদের পৌঁছবার আগেই আরো কতকগুলি ইউরোপীয় বয়স্ক ব্যক্তি ও ছেলেমেয়ে নিজ নিজ স্থান দখল ক'রে ব'সে ছিলেন। আমাদের বস্‌বার জায়গা থেকে সামনে প্রসারিত বিস্তীর্ণ একটী ভূখণ্ড দেখা গেল— সামনে বর্ষার জলে ধোওয়া চমৎকার সকালের মিঠে রোদ্দুরে উদ্ভাসিত মসজিদের নীল রঙের গম্বুজ বড়ো চমৎকার দেখাচ্ছিল। দূরে আমীরের পুরাতন প্রাসাদ, আর বাঁয়ে একটা চওড়া রাস্তা— যে রাস্তা দিয়ে আমীরের মিছিল আসবে। আশে-পাশে মাটির প্রাসাদ, বেশির ভাগই দোতলা। সারারাত্রির অতিবৃষ্টিতে আমাদের যেখানে বসতে দিয়েছিল সেই ঢাবার ছাত জলে ভিজে যেন ফুলে আছে— মনে হ'ল, তার উপর জোরে লাফালাফি ক'রলে ছাত ধ্বসে' প'ড়বে। খানিকক্ষণ পরে অন্য এডিকং আর দোভাষী পরিবৃত হ'য়ে রেসিডেণ্ট জন্‌স্টন সাহেব এসে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে ব'সলেন।

এদিকে রাস্তায় ভিড়ের অবধি নেই। একখানা বিরাট্ সচল চিত্রের মত। সব মানুষেরই ঘন কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ, তার উপরে সাদা নীল আর অন্য রঙের আলখাল্লা পাগড়ি পোশাক, একটা হৈ হৈ কলরব। ঠিক আমাদের বসবার জায়গার নীচে একদল আফ্রিকান সেপাই কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের গুরখাদের মত। কালো কোট আর হাফপ্যাণ্টে আর মাথায় লাল পশমের থোকা দেওয়া কালো টুপিতে এদের খুবই মজবুত আর কেতাদুরুস্ত, এক কথায় smart দেখাচ্ছিল। এদের মধ্যে ফৌজি বাদ্যের দল ছিল, তারা মাঝে মাঝে drum বা ঢোলক, pipe বা শানাই-জাতীয় বাঁশি আর bugle বা শিঙা-জাতীয় বাঁশি বাজিয়ে আসর জমিয়ে রাখ্‌ছিল। এর মধ্যে দুজন লোক দেখা দিলে, খুব চকাবকা রঙের পোশাক-পরা, এরা রণপার উপর চ'ড়ে রকমারি কায়দা-করণ দেখাতে লাগ্‌ল। তারপরে দূর থেকে বাজনার আওয়াজ শোনা গেল, আর দেখা গেল, মিছিল আমাদের বাঁ দিক্‌কার রাস্তা দিয়ে আস্‌ছে। দলে দলে ঘোড়-সওয়ার, বেশির ভাগই হাউসা। আলখাল্লা, মুখঢাকা পাগড়ি, হাতে বল্লম। আমীরের আগে এসে পৌঁছলেন তাঁর ঘরোয়া কতকগুলি কর্মচারী। সবাই ঘোড়ায় চ'ড়ে; যেমন, তাঁর বাড়ির চাকরদের যিনি প্রধান তিনি, আর ঘোড়ায় চ'ড়ে রাজার বিদূষক বা ভাঁড়; আর বিশেষ লক্ষণীয় ছিল,— চার জন ঘোড়-সওয়ার, লোহার জিঞ্জির বা শিকলের সাঁজোয়া বা বর্ম-পরা মাথায় লোহার টোপর বা টুপি, যোদ্ধা ব্যক্তি। সব জিনিসটা মিলে মধ্যযুগের আরব জগতের একটা ঝলক যেন দেখিয়ে দিলে। এই ঘোড়-সওয়ারদের পরে এলেন স্বয়ং আমীর। তাঁর পাশে আর একজন ঘোড়-সওয়ার বিরাট্ এক রাজছত্র তাঁর মাথায় ধ'রে নিয়ে আসছে। আমীর এসে আমাদের বস্‌বার জায়গার কাছে পৌঁছতে-পৌঁছতে তাঁর দলের মধ্যে থেকে জন দুই সম্মানিত ব্যক্তি এলেন, আর ইংরেজ রেসিডেণ্টের দোভাষী এলেন, ইনি উচ্চপদস্থ হাউসা কর্মচারী। এঁরা এসে রেসিডেণ্টকে আমীরের শুভাগমনের সংবাদ জানালেন। রেসিডেণ্ট তখন এঁদের সঙ্গে আমাদের দোতলা থেকে নীচে রাস্তায় নেমে গেলেন, আর সেখানে আমীরের প্রতীক্ষায় দাঁড়ালেন। আমীর এসে ঘোড়া থেকে নামলেন। রেসিডেণ্টের সঙ্গে শিষ্টালাপ ক'রলেন দোভাষীর মাধ্যমে, আর তারপরে আবার ঘোড়ায় চ'ড়ে সদলে প্রাসাদের দিকে গেলেন। এইভাবেই এই ছোটো-খাটো দরবার-পর্ব শেষ হ'ল। রেসিডেণ্টসাহেব তাঁর নিজের মোটরে উঠলেন, আমরাও নেমে এসে ভিড় ঠেলে ঠেলে আমাদের গাড়ির কাছে পৌঁছলুম।

সম্মান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন বালক ছিলেম তখন চন্দননগরে আমার প্রথম আসা। সে আমার জীবনের আরেক যুগে। সেদিন লোকের ভিড়ের বাইরে ছিলেম প্রচ্ছন্ন, কোনো ব্যক্তি কোনো দল আমাকে অভ্যর্থনা করে নি। কেবল আদর পেয়েছিলেম বিশ্বপ্রকৃতির কাছ থেকে। গঙ্গা তখন পূর্ণগৌরবে ছিলেন, তাঁর প্রাণধারায় সংকীর্ণতা ঘটে নি ; ছায়াস্নিগ্ধ শ্যামলতায় তাঁর দুই তীরের গ্রামগুলি শান্তি ও সন্তোষের রসে ভরা ছিল।

তার পূর্বে শিশুকাল থেকে সর্বদাই ছিলেম কলকাতার ইটের খাঁচায়। মুক্ত আকাশে আলোকের সে সদাব্রত, তার নানা বাধা-পাওয়া দাক্ষিণ্যের খণ্ড-অংশ পৌঁছত আমার ভাগে। আমার অর্ধাশনক্লিষ্ট মন এখানে এসে মুক্তির অমৃত অঞ্জলি ভ'রে পান করেছে। চিরদিন যারা এই শ্যামলার আঁচলে বাঁধা হয়ে থাকত তারা একে তেমন সম্পূর্ণ দেখে নি। আমি এসেছিলেম যেন দূরের অতিথি, তাই আমার জন্যে ছিল বিশেষ আয়োজন। সেদিন গঙ্গাতীরের পূর্বদিগন্তে বনরেখার উপরের পথে প্রতিদিন সকালে সোনার আলোয় মাধুর্যের যে ডালি আসত সে আর কারো চোখে তেমন করে পড়ে নি, আর সূর্যাস্তের নানা রঙের তুলিতে গঙ্গার জলধারায় রেখায় রেখায় যে লেখন দেখা দিত, সে বিশেষ করে আমারই জন্যে।

সেই অতিথিবৎসলা বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর অবারিত আঙিনায় সেদিন যখন বালককে বসালেন, তাকে কানে কানে বললেন, 'তোমার বাঁশিটি বাজাও।' বালক সে দাবি মেনেছিল।

ছেলেমানুষের বাঁশি ছেলেমানুষী সুরে যেখানে বাজত সে আমার মনে আছে। মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি, বড়ো যত্নে তৈরি, তাতে আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু সৌন্দর্যের ভঙ্গি ছিল বিচিত্র। তার সর্বোচ্চ চূড়ায় একটি ঘর ছিল, তার দ্বারগুলি মুক্ত, সেখান থেকে দেখা যেত ঘন বকুলগাছের আগ্‌ডালের চিকণ পাতায় আলোর ঝিলিমিলি। চার দিক থেকে দুরন্ত বাতাসের লীলা সেখানে বাধা পেত না, আর ছাদের উপর থেকে মনে হত মেঘের খেলা যেন আমাদের পাশের আঙিনাতেই। এইখানে ছিল আমার বাসা, আর এইখানেই আমার মানসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেম—

এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।

সে ঘর নেই, সে বাড়ি আজ লৌহদন্তদন্তুর কলের কবলে কবলিত। সে গঙ্গা আজ অবমাননায় সংকুচিত, বন্দী হয়েছে কল-দানবের হাতে— ত্রেতাযুগে জানকী যেমন বন্দী হয়েছিলেন দশমুণ্ডের দুর্গে। দেবী আজ শৃঙ্খলিতা।

সেদিন যে বালক জীবনের উষালোকে আপনাকে স্পষ্ট করে চেনে নি এবং চেনে নি এই সংসারকে, তার উপরে একে-একে অন্তত পঞ্চাশ বৎসরের চাপ পড়েচে। এই চাপে সেই বালক সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। আমি আজ নানা কাজে হাত দিয়েচি, এবং নানা দেশের কাছ থেকে খ্যাতি অর্জন করেচি। কিন্তু অন্তরের

মধ্যে সেই বালক এখনো আছে কাঁচা— সংসারের যে হাটে সব জিনিসের দর যাচাই হয় সেখানকার রাস্তাঘাটে ও চালচলনে এখনো সে পাকা হয় নি ; প্রকৃতির খেলার প্রাঙ্গণটার দিকে এখনো তার টান— তা ছাড়া খ্যাতির মধ্যে সে আপনার খাঁটি পরিচয় পায় না। খ্যাতির মতো বন্ধন নেই, দশের মুখের কথার জাল থেকে মনকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে রাখা শক্ত। বালকের মনের যে ডানা সেদিন আকাশে ছাড়া পেয়েছিল তার সঙ্গে খ্যাতির দড়ি বাঁধা ছিল না। আজো সেদিনকার সেই খ্যাতিহীন মুক্তির আকাশের জন্যে তার মন ব্যাকুল হয়। সেইজন্যেই এত করে মনে পড়ে চন্দননগরের গঙ্গার তীর, সেই মোরানের বাগানবাড়ির উপরিতলের খোলা ঘরটি, যেখানে বাতাস আলো এবং বালকের কল্পনার পরস্পর অবাধ মেলামেশার মাঝখানে জনতার খ্যাতি নিন্দার কলরব আবর্ত তৈরি করে নি।

মানুষের কাছ থেকে দরদ ও আদর পাবার লোভ আমার নেই এ কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে। মনে ভাবি, বিধাতার স্নেহের দান মানুষের সমাদর বেয়েই ঝরে আসে। যখন মানুষ বলে, তুমি যা দিয়েছ তাতে খুশি হয়েছি— তখন সেই খুশির কথাটা একটা মস্ত পুরস্কার। এ পুরস্কার চাই নে বলে স্পর্ধা করতে পারি নে।

কিন্তু সংসারে যশের পুরস্কার বালকের জন্যে নয়, তার জন্যে মুক্তি। জনসভায় আসন বজায় রাখতে হলে তার উপযুক্ত সাজসজ্জা চাই, জনসভার দস্তুর বাঁচিয়ে চলবার আয়োজন অনেক। বালকের বসনভূষণের বাহুল্য নেই, যেটুকু তার আছে তা যদি ছেঁড়া হয় বা তাতে ধুলো লাগে তবু সেটা বেমানান হয় না। সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো সে অন্যের জন্যে খেলে না, তার খেলা তার আপনারই জন্যে। এই কারণে খেলাতে তার কর্মের বাঁধন নেই, খেলাতে তার ছুটি। বিশ্বের মধ্যে যে চিরবালক জলে স্থলে আকাশে আলোতে ছায়াতে অবহেলায় খেলা করেন, যিনি সেই খেলার বদলে শিরোপা চান না, মর্তের বালক তাঁকে না চিনেও, না জেনেও, তাঁকেই পায় আপন খেলার সাথি, তাই দেশের লোকের কথায় তার কোনো দরকার হয় না।

কিন্তু বয়স্কের কীর্তি তো বালকের খেলার মতো নয়। বহুলোকের সঙ্গে তার বহুতর যোগ। এখানে বন্ধুকে না হলে চলে না, এখানে সহায়কে না পেলে ক্লান্তির ভারে পিঠের হাড় বেঁকে যায়। কাজের দিনে প্রাঙ্গণে ধুলোয় একলা বসে অকিঞ্চনের আয়োজনে তার শক্তি পাওয়া যায় না, পাঁচজনকে ডাক দিতে হয়। বালককালে যেদিন চন্দননগরে এসেছিলেম সেদিন এসেছিলেম বিশ্বপ্রকৃতির খেলাঘরে। সেদিনকার দান দেবতার প্রত্যক্ষ দান, সে আমি আকাশে, বাতাসে, বনের ছায়ায়, গঙ্গার কলস্রোতে পেয়েছি। আজ এসেছি জনসভায়, কবিত্ব নিয়ে নয়, কর্মের ভার নিয়ে— এর যোগ্য দান আজ আমি মানুষের কাছে দাবি করতে পারি। সেদিন সেই ছাতের উপর খোলা আকাশের নীচে মনের স্বপ্নকে ছন্দের গাঁথনিতে একলা বসে রূপ দিয়েছি, সেদিন ছিলেম *সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিখেলার* সহযোগী। তিনি আমার মনে আনন্দ জুগিয়ে-ছিলেন। আজ আমি কর্মীরূপে কর্ম ফেঁদে বসেচি। এ কর্ম মানুষের কর্ম, মানুষকে তাই সহযোগিতার জন্যে ডাক দেব। আজ আমাকে আপনারা যে সম্মান দিতে এসেছেন সে যদি সেই সহযোগিতার আহ্বানের সাড়া হয় তবে জানব কর্মের ক্ষেত্রে সার্থক হয়েচি। তা যদি না হয়, এর সঙ্গে যদি সহযোগিতা না থাকে তবে এই সম্মানের ভার দুর্বিষহ। বহুদূর থেকে নারদের পুষ্পমাল্য ইন্দুমতীকে সাংঘাতিক আঘাত করেছিল— বস্তুত সে মালারই ভার নয়, সে দুরত্বের ভার। দূরে থেকে যে সম্মান, সে সম্মানের ভার

বহন করে সংসারে মুক্তচিত্তে বিচরণ করতে কজন পারে? মানুষ সকলের চেয়ে সুখে থাকে যখন সে আপনাকে ভোলে, যখন খ্যাতির ধাক্কায় ধাক্কায় তার নিজের দিকে তার নিজেকে কেবলই জাগিয়ে রাখে তখন আত্মার যে নিভৃতে তার গভীরতম কৃতার্থতা সেখানে যাবার পথ অবরুদ্ধ হয়।

বালককালে বাঁশির উপরে দখল ছিল না, বাজিয়েছিলেম যেমন-তেমন ক'রে, পথে লোক জড়ো হয় নি। তার পরে যৌবনে বাঁশিতে সুর লাগল বলে নিজের মনে সন্দেহ রইল না, তখন সকলকে নিঃসংকোচে বলেছি "তোমরা শোনো"। তেমনি কর্মের আরম্ভে একদিন কর্মকে সম্পূর্ণ চিনি নি। কোন্ রূপের আদর্শে তার প্রতিষ্ঠা হবে সেদিন জানতেম না— সেদিন পথের লোকে উপেক্ষা করে চলে গেছে, আমিও বাইরের লোককে ডাক দিই নি। শেষে কর্ম যখন আপন প্রাণশক্তিতে মূর্তিপরিগ্রহ করলে তখন তার পরিচয় গোপন রইল না। তখন নিঃসংশয় দৃষ্টিতে তাকে দেখতে পেলেম। তখন সকলকে ডেকে বলেছি "তোমরা এসো"। বাঁশির সুর বিকাশ লাভ করে একদিন যেমন বিশ্বের সকলের হয়, কর্মও তেমনি বিশেষ পরিণতিতে বিশ্বের সামগ্রী হয়ে ওঠে। সেই বিশ্বের ধর্ম যখন কর্মের মধ্যে দেখা যায় তখন, শুধু সম্মান নয়, সহায়তা দাবি করবার অধিকার জন্মে। সেই অধিকার আজ এই সভায় সকলের কাছে নিবেদন ক'রে বিদায় গ্রহণ করি। ২১শে বৈশাখ ১৩৩৪

চন্দননগর পৌরসভায় অভ্যর্থনা উপলক্ষে কথিত

বঙ্গবাণী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও নব্যবিজ্ঞান

বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান

একদিন জগৎকে ভারতের দান ছিল এমন যা গৌরবের বস্তু। দশকিয়া গণনা ও দশমিকের হিসাব এমনি এক অমূল্য দান, প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে আজও তা প্রচলিত। ভারতের গণিতবিদ্‌রা কষে বার করে দিয়েছিলেন বৃত্ত ও ব্যাসের অনুপাতাঙ্ক। বলে দিয়েছিলেন বীজগণিতের বর্গমূল-নিষ্কাশন-সূত্র। তার জ্যোতির্বিদ্‌রা নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করেছিলেন সৌর-বৎসর-মাস ও চান্দ্র-মাসের দিন-সংখ্যা, অয়নচলনের গতি, সূর্য-পরিক্রমণের পথ, ক্রান্তিপাত ও গ্রহগণের অবস্থানাদি। আর্যভট্টই জগতের মধ্যে প্রথম অনুমান করেছিলেন আকাশে নক্ষত্ররাশির পশ্চিমাভিমুখে গমনের কারণ হল আসলে পূর্বমুখে পৃথিবীর গতি। তিনি বলেছিলেন, "অনুলোমগতি নৌস্থ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ, অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগামি"— পূর্বদিকগামী নৌকাস্থ ব্যক্তি যেমন তীরের বৃক্ষরাশিকে পশ্চিমমুখগামী দেখে, তেমনি পৃথিবীর পূর্বদিকে গতির জন্যই আকাশস্থ অচল নক্ষত্ররাশিকে সমপশ্চিমগামী দেখায়। আপন অক্ষে পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনের কথা স্পষ্টত এতে বোঝায় না ; কিন্তু গতি যে নক্ষত্রের নয়— পৃথিবীর, এ তথ্য প্রথম তাঁরই কাছে উদ্ভাসিত হয়েছিল। এমনি আর-এক জয়পতাকাস্বরূপ প্রোথিত রয়েছে শিল্পকৃতিত্বের নিদর্শন পঞ্চম শতাব্দীতে ঢালাই লোহার বিষ্ণুস্তম্ভ কুতবমিনারের প্রাঙ্গণে। উপনিষদ্ দর্শন ব্যাকরণ শব্দকোষ কাব্য মহাকাব্য কাব্যজিজ্ঞাসা উপাখ্যান নাটক সংগীত নৃত্যশাস্ত্র ছন্দশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র চিকিৎসা কামশাস্ত্র প্রভৃতিতে, ও কলাশিল্পে ভারতের কীর্তি জগতের ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ্‌স্বরূপ। ভারতের ঋষিরাই জগতে প্রচার করে গেছেন অদ্বৈতবাদ, যাকে বলা যেতে পারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা-কিছু বিদ্যমান তা-সবের অভিন্ন-একীকরণ মন্ত্র। ভারতই জগতে এনেছে অহিংসা ও শান্তির বাণী।

কিন্তু এসব হল প্রাচীন দান, প্রাচীন কীর্তি। মধ্যযুগ থেকে এমন কোনো দান বা কীতি ভারতের নেই যা জগৎকে জ্ঞানে গরিমায় বা ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করেছে। যদি-বা থাকে তবে তা নগণ্য। সৌভাগ্যের কথা, বর্তমান শতাব্দীতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ক্ষণজন্মা মনীষী বিজ্ঞান ও সাহিত্যে এমন আবিষ্কার ও রচনা সাধিত করেছেন যা জগতে শুধু স্বীকৃত ও গৃহীত হয় নি, পরন্তু যা পাঠ্যবিদ্যার অঙ্গীভূত হয়েছে ও নিত্য ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ও রচনার সমতুল্য বিবেচিত হয়েছে। ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে অগ্রসর এইসব বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের মধ্যে 'বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান' অথবা 'বোস-পরিসংখ্যান' অন্যতম। এর জনক হলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৯২৪ অব্দে এটি রচিত হয় ও স্বয়ং আইনস্টাইন কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে তাঁরই উদ্যমে প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর পরে সম্প্রতি এ বছর লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি এর রচয়িতাকে ফেলো নির্বাচন করে সংবর্ধিত করেছেন। কিন্তু বহুপূর্বেই বোস-পরিসংখ্যান আপন উৎকর্ষে জগতে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বোস-পরিসংখ্যান একটা সামষ্টিক বিধান ও আজকাল উচ্চাঙ্গ পদার্থবিজ্ঞানের এক অবশ্যপাঠ্য অধ্যায়। এ বস্তুটি কী, জানবার জন্য অনেকেই সমুৎসুক। বিষয়টিকে যথাসম্ভব সাধারণবোধ্য করে

এখানে উপস্থিত করলাম ও এর অন্তরে সহজে প্রবেশের জন্য আমরা একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্তের শরণ নিলাম।

প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে পড়লে সহজে আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলি; সঙ্গী ও দলের লোক থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হই। ছোট-বড় স্ত্রী-পুরুষ কে কোথায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হই তার কোনো ঠিকঠিকানা থাকে না। আজকাল তাই বৃহৎ মেলায় ও বিরাট ভিড়ের জায়গায় খোঁজ-আপিসের ব্যবস্থা করা হয় যাতে হারানো লোকজন সহজেই পুনর্মিলিত হতে পারে। ভিড়ের ধর্মই হল এই, ভিড় লোকজনকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে। ভিড়ে একটা চাপ সৃষ্টি হয়, তারই ফলে এই বিক্ষেপের উদ্‌ভব। ক্ষেত্রবিশেষে এই চাপ অতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। ১৯৫৪ অব্দে এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় সহস্রাধিক স্নানার্থীর প্রাণবিনাশ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যান্য দেশেও প্রচণ্ড ভিড়ে কত লোকের প্রাণনাশ হয় সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে তার বিবরণ পাওয়া যায়। বিশৃঙ্খল বিক্ষুব্ধ জনতার এমন ভয়াবহতা আছে যা এককের থাকা অসম্ভব। ভিড়ের বিক্ষেপধর্মও ব্যষ্টিজনের মধ্যে অবর্তমান। বরং সাধারণে আমরা পরস্পরকে আকর্ষণ করি, বিক্ষেপ করি না ও আত্মীয়বন্ধুস্বজনের যতদূর সম্ভব নিকটে থাকি। বস্তুত একক জনের ধর্ম ভিড়ের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যেখানেই একের বদলে বহুর সমাবেশ সেখানেই ব্যষ্টিগত আচরণের পরিবর্তে সামষ্টিক আচরণেরই প্রাধান্য। বহু একত্রিত হয়ে যে সমষ্টি উৎপন্ন করে তা পৃথক এক সত্তা ও পৃথক লক্ষণাদি লাভ করে, যা ব্যষ্টিতে অবর্তমান ও যা ব্যষ্টিগুলির লক্ষণ আচরণাদির যোগফল মাত্র নয়। সমষ্টিতে যা প্রকটিত ব্যষ্টিতে তা অপ্রত্যাশিত, এমনকি নিরর্থক। প্রকৃতপক্ষে ব্যষ্টি ও সমষ্টির তাৎপর্য বিভিন্ন।

এক ও বহু, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, সামান্য ও সমূহ— এদের মধ্যে তাৎপর্যের বিভিন্নতা জগতের প্রাচীন মনীষীরা উপলব্ধি করেছিলেন। উপনিষদের ঋষিরা বলেছিলেন— ভূমাকে জানো, তবেই জ্ঞানের আনন্দ সম্যক হবে— "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য"; বিশ্বকে টুকরো টুকরো ভাবে জানলে জ্ঞান সার্থক হবে না, তার নিরতিশয় বা সম্পূর্ণ অখণ্ড রূপ ও সত্তার যে ভিন্ন তাৎপর্য আছে তাকেও জানা চাই।

বহুর সমাবেশ বা সমষ্টির যে বিশেষ একটা নির্দেশ আছে আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে নিত্যই তার পরিচয় পাই। সমাজ রাষ্ট্র কৃষি স্বাস্থ্যবিভাগ প্রভৃতির ব্যবস্থায়, ইন্‌সিয়োরেন্স জন্মমৃত্যু ও প্রজনন সংক্রান্ত ব্যাপারে, জুয়ার হার-জিতে, তাস(flush)-পাশার দানে, টার্গেট গুটিঙে, ঘোড়দৌড়ের ফলাফলে সমষ্টিগত বিধির নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। সমষ্টির নিয়ন্ত্রণ অবিসংবাদিত ভাবে আমাদের সকল রকম অনুষ্ঠান ও উদ্যোগের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। স্বনামধন্য প্রফেসার প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সমষ্টিগত বিধিলক্ষণের অনুশীলন-অধ্যয়নাদি ও গবেষণার জন্য বরানগরে যে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন তা আজ দেশবিদেশে প্রখ্যাত।

সামষ্টিক বিধির একটা মূলকথা হল ব্যষ্টির সমাবেশটি বহুসংখ্যক হওয়া চাই। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। একটা টাকা নিয়ে কেউ যদি উপর দিকে ছুঁড়ে দেন তো টাকাটা পড়বে হয় এ-পিঠ নয় ও-পিঠ হয়ে। যদি টাকাটা বার বার এই রকম উপর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া যায় তো অঙ্কশাস্ত্রানুসারে অর্ধেকবার এ-পিঠ ও বাকি অর্ধেকবার ও-পিঠ হয়ে পড়বে। কিন্তু এই নিয়ম রক্ষিত হওয়ার জন্য টাকার ছুঁড়ে-ফেলাটা সহস্র লক্ষ বার হওয়া চাই, নয়তো নিয়মের ব্যতিক্রম হবে। দু বার ফেললে হয়তো দু বারই এ-পিঠ নয়তো

দু বারই ও-পিঠ হয়ে পড়বে। ঠিক এই রকমই ফ্লাশের দানে : এক রঙের পাঁচটি তাস একই হাতে আসার সম্ভাবনা হল অঙ্কশাস্ত্রমতে পাঁচ-শতে এক। কিন্তু পাঁচ শ বার তাস বিলি করলে হয়তো বহুবার হবে নয়তো একবারও হবে না। পাঁচ-শতে এক, এ-নিয়ম ব্যতিক্রমহীন হওয়ার জন্য চাই লক্ষ বার বা ততোধিক বার তাসের বিলি। টার্গেট শুটিং ঘোড়দৌড় ইত্যাদিতেও ঠিক এই রকম।

সমাজ ও রাষ্ট্রে বা কৃষি বা তাস-পাশায় যেমন, পদার্থবিজ্ঞানেও তেমনি সামষ্টিক বিধির আধিপত্য। একটা রুল হাতে নিয়ে দেয়ালে লাগিয়ে মনে করলাম রুলটা দেয়ালে ঠেকে গেছে, কি না স্পর্শ করেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রুলটা কোটি কোটি অণুর সমষ্টি ; অণু ও তার অন্তর্গত পরাণু[১]গুলিতে আছে ঝাঁকে ঝাঁকে সহস্র সহস্র ইলেকট্রন-প্রোটনাদি। ব্যষ্টিক ভাবে রুলের ও দেয়ালের কোন্ বা ক-টা ইলেকট্রন প্রোটন পরস্পরকে স্পর্শ করছে বলা অসম্ভব ও অর্থহীন। রুল ও দেয়ালের স্পর্শলাভ একটা সামষ্টিক ব্যাপার। শতসহস্র কোটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টি হল মেঘ ; আবার প্রায় সহস্র কোটি নক্ষত্রের সমাবেশ হল একটা নক্ষত্রমণ্ডল, যাকে আমরা বলি নীহারিকা। যে রকম ঘরে আমরা বাস করি তার বায়ুতে আছে কোটি কোটি অক্সিজেন-নাইট্রোজেন-অণু। এসকলের যেসব আচরণ আমরা প্রত্যক্ষ করি তা সামষ্টিক আচরণ, ব্যষ্টিক নয়। ধরা যাক, ঘরের মধ্যে যে বায়ু আছে তার টেম্পারেচার। অবিদিত নেই, গ্যাস হল অতিদ্রুতবেগবান অণুর সমাবেশ। টেম্পারেচার হল তার সামষ্টিক গত্যঙ্ক ; কিন্তু যদি বলা যায়, একটি বা গুটিকয়েক অণুর টেম্পারেচার তবে তা হবে অর্থহীন। আবার, অণুদের গতি জানা থাকলেও টেম্পারেচার নির্ণয় সম্ভব নয়। কল্পনা করা যেতে পারে যে, প্রত্যেকটি অণুর গতিবিধি-নির্ণয় করে তা থেকে টেম্পারেচার-অবগতির একটা উপায় হতে পারে ; কিন্তু তাতে আয়ু নিঃশেষ হবে। অতএব অন্য পথের সন্ধান চাই।

সমস্যাটির উদয় হয়েছিল বৈজ্ঞানিক-মহলে উনিশ শতকের গোড়ায়। ইতিপূর্বে কয়েক শতাব্দী আগেই গ্যালিলিয়ো নিউটন প্রভৃতি মনীষীরা ব্যষ্টির স্থিতি গতি কক্ষ ইত্যাদির গণিত রচনা করেছিলেন। পৃথিবী ও গ্রহের গতিবিধি, গ্রহণ ইত্যাদির, কামানের গোলা, বিলিয়ার্ড-বল ও রাইফেল-বুলেটের অঙ্ক কষে ফলাফল বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু মুশকিল হল গ্যাস নিয়ে। ইতিমধ্যে স্টিম-চালিত ইন্‌জিন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই স্টিমের ব্যাপার নিয়ে বিজ্ঞানীরা আলোচনায় রত হলেন ; কিন্তু ব্যষ্টি-গণিত এতে অচল। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল ও ক্লসিয়াস লাগলেন সামষ্টিক গণিত নির্ণয় করতে। ম্যাক্সওয়েল অণুদের গতির বণ্টন বলে দিলেন সমষ্টিগণিত প্রয়োগ করে। সমষ্টিগণিত এই থেকে প্রতিষ্ঠিত হল। বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, শুধু নিউটনের গণিতই যথেষ্ট নয় ; পদার্থবিজ্ঞানে চাই সমষ্টিগণিত। গ্যাসের অন্যান্য আচরণ ও radiation বা বিকিরণক্রিয়ার ব্যাখ্যা সমাধানে লাগলেন লর্ড রেলে, বোল্টজম্যান, উইন্‌স প্রভৃতি, এই নবপর্যায়ের গণিত প্রয়োগ ক'রে। অবশেষে প্লাঙ্ক (Planck) তাকে অঙ্কগত করলেন ও তা করতে গিয়ে একটা সম্পূর্ণ নূতন অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। সে হল Quantum Theory : শক্তির কণাবাদ, যেমন বস্তুর। অর্থাৎ শক্তিপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন শক্তি নয় ; নদীপ্রবাহ যেমন জলকণার স্রোত, শক্তিপ্রবাহ তেমনি শক্তিকণার স্রোত।

১ পরমাণু ও পারমাণবিক শব্দ দুটির পরিবর্তে লেখক পরাণু ও পরাণবিক শব্দ প্রয়োগ করে আসছেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এ পরিবর্তন অনুমোদন করেন।

প্লাঙ্ক যে ভাবে সমষ্টির অঙ্ক প্রয়োগ করলেন তা বিজ্ঞানের চক্ষে ত্রুটিহীন ও অনাপত্তিজনক হয় নি। ১৯২৪ অব্দে সত্যেন্দ্রনাথের যে গবেষণা প্রকাশিত হল তাতেই অতি অভিনব ও স্বপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তিতে ত্রুটি ও আপত্তিহীন ভাবে Planck Law -এর প্রমাণ সিদ্ধ হল। এই গবেষণাটির বিষয়বস্তু ছিল আলোককণা বা ফোটন (photon) ও বিকিরণ (radiation) -এর সামষ্টিক আচরণ। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন, শুধু ফোটন কেন এমন-কি বস্তুকণার সমষ্টিতেও বোস-পরিসংখ্যান-বিধি প্রযোজ্য। তিনি স্বয়ং একে প্রয়োগ করলেন ইলেক্‌ট্রন-গ্যাসের আচরণ সমাধানে। ম্যাক্সওয়েল ও ক্লসিয়াস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গ্যাস-অণুদের সামষ্টিক বিধি, এবার প্রতিষ্ঠিত হল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সকল কণাসমষ্টির সামষ্টিক বিধি— আলোককণা, বিকিরণ, ইলেক্‌ট্রন-কণা ইত্যাদি। পদার্থবিজ্ঞানে সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক একটা নতুন অধ্যায় যোজিত হল।

বোস-পরিসংখ্যানকে আইনস্টাইন ইলেক্‌ট্রন-গ্যাসে ব্যবহার করলেও দেখা গেল কার্যক্ষেত্রে এ প্রয়োগ খুব সফল হয় না। বস্তুত সব বস্তুকণাই বোস-পরিসংখ্যান-নিয়ন্ত্রিত নয়; যেসব বস্তুকণা বোস-পরিসংখ্যান অনুসরণ করে না তারা অপর-এক পরিসংখ্যানের অধীন। সত্যেন্দ্রনাথের পদানুসরণ ক'রে ফার্মি ও ডিরাক (Fermi-Dirac) দু বছর পরে এই পরিসংখ্যান প্রস্তাবন করেন।

এই উভয় পরিসংখ্যানই এখন Atomic ও Quantum Mechanics -এ গ্রাহ্য। পদার্থবিজ্ঞানে যেসকল প্রাথমিক কণিকা স্বীকৃত ও বিবৃত হয়েছে তারা দুই দলে বিভক্ত। একদল বোস-বিধির অনুবর্তী; এদের নামকরণ হয়েছে বোসন। অপর দল ফার্মি-ডিরাক-বিধি ও Pauli's Exclusion Principle -এর অনুবর্তী। এদের নামকরণ হয়েছে ফার্মিয়ন। ফোটন, কোয়াণ্টাম ও যুগ্মসংখ্যক ভর-সমন্বিত কণিকারা, যথা অ্যালফা-কণা, কয়েকটি মেসন ইত্যাদি প্রথম দলের অন্তর্গত; ইলেক্‌ট্রন প্রোটন নিউট্রন প্রভৃতি অযুগ্মসংখ্যক ভর-সমন্বিতরা দ্বিতীয় দলের অন্তর্গত।

বিশ শতকের প্রারম্ভে পদার্থবিজ্ঞানের প্রাচীন প্রত্যয়গুলি সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিল। প্রচলিত বিধি-নির্দেশ ও সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতার মধ্যে গরমিল উপেক্ষণীয় সীমা অতিক্রম করল। নতুন নতুন আবিষ্কার পুরাতন সিদ্ধিকে স্থানচ্যুত করল। বিজ্ঞানে বিপ্লব দেখা দিল ও অভ্যুদয় হল নব্যবিজ্ঞানের। প্লাঙ্ক-বর্ণিত শক্তিকণাবিধি থেকে এর সূচনা (১৯০০)। আইনস্টাইন শক্তিকণাবিধি সমর্থন করে দেখালেন এর দ্বারা ধাতুগাত্রে আলোকপাতে ইলেক্‌ট্রন-উৎক্ষেপ হুবহু ব্যাখ্যাত হয়। শক্তিকণাবিধি সব দিক থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। রাদারফোর্ড পরাণুকে দিলেন ভেঙে ও এক পরাণুকে অন্য পরাণুতে রূপান্তরিত করে সিদ্ধান্ত করলেন পরাণু অভিন্ন প্রাথমিক বস্তু নয়, ও প্রোটন-ইলেক্‌ট্রনে সাজানো বস্তু। নীলস্ বোর পরাণুর ইলেক্‌ট্রন-সজ্জাতে শক্তিকণাবিধি প্রয়োগ করে হাইড্রোজেন-বর্ণছত্রের ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হলেন। Correspondence Principle উদ্ভাবন করে এ বিষয়ে কয়েকটি দুরূহতা দূর করে প্রাচীন ও নব্য হিসাবের মধ্যে সেতু স্থাপনে সক্ষম হলেন। ইতিমধ্যে (১৯০৫-১৯১৫-১৯১৮ অব্দ) আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রচারিত ও সমর্থিত হল। এ মতে শুধু দৈর্ঘ্য প্রস্থাদি, কাল ও গতি (অনন্যগতি ও শীঘ্রগতি দুইই) যে কেবল আপেক্ষিক তা নয়, পরন্তু বস্তুকণা শক্তিকণাতে ও শক্তিকণা বস্তুকণাতে রূপান্তরিত হতে পারে— এ হয় সিদ্ধ। ১৯২৩ অব্দে লুই দ্য-ব্রলি তরঙ্গ ও বস্তুকণার একাত্মতা প্রমাণ করলেন তাঁর Wave Mechanics -এর অবতারণা করে, ও সত্বই তাকে সম্প্রসারিত করে তার জন্য নূতন

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
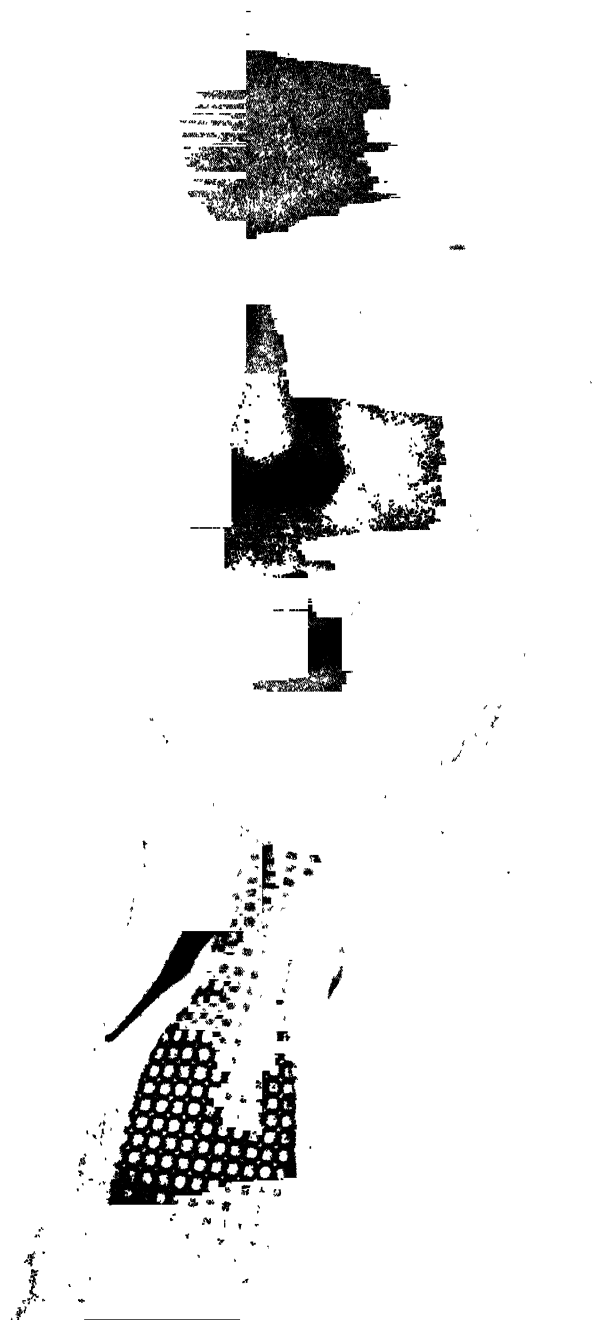
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

গণিতের বুনিয়াদ রচনা করলেন শ্রডিংগার। ১৯২৬ অব্দে হাইসেন্‌বার্গ রচনা করলেন মাত্রাগণিত বা Quantum Mechanics। পরাণুর গড়ন বদল করে অন্য পরাণুতে তাকে রূপান্তর করে তা থেকে অশেষ শক্তি মানুষের আয়ত্ত হতে পারে এর প্রমাণ হল মহাযুদ্ধে হিরোশিমায় অ্যাটম বোমার ধ্বংস-কাজে। যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে বিখ্যাত বিজ্ঞানী জোলিও-কুরী কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় নূতন পরাণু সৃষ্টি করার কৌশল দেখালেন। শক্তিকণা বস্তুকণায় রূপান্তরিত হয় দেখিয়েছেন ডিরাক, পজিটিভ বিদ্যুৎযুক্ত, ইলেক্‌ট্রনের জুড়ি, পজিট্রনের ভবিষ্যদ্বাণী করে, যা পরে সাক্ষাৎপ্রমাণিত হয়েছে। নব্যবিজ্ঞানের জয়যাত্রা চতুর্দিকে শুরু হল। এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের 'বোস-পরিসংখ্যান'। কেবল ওটি প্লাঙ্ক-অঙ্ক (Planck's Law) ও শক্তিকণা প্রতিষ্ঠিত করবার স্বাধীন সোপান স্বরূপ হয় নি। ও এনে দিল নব্য-বিজ্ঞানে, Atomic Physics ও Quantum Mechanics -এ সমষ্টির সূত্র। বিজ্ঞানে, যেমন অন্যত্র, সামষ্টিক-সূত্র অপরিহার্য। সে বিজ্ঞান অচল যাতে সমষ্টির আসন নেই। নব্যবিজ্ঞানের এই অপরিহার্য অধ্যায়টি রচনা করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাতে নব্যবিজ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

শিশিরকুমার মিত্রের গবেষণা

মার্কনি যখন এক স্থান হতে আঠার মাইল দূরে আর-এক স্থানে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠাতে সক্ষম হলেন, তখন তিনি তোড়জোড় করতে থাকলেন, ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় বিনা-তারে সংকেত পাঠাবেন। বিশেষজ্ঞরা বললেন, পৃথিবী গোলাকার, ইংলণ্ডের কোনো স্থানের স্পর্শকরূপে যে তরঙ্গ-স্রোত যাত্রা করবে, আমেরিকায় পৌছতে তো তাকে বেঁকতে হবে; সে বেঁকবে কেন? তাঁদের উপদেশবাণীতে কর্ণপাত না ক'রে মার্কনি কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন, আর ১৯০১ সনে একদিন কর্নওয়াল থেকে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠালেন তা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে পৌছে সেখানে এক যন্ত্রে সাড়া দিল। জগদ্‌বাসী স্তম্ভিত হল।

কিন্তু কি ক'রে এটা সম্ভব হল, বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে থাকলেন। অবশ্য একটা বৈজ্ঞানিক হিসাব আছে যে, তরঙ্গে যার গতি তা অল্প একটু বেঁকতে পারে, কিন্তু অতটা তো নয়। ১৯০২ সনে আমেরিকায় কেনেলি ও ইংলণ্ডে হেভিসাইড প্রায় একই সময়ে বললেন যে, উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের কোনো-একটি স্তর পরিবাহকের কাজ করছে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সেখানে প্রতিফলিত হচ্ছে, সেই কারণে তার গতির দিক্‌-পরিবর্তন ঘটছে। হেভিসাইড এ কথাও বললেন যে, সূর্যরশ্মি সম্ভবত এই বায়ুস্তরে পজিটিভ ও নেগেটিভ আয়ন সৃষ্টি করছে, ফলে ওই আয়নিত বায়ুস্তর পরিবাহক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু এ তো কল্পনা মাত্র। প্রমাণ চাই!

প্রথম প্রমাণ দিলেন অ্যাপেল্‌টন অনেকদিন পরে, ১৯২৫ সনে। ঘোরালো ও খাড়া আকাশ-তার খাটিয়ে সংকেতের আওয়াজ কিভাবে ক্ষীণ হতে থাকে লক্ষ্য করে তিনি সুনিশ্চিত হলেন যে, বায়ুমণ্ডলে কোনো এক স্তরে প্রতিফলনের জন্য ওইরকম ঘটছে।

মার্কনি যেকালে বিনা-তারে সংকেত পাঠান তখন পর্যন্ত উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি সম্বন্ধে

বিজ্ঞানীদের জ্ঞান খুব কমই ছিল। যত উপরে ওঠা যায় বায়ুর ঘনত্ব তত কমে আসে, বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর উপরিভাগে আড়াই শ, তিন শ, কি, চার শ মাইল অবধি বিস্তৃত— এইরকম কয়েকটা কথা।

এর পর আবহবিদ্‌রা কিছু কিছু গবেষণা আরম্ভ করলেন। বেলুন উড়ালেন, চাপ উষ্ণতা আর্দ্রতা মাপবার যন্ত্র বেলুনের মধ্যে রইল; বেলুন নেমে এসে ওইসব সম্বন্ধে সংবাদ জানাল। কিন্তু বেলুন তো বেশিদূর উঠতে পারল না; পিকার্ডের বেলুন ১৬ কিলোমিটার অবধি উঠেছিল; বেলুনের দৌড় ওই অবধি। এর পর ছোঁড়া হল রকেট; সে উঠল ১৮০ কিলোমিটার অবধি। রকেট ট্রান্‌সমিটার বহন করে নিয়ে উঠত, উপর থেকে সংকেত ছাড়ত, বিজ্ঞানী মাটিতে বসে সেই সংকেত ধ'রে তার তাৎপর্য গ্রহণ করতেন। এতে ক'রে উপরের স্তরের টাটকা খবর মিলতে লাগল। কিন্তু এর দোষ রইল এই, ট্রান্‌সমিটারকে খবর সংগ্রহ করতে হবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে।

এর পর বিজ্ঞানী যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল-সম্বন্ধীয় গবেষণায় তা বিশেষ কার্যকর হল। এই পদ্ধতিতে মাটি থেকে ক্ষণস্থায়ী এক ঝলক বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠানো হবে, উপরে পরিবাহক স্তরে প্রতিফলিত হয়ে তা নীচে নেমে আসবে, তখন তাকে গ্রাহকযন্ত্রে ধরা যাবে।

এই রকমের এক পরীক্ষায় প্রেরকযন্ত্রের কয়েক কিলোমিটার দূরে গ্রাহকযন্ত্র রাখা হয়েছে। প্রেরকযন্ত্র থেকে ক্ষণস্থায়ী এক গুচ্ছ তরঙ্গ পাঠানো হল; গ্রাহকযন্ত্রে পরপর দুবার সংকেত পাওয়া গেল। প্রথমটায় তরঙ্গ প্রেরকযন্ত্র থেকে সোজাসুজি গ্রাহকযন্ত্রে এসেছে; আর দ্বিতীয়টায় তরঙ্গ গ্রাহকযন্ত্র থেকে যাত্রা ক'রে উপরে আয়নিত স্তরে পৌঁছল, সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে এসে গ্রাহকযন্ত্রে জানান দিয়েছে।

একটা কুয়ার মুখের কাছে ক্ষণস্থায়ী একটা শব্দ করা হল; অল্প সময় পরে প্রতিধ্বনি ফিরে এল; শব্দের যাত্রা করা ও ফিরে আসার মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান একটা ঘড়ির সাহায্যে তা মাপা হল। এখন এই সময়ে শব্দ কুয়ার তলা অবধি গিয়েছে ও ফিরে এসেছে। জানা আছে যে, শব্দ সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট যায়। সুতরাং এর থেকে কুয়ার গভীরতা আমরা মাপতে পারি।

এইবার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষাটি ধরা যাক। প্রথম সংকেত ও দ্বিতীয় সংকেতের মধ্যে সময়ের ব্যবধানটা মাপা হল। বিদ্যুৎ-তরঙ্গের বেগ আলোর বেগের সমান, আর তা হলে সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল; সুতরাং সময়ের ব্যবধান জানা হওয়ায় পরিবাহক-স্তরের দূরত্ব মাপা গেল। অবশ্য একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, এরূপ পরীক্ষায় সময়ের ব্যবধান অত্যন্ত কম, একটি সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের চেয়েও কম; কোনো ঘড়ি এরকমের হিসেব দিতে পারে না। এর জন্যে বিজ্ঞানের এক নবাবিষ্কৃত যন্ত্র ব্যবহার করতে হল। উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহে এই যন্ত্র বিজ্ঞানীর প্রধান সহায় হল।

এই সময়ে শ্রীশিশিরকুমার মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এস্‌সি. উপাধি লাভ করে প্যারিসে এসেছেন। বিজ্ঞানের এই দিকটা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠাবার ও তা ধরবার সমস্ত কৌশল তিনি আয়ত্ত করে নিলেন। তার পর দেশে ফিরে এসে কলকাতা বিজ্ঞান-কলেজে তিনি এক পরীক্ষাগার স্থাপন করলেন। গবেষণা চলতে লাগল। সহকর্মীরূপে পেলেন কয়েকজন বিজ্ঞানীকে যাঁদের দানও অসামান্য।

অ্যাপেল্‌টন দেখিয়েছিলেন, উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের যে অংশ আয়নিত হয় তাতে দুটি পৃথক পৃথক স্তর আছে, যেখানে আয়নরা বেশিরকম ঘনীভূত হয়েছে। এই দুই স্তরের নাম দেওয়া হল E ও

F-স্তর। E-স্তর প্রায় ১০০ কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থিত, আর F-স্তর আছে ২০০ থেকে ২৫০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে। শিশিরকুমার মিত্র E-স্তরের নীচে, ভূপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৬০ কিলোমিটার উঁচুতে, আর-একটি স্তরের সন্ধান পেলেন। সাধারণ পদ্ধতিতে তা ধরা যায় না; এর জন্য শিশিরকুমারকে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হল। শিশিরকুমার লক্ষ্য করলেন, এই স্তর বিশেষভাবে শোষকের কাজ করে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বড় হলে এই স্তরে তা প্রতিফলিত হয়, মাঝারি বা ছোট হলে প্রতিফলন হয় না। এই স্তর কেবলমাত্র দিবালোকে গঠিত হয়, রাত্রে এ লুপ্ত হয়ে যায়। শিশিরকুমারের এ গবেষণা পৃথিবীর বিভিন্ন পরীক্ষাগারে স্বীকৃতি পেল, অ্যাপেল্‌টন এই স্তরের নাম দিলেন D-স্তর। তা হলে শেষ অবধি এই দাঁড়াল, বায়ুমণ্ডলের আয়নিত অংশে মোটামুটি তিনটি স্তর আছে — D, E ও F। তার পর এও দেখা গেল, F-স্তরটি দিবাভাগে F_1 ও F_2 দুটি পৃথক স্তরে বিভক্ত হয়, রাত্রে তারা আবার জোড়া লাগে। কোন্ স্তরে বায়ুর কোন্ উপাদান আয়নিত হচ্ছে শিশিরকুমার সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করলেন। বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে প্রকৃতির বিরাট পরীক্ষাগারে দিনে রাত্রে যেসব ঘটনা ঘটছে, তার সম্পূর্ণ রহস্য আজও অনুদ্‌ঘাটিত রয়েছে। কিন্তু যেসব বিজ্ঞানী ধীরে ধীরে সেই যবনিকা উন্মোচন করছেন, শিশিরকুমার মিত্র তাঁদের অন্যতম।

উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে গবেষণা খুব বেশি দিনের নয়। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর বহু স্থানের বহু বিজ্ঞানী অনেক তথ্য আহরণ করেছেন। শিশিরকুমার মিত্র সেসমস্ত সংগ্রহ করে *The Upper Atmosphere* নামে এক বৃহৎ প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। রাশিয়া সমগ্র পুস্তকখানি নিজ ভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছে। এর আগে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বলিত কোনো পুস্তক এত সমাদর লাভ করে নি।

রয়াল সোসাইটির সভ্যপদে নির্বাচন সম্বন্ধে একটা কথা বলে শেষ করি।

১৯৩৬ সনে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ওই প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদে নির্বাচিত হন। তার পর দীর্ঘ দশ বছরের মধ্যে আর কোনো ভারতবাসীকে সভ্য করা হয় নি। গত বছরে সভ্য হলেন ওয়াডিয়া, আর এ বছর মিত্র ও বসু। এটাকে কি একটা সাধারণ ঘটনা বলে ধরা যাবে, না, এর মূলে কোনো কারণ আছে।

যতদূর জানা যায় তা এই।—

রয়াল সোসাইটির দু রকম সভ্য আছে, সাধারণ সভ্য ও বিদেশী সভ্য। অবশ্য রাজপরিবার থেকে সভ্য করবার তৃতীয় এক বিধি আছে। বিদেশী সভ্যের সংখ্যা খুবই কম, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যাঁরা একেবারে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন তাঁদের মধ্য থেকেই এই শ্রেণীর সভ্য করা হয়। ১৯৪৬ সন পর্যন্ত ভারত ইংলণ্ডের অধীনে থাকায় সাধারণ সভ্যশ্রেণীর মধ্যে ভারতবাসীকেও নেওয়া হত। কিন্তু ১৯৪৭ সনে ভারত যখন স্বাধীন হল, তখন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বললেন, আর তো ভারতবাসীকে সাধারণ সভ্য করা চলে না। এই রকমে দশ বছর গেল; এখন কর্তারা মত বদলালেন, বললেন, ভারত যখন কমনওয়েলথভুক্ত রয়েছে তখন ভারতবাসী সম্বন্ধে বাধানিষেধ প্রয়োগ করার দরকার নেই। এই গোলমালটা না উঠলে বোধ হয় ওয়াডিয়া, মিত্র, বসু এর আগেই সভ্য হতেন।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

রয়েল সোসাইটি : লণ্ডন

ইংলণ্ডে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। কিন্তু শিক্ষিত সমাজে নতুন চিন্তাধারার ব্যাপক প্রসার এবং তাকে কার্যকর করবার উদ্যম সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে হয় নি। এলিজাবেথের (১৫৩৩-১৬০৩) সনদ নিয়ে ইংরেজ বণিকেরা পৃথিবীর নানা দেশে বেরিয়ে পড়ল বাণিজ্যের সন্ধানে। বাণিজ্য-বিস্তারের ফলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পেল। দারিদ্র্যের পীড়ন ক্রমশ দূর হওয়ায় এল সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান-চর্চার সুযোগ। দুঃসাহসী ভ্রমণকারীরা কত অজানা দেশ আবিষ্কার করে আশ্চর্য সব বিবরণ প্রচার করতে লাগল। ক্যাক্সটনের (১৪২২-১৪৯১) মৃত্যুর পর প্রায় এক শ বছর পার হয়ে গেছে। এই এক শ বছরে ছাপাখানার প্রভূত উন্নতি হয়েছে; বেড়েছে মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা। বাণিজ্যপ্রসারের সঙ্গেসঙ্গে পণ্য-উৎপাদনের যান্ত্রিক পদ্ধতি উন্নত করবার জন্য পরীক্ষার বিরাম নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রীক ও ল্যাটিন বিদ্যার একাধিপত্য শিথিল হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও নতুন চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছে সুস্পষ্টরূপে। গির্জার অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছে; রাজা যে পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এ কথা নির্বিচারে মেনে নিতে নবচেতনাপ্রাপ্ত নাগরিকরা আর রাজি নয়। এতদিন যাবৎ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে পূজা করবার চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ১৬৪৯ সালে। ঐ বছরই প্রথম চার্লসকে (১৬২৫-১৬৪৯) বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বছরের মধ্যে ইংলণ্ডে দুটি উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়। একটি জন নেপিয়ারের (১৫৫০-১৬১৭) লগারিদ্‌ম, অন্যটি উইলিয়াম হার্ভের (১৫৭৮-১৬৫৭) মানবদেহে রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধে। অ্যারিস্টটল (খ্রী. পূ. ৩৮৪-৩২২) বলেছিলেন, রক্ত যকৃৎ থেকে হৃদ্‌পিণ্ডে যায়। হার্ভে দেখালেন, তা ঠিক নয়; হৃদ্‌পিণ্ডই দেহের সর্বত্র রক্ত সঞ্চালিত করে। এ ছাড়া সৌরজগৎ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩), গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২), ও কেপলারের (১৫৭১-১৬৩০) বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলি ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। কয়েকজন এক জায়গায় মিলিত হলে কেবল এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হত।

ইংরেজ নাবিক বণিক ও পর্যটকেরা পৃথিবীর সকল দেশ থেকে পশুপাখী গাছপালা কৃষিজাত খনিজ ও শিল্প দ্রব্যের বিচিত্র সংগ্রহ নিয়ে দেশে ফিরতে লাগল। এইসব অদৃষ্টপূর্ব দ্রব্যসম্ভার সম্বন্ধেও জনচিত্তে কৌতূহলের শেষ নেই: কবে নতুন জিনিস কি এল, কেবল তাই নিয়ে আলোচনা। জনচিত্ত বিশেষ করে অধিকার করল তিনটি নতুন জিনিস: চা কফি ও তামাক। চা অথবা কফির পেয়ালা সামনে রেখে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা বেশ জমাট হয়ে ওঠে।

সেটা বোধ হয় ১৬৪৫ সাল। একদিন লণ্ডনের এক রেস্তোরাঁয় কফি খেতে খেতে জন-দশেক যুবক স্থির করলেন যে, তাঁরা এইসব নতুন আবিষ্কার নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করবেন। সপ্তাহে একবার তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁয় চা কফি ও খাবার খাবেন, আর সেইসঙ্গে চলবে আলোচনা। খাবার খরচা বাবদ প্রত্যেককে সপ্তাহে এক শিলিং করে চাঁদা দিতে হবে। আলোচনাচক্রে রাজনীতি ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী উত্থাপন করা হবে না বলে স্থির হল। একমাত্র আলোচ্য বিষয় হবে 'নবদর্শন' বা বিজ্ঞান।

কিছুদিন পরে অক্সফোর্ডেও এমনি একটি আলোচনাচক্র গড়ে ওঠে। এই দুটি চক্রই ছিল অনেকটা

ক্লাবের মত। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা কার্যক্রম এদের ছিল না। তথাপি রয়েল সোসাইটির সূচনা এদের মধ্যেই হয়েছিল।

কয়েক বছর পরে অক্সফোর্ড আলোচনাচক্রের অধিকাংশ সভ্যকে কার্যোপলক্ষে লণ্ডন আসতে হয়। এর ফলে লণ্ডনের মূল চক্রটির শক্তি বৃদ্ধি হল। এবার আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি সমিতি স্থাপন করবার কথা উঠল। ১৬৬০ সালে এই সমিতি স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় চার্লসের পৃষ্ঠপোষকতায় সমিতি রাজকীয় সনদ লাভ করে ১৬৬২ সালে। সমিতির নাম হল THE ROYAL SOCIETY OF LONDON FOR PROMOTING NATURAL KNOWLEDGE, কিন্তু সম্পূর্ণ নামটি অনেকেরই জানা নেই; রয়েল সোসাইটি নামটিই সকলের নিকট পরিচিত।

সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সনদে বলা হয়েছে যে, সভ্যদের "studies are to be applied to further promoting by the authority of experiments the sciences of natural things and of useful arts, to the glory of God the creator, and the advantage of the human race"। আজ পর্যন্ত রয়েল সোসাইটি বিজ্ঞান সাধনার এই আদর্শকেই মূলতঃ অনুসরণ করে আসছে। বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য বিষয়ে সোসাইটি কর্মবিস্তারের চেষ্টা কখনো করে নি।

রয়েল সোসাইটির কাজ শুরু হয় ১১৯ জন সদস্য নিয়ে। এই সদস্যদের নাম হল Fellows। সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, দু জন সম্পাদক ও একুশ জন ফেলো নিয়ে গঠিত কার্যনির্বাহক সমিতির উপর সোসাইটি-পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল।

উদ্যোক্তারা সোসাইটির পরিকল্পনা রচনায় পূর্বসূরীদের রচিত নানা পুথিপত্র থেকে যে প্রেরণা লাভ করেছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দেখলেন যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্যে নতুন চিন্তাধারা ও নতুন আবিষ্কারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাই তাঁদের কেউ কেউ যুগোপযোগী শিক্ষার প্রস্তাব করেছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব পাওয়া যায় ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) *New Atlantis*এ। এখানে তিনি হাউস অব স্যালোমোন -এর যে কল্পনা করেছেন তা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্রের ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। হাউস অব স্যালোমোন -এর অধ্যাপকদের নাম দেওয়া হয়েছে ফেলো। রয়েল সোসাইটির উদ্যোক্তারা এই পরিকল্পনা থেকে নিঃসন্দেহে উদ্দীপনা লাভ করেছেন।

সমসাময়িক আরও কতকগুলি পরিকল্পনা মিলিত ভাবে রয়েল সোসাইটির আদর্শকে প্রভাবান্বিত করেছে। তাদের নাম উল্লেখ করবার সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু গ্রেশাম কলেজের কথা একটু বলতে হয়। সার্ টমাস গ্রেশাম বিত্তশালী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেখলেন লণ্ডনে সাধারণ নাগরিকদের লেখাপড়ার সুযোগ নেই, যুগের সঙ্গে তারা তাল রেখে চলতে পারছে না। কেম্ব্রিজে বা অক্সফোর্ডে ক-জন যেতে পারে? গ্রেশাম নিজের বাড়িতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। অধ্যাপক নিযুক্ত হল। অধ্যাপকরা বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতা দেন। লণ্ডনের নাগকিরদের এসব বক্তৃতায় যোগদানের অবাধ অধিকার ছিল। অন্যান্য বিষয় ব্যতীত পদার্থবিদ্যা জ্যামিতি ও জ্যোতিষ (astronomy) এখানে পড়ানো হত। গ্রেশাম কলেজ ১৫৯৮ সালে স্থাপিত হয়। বয়স্ক-শিক্ষা-আন্দোলনের সূত্রপাত এই কলেজই করেছিল।

রয়েল সোসাইটি যদিও গ্রেশাম কলেজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় নি, তথাপি সোসাইটি স্থাপিত হবার

পর থেকে কিছুকাল যাবৎ উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছিল। প্রথম পর্যায়ে গ্রেশাম কলেজের সহযোগিতা না পেলে সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীকে নানা বিষয়ে বিপদে পড়তে হ'ত। গ্রেশাম কলেজের বাড়িতেই সোসাইটির কাজ শুরু হয়। কলেজের অধ্যাপকেরা বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম দিকে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। ১৭১০ সাল পর্যন্ত গ্রেশাম কলেজের বাড়িতেই সোসাইটির যা-কিছু কাজ হয়েছে।

কয়েক বছরের মধ্যে রয়েল সোসাইটির তিন শত বৎসর পূর্ণ হবে। এই তিন শত বৎসরের চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আলোচনা করবার সুযোগ এখানে নেই। সোসাইটি আজ যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত তা অত্যন্ত কঠোর সাধনার দ্বারা অর্জন করতে হয়েছে। এখন রয়েল সোসাইটির সভ্য হবার সুযোগ পাওয়াকে বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ সম্মান বলে মনে করেন। রয়েল সোসাইটির ইতিহাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ইংলণ্ডের তো বটেই, পৃথিবীরও। রয়েল সোসাইটি যদিও প্রধানত ইংলণ্ডের বিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠান, তথাপি অন্যদেশের বিজ্ঞানীরাও সোসাইটির নিকট থেকে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে থাকেন। বিজ্ঞানের নীতিকে ভূগোলের সীমানা দিয়ে বন্দী করা যায় না। তাই দেশের বাহিরেও সোসাইটি বৈজ্ঞানিক অভিযান চালিয়েছে, বিদেশী বিজ্ঞানীদেরও উপযুক্ত মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয় নি।

রয়েল সোসাইটির বর্তমান প্রতিপত্তি দেখে অনুমান করা শক্ত যে, প্রথম দু শ বছর এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। কয়েক বার তো বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। গোড়া থেকেই সোসাইটি গভর্নমেণ্টকে বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে। ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মূলে আছে রয়েল সোসাইটির সক্রিয় সহযোগিতা। তথাপি রয়েল সোসাইটি যে দীর্ঘকাল যাবৎ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে নি তার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম কারণ, অর্থাভাব। দ্বিতীয় চার্লস যদিও সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক হলেন, তথাপি সরকারি সাহায্য পাওয়া যায় নি। সোসাইটির সভ্যদের চাঁদাই ছিল একমাত্র আয়। অথচ অধিকাংশ সদস্যের চাঁদাই বাকি পড়ে থাকত ; বাকি চাঁদা আদায়ের জন্য একবার সোসাইটিকে আদালতের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

আর-একটি কারণ হল একদল লোকের প্রবল বিরোধিতা। জগৎ ও সৃষ্টি সম্বন্ধে চিরাগত বদ্ধমূল মতবাদের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা হত বলে গোঁড়া খ্রীস্টান সম্প্রদায় সোসাইটি ও তার পরিচালকদের নাস্তিক বলে প্রচার করতে লাগল। কিন্তু সোসাইটির বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো অস্ত্র হয়ে দাঁড়াল ব্যঙ্গ নাটক ও কাব্যগুলি। স্যামুয়েল বাটলার (১৬১২-৮০) সোসাইটির কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি মারাত্মক ব্যঙ্গকাব্য *Elephant in the Moon* লিখলেন। তাঁর আর-একটি ব্যঙ্গ কবিতা হল : *On the Royal Society*। যদিও কবিতা দুটি ছাপা হয়েছিল অনেকদিন পরে, তথাপি তখনকার রীতি অনুসারে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে সমালোচকদের যথেষ্ট আনন্দের খোরাক জুগিয়েছিল।

এর পরে টমাস শ্যাড্‌ওয়েল (আনুমানিক ১৬৪২-৯২) *The Virtuoso* নামে একটি ব্যঙ্গনাটক রচনা করে প্রকাশ করলেন ১৬৭২ সালে। ঐ বছরই লণ্ডন শহরে সাফল্যের সহিত এই নাটক অভিনীত হয়। নাটকের নায়ক স্যর নিকলাস গিমক্র্যাক রয়েল সোসাইটির সভ্যদের প্রতিনিধি। এই ব্যঙ্গ চরিত্রটি ইংরেজী সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। চৌদ্দ বছর পরে লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে *The Emperor in the*

Moon নামে আর একটি ব্যঙ্গনাটকের অভিনয় হয়, এই নাটকেরও আক্রমণের লক্ষ্য রয়েল সোসাইটি; নাটকের লেখিকা মিসেস আফ্রা বেন (১৬৪০-৮৯)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সোসাইটির বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণ শুরু হয়। অ্যাডিসন (১৬৭২-১৭১৯) স্পেক্টেটর ও ট্যাটলার কাগজে পর পর কিছুদিন তীব্র আক্রমণ চালালেন। সুইফ্‌ট (১৬৬৭-১৭৪৫) তাঁর 'গালিভার্স ট্র্যাভেলস'এর লাপুটা-অভিযান অধ্যায়ে রয়েল সোসাইটির ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন।

সমকালীন খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা যে রয়েল সোসাইটির কার্যকলাপ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না এ থেকেই সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলি একেবারে অকারণ ছিল না। সোসাইটির ইতিহাসকে মোটামুটি দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়: প্রথম পর্যায়ের প্রায় দেড় শ বছর বিজ্ঞানসাধনায় সোসাইটির যথেষ্ট দান থাকা সত্ত্বেও এর পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিকদের হাতে ছিল না। সোসাইটির অধিকাংশ সদস্যই প্রকৃত বিজ্ঞানসাধক ছিলেন না এবং কার্যকরী সমিতিতেও বিজ্ঞানীরা প্রাধান্য লাভ করেন নি। আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭), সার্ হামফ্রি ডেভি (১৭৭৮-১৮২৯) প্রভৃতি দু-চার জন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ব্যতীত এই দীর্ঘকাল যাবৎ যাঁরা সোসাইটির সভাপতি হয়েছেন তাঁরা প্রতিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিক নন। রাজকীয় সনদপ্রাপ্ত সোসাইটির সভ্য হওয়াকে অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা সম্মানজনক বলে মনে করত। তাই নির্দিষ্ট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশই এই শ্রেণীর লোকেরা অধিকার করে ছিল।

গোড়ার দিকে সোসাইটির সভ্য হবার জন্য আগ্রহের আর-একটি কারণ ছিল। পৃথিবীর সকল দেশ থেকে সংগৃহীত বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার সোসাইটির মিউজিয়মে রাখা হত। সাধারণ লোকের নিকট এদের আকর্ষণ কম ছিল না। এ ছাড়া নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি অভিজাত সম্প্রদায়ের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করত। এই আকর্ষণ অনেকটা ম্যাজিকের প্রতি মোহের মত; সত্যকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার অভাব ছিল। অনেক চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকে জাদুবিদ্যা বলেই দেখা হত। গোড়ার দিকে অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে আলোচনা হলেও বিজ্ঞানসাধনার ঐকান্তিকতা আসতে বিলম্ব হয়েছে। সুতরাং অভিজাত সম্প্রদায়ের 'শখের বৈজ্ঞানিকরা' ব্যঙ্গাত্মক রচনার আক্রমণের পাত্র হয়েছিল।

রয়েল সোসাইটির ইতিহাসে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৮২০ সালে। খনিতে ব্যবহারের উপযোগী নিরাপদ প্রদীপের আবিষ্কর্তা সার্ হামফ্রি ডেভি সোসাইটির সভাপতি হবার পর থেকে বৈজ্ঞানিকদের সোসাইটি-পরিচালনার ব্যাপারে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৮২০ সালে সোসাইটির কার্যকরী সমিতিতে সর্বপ্রথম প্রকৃত বৈজ্ঞানিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ আছে।

রয়েল সোসাইটির সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। ১৮২০ সালে সংস্কার শুরু হলেও চল্লিশ বছর পরে দেখা যায় যে, মোট ৬৩০ জন ফেলোর মধ্যে ৩৩০ জন মাত্র বৈজ্ঞানিক। আবার এই বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অধিকাংশই চিকিৎসক। ১৯৪০ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, চিকিৎসকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দূর হয়ে পদার্থবিদ্ ও রসায়নবিদ্‌দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে বছর ডাক্তার পদার্থবিদ্ ও রসায়নবিদ্‌দের সংখ্যা যথাক্রমে ছিল ২৮, ৮৬ ও ৭৯। বর্তমানে সোসাইটির ফেলোর সংখ্যা সাধারণত ৫৬৮ জনের বেশি হয় না। বছরে ২৫ জনের অধিক নতুন ফেলো নেবার নিয়ম নেই। নির্বাচনে কঠোরতা অবলম্বন করায় এখন শুধু প্রতিষ্ঠাপন্ন বৈজ্ঞানিকরাই ফেলো হতে পারেন। বয়সের দিক থেকেও একটা

নিয়ম পালন করা হয়। পূর্বে অনেক তরুণও ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু এখন যাঁরা নির্বাচিত হন তাঁদের গড় বয়স সাতচল্লিশের কম নয়। অর্থাৎ, সোসাইটি নির্বাচনের পূর্বেই যাচাই করবার সুযোগ পায় মনোনীত ফেলো তাঁর নিজের ক্ষেত্রে কি কাজ করেছেন। ১৮৭৪ সাল থেকে লর্ডদের রয়েল সোসাইটির ফেলো হবার বিশেষ সুবিধা বাতিল করে দেওয়া হয়। সদস্য-নির্বাচনে এইসব বিধিনিষেধ আরোপ করবার ফলে সোসাইটি এবং ফেলোশিপের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখন অনেক মহিলাও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। সোসাইটি মহিলাদের ফেলো হিসাবে নির্বাচন করতে বহুদিন যাবৎ দ্বিধাবোধ করেছে। ১৯৪৫ সালে সর্বপ্রথম দু-জন ইংরেজ মহিলা বিজ্ঞানীকে ফেলো নির্বাচন করে নতুন ধারার প্রবর্তন করা হয়। যদিও এঁরা গুণের দিক থেকে কোনো অংশে ন্যূন ছিলেন না তথাপি সোসাইটির শতকরা দশ জন ফেলো একমাত্র মহিলা বলেই এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানীরাও যে কত গোঁড়া হতে পারেন এটা তারই প্রমাণ।

পূর্বেই বলেছি, রয়েল সোসাইটির বিজ্ঞানচর্চা ইংলণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অন্য দেশের বিজ্ঞানী ও তাঁদের সাধনার সঙ্গে সোসাইটি যোগাযোগ রক্ষা করতে উৎসুক। এই প্রয়োজনে বিদেশী বিজ্ঞানীদের ফেলো নির্বাচন করা আরম্ভ হয়। প্রথম বিদেশী ফেলো একজন আমেরিকান, তিনি সোসাইটির সঙ্গে গোড়া থেকেই যুক্ত ছিলেন। বিদেশী ফেলোদের সংখ্যা এখন মোট ষাট জন। এক বছরে চার জনের বেশি বিদেশী বিজ্ঞানীকে ফেলো নির্বাচিত করা হয় না। এ বছর চার জনের মধ্যে দু-জন বাঙালি বৈজ্ঞানিক নির্বাচিত হয়েছেন, এটা আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা।

ইংরেজ আমলে ভারত-সরকার বিজ্ঞান-বিষয়ে রয়েল সোসাইটির নিকট পরামর্শ চাইতেন। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গবেষণায় এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে রয়েল সোসাইটির সাহায্য পাওয়া গেছে। সুতরাং সোসাইটির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ দীর্ঘকালের। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ডক্টর শিশিরকুমার মিত্রের পূর্বে যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচন করে সম্মানিত করা হয়েছে তাঁদের নাম দেওয়া হল—

নাম	কোন বছর নির্বাচিত হয়েছেন
এ. কারসেৎজি, ১৮০৮-৭৭	১৮৪১
শ্রীনিবাস রামানুজম্, ১৮৮৭-১৯২০	১৯১৮
জগদীশচন্দ্র বসু, ১৮৫৮-১৯৩৭	১৯২০
শ্রীচন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ, ১৮৮৮-	১৯৩০
মেঘনাদ সাহা, ১৮৯৩-১৯৫৬	১৯৩১
বীরবল সাহানী, ১৮৯১-১৯৪৭	১৯৩৬
শ্রী কে. এস. কৃষ্ণান, ১৮৯৮-	১৯৪০
শ্রী হোমি জে. ভাবা, ১৯০৯-	১৯৪১
শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, ১৮৯৫-১৯৫৫	১৯৪৩
শ্রী এস. চন্দ্রশেখর, ১৯০৫-	১৯৪৪
শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ১৮৯৩-	১৯৪৫
শ্রী ডি. এন. ওয়াদিয়া, ১৮৮৩-	১৯৫৭

১৭৮০ সাল থেকে সোসাইটি গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে বিনা ভাড়ায় বাড়ি পেয়ে আসছে। এখন সোসাইটির দপ্তর লণ্ডনের পিকাডিলি অঞ্চলে বার্লিংটন হাউসে অবস্থিত। ১৮৫০ সালে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সোসাইটিকে এক হাজার পাউণ্ড দেওয়া হয়। বর্তমানে এই খাতে সরকারি সাহায্যের পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ টাকা। এ ছাড়া বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পুথিপত্র প্রকাশের জন্য ১৯২৫ সাল থেকে সোসাইটি বার্ষিক প্রায় তেত্রিশ হাজার টাকা সরকারি সাহায্য পেয়ে আসছে।

সরকারি সাহায্য ও সভ্যদের চাঁদা সোসাইটির মোট আয়ের একটি অংশমাত্র। ১৮৫৯ সালে কয়েকজন সভ্যের উৎসাহে কতকগুলি বিশেষ কাজের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা আরম্ভ হয়। ১৯৪০ সালে বিশেষ অর্থখাতে মিলিতভাবে পনেরো লক্ষ টাকারও বেশি ছিল। ১৯৩৯ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, সোসাইটির 'জেনারেল পার্‌পাস্‌ ফাণ্ডে' মজুত অর্থের পরিমাণ ষোল লক্ষ টাকারও অধিক। সাতাশটি রিসার্চ ফণ্ডের মোট অর্থের পরিমাণ ঐ বছর ছিল প্রায় চুয়াত্তর লক্ষ টাকা। কয়েকটি খাতের পুরনো হিসাব যা পাওয়া গেছে এখানে তা দেওয়া হল। এ থেকে সোসাইটির আর্থিক সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে। আরো অনেক ফণ্ড মেডেল ও পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দানে গত এক শতাব্দী যাবৎ সোসাইটির অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। অর্থের অভাবে সোসাইটির উদ্দেশ্যসাধনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবার আশঙ্কা আর নেই।

রয়েল সোসাইটির একমাত্র উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন করা। দর্শন সাহিত্য ইতিহাস সমাজবিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের শাখা সোসাইটির আওতার মধ্যে পড়ে না। সোসাইটি বিভিন্ন উপায়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাধারণভাবে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য কাজ করে। প্রথম প্রথম সোসাইটির ল্যাবরেটরিতে নানা পরীক্ষা চলত। বয়েলের (১৬২৭-৯১) বাতাসের চাপ সম্বন্ধে পরীক্ষা, ক্রিস্টোফার রেনের (১৬৩২-১৭২৩) পশুর দেহে ইন্‌জেকশনের পরীক্ষা প্রভৃতি সোসাইটির বাড়িতেই হয়েছে। এখন সাধারণত হাতে-কলমে পরীক্ষার ব্যবস্থা সোসাইটির নেই। তবে বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি তাঁর উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রদর্শনের সুযোগ পান। জগদীশচন্দ্র বসু, মার্কনি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরা বার্লিংটন হাউসের বক্তৃতামঞ্চে তাঁদের আবিষ্কার দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন।

সরকার বা অন্য-কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে রয়েল সোসাইটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। গ্রীনউইচের রয়েল অবজারভেটরির পুনর্গঠন ১৭১০ সালে সোসাইটির নির্দেশ অনুসারে হয়। জুলিয়ান পঞ্জিকা থেকে ইংলণ্ডে বর্তমানে প্রচলিত জর্জিয়ান পঞ্জিকায় পরিবর্তনও রয়েল সোসাইটির সাহায্যে করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন কুকের কুমেরু-অভিযানের দায়িত্বও ছিল রয়েল সোসাইটির। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, গত প্রায় তিন শ বছর যাবৎ ইংলণ্ডে যত বৃহৎ বৈজ্ঞানিক অভিযান, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও আবিষ্কার হয়েছে তার মূলে ছিল রয়েল সোসাইটির সহযোগিতা।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তাদের সংগঠন ও উন্নয়নের দায়িত্ব প্রধানত রয়েল সোসাইটির। রয়েল সোসাইটি প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডে সকল প্রকার বিজ্ঞানচর্চার মস্তিষ্ক স্বরূপ।

বিশেষ বিশেষ গবেষণার জন্য রয়েল সোসাইটি নিয়মিতভাবে বৃত্তির ব্যবস্থা করে। রয়েল সোসাইটির সহায়তার ফলে যেসব গবেষণার প্রকৃতই মূল্য আছে অর্থের অভাবে তার কাজ কখনো বাধা পায় না। গবেষক ব্যক্তিগত ব্যয়নির্বাহের জন্য এবং যন্ত্রপাতি-সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃত্তি পান। প্রতি বৎসর

খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের সম্মানবৃত্তি দিয়ে বক্তৃতা করবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। এ ছাড়া সোসাইটি বহু মূল্যবান পদক ও পুরস্কার দিয়ে বিজ্ঞানসাধনায় উৎসাহ দেয়।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তথ্যগুলি প্রচার করবার দায়িত্বও রয়েল সোসাইটি গ্রহণ করেছে। পূর্বে সোসাইটির পক্ষ থেকে বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করা হত। সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নিউটনের *Principia* (১৬৮৭)। বর্তমানে সোসাইটি ঐ ধরনের বই প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে না। সোসাইটির দুটি সাময়িকী এখন বিশ্ববিখ্যাত। একটি হল Philosophical Transactions of the Royal Society, অপরটি Proceedings of the Royal Society। প্রাচীনত্বের দিক থেকে 'ট্র্যানজাকশান' পৃথিবীর বিজ্ঞান-সাময়িকীগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৬৬৫ সালের মার্চ মাসে এর প্রথম সংখ্যা বের হয়। সোসাইটির তদানীন্তন সম্পাদক নিজের দায়িত্বে এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন; সোসাইটির সঙ্গে তখন পত্রিকার সরাসরি কোনো যোগ ছিল না। সম্পাদককে প্রতিদিন বিজ্ঞান-বিষয়ক এত চিঠির জবাব দিতে হত যে, তিনি ভাবলেন পৃথক ভাবে চিঠির জবাব না দিয়ে পত্রিকায় প্রশ্নের আলোচনা করলে তাঁর পরিশ্রম লাঘব হবে। পরে সোসাইটি TRANSACTION পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে PROCEEDINGS প্রকাশ শুরু হয়। যোগ্য বিবেচিত হলে যাঁরা ফেলো নন তাঁদের প্রবন্ধও ছাপানো হতে পারে। এ ছাড়া Notes and Records of the Royal Society বছরে সাধারণতঃ দুবার বের হয়। বছরে একবার বের হয়: Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society এবং Year Book of the Royal Society।

গোড়ার দিকে রয়েল সোসাইটি যেসব নমুনা সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছিল তার পরিমাণ ক্রমশ এত বৃহৎ হয়ে দাঁড়াল যে, রাখবার অসুবিধার জন্য নমুনাগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়মে দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পুথিপত্রের সংগ্রহ অব্যাহত ভাবে চলে আসছে। বর্তমানে সোসাইটির গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। সোসাইটির সভ্য এবং সভ্যদের সুপারিশ নিয়ে যে-কোনো গবেষক এই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

সোসাইটি প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে কেউ কেউ এর নাম দিয়েছিলেন invisible college বা 'অদৃশ্য শিক্ষালয়'। এই নামকরণের যুক্তি ছিল এই যে, সোসাইটির নিজস্ব পরীক্ষাগারে গবেষণার সুযোগ নেই। নিয়মিত কোনো বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় না; তথাপি অন্য উপায়ে সোসাইটি বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়, এবং বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য কাজ করে। আজও সোসাইটি সম্বন্ধে এ কথা ঠিক তেমনি প্রযোজ্য। রয়েল সোসাইটি প্রত্যক্ষরূপে বিজ্ঞানের সাধনা করে না। কিন্তু সোসাইটি সেরা বিজ্ঞানীদের মিলনকেন্দ্র: এঁরা বিজ্ঞানচর্চার পথ সুগম করবার জন্য নীতি নির্ধারণ করেন, বিজ্ঞানচর্চার জন্য বরাদ্দ অর্থের এক বৃহৎ অংশ এঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন। অপ্রত্যক্ষ হলেও ইংলণ্ডের বিজ্ঞানজগতে রয়েল সোসাইটির প্রভাব অপ্রতিহত।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পী উইলিয়ম ব্লেক

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেসব কারিগর লণ্ডন শহরে এনগ্রেভিঙের কাজ করে জীবিকা অর্জন করতেন কবি উইলিয়ম ব্লেক তাঁদের অন্যতম। উইলিয়ম ব্লেকের শিল্পীজীবন তাৎকালিক পেশাদার কারিগরদের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত।

ব্লেকের জীবনকালে ইংলণ্ডের এনগ্রেভিঙ-শিল্পের পরম্পরা যে নানাভাবে সার্থক পরিণতি লাভ করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর শিল্পীদের সামনে যে চাহিদা ছিল তা অনেকটা কমার্শিয়াল। পুস্তক-প্রকাশক, ক্যালিকো-প্রিণ্টার— প্রধানত এই দুই শ্রেণীর ব্যবসায়ী এই জাতীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আঙ্গিকের যান্ত্রিক দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা না থাকলে এই সময়ে পেশাদার এনগ্রেভার হিসাবে কেউই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন না। কাজেই পেশাদার শিল্পী হিসেবে ব্লেক যে লণ্ডন শহরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, এই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট প্রমাণ করে যে তিনি দক্ষ কারিগর ছিলেন। কারিগরির ক্ষেত্রে নূতন দিক উদ্ভাবন ক'রে এই শিল্পকে রূপ দিতে তিনি কিছুটা সমর্থও হয়েছিলেন। কিন্তু, তাঁর দক্ষতা ও শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শ কিছুটা ভিন্ন ছিল বলেই তিনি জনপ্রিয় হতে পারেন নি। সমসাময়িক এনগ্রেভারদের সম্বন্ধে তাঁর উক্তি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, তাঁর রুচি সমকালীনদের থেকে কতটা পৃথক ছিল।

ব্লেকের প্রতিভার মর্যাদা দিতে সক্ষম এমন দু-চার জন বন্ধুর অভাব না হলেও সাধারণভাবে তাঁর শিল্পপ্রতিভা সম্বন্ধে সমসাময়িক কাল যথেষ্ট সচেতন ছিল মনে হয় না। জীবিতকালে ব্লেক কি পরিমাণে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন সে সম্বন্ধে বা তাঁর সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করবার পক্ষে বন্ধুকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশই যথেষ্ট—

Arrived safe in London, my wife in very poor health, still I resolve not to lose hope of seeing better days. Art in London flourishes. Engravers in particular are wanted. Every engraver turns away work that he cannot execute from his superabundant employment. Yet no one brings work to me. I am content that it shall be so as long as God pleases. I know that many workers of a lucrative nature are in want of hands; other engravers are courted. I suppose that I must go a courting, which I shall do awkardly; in the meantime I lose no moment to complete Romney to satisfaction.

How is it possible that a Man almost fifty years of Age, who has not lost any of his life since he was five years old without incessant labour and study, how is it possible that such a one with ordinary common sense can be inferior to a boy of twenty, who scarcely has taken or deigns to take pencil in hand, but who rides about the Parks or Saunters about the Playhouses, who Eats and drinks for business not for need, how is it possible that such a fap can be superior to the studious lover of Art can scarcely be imagin'd.

এই মানসিক অবস্থার মধ্যেও ব্লেকের উৎসাহ-উদ্দীপনা একেবারে নিষ্প্রভ হয় নি। তাই তিনি বলতে পেরেছেন—

Yet I laugh and sing, for if on Earth neglected, I am in Heaven a Prince among Princes.

কিন্তু এই উৎসাহ চিঠির শেষাংশে নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে—

Some say that Happiness is not Good for Mortals and they ought to be answer'd that sorrow is not fit for Immortals and is utterly useless to any one; . .

To William Hayley, London, 7 October, 1803.

ব্লেকের সাংসারিক অসচ্ছলতা বেড়েছে বই কমে নি। জীবনের শেষ সীমায় ব্লেক বন্ধুদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্পর্শকাতর স্বাধীনচেতা অক্লান্তকর্মী ব্লেকের পক্ষে এই অর্থসাহায্য-গ্রহণ বিশেষ আনন্দদায়ক হয় নি এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ব্লেকের সাংসারিক জীবন বা সাধারণভাবে তাঁর জীবনের ইতিহাস এ ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয় নয়। তাঁর ছবির মতই তাঁর জীবন গাঢ় অন্ধকার ও উজ্জ্বল আলোকের সমাবেশ, এইটুকু মনে রাখলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর এই জীবন তাঁর শিল্পের ক্ষেত্রে বারংবার যে প্রতিফলিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু, তার চেয়েও সত্য ব্লেকের প্রতিভা ও তার প্রেরণার অপ্রতিহত গতি। এই প্রেরণার ক্রিয়া অনুসরণ করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। প্রথমেই ব্লেকের শিল্পের আঙ্গিক তথা ভাষা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার।

সমসাময়িক পরম্পরার সঙ্গে তুলনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, উইলিয়ম ব্লেকের আঙ্গিক সরল এবং তার আদর্শ গঠনধর্মী। ব্লেকের এনগ্রেভিঙে দৈবাৎ যান্ত্রিক কৌশলের অতিপ্রয়োগ দেখা যায়। এদিক দিয়ে ব্লেক তাঁর সহকর্মীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্লেকের এনগ্রেভিঙ-লাইনে যে রেখার বুনোট (texture) আছে, সে ক্ষেত্রে স্বভাবের অনুকরণ-চেষ্টা নেই।

ধাতুফলকের কঠিনতা এই রেখার বুনোট তৈরি করে আরো স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে বলা চলে।

এনগ্রেভিঙের ভাষা আলো-আঁধারের ভাষা। এই সীমাবদ্ধ আঙ্গিক এনগ্রেভিঙ-শিল্পে যেমন নির্দিষ্টতা এনেছে তেমনি এনগ্রেভিঙ-শিল্পের বৈশিষ্ট্য এনেছে। এনগ্রেভিঙের এই স্বভাব ব্লেকের হাতে সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে বলা চলে। ব্লেকের এই আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য সমসাময়িক পৃষ্ঠপোষকদের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট না হলেও আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য তাঁর হাতে কতটা সার্থক হয়েছিল তা রাস্কিনের একটি উক্তি থেকে সহজেই বোঝা যাবে। রাস্কিন বলেছেন—

In expressing conditions of glaring and flickering light, Blake is greater than Rembrandt. —*The Engravings of William Blake*, p. 49

রাস্কিনের এ উক্তি যদিও ব্লেকের পরিণতকালের শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে, তবুও এই উক্তি সাধারণভাবে আঙ্গিকের বিশেষত্বের প্রকাশ করে। ব্লেকের আলোছায়া তথা কালো ও সাদার বিন্যাস সত্যই অপূর্ব। পাথরের মতন এই কালো-সাদার কঠিনতা। মনে হয়, যেন ছবির এক-একটি অংশ গাঢ় ও উজ্জ্বল আলোর সমাবেশ। এদিক দিয়ে জর্মান এনগ্রেভার ডুরারের সঙ্গে ব্লেকের তুলনা অসংগত নয়। পার্থক্য এই যে, ডুরারের এনগ্রেভিঙে যে আলো-আঁধার তা সকাল-সন্ধ্যার মৃদু আলো, আর ব্লেকের এনগ্রেভিঙে প্রতিফলিত হয়েছে দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল উত্তপ্ত আলো।

কেবলমাত্র আঙ্গিকের নিপুণতা শিল্পীকে বড় করে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। ভাষাসৃষ্টির দক্ষতায় তার মূল্য যতই থাক্ শিল্প বিচারে সেই শেষ কথা নয়। তাই ব্লেক সত্যই রূপস্রষ্টা কি না জানতে হলে তাঁর শিল্পরচনা নানা দিক দিয়ে দেখা দরকার। ব্লেকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, তিনি বস্তুরূপ যথাযথ অঙ্কনে নিপুণ ছিলেন না। মাইকেলেঞ্জেলোর, রুবেন্স, এবং নানারকম ভালোমন্দ ছবি বা এনগ্রেভিঙ এমন-কি কপিবুক থেকে ব্লেক মানুষ বা জীবজন্তুর আকার অনুসরণ করে ব্যবহার করতেন। ব্লেকের জীবনে মাইকেলেঞ্জেলোর প্রভাব ক্ষতিকর হয়েছে এ কথা প্রায়ই শোনা যায়। ব্লেকের প্রেরণার গতি ও মাইকেলেঞ্জেলোর প্রতিভা যে সম্পূর্ণ বিপরীত এ কথাও ঠিক। কেবল মাইকেলেঞ্জেলো নয়, রেনেসাঁ-পরবর্তী ইউরোপীয় শিল্পপরম্পরা বা বহু শিল্পীর সঙ্গে তুলনায় ব্লেকের প্রকৃতি স্বতন্ত্র।

উইলিয়ম ব্লেকের শিল্পসৃষ্টিতে ক্ষণে ক্ষণে দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। এই দ্বন্দ্ব আঙ্গিকের দুর্বলতাজনিত নয় বলেই আমরা মনে করি। শিল্পের ভাষা তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তে ছিল এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝবার অনেক ইঙ্গিত তাঁর রচনায় চিঠিপত্রে এবং সর্বোপরি তাঁর সৃষ্টিতে তিনি রেখে গেছেন। মনে হয় ব্লেকের শিল্পী-জীবনের এই দ্বন্দ্ব বাস্তব ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে এসেছিল। ব্লেকের জীবনদর্শনের একটি ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে—

> The desire of Man being Infinite, the possession is Infinite and himself Infinite.
>
> He who sees the Infinite in all things, sees God. He who sees the Ratio only, sees himself only. . .
>
> —*Poetry and Prose of William Blake* edited by Geoffrey Keynes, 1948.

অর্থাৎ ব্লেক জীবনের ছোট-বড় সমগ্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ব্যাপকতর উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করেছেন। চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন তেমনি শিল্পসৃষ্টিতেও সমগ্রতার রূপ দেবার চেষ্টা বা সাধনা ব্লেক যে করেছিলেন সে কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করব। আপাতত এই বলে রাখা প্রয়োজন যে, সমগ্রতার উপলব্ধি সম্বন্ধে ব্লেকের যে প্রয়াস তার সঙ্গেই তুলনা করা চলে এমন-কোনো শিল্পসৃষ্টি যা রেনেসাঁ-পরবর্তী যুগে দৈবাৎ সম্ভব হয়েছে। ব্লেকের মনের প্রতিফলন কিঞ্চিৎ হয়তো তিনি পেয়েছিলেন মাইকেলেঞ্জেলোর বিপুল সৃষ্টিক্ষমতায় অথবা গথিক-স্থাপত্যের বিরাট গঠনের মধ্যে। দান্তের ব্যাপক কল্পনাশক্তির কাছেও হয়তো তিনি ঋণী থাকতে পারেন। শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যেটুকু ব্লেক পেয়েছিলেন তা তাঁর প্রেরণার সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল না। কেন তিনি স্বদেশে প্রচলিত অনুক্রম অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন নি সে সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব স্পষ্ট ধারণায় উপনীত হবার চেষ্টা করব।

ব্লেকের শিল্পসৃষ্টি দু ভাগে বিভক্ত করা চলে, এনগ্রেভিঙ ও ড্রয়িঙ।

এই দুই ভিন্নশ্রেণীর শিল্পের পৃথক আলোচনা এবং শিল্পীর বর্ণপ্রয়োগ-রীতি, আদর্শ অথবা আঙ্গিকের বিস্তারিত উদ্ঘাটন এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সামগ্রিক বিশেষত্ব সংক্ষেপে দেখানো যেতে পারে।

ব্লেকের ছবি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পর্দার মত স্তরে স্তরে সাজানো। ছবির ভূমি (plans) কতকগুলি জ্যামিতিক আকারে বিভক্ত এবং এই ভাগগুলিকে আশ্রয় ক'রে বস্তু নির্দিষ্ট আকার পেয়েছে। ছবিতে কেন্দ্র বলতে বিশেষ কোনো একটা অংশকে ধরা হয় নি। উপরে নীচে এবং পাশাপাশি এই কয় স্তরের মধ্যে

অসংখ্য বস্তুর সমাবেশ। ছবিতে বস্তুর সমাবেশ বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে করা হয় নি। মনে রাখা দরকার, ব্লেকের ছবি বাস্তবের অনুকৃতি বা প্রতিধ্বনি নয়।

নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্লেকের রচিত জগৎ শিল্পের জগতে জীবন্ত। ছবির উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য তাঁর এনগ্রেভিঙ বা ওয়াটার-কালার ড্রয়িং উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উপরোক্ত বিশেষত্ব আছে ব'লেই ব্লেকের ছবিমাত্রেই মণ্ডনধর্মী। ব্লেকের ছবিতে এই বৈশিষ্ট্য তথা মণ্ডনরীতি একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব বলা চলে। কারণ, এদিক দিয়ে কোনো পারম্পর্যবাহিত আদর্শ তিনি গ্রহণ করেন নি।

তাঁর মণ্ডনের আদর্শ উল্লেখযোগ্য—

No one ever can design till he has learned the language of art by making many finished copies both of nature and of art, and of whatever comes in his way from earliest childhood.

ইতিপূর্বে ব্লেকের জীবনদর্শনের উল্লেখ করেছি। তারই পাশে তাঁর শিল্পদর্শনে এই সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তুলনা ক'রে বলা যেতে পারে যে, শিল্পী ব্লেক বাস্তবজগতের আলোড়ন অথবা বিশ্লেষণধর্মী অভিজ্ঞতা অপেক্ষা জগতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটি অখণ্ড ছন্দের উপলব্ধি করার প্রয়াস করেছেন। ব্লেকের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে এই উপলব্ধি বারংবার লক্ষ্য করা যাবে। তাই দেখা যায়, ব্লেকের ছবিতে মানুষ ও প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে। মেঘের গতিবেগ, স্তরে স্তরে সাজানো ঊর্ধ্বমুখী পর্বতশ্রেণী, শাখাপ্রশাখা, বিস্তৃত বৃক্ষশ্রেণী, জলের বিচিত্র গতি— এই আবেষ্টনের মধ্যে ব্লেকের রচিত নরনারী পশুপাখি কীটপতঙ্গ বিরাজিত। ব্লেকের ছবিতে মানুষ প্রকৃতিকে অস্বীকার ক'রে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখবার চেষ্টা করে না, বরং আকাশে জলে গাছে পাহাড়ে যে প্রাণের স্পন্দন তারই প্রতিধ্বনিরূপে মানুষের স্থান ব্লেকের শিল্পসৃষ্টিতে।

ব্লেকের শিল্পরচনায় সত্যই একটি অলৌকিক অথচ প্রত্যক্ষবৎ জগতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শিল্পরূপের এই বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ প্রাচ্য শিল্পধারায় পাওয়া গেলেও রেনেসাঁ-উত্তর শিল্পের ইতিহাসে এই আদর্শ বিরল।

ব্লেকের ছবির মধ্যে সর্বত্র একটি ধ্যানময়রূপ আছে। ব্লেকের ছবি আমাদের মনে ততটা উত্তেজনার সৃষ্টি করে না যতটা মনকে একটি কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যায়। তিনি সমকালীন ঘটনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সংসারের ন্যায়-অন্যায় তাঁকে গভীর পীড়া দিয়েছে। এ বিষয়ে তিনি চিন্তাও করেছেন। তাঁর এইসব চিন্তা তাঁর সৃষ্টিতে এক রকমের উত্তেজনা এবং সমস্যার ভাব এনেছে বলে চিত্রের ধ্যানময়তার সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে সার্থক মিলন ঘটেছে বলা চলে না। অনেক ক্ষেত্রে এর ফলে ছবির ভাবপ্রকাশ সুষ্ঠু হয় নি। অনেক রকম ধাতু একসঙ্গে গলিয়ে কারিগর যেমন নূতন ধাতু সৃষ্টি করেন, শিল্পী ব্লেক তেমনি তাঁর জীবনের স্থায়ী এবং সাময়িক অভিজ্ঞতা একত্র করে একটি শিল্পরূপ সৃষ্টি করেলেন। তাঁর এই অতুলনীয় প্রকাশ কোথাও কোথাও ব্যর্থ হয়েছে এ কথা যদি আমরা স্বীকার করেও নি তবু বলতে হবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাসে ব্লেক অতুলনীয়।

ইংলণ্ডের শিল্পাদর্শ যখন বিশেষভাবে বাস্তবমুখী, যে সময়ে গ্রীকশিল্পের আদর্শ বিলেতের শিল্পী ও শিল্পরসিকদের কাছে একমাত্র এবং অদ্বিতীয় বলে স্বীকৃত হতে চলেছে, যে সময়ে নবপ্রতিষ্ঠিত রয়াল অ্যাকাডেমি সমসাময়িক শিল্পের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করতে উদ্যত সেই মুহূর্তে ব্লেক শিল্পীহিসাবে আত্মপ্রকাশ

করেছিলেন। ব্লেকের অন্তর্মুখী প্রেরণার (subjective) বহিঃপ্রকাশরূপে তিনি যে নিজস্ব শিল্পসৃষ্টি করতে প্রয়াস করেছিলেন এই দুই দিকের আদর্শ সে সময়ের শিল্পী বা রসিকমহলে বিশেষ করে তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের কাছে যদি অক্ষম সৃষ্টি বলে মনে হয়ে থাকে, তবে বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই।

আজকের দিনে ইউরোপীয় শিল্পী ও শিল্পরসিক গ্রীক্ আদর্শকে একমাত্র আদর্শ বলে মনে করেন না। প্রাচ্য শিল্প-সংস্কৃতির আদর্শ ইউরোপীয় রসিকসমাজে পরিচিত। প্রাচ্য শিল্পের প্রভাব যেমন আঙ্গিকের দিক দিয়ে তেমন আদর্শের দিক দিয়ে আজকের দিনে ইউরোপীয় শিল্পকে যে প্রভাবান্বিত করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রাচ্য-শিল্পকে চেনবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় রসিকসমাজকে ভিন্ন ভিন্ন পথে রসসৌন্দর্য উপলব্ধি করার সুযোগ দিয়েছে। এই নূতন পরিস্থিতিতে ব্লেকের শিল্পসৃষ্টির আর-একবার বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। তাই আমরা শুনতে পাই—

William Blake's painting has the colour, the imaginative case, and a hint of the surface tension of Matisse.

—*William Blake* by J. Bronowski.

তাঁর শিল্পসৃষ্টি বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার্য নয় সে ক্ষেত্রে প্রকৃতির ধ্যানময় রূপ যে প্রকাশ পেয়েছে সে কথাও আজ স্বীকৃত। অর্থাৎ ব্লেকের শিল্প-প্রেরণার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে ইউরোপের রসিক যথেষ্ট ও যথার্থ মূল্য দিতে পারছেন। তবু নিঃসন্দেহ বা অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্লেককে সার্থক শিল্পীর আসন দিতে আজও দ্বিধা দেখা যায়। সম্ভবত, প্রাচ্য শিল্পী ও শিল্পরসিকেরা ব্লেককে অপেক্ষাকৃত সহজে স্বীকার করে নিতে পারবেন। কিন্তু এদিক দিয়েও সম্পূর্ণ স্বীকৃতি পেতে কিছুটা বাধা আছে।

প্রাচ্যশিল্পের বাহন মণ্ডনধর্মী ভাষার নৈপুণ্য এবং পরম্পরাগত সংস্কারের তুলনায় ব্লেকের আঙ্গিকের নিপুণতা সম্বন্ধে সন্দেহ হতে পারে। অর্থাৎ কোনো পূর্বপ্রদত্ত ধারাবাহিকতার সঙ্গে তাঁকে খাপ খাওয়ানো যাবে না। কারণ তিনি নূতন পরম্পরার পথপ্রদর্শক। ব্লেক যেভাবে তাঁর প্রেরণার উপযোগী করে শিল্পসৃষ্টি করেছেন তা ভালো করে লক্ষ্য করলে রসজ্ঞ মাত্রেই বুঝতে পারবেন ব্লেকের প্রতিভার অসাধারণত্ব। ব্লেক অতীতের অনুক্রমিক প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই ব্লেকের রচনায় ত্রুটিবিচ্যুতির অভাব নেই, কিন্তু নূতন সম্ভাবনা ব্লেকের প্রতিভার ফলে যতটা সার্থক হয়েছে তেমন দৃষ্টান্ত আধুনিক শিল্পীর ইতিহাসে অল্প।

আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে ব্যবধান কমে এসেছে। এই দুই শিল্পলোকের যোগাযোগের মধ্য দিয়ে শিল্পের নূতন রূপ দেখা দেবে এমন কল্পনা করা যেতে পারে। এই ভবিষ্যতের পথ যাঁরা সুগম করেছেন তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই উইলিয়ম ব্লেক একজন। এদিক দিয়ে তাঁর দূরদর্শী প্রতিভা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবধানকে অনেক পরিমাণে দূর করেছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শিল্পদৃষ্টি যত ঘনিষ্ঠ হবে ব্লেকের প্রতিভা রসিকসমাজে তত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এ আশা দুরাশা নয়।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

ব্লেকের স্বভাব ও কবিস্বভাব

যীশু হাত বাড়িয়ে বললেন: 'তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে ঐ গর্তের মধ্যে নেমে গিয়ে হারানো মেষশাবটিকে তুলে আনবে? তোমাদের মধ্যে কি কেউই নেই?' —বাইবেল

'ছবি ও গানে, শিল্পে ও জীবনে মধ্যযুগের জেগে ওঠার নামই রোমান্টিকতা। কিন্তু রোমান্টিক কবিতার জন্ম তো যীশুর ধর্মে; যীশুর রক্তের মধ্য থেকে যে-আগুনঝুরি ফুল ফুটে উঠল, তারই নাম রোমান্টিক কবিতা।' —হাইনে

মার্গারেট মার্শালের *The Subtle Knot* বইখানি হাতে এসেছে। বইটির বিষয়, এককথায়, সতেরো শতকের ধর্মবিশ্বাসী মানুষের সন্দেহবাদ। কিংবা বলা যায়, ঐ শতাব্দীর মনন-প্রণেতা কয়েকজন ভাবুক মানুষের ভাবনা বিশ্লেষণ করে শ্রীমতী মার্শাল স্বাভাবিক যুক্তিসূত্র ধরে আধুনিক যুগের প্রসঙ্গে অবরোহণ করেছেন। একান্ত মানবিক ও অমিশ্র আধ্যাত্মিক চৈতন্য কখনোই সেতুসাধ্য কি না, এই প্রশ্নের আঘাতে সেই মনীষীদের রচনাবলী বিচলিত। জোসেফ গ্র্যানভিলের *Scepsis Scientifica* (লণ্ডন, ১৬৬৫) থেকে একটি প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা এখানে আবার উত্থাপিত হল:

'স্বর্গত প্লেটো বলে গেছেন যে মানুষ প্রকৃতির একটি বৃত্ত; উপরের দিকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা শুদ্ধসত্ত্বের খেলা, নীচের ভূমণ্ডলে মানুষের শারীরিক অস্তিত্ব। এই দুটি ভাগ যে একেবারেই দ্বিধানির্দিষ্ট, এ কথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। কিন্তু কি ক'রে ঐ চিন্ময় অংশের সঙ্গে এই মৃন্ময় অংশ মিলবে, ভেবে পাই না। কোন্ সিমেন্টে স্বর্গ আর মাটিকে জোড়া লাগাবে, আলো আর অন্ধকারের মতো চিরস্বতন্ত্র দুটি নিয়মকে? এই সমস্যার বোধহয় কখনো কোনো সমাধা নেই। কি করে একটি ভাবনা মার্বেলের প্রতিমূর্তির সঙ্গে সংলগ্ন হতে পারে, কিংবা সূর্যরশ্মি একতাল কাদার সঙ্গে?'

বলা বাহুল্য, এই দুশ্চিন্তা শুধু প্লেটোনিক নয়, আন্তর্জাতিক। উপনিষদে এ সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধান্তের মতোই বলে দেওয়া হয়েছে, এমন-কি কোনো দ্বন্দ্ব উত্থাপনের সুযোগও সেখানে দেওয়া হয় নি:

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।

—কঠোপনিষৎ। দ্বিতীয় বল্লী

স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তি প্রেয়কেই গ্রহণ করেন, এ কথা বললে সমস্ত সমস্যার লঘুকরণ হলেও সমাধান হয় কিনা— ব্লেক আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের মধ্যে এই প্রশ্নের পৌরোহিত্য করেছিলেন। এই প্রশ্নের অনুষঙ্গেই তাঁর জীবন কেঁপে উঠেছিল এবং তাঁর কবিতা একই আলোড়নের সঙ্গে সমারব্ধ।

দেহাত্মদ্বৈতত্বের জিজ্ঞাসা বেয়ে ব্লেকের কাছে সেই কথাটাই বড়ো হয়ে উঠেছিল, গ্যেটে সম্বন্ধে কার্লাইল যে কথা তুলেছিলেন, অর্থাৎ তুলতে বাধ্য হয়েছিলেন: 'গ্যেটে মানুষ হিসেবে কিরকম? ভিতর থেকে তিনি কেমন মানুষ?' টমাস বাট্স ব্লেককে লিখেছিলেন: 'তুমি বড়ো শিল্পী বা বড়ো কবি হবে কি না জানি না, কিন্তু তুমি যে একজন মহত্তর মানুষ হবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলে দিতে পারি।' ব্লেক এর উত্তরে

যৌবনে উইলিয়ম ব্লেক

পত্নী ক্যাথেরিন ব্লেক - অঙ্কিত

With dreams upon my bed thou scarest me —Job vii, 14

দুঃস্বপ্ন ॥ ব্লেক কর্তৃক অঙ্কিত ও ক্ষোদিত

একটি কথাই জোর দিয়ে বলেছিলেন : 'ভবিষ্যতে আমি ধর্ম ও প্রপন্নার্তির একজন সবল সমর্থক হব।' এই ধর্মও তাঁর কাছে কোনো অনুশাসনের দৌরাত্ম্য নয়, ল্যাটিন প্রতিশব্দ 'forma' বা রূপকল্পের অর্থে প্রাণদ শক্তি।

ব্লেকের বিষয় হল সমগ্র মানুষ, একক মানুষ, সম্পূর্ণ মানুষ ; তার জন্ম, তার প্রাণময় ও মৃত্যুময় জীবন এবং পুনর্জন্ম। মানুষের বিনিঃশেষ ধাতুরূপ ও ঈপ্সিত শিল্পরূপের মধ্যে অননুদিত দূরত্বের যন্ত্রণা ও মানবিকতার পুনর্বিচার—ব্লেকের স্থায়ী বেদনা এখানেই বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে। 'The subtle knot that makes us man' কথাটা প্রথম পর্যাপ্ত চতুরালির সঙ্গে বলেছিলেন ডান্। মৃত্যুর অনিবার্যতা ও সৃষ্টির অর্থহীনতা ডানের কাছে পরিচিত দুঃস্বপ্নের মতো দেখা দিয়েছিল। মানুষ সেই দারুণ দোটানায় নিতান্ত এক করুণাস্পদ জীবমাত্র, যুক্তি ও বিশ্বাসের সমীকরণে যার করুণ আগ্রহ নিয়োজিত। ডান্ শেষ পর্যন্ত মানুষের কান্নায় যতটা কেঁদেছিলেন, যতখানি সাড়া দিয়েছিলেন, মানুষের মানবিক উপাদানে তার এককণাও ভরসা স্থাপন করতে পারেন নি। তাঁর শেষজীবনের প্রার্থনা-পদাবলীতে তাই একরকম সুন্দর ও শোচনীয় অধ্যাত্ম বিধুরতা ফুটে উঠেছিল, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে যার একমাত্র তুলনাস্থল শেষবয়সের বিদ্যাপতি।

ডান্ থেকে দান্তের কাছে ফিরলেও একজন মানুষ যতটা বিস্মিত হবেন, সেই পরিমাণে তিনি কখনোই আশান্বিত হতে পারবেন না। দান্তে যে-টমাস অ্যাকুয়ানাসকে গুরু হিসেবে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন তাঁর মধ্যেও বৈষ্ণব ধর্মের ঈশ্বর-মানুষের পৌনঃপুনিক নিত্যলীলার প্রসন্ন প্রতিশ্রুতি নেই, আছে নিষ্ঠুর বিচারকের আকস্মিক সম্মতিদান। জগৎ বা জীবন বিশ্বময়ের বুক থেকে এসে তাঁরই বুকে ফিরে যাচ্ছে, প্রত্যেক মানুষও ফিরে যেতে পারে, কিন্তু সে ফিরবার সুযোগ মাত্র একবারের জন্য পাবে, তার বেশি নয়। ঐ একবারের শীর্ণ সুযোগের ভিতরেই তাকে তার মানবজীবনকে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্যে নিঃশেষে নিবেদন করে দিতে হবে— টমাস অ্যাকুয়ানাস মানুষের সদ্‌গতির (sublimation) জন্যে এই নির্দেশই দিয়েছিলেন। দান্তেও প্রথম থেকেই একজন সংশোধিত মানুষকে ভালোবাসতে চেয়েছিলেন এবং মানুষ ও ভগবানের মাঝখানের ব্যবধানের ঘোরানো সিঁড়িগুলি মেনে নিয়েছিলেন।

মিলটনের কাছে মানুষের পতন কিংবা আত্মার ট্র্যাজেডি ব্যক্তিগত বিষয় হয়েই এসেছিল, তার জলন্ত প্রমাণ তাঁর রচনার পথ ও পরিণতি। *Samson Agonisths*-এর প্রথম দুই ছত্রের সঙ্গেই 'On His Blindness' সনেটের যে সাদৃশ্য আছে, তা অসাবধান পাঠকের চোখেও ধরা পড়বে। অথচ মিলটন এই সাদৃশ্যকেই রূপান্তরিত করবার জন্যে কলম ধরেছিলেন। ব্যক্তিগত মানুষের ট্র্যাজেডি তিনি স্বীকার করেন নি, সব মানুষের বিপর্যয়ই তাঁর লক্ষ্যবিষয় ছিল। তিনি পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে চেয়েছিলেন মানুষ মাত্রের উপরেই একটি নির্বিশেষ অধ্যাত্ম অস্ত্রোপচার হোক। তাঁর রাজনৈতিক রচনায়- মানুষের অধিকারের প্রত্যাশাজ্ঞাপন সত্ত্বেও নিছক একজন মানুষকে কখনোই সম্ভাবনা ও শক্তির বিচারে তিনি বিশ্বাস করেন নি, দুর্বল ব'লে মমতা করেছিলেন।

ব্লেক মানুষকে বিশ্বাস করেছিলেন, তার সবলতা-দুর্বলতা নিয়ে তাকে ভালোবেসেছিলেন। টমাস্ এ কেম্পিস্-কে পাঠ ক'রে রবীন্দ্রনাথের যে অস্বস্তি হয়েছিল, ব্লেকের কাছেও সেরকম অস্বস্তি হয়তো অবিদিত ছিল না। জীবনদেবতা যীশুকে অনুসরণ ক'রে সমস্ত জীবনকে বিবিক্ত নীরক্ত

শান্ত রসে পরিণত করার চেয়ে সমগ্র জীবনে যীশুর প্রতিসরণই তিনি কামনা করেছিলেন। মিলটন চেয়েছিলেন :

'To prove the ways of God to men'.

ব্লেক নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন :

'To prove the ways of men to God'.

The Book of Urizen থেকে ব্লেকের এই আকাঙ্ক্ষার মূর্তরেখা লক্ষ্য করা যেতে পারে। চিরন্তন দেবতাদের সংঘ থেকে একজন আদিম পুরোহিত নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলেন। ইউরিজেন ব'লে এই পুরোহিতের আত্মচিন্তার পটভূমি অপার শূন্য। দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভে আত্মসন্ধিৎসু এই পুরোহিত প্রত্যেক দেবতার জন্য নির্দিষ্ট একটি সার্বজনীন সমতান বা সুনিয়মকে অবিশ্বাস করলেন। তিনি বললেন প্রত্যেক দেবতার এক নিজস্ব জগৎ আছে যার নিজস্ব নিয়ম থাকা উচিত :

'one command, one joy, one desire,
one curse, one weight, one measure,
one King, one God, one law.'

—দ্বিতীয় অংশ, ৪৭-৪৯ ছত্র

চিরন্তন দেবতারা স্বভাবতই ইউরিজেনকে সহ্য করতে না পেরে নির্বাসন দিলেন। আগুন ঝড় ও রক্তের নানা পরীক্ষায় ইউরিজেন কালাতিপাত করতে লাগলেন। তাঁর সেই বিচ্ছিন্ন চিন্তার ভিতরে মানুষের জগৎ সূচিত হল একদিন। সৃষ্টির পথ ক্রমবিভাজিত। ইউরিজেনের মধ্য থেকে লস্ (Time) ও এনিথার্মন্ (Space)— এই দুজন মানব-মানবী এলেন। এনিথার্মনকে সুইনবার্নের কথা মতো 'Universal or typical woman' বললে অনেক কথাই বাকি থেকে যায়। তিনি লস্ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলেন, এবং এই ভাবে সমস্ত সৃষ্টি 'চিরন্তন থেকে বিশ্লিষ্ট' ('rent from Eternity') হতে লাগল। এই বিচ্ছিন্নতা এত নিদারুণ যে তার প্রাচীরের আড়াল থেকে ভালোবাসা নয়, দয়াই সম্ভব :

'It is not love I bear to Enthiarmon : It is Pity.
She hath taken refuge in my bosom and I cannot cast her out.

Four Zoas। প্রথম রাত্রি

এনিয়ন হলেন লস্ ও এনিথার্মনের জননী। তিনি একজন ছায়াময়ী নারী এবং বর্ষীয়সী এই জননীর কান্না ব্লেকের পৌরাণিক কবিতাবলীর পশ্চাৎপট আচ্ছন্ন ক'রে আছে। 'Four Zoas' নামে আখ্যায়িকায় মানুষের এই মৌল ঐক্য থেকে নির্বাসন ও পুনর্মুক্তির সংকেত আছে। ইউরিজেন বিবেকী বুদ্ধি, উর্থোনা বা লস্ সত্বশক্তি, লুভাহ্ সংরাগ এবং থার্মেস্ শরীরী শক্তির প্রতীক্— প্রত্যেকে পারস্পরিক সংহতির কাজে লাগতে পারলেই মানুষের পথের অনিশ্চিতি কেটে যাবে। সুইডেনবোর্গ ও বোএ্হমের ধারণা, বিশেষত দ্বিতীয় জনের যন্ত্রণাময় আত্মসন্ধান ও বিশ্বচেতনার[১] বোধ থেকেই ব্লেকের এই পৌরাণিক চেতনার আভাস এসেছিল। বোএ্হম লিখেছিলেন 'আমার মধ্যে আমি তিনটি জগৎ খুঁজে পেলাম।

---

১ The works of Jacob Boehme। চার খণ্ডে অসম্পূর্ণ ইংরেজি অনুবাদ। প্রকাশ : ১৭৬৪-৮১, লণ্ডন ; প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

একটি জ্যোতির্বিশ্ব, আরেকটি অগ্নিময়, নারকীয় ; সর্বশেষ জগৎটি হল ঐ দুই অন্তর্মুখী এবং আত্মিক স্তরেরই বহির্জাত রূপ মাত্র। তখন আমি বুঝলাম মন্দ-ভালোর মধ্যে কী অভিন্ন শক্তি আছে ; দুয়েরই অব্যর্থতা বুঝতে পেরে অনন্তের জঠর থেকে নিষ্ক্রান্ত নানাজন্মের রহস্য আমি বুঝতে শিখলাম'— ব্লেকের মধ্যে সারাজীবন ধরে এই কথাগুলির অনুরণন আছে। সেমেটিক পুরাণগুলির সঙ্গে ব্লেকের ঘনিষ্ঠতা যে নিতান্ত প্রাথমিক ছিল না, তা বোঝা যায় মিশরীয় সৃষ্টিতত্ত্বে উল্লিখিত সর্বনির্মাতা রা-আতুমের শূন্যকাতর আত্মবিভক্ত অস্তিত্বের সঙ্গে ইউরিজেনের পরিকল্পনায় বহুলাংশিক সারূপ্যে। তাঁর বিমিশ্র চেতনার সঙ্গে সবচেয়ে আত্মীয়তা বোধহয় জালালুদ্দিন রূমী'র, যাঁর 'মস্‌নভী'র দ্বিতীয় খণ্ডে পাপীদের স্বর্গ-অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও 'দিবান-ই সাম্‌স্‌ই-তব্রিজে' আছে একই সঙ্গে একক ও যৌথ মানুষের কথা। ব্লেকের 'All Religions are one' মূলত সেই এক সুরেই বাঁধা। ব্লেক রূমী থেকে খুব সম্ভব কিছু গ্রহণ করেন নি, দুজনের মনের মিলের কথাই এখানে বলা হয়েছে। *Four Zoas* এর অনেক আগে থেকেই ব্লেকের মনে আলো-অন্ধকারের যে টানাপোড়েন চলেছিল, তার প্রতিলিখন থেকে বোঝা যাবে নিজের কথা বলবার জন্য বিভিন্ন পুরাণকে ব্লেক কিভাবে পরিবর্তিত করেছিলেন :

> Then tell me, 'what is the Material World, and what is it dead?'
> He, laughing, answer'd : "I will write a book on leaves of flowers,
> If you will feed me on love-thoughts, and give me now and then
> A cup of sparkling poetic fancies; so, when I am tipsy,
> I will sing to you to this soft lute, and show you all alive
> The world, and every particle of dust breaths forth its joy.'
>
> —*Europe—A Prophecy*

আমার মনে হয়, মিশরীয় পুরাণে মানবীয় নিয়তির অনুলেখক থথ্ (গ্রীক হার্মেস) ব'লে যে-দেবতাকে দেখি স্বর্গের বৃক্ষের পাতায় পাতায় প্রত্যেক মানুষের জীবন লিখে রাখছেন— এখানে তিনিই প্রতিশ্রুতি-ব্যঞ্জক হয়ে নতুন পোশাক প'রে দাঁড়িয়েছেন। প্রথমত, ব্লেকের জীবনের অন্যতম দ্বন্দ্ব— কবির সঙ্গে ভাবীকথকের দ্বন্দ্ব— এখানে ফুটেছে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক 'বিশেষ' মানুষের অন্তর্নিহিত যে-অপরিমিত আলো এবং প্রত্যেক 'বিশেষ' ধূলিকণায় বিশ্ববীক্ষণের যে-সম্ভাবনা— এখানে ব্লেককে তাই চিন্তিত করেছে এবং এখানকার মতো একাধিকবার প্রচলিত হেলেনীয়, সেমেটিক ও খ্রীস্টীয় ধর্ম-পুরাণের গৃহীত কাঠামোকে বদলাতে প্রবুদ্ধ করেছে। হুইট্‌ম্যান-ও অণুতম বালুকণা ও সর্বসাধারণের মধ্যে পূর্ণ-কে অনুধাবন করেছিলেন। ব্লেকের 'Memorable Fancy' পর্যায়ের সুরেলা গদ্যরীতির সঙ্গে হুইটম্যানের কিছুটা স্বরসাম্য থাকলেও সমধর্মিতা ঠিক ছিল না, তার কারণ বিশেষীকরণের চেয়ে সাধারণীকরণই তাঁর বক্তব্য ছিল। তাছাড়া অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বিচ্ছেদ যেভাবে 'Old Age Echoes'এর মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তা পৌরাণিক চিত্রকল্প ব্যবহারে হুইটম্যানকে উৎসাহিত করে নি।

'নিরালা মানুষের বেদনা'— চেস্টরটন কথাটা সম্ভবত কথাচ্ছলে বলেছিলেন। ব্লেক এই বেদনাকে জেনেছিলেন। নঙর্থক ইঙ্গিতে মানুষের মধ্যে তা 'Spectre' হয়ে কাজ করে, যাকে দ্রবীভূত ক'রে না দিতে পারলে শান্তি নেই। অন্যদিক থেকে, বিচিত্র বিষম মানুষের রূপাবলী দেখতে ব্যগ্র ছিলেন

বলেই ব্লেক চসারের রচনার ছবি এঁকে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখেছিলেন, কেননা চসার, তাঁর ভাষায়, বিচিত্র-কে বন্দনা করেছেন ও চিরন্তন ('eternize') ক'রে গেছেন। জেরেমি টেলারের মতো তাঁরও মননের একটি লক্ষ্য ছিল 'To secure the persons' অন্যথা, বিচিত্রকে না দেখে নিজেকেই যিনি দেখেন ব্লেকের কাছে তিনি অন্ধ গড়নির্ণয়ের (ratio) অপরাধে অপরাধী। হপকিন্সের 'Singularity' ব্লেকের চেতনা বহন করছে। হপকিন্সের কবিতা আজকের পাঠকের কাছে সার্থক ছন্দোনিরীক্ষার আধার হিসেবেই সম্মানিত। কিন্তু সেই নিরীক্ষার আড়ালে তাঁর যে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব কাজ করেছিল, সে কথা আমরা ভুলে যাই। হপকিন্স, অন্ততঃ সেই দিক থেকে, ব্লেক ও আজকের যুগবেদনার মধ্যে একটি যোজকের মতো কাজ করছেন।

ব্লেকের প্রথম পর্বের রচনা *Songs of Innocence* ও *Song of Exyerience*—একটি আরেকটির বিপ্রতীপ। প্রথমটিতে আছে প্রতিধ্বনিময় সবুজের ব্যঞ্জনা, দ্বিতীয়টিতে ব্যঞ্জনাহীন কান্না ; প্রথমটিতে শিশুর আনন্দ ও ধাত্রীর প্রশান্তি, দ্বিতীয়টিতে শিশুর আনন্দেও ধাত্রীর বিরক্তি। কিন্তু এই দুই বিপ্রতীপ কোণ ব্লেকের মনে পরস্পর সমান হয়ে তাঁর পরবর্তী রচনা তথা আধুনিক কবিতার সঙ্গে যোগসেতুর মতো কাজ করছে। 'Contraries meet in one' ব'লে ডান্ মানুষের সম্পর্কে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তার জন্যে অনুতপ্ত প্রার্থনা করেছিলেন। ব্লেক কচিৎ কখনো প্রার্থনা করেছেন হয়তো, কিন্তু তাঁর সচেতন দৃষ্টি পরস্পরবিরুদ্ধ অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি ঐশী অভিজ্ঞান আবিষ্কারের দিকে প্রসারিত। বেউলাহ্ হল সেই উত্তীর্ণ জগৎ এবং মানুষেরই সাধ্যস্বর্গ। তিনি যাকে বোধিচর্যা (vision) বলেছেন তা-ও মানবিক একাগ্রতা, যার কথা প্লটিনাস অনেক আগে বলে গিয়েছিলেন। শিশুর মতো উৎসাহে আত্মজয়ী শিশুর কথা ব্লেক সারাজীবন ব'লে গিয়েছিলেন, যে-শিশু অভিজ্ঞতা-পরিমিত নয়, প্রজ্ঞা-পরিণত। ঠিক ওআর্ডস্বার্থীয় শিশুরা নয়, 'শিশু ভোলানাথের' পরবর্তী 'পূরবী'র কবিতায় কবিতায় ছড়ানো সৃষ্টিশীল শিশুদের সঙ্গে ব্লেকের শিশু বা মানুষেরা একাধিক অর্থে তুলনীয়। এই মানুষেরা, ব্লেকের ভাষায়, নিউটনীয় বিশ্বাসের নিদ্রায় অভিভূত নয়, বস্তু-বুদ্ধি-আবেগ-চিন্ময়তা—এই চার দিক থেকে সম্পূর্ণ vision বা মানবিক বোধিতে জাগরূক। *Four Zoas* এই অমূর্ত চারটি শক্তির দেহরূপ। Zoas শব্দের মূল অর্থ গ্রীক ভাষায় 'পাশব' হলেও তা ব্লেকের হাতে 'Life's in Eternity' হয়ে উঠেছে।

ব্লেকের সাংকেতিক কবিতা এখানেই আধুনিক সাংকেতিক কবিতার সঙ্গে সদৃশ এবং স্বতন্ত্র। রিল্‌কেও মানুষের জন্মমৃত্যুর অর্থ খুঁজেছিলেন এবং সমস্ত জীবনের গোধূলি-আলোয় চিরপরিচিত দেবতাদের মুখ নতুন ক'রে দেখেছিলেন। কিন্তু রিল্‌কে সে-দেখা প্রধানত নিজের জন্যই দেখেছিলেন এবং তাই তিনি এত অন্তর্বৃত। অবশ্য মালার্মের রচনায় অন্তর্বৃত্তি চূড়ান্তে সন্নিবিষ্ট। এই দুজনের শিল্পসত্যের যত পার্থক্যই থাক, সাদৃশ্য ঐ শর্তহীন অন্তর্মুক্তিতে। ব্লেক এঁদেরই মতো পুরাণকে নিজের কাজে চরিতার্থ করেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে মানুষ ও শিল্পীর দ্বন্দ্ব একটি মূলসূত্র। পক্ষান্তরে, শিল্পীর আত্মসন্ধান আধুনিক কবিতার অবিভাজ্য ক্ষেত্র। ব্লেকের কাছে এই ক্ষেত্রটি বিভাজিত হয়েই এসেছিল। অথচ বাট্‌সকে শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন : 'বুদ্ধিশক্তির কাছে উৎসর্গিত প্রতীককে যদি বহিরঙ্গ অর্থ বা অভিধা (corporeal understanding) থেকে লুকিয়ে রাখা যায়, সেই গোপনতাকেই আমি মহত্তম কবিতার সংজ্ঞা

হিসেবে দাঁড় করাব। প্লেটো এই পথই দেখিয়ে গেছেন।' আবার ব্যক্তি ও সভ্যতার সংকট দেখে সেই ব্লেকই বারংবার গোপন দুর্গ ছেড়ে পথে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে মাঝে-মাঝে সত্য কথার আধার সংবৃত সৌন্দর্য নয়, রূঢ়গলায় স্পষ্ট ক'রে সত্য না বললে শুধু সত্যের অপলাপ নয় অপমান করা হয়। এই প্রবণতা মাঝে-মাঝে তাঁর কবিতার গুরুতর ক্ষতি করেছে, কেননা, অনেক সময়েই তাঁর কণ্ঠ সত্যকথনের উত্তেজনায় বেসুরো, এমন-কি কর্কশ। তাঁর পরবর্তী কবিতার অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে ছদ্মবেশী গদ্যের অমিতাচার। রিল্‌কে যেখানে তীক্ষ্ণ, ব্লেক সেখানে তিক্ত হতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। তাঁর একদিকে অসংখ্য এপিগ্রামের মাধ্যমে তারবার্তায় জরুরি খবর পৌঁছে দেওয়ার সপ্রতিভ ব্যস্ততা, অন্যদিকে এপিগ্রামকে নিয়ে বিদ্রূপে উজ্জ্বল এপিগ্রাম :

> This whole life is an epigram smart, smooth and neatly penn'd,
> Plaited quite neat to catch applause, with a hang-noose at the end.

অথবা নিজেকে নিয়ে :

> And in melodious accents I
> Will sit me down, and cry 'I'! 'I'!

তাই তাঁর চিঠিতে প্লেটোর পাশেই ঈসপের নাম, প্রাণময় গথিক শিল্পের সঙ্গে গাণিতিক গ্রীক শিল্পের উল্লেখ, রচনায় বক্রোক্তির পাশেই স্বভাবোক্তির উপস্থিতি। তাঁর ছবির আদর্শ বলিষ্ঠ রেখার সঠিক সমাবেশ। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রেখার মায়া মূর্ছনানির্ভর, ব্লেকের ছবি রেখার মাধ্যমে 'অ্যাবস্ট্রাক্ট'কে সংজ্ঞা দেবার জন্য তৎপর। অয়েল-পেন্টিঙের আচ্ছন্নতা বা সুদূরতা তিনি চিরদিনই পাশ কাটিয়ে গিয়ে মিনিয়েচার ও ফ্রেস্কোধর্মী ছবি আঁকতে বসেছেন এবং অধিকাংশ তাৎপর্যদুর্গম ছবির পাতার পর পাতা ব্যাখ্যা ক'রে গিয়েছেন। সেজন্য symbol শব্দের বদলে allegory শব্দটি বসালেই তাঁর উদ্দেশ্য ও উপায় বোঝা সহজ হয়।

যাঁর আদি রচনায় স্পেন্সরীয় ছন্দোলালিত্য এবং ক্যারোলিন কবিতার আয়াম্বিক-অ্যানাপেস্টিক ছন্দোবন্ধের মিশ্রজাদু, সেই একই ব্লেক পরে পর্ব-বিভাগ, যতি-স্থাপনা ও স্বরাঘাত-সন্নিবেশে অত্যন্ত অনিয়মী। কিন্তু এই অনিয়ম ইচ্ছাকৃত। '*Jerusalem*'-এর ভূমিকায় তিনি সেই কথা বলেছেন : 'প্রত্যেক চরণে মাত্রাসংখ্যা ও যতিস্থাপনায় বৈচিত্র্য এনেছি। প্রত্যেক শব্দ ও প্রত্যেক বর্ণকে বিচার ক'রে যথাযোগ্য জায়গায় অভিষিক্ত করা হয়েছে। 'ভীষণ' অংশের জন্য অনুরূপ মাত্রাসন্নিবেশ, 'শান্ত' ও 'মৃদু' অংশের জন্য অনুকূল বর্ণসংখ্যা, শিল্পমূল্যে অনুজ্জ্বল অংশের জন্য গদ্যের উপযোগী শব্দচয়ন— প্রত্যেকটিই যথাযথ এবং দরকারী। কবিতা শিকল প'রে থাকলে তা সমস্ত মানবজাতিকে শৃঙ্খলিত করে। জাতিপুঞ্জ ওঠে বা নামে কিনা তা নির্ভর করে, যে-মাত্রায় তাদের কবিতা, ছবি ও গান ওঠে বা নামে তার উপরে। মানুষের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল শুধু শিল্প, প্রজ্ঞা আর বিজ্ঞান।' ব্লেকের অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁর স্বভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসম। দ্বিপদী রচনায় আশ্চর্য সফল ব্লেক আয়তনিক রচনায় অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর যুগে কবিপ্রসিদ্ধির রূপবদ্ধ 'সনেট' সম্ভবত একটিও লেখেন নি, তার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি তাঁর অনেক বক্তব্য সংকুচিত ক'রে সুমসৃণ হতে রাজি নন। ব্লেকের কবিতা তাঁর জীবনের ধারাবাহিক আত্মবিবরণী। অনেক সময়ে কোনো চিঠি লিখতে গিয়ে কবিতা সেই চিঠির মধ্য

থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে। সেদিক দিয়ে দেখলে তাঁর কবিতা-ও পত্রধর্মী, কেননা সেখানে চিঠির বর্ণনাগুণ ও প্রত্যক্ষতা দুয়েরই প্রাচুর্য।

'লিরিক' থেকে তাঁর বিবর্তন 'লিটারারির এপিকে'র রূপবৈচিত্র্যে এবং তাঁর এই রূপান্তর তাঁকে বুঝবার সহায়তা করে। রূপকল্পের ঐ পার্থক্য মাত্রাগত, কেননা 'ব্যক্তিগত' ব্লেকই আপ্রাণ নিজের সঙ্গে যুঝে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর *Book of Thel* (১৭৮৯) থেকে *The Ghost of Abel* (১৮২২)—দীর্ঘ তেত্রিশ বছর এই অন্তর্যুদ্ধের পরিচয় রক্তাক্ত মানচিত্রের মতো তিনি এঁকে গিয়েছেন। নিজেকে ও সব মানুষকে দেখতে চাওয়ার আলোয় তাঁর কাছে প্রকৃতিবিশ্বও মানুষের মূর্তিগ্রহ করেছে; আবার সেই প্রকৃতিকেই তিনি অজস্রবার তাঁর রচনায় লাঞ্ছিত ক'রে মানুষকে তার স্বাশ্রয়ী শিল্পচৈতন্যে জেগে উঠতে বলেছেন। ওআর্ডস্বার্থ প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে পরা-প্রকৃতির যে-নভোমণ্ডলে পৌঁছেছিলেন ব্লেক থেকে তার অবস্থান দূরে নয়:

Life, I repeat, is energy of love
Divine or human, exercised in pain,
In strife, in tribulation; and ordained,
If so approved and sanctified to pass,
Through shades and silent race, to endless joy.

—*The Pastor* । পঞ্চম সর্গ

ব্লেক মানব-প্রকৃতিকে অবলম্বন ক'রে এই একই জায়গায় পৌঁছেছিলেন:

All Human Forms identified, even Tree, Metal, Earth and Stone; all
Human Forms identified, living, going forth and returning wearied
Into the Planetary lives of Years, Months, Days and Hours; reposing
And then awaking into His bosom in the life or Immortality.
And I heard the name of their Emanations; they are named
Jerusalem.

—*Jerusalem*-এর সর্বশেষ অংশ

বাইবেলের একদিকে Job-এর সংঘাতময় আত্মসমীক্ষা, অন্যদিকে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের স্নিগ্ধ 'Covenant' বা আনন্দময় গ্রন্থিবন্ধনী। ব্লেক পাপ এবং প্রেম— এই দুটি পরশপাথরেই ব্যক্তি ও বিশ্বময়কে পরীক্ষা ক'রে নিয়েছিলেন। কোল্‌রিজের অপ্রাকৃত অনিশ্চিত, ব্লেকের অপ্রাকৃত অনন্ত। এবং ব্লেক প্রাত্যহিক ও মানবিক প্রয়োজনে সেই পরা-প্রকৃতকে ব্যবহার করেছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রসঙ্গে শুধু সেই বিস্ময়স্তব্ধ ছোটো মেয়েটির প্রথম প্রশ্ন ছিল 'মা, ঈশ্বর কি তখন থেকে আর বাড়েন নি, একটুও বাড়েন নি?' ব্লেক এই প্রশ্নটিকেই যেন মেনে নিয়ে বললেন:

God becomes as we are, that we may be as he is.

—There is no Natural Religion-এর প্রথম অংশের সিদ্ধান্ত

এবং বিশ্বাস করলেন যে:

As All men are alike in outward form, so (and with the same infinite variety) all are alike in the poetic genius.

No man can think, write, or speak from his heart, but he must intend truth. Thus all sects of Philosophy are from the Poetic Genius, adapted to the weakness of every individual.

—All Religions are One থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্র

এই নিখিল কবিপ্রতিভার অংশীদার মানুষ ও ঈশ্বর, বিচ্ছিন্ন মানুষ ও সমাহৃত মানুষ। ধর্ম ও সভ্যতা, ভাবনা ও মূল্যবোধ সবি এই সৃজনী কবিপ্রতিভার উৎসারণ— নইলে ব্লেক কিছুই মেনে নেবেন না। জীবনদেবতা যীশু শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে একজন অনন্য শিল্পশিক্ষক। 'Surface Man'এর পর্দা খুলে আত্ম-আবিষ্কৃতি— এদিক দিয়ে হয়তো তাঁকে মিস্টিক বলতে পারি; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ অর্ফিক ও এলুসিনিয় জগতে অথবা বৈদিক স্তোত্রের নীলিমায় যে-মরমী অতীন্দ্রিয়তা আবিষ্কার করেছিলেন, ব্লেক সেই ধ্রুপদী জগতের ঘনিষ্ঠ অধিবাসী নন। রোমান্টিক ও মিস্টিক— এই দুই ভাবমেরুর মাঝখানে যে অবিজিত উপত্যকা আছে ব'লে আমরা অনেক সময় মনে করি, ব্লেকের জীবন ও কবিতা সেই গৃহীত ব্যবধান অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। 'All that lives is holy'— এই কথাটি উচ্চারণ করবার জন্য তিনি নচিকেতার মতো মৃত্যুর সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। স্বর্গের যান্ত্রিক সহজ শান্তিতে সন্দিগ্ধ তাঁর ইউরিজেনের হাতে পৃথিবী দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতার রাজ্য হয়ে উঠেছিল; তিনি নিজে আবার সমস্ত বিরুদ্ধ ও স্বতন্ত্রকে মৌলস্বর্গে নিয়ে গেলেন, যেখানে এক ও অনেকের মিলনে রচিত পরিণত শান্তির ছবি আছে। দেবদূতদের সম্মেলক গান সেখানে শোনা যাচ্ছে:

The Elohim of the Heaven swore vengeance for sin. Then
Thou stoods't
Forth, O Elohim Jehovah, in the midst of the Darkness of
The oath, All clothed.
In Thy covenant of the Forgiveness of sins. Death, O Holy!
Is this Brotherhood?
The Elohim saw their oath, Eternal Fire: they rolled apart,
trembling, over The
Mercy seat, each in his station fixt in the firmament by Peace,
Brotherhood and Love.

—*The Ghost of Abel.*

শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

উইলিয়ম ব্লেকের কবিতার অনুবাদ

সহজ দর্শন

Auguries of Innocence

বালিকণিকায় যদি দেখবে জগৎ
এবং দ্যুলোক বুনো ফুলের ভিতরে,
নিঃসীমের আঁজলা নাও হাতের তেলোয়,
অন্তহীন কাল বাঁধো একটি প্রহরে।

যে-বাদুড় সাঁঝ-শেষে ঝাপটায় ডানা
সে-ই রেখে গেছে বুদ্ধি কিছুই-না-মানা ;
রাতের সাক্ষাৎকারে যে পেঁচাটা যায়
নাস্তিকের আঁত্‌কে-ওঠা চীৎকারে ফোটায়· ·

সুখে আর দুঃখে চলে বিচিত্র বুনন
অমর্ত্য আত্মার এই মর্ত্য আচ্ছাদন ;
প্রতিটি বিলাপ প্রতি খেদের অন্তরে
এক-একটি আনন্দ-অপ্সরী নৃত্য করে।

প্রত্যেক চোখের প্রতি ফোঁটা অশ্রু গ'লে
শিশু হয়ে থেকে যায় অনন্তের কোলে ;
ভেড়া কুত্তা গোরু সিংহ ডাকুক যে-কেউ
স্বর্গ-উপকূলে তার আছড়ায় ঢেউ· ·

দেখার যা দেখে তবু ধন্দ যার থাকে
থেকে যাবে ঐ রকমই যা-ই করো তাকে,
সূর্য চন্দ্র সন্দিগ্ধ একটুও যদি হয়
তৎক্ষণাৎ নিবে যাবে, তখনি প্রলয়· ·

ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে, তিনি জ্যোতি—
এই জানে দীন-আত্মা রাত্রির সন্ততি,
কিন্তু যারা অধিবাসী দিনের রাজ্যের
নবরূপ ভগবান দেখান তাদের।

সুনীলচন্দ্র সরকার

বাঘ

Tyger ! Tyger ! burning bight

বাঘ, বাঘ, তুমি রাঙা অঙ্গার,
জ্বলো অরণ্যে ঘন তমসার।
কার হাত চোখ মৃত্যুঞ্জয়
গড়েছিলো ওই সুঠাম প্রলয় ?

অতল সাগরে, অগম শূন্যে
জ্বলে ছিলো কি ও আঁখির বহ্নি ?
সে আগুন নিতে ভ'রে দুই মুঠি
ভর করেছে সে কোন পাখা দুটি ?

কত বড় কাঁধ, কোন সে যন্ত্রী
জড়িয়েছে তোর হৃদয়তন্ত্রী ?
জাগিয়ে পাঁজরে আদিতম ধ্বনি
কোন বাহুবল, পায়ের বাঁধুনি,
কিসের হাতুড়ি, কেমন শেকল,
মগজ-গলানো কোন দাবানল,
কিসের নেহাই, কী সাঁড়াশি-চাপ
বেঁধেছিলো ওই দারুণ প্রতাপ ?

দীর্ঘ বর্শা তারাদের হাতে
খ'সে গেলে, নীল অশ্রুপ্রপাতে
ধুয়ে-গেলে, গড়া হয়ে গেলে শেষ
সে কি হেসেছিল ? তারই রচা মেষ ?

বাঘ, বাঘ, তুমি রাঙা অঙ্গার,
জ্বলো অরণ্যে ঘন তমসার।
কার হাত চোখ মৃত্যুঞ্জয়
গড়েছিল ওই সুঠাম প্রলয় ?

নরেশ গুহ

পতঙ্গ

The Fly

ওরে পতঙ্গ, ছোট পতঙ্গ,
এই নির্বোধ আঙুলে আমার
চঞ্চল তোর নিদাঘ-রঙ্গ
মুছে গেল, ফুটে উঠবে না আর।

তোমারই মতন আমিও কি নই
দ্বিতীয় একটি পতঙ্গ ? আর
ওরে পতঙ্গ, তাহলে আবার
তুমিও কি নও আমার মতই ?

কেননা, অন্য অন্ধ আঙুলে
ভাঙবে আমারও এই পাখা ছুটি।
এখনও ভাঙে নি, তাই পাখা তুলে
নাচি, গান গাই, আনন্দে ছুটি।

চিন্তাই যদি জীবনের বিভা,
শক্তি এবং প্রাণবায়ু, আর
চিন্তাবিহীন জীবন যদি বা
মৃত্যুর মত রিক্ত, অসার—

তাহলে তাহলে— বিলুপ্ত হই,
অথবা জাগাই জীবনরঙ্গ—
ওরে পতঙ্গ, তোমার মতই
আমিও তো এক সুখী পতঙ্গ।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ধাত্রীর গান

Nurse's Song

যখন শিশুর কণ্ঠ শোনা যায় ঘাসের সবুজে
আর উপত্যকা ভরে চপল গুঞ্জন,
আমার কিশোর দিন ফিরে আসে স্পষ্টতায় মনে,
সবুজ ও বর্ণহীন হয়ে যায় আমার আনন।
তখন বাড়িতে আয়, বাছারা আমার, সূর্য পাটে নামে
রাত্রির শিশির ঝরে পড়া শুরু হয় ;
তোদের বসন্ত আর তোদের দিবস নষ্ট উচ্ছলতায়
এবং তোদের শীত আর রাত্রি ছদ্মবেশে রয়।

আলোক সরকার

মওলানা আবুল কালাম আজাদ

মওলানা আজাদের সঙ্গে আমার প্রথম-পরিচয়ের সৌভাগ্য ১৯৩৬ সালে হয়েছিল, কিন্তু তার পূর্বে বহু বার বহু সভা-সমিতিতে তাঁকে দেখেছি, তাঁর অপূর্ব ভাষণ শুনেছি। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে যাঁরা ভারতবর্ষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিলেন, দেশে নবজীবনের আলোড়ন এনেছিলেন, মওলানা আজাদ তাঁদের অন্যতম। তাই প্রথম যে কবে তাঁকে দেখেছিলাম, আজ সে কথা স্মরণ না থাকলেও প্রথম-পরিচয়ের দিনেই তাঁকে আপনার জন বলে মনে হয়েছিল।

১৯৩৬-৩৭ সালে নতুন ভারত-শাসন আইনে যে নির্বাচন হয়, তার প্রাক্‌কালে ফজলুল হক সাহেব, শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত এবং ডাক্তার আর আহমদের সঙ্গে আমি মওলানা আজাদের বাড়ি যাই। তখন নির্বাচন নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে, কী ভাবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলনের শক্তি ও প্রসার বাড়ানো যায় তা নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। বাংলা দেশের নির্বাচনে কংগ্রেস সাক্ষাৎ ভাবে সমস্ত আসনগুলি দখলের চেষ্টা করবে, না, মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির জন্য কৃষকপ্রজা-সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করবে, তা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেও মতভেদ ছিল। রাজনৈতিক কার্যক্রমে কংগ্রেস ও কৃষকপ্রজা-সমিতির মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে অনেক বিষয়ে কৃষকপ্রজা-সমিতির সমাজতান্ত্রিক মনোভাব কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ পছন্দ করতেন না। কংগ্রেসের মধ্যে কারও কারও ইচ্ছা ছিল যে, কংগ্রেস সমস্ত আসনগুলি দখল করতে চেষ্টা করুক, সেজন্য প্রয়োজন হলে কৃষকপ্রজা-সমিতির সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তাঁরা রাজি ছিলেন। আর এক দলের মত ছিল যে, বাংলা দেশের তখনকার পরিস্থিতিতে সংরক্ষিত আসন দখল করা কংগ্রেসের পক্ষে সহজ হবে না। কৃষকপ্রজা-সমিতির সঙ্গে যদি কংগ্রেসের প্রতিযোগিতা হয় তবে তার ফলে মুসলিম লীগ বা অন্য কোনো প্রতিক্রিয়াপন্থী দলই জয়লাভ করবে। বিভিন্ন মতামত শুনে মওলানা আজাদ যখন শেষে নিজের মত প্রকাশ করলেন, তাতে বিরোধবান্ সকল দলের মতের মধ্যেই একটা সামঞ্জস্যসাধন সম্ভব হল।

প্রথম-পরিচয়ের দিনেই মওলানা আজাদের স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি ও সহজ ন্যায়পরায়ণতার যে পরিচয় পেয়েছিলাম, তা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর অনন্যসাধারণ মননশক্তি তখনকার দিনেই প্রবাদ-বাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে প্রবল ন্যায়বোধের সমন্বয় না হলে এ ধরনের খ্যাতি এত সহজে গড়ে উঠতে পারত না। যখনই যে প্রশ্ন নিয়ে তাঁর কাছে সমাধানের জন্য গিয়েছি, দেখেছি যে, কখনো একতরফা কথা শুনে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত করেন নি। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকেও তিনি এসব ব্যাপারে একেবারেই আমল দিতেন না। সকল দিকের সকল কথা শুনে বিচারকের দৃষ্টিতে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে তিনি শেষে যে রায় দিতেন, তাকে অগ্রাহ্য করা কঠিন ছিল, অগ্রাহ্য করবার কথাও কারও মনে আসত না। ফলে বহু ক্ষেত্রে দেখেছি তাঁর সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিয়ে বলেছে যে, এ রকম সহজ সিদ্ধান্ত আগে কেউ ভাবে নি কেন, সেটাই আশ্চর্যের কথা।

মওলানা আজাদের সঙ্গে প্রথম যখন পরিচয় হয় তখন রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনার জন্যই তাঁর কাছে যেতাম। অল্পদিনের মধ্যেই কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে ঘনিষ্ঠতরভাবে জানবার সুযোগ পাই। রামগড়-কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়েকদিন আগে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন যে, রামগড়ে কবে যাব। আমি তখনও কোনো ব্যবস্থা করি নি এবং সে কথা তাঁকে বলি। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর অতিথি হয়ে আসবার জন্য আমাকে বলেন এবং বলেন যে, সভাপতির ক্যাম্পেই আমাদের থাকবার সমস্ত ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। এ রকম উদারতা এবং সহৃদয়তার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। কতটুকুই-বা তিনি তখন আমাকে জানতেন! আরও বহু রাজনৈতিক কর্মীর মতন আমিও দরকারমত তাঁর কাছে এসেছি, নানা সমস্যা নিয়ে আলাপ করেছি, কিন্তু কোনোদিন তাঁর অন্তরঙ্গ হবার কথা ভাবি নি। আমার কোনো ওজর-আপত্তি তিনি শোনেন নি। তাঁর নির্দেশমত রামগড়-কংগ্রেসে তাঁর অতিথি হিসাবেই যোগ দিয়েছিলাম।

যে দু-তিন দিন মওলানা আজাদের অতিথি হিসাবে রামগড়ে কাটাই, সে দিনগুলি চিরদিন আমার স্মরণে থাকবে। প্রাতরাশের সময়ে, দুপুরে এবং রাত্তিরে খানার টেবিলে পণ্ডিত জওহরলাল, শ্রীমতী নাইডু এবং আরও অনেকে এসে সভাপতির সঙ্গে যোগ দিতেন। রাজনীতির গণ্ডি পার হয়ে সাহিত্য ললিতকলা সমাজতত্ত্ব দর্শন নিয়ে আলোচনা মেতে উঠত। যাঁরা আসতেন সবাই কৃতী, সকলেরই সাহিত্য দর্শন সমাজসেবার কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ দান ছিল, কিন্তু বর্তমানকালের এ নওরতন-সভাতেও মওলানা আজাদের ভাস্বর বুদ্ধি বারবার দীপ্যমান হয়ে উঠত। ইয়োরোপীয় সাহিত্যদর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতারও তিনি সাধক, তাই এ দুই ক্ষেত্রে অন্যান্য সকলের সঙ্গে তিনি মোটামুটি সমানভাবে কথা বলতে পারতেন, কিন্তু আরবী ফারসী সাহিত্যদর্শনের সঙ্গে তাঁর যে বিরাট ও নিগূঢ় পরিচয় সে ক্ষেত্রে এই সুধী-সজ্জনদের মধ্যে কেউ তাঁর জুড়ি ছিলেন না। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। যে ভাবে নিজের মতামতের সমর্থনে তিনি আরবী ফারসী কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা থেকে উদ্ধৃত করতেন, তাও বিস্ময়কর। একমাত্র ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ ভিন্ন মওলানা আজাদের মতন অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আমি আর কারও দেখি নি।

বহু মনীষীর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রবল ধারণাশক্তি না থাকলে মনীষী বলে গণ্য হওয়া কঠিন ; কিন্তু পূর্বেই বলেছি যে, সমস্ত দিক বিচার না করে মওলানা আজাদ কখনো কোনো কথা বলতেন না। একতরফা মত পোষণ করাও যেন তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। রামগড়-কংগ্রেসের আমলে নূতন করে তাঁর সমদৃষ্টি ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় পাই। সুভাষচন্দ্র বসু তখন কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রামগড়েই এক আপসবিরোধী সম্মিলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। মতান্তর থেকে মনান্তর হতে বেশি দেরি লাগে না ; তাই কংগ্রেস-মহলে অধিকাংশ নেতাই সেদিন সুভাষচন্দ্রের বিরোধী। রামগড়-কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই সেদিন তাঁর প্রতি বিরক্ত, তাঁর আচরণের নিন্দায় পঞ্চমুখ। মওলানা আজাদ কিন্তু কোনোদিন সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি, বরং কেউ তাঁর সমালোচনা করলে বলেছেন যে, সুভাষবাবু রাজনৈতিক যে পথ বেছে নিয়েছেন তা আমরা ভুল মনে করতে পারি, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের নিষ্ঠা ও দেশসেবার কথা যেন কেউ কখনো না ভোলে।

মতের বিরোধ সত্ত্বেও মানুষকে মওলানা আজাদ যেরূপ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারতেন তার তুলনা সহজে মিলবে না। সেকালে মিস্টার জিন্না বহু বার তাঁর নিন্দা করেছেন, কিন্তু মওলানা আজাদ মিস্টার

জিন্নার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে অনেকেই সেদিন মওলানা আজাদকে বারবার অপমান করবার চেষ্টা করেছে, তাঁর চরিত্র ও বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, কিন্তু মওলানা আজাদের চিন্তায় বাক্যে ব্যবহারে কোনোদিন বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা দেয় নি। কলকাতার ময়দানে ঈদের নমাজের সময়ে মওলানা আজাদ ইমামতি করতেন, লক্ষ লোক নমাজের শেষে তাঁর খোৎবা বা ভাষণ শুনতে আসত। কিন্তু মুসলিম লীগের পাণ্ডাদের তা সহ্য হল না, তারা আওয়াজ তুলল যে লীগের বিরোধী মওলানা আজাদ সমাজদ্রোহী, ঈদের জমাতে তাঁকে ইমাম করা চলবে না। কলকাতার অধিকাংশ মুসলমান এ কথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়েন; এমন কথাও হয় যে, যদি লীগপন্থীদের মধ্যে কেউ কেউ মওলানা আজাদকে না চায় তবে তারা পৃথকভাবে ব্যবস্থা করুক, কিন্তু কলকাতার সাধারণ জমাতে মওলানা আজাদই নমাজে নেতৃত্ব করবেন। মুসলিম লীগের সদস্যদের মধ্যে এক বৃহৎ অংশও ঘোষণা করেন যে, তাঁরা মওলানা আজাদের রাজনীতির বিরোধী, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ও চরিত্রশক্তির তাঁরা ভক্ত, তাই ঈদের নমাজে তাঁরা মওলানা আজাদকেই ইমাম হিসাবে চান। কিন্তু মওলানা আজাদ বললেন যে, রাজনীতির দ্বন্দ্বকে ধর্মের ক্ষেত্রে আনা ঠিক হবে না। মুষ্টিমেয় একদল লোকও যদি তাঁকে না চায়, তবে তিনি স্বেচ্ছায় ইমামতি ছেড়ে দেবেন। তাঁকে নিয়ে যে ঈদের জমাৎ দ্বিধাবিভক্ত হবে, তা তিনি কিছুতেই মানতে রাজি হন নি।

সিমলা-কন্‌ফারেন্সের অবসরে মওলানা আজাদের অন্তরঙ্গ মহলে আমার যোগদানের সৌভাগ্য হয়। ভারতত্যাগ-আন্দোলনের ঘোষণার সঙ্গে ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। সে সময়ে আমরা যারা বাইরে ছিলাম, তারা প্রত্যেকেই নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত কংগ্রেসের কার্যক্রম সফল করবার চেষ্টা করেছি। ১৯৪৫ সালে যখন ইয়োরোপে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, তখন লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের জন্য সিমলায় এক কন্‌ফারেন্স ডাকেন। সেই কন্‌ফারেন্সে যোগদানের জন্য কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। অন্যান্য সকলের সঙ্গে আমিও মওলানা আজাদের অভ্যর্থনার জন্য হাওড়ায় গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে দেখা করতে বলেন। দু-এক কথার পরে তিনি বললেন যে, আহমদনগর জেলে থাকবার সময়ে তিনি আমার মহারাজা সায়াজী রাও বক্তৃতাগুলি পড়েছেন এবং সেগুলি তাঁর ভালো লেগেছে।[১]

জেলে থাকবার সময়ে দেশের সমস্ত খবর তাঁদের কাছে পৌঁছত না, অথচ মুক্তির সঙ্গেসঙ্গে সিমলায় কন্‌ফারেন্সের ব্যবস্থা হয়েছে। মওলানা আজাদ বললেন যে, কন্‌ফারেন্সের সময়ে যদি আমি তাঁর সঙ্গে থাকি এবং তাঁর সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করি তবে তাঁর কাজের সুবিধা হয়। আমি বললাম যে, দেশের মুক্তিসাধনায় কংগ্রেসের সভাপতিকে যদি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি, তবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব। সিমলায় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম এবং পরে ক্যাবিনেট মিশনের আলোচনার সময়েও তিনি আমাকে সহকারী হিসাবে ডেকেছিলেন। সেই সময় থেকে মওলানা আজাদের সঙ্গে কাজ করবার যে সুযোগ পেয়েছিলাম, তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তা বজায় ছিল।

প্রায় বারো-তেরো বৎসর তাঁর সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবার

১ পরে পরিবর্ধিত আকারে সেগুলি *The Indian Heritage* নামে প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্বে এবং পরে প্রকাশ্য ও ঘরোয়া রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় বার বার তাঁর চরিত্র ও মনীষার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আরও দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর উদারতা ও সমদৃষ্টির আর-একটি ঘটনা মনে পড়ছে। সিমলা-কন্‌ফারেন্সের পরে মওলানা আজাদ যখন কলকাতায় ফিরছিলেন, তখন আলিগড় স্টেশনে একদল ছাত্র তাঁকে অসম্মান করবার চেষ্টা করে। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধের ফলে তাদের সমস্ত অপচেষ্টা যেভাবে ব্যর্থ হয়, যারা না দেখেছে তাদের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন। দলনির্বিশেষে বহু সুধী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছাত্রদের এ অনুশাসনহীনতার কঠোর নিন্দা করে দাবি করেন যে, এ অপচেষ্টার জন্য যারা দায়ী তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

শুধু তাই নয়। লর্ড ওয়াভেল তখন ভারতবর্ষের বড়লাট। মওলানা আজাদ তাঁর আমন্ত্রণে সিমলা গিয়েছিলেন বলে লর্ড ওয়াভেল আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের বলেন যে, যেসব ছাত্র তাঁর অতিথিকে অসম্মান করেছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাদের নাম খারিজ করে দিতে হবে। মওলানা আজাদ তখন ওয়াভেলকে অনুরোধ জানান যে, ছাত্রদের যেন কোনো কঠোর শাস্তি দেওয়া না হয়। তরলমতি ছাত্ররা যা করেছে তা অন্যের প্ররোচনায় করেছে। তাই তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দিলে শাস্তি বেশি কঠিন হয়ে পড়বে।

মওলানা আজাদের অনন্যসাধারণ সত্যনিষ্ঠা ও বিনয়ের আর-একটি উদাহরণ মনে পড়ছে। ১৯৫১ সালে মওলানা আজাদের সঙ্গে আমি লণ্ডন যাই। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন তখন ভারতীয় হাইকমিশনার। মিস্টার অ্যাট্‌লীর সঙ্গে মওলানা আজাদের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন বলেন যে, মওলানা আজাদ ইংরেজি ভালো জানলেও ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের বিরোধী এবং তাই কখনো ইংরেজিতে কথাবার্তা বলেন না। তখনকার দিনে কংগ্রেসী মহলের অনেকেরই এইরকম ধারণা ছিল, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননেরও হয়তো তাই বিশ্বাস ছিল। মওলানা আজাদ তখনই উর্দুতে জবাব দিলেন যে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননের ধারণা ঠিক নয়। নীতি হিসাবে তাঁর ইংরেজির বিরুদ্ধে কোনোই আক্রোশ নেই— ইংরেজি তিনি বেশি বয়সে নিজের চেষ্টায় শিখেছিলেন, তাই ইংরেজি পড়তে বা বুঝতে কোনো অসুবিধা না হলেও কথা বলবার অভ্যাস কোনো দিনই তাঁর হয় নি। তা নইলে লণ্ডনে এসে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ভাষায় কথা বলতে পারলে তিনি বরঞ্চ খুশিই হতেন।

২

প্রথম যেদিন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মওলানা আজাদের আবির্ভাব হয়, তার পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও সাহিত্যিক ও দার্শনিক হিসাবেই তাঁর কৃতিত্ব বেশি, না, রাজনৈতিক নেতা হিসাবেই তাঁর দান মহত্তর, তা নিয়ে ভক্ত ও নিন্দুক উভয়ের মধ্যেই মতভেদ আজও শেষ হয় নি। "আল হিলাল" ও "আল বালাগে"র অগ্নিবর্ষী রচনা যেদিন উত্তর-ভারতের সাহিত্যজগতে নবীন আলোড়ন জাগাল, তখনো মওলানা আজাদের বয়স ত্রিশ হয় নি। উর্দুভাষার ইতিহাসে এ রকম বিপ্লবকারী রচনা পূর্বে কোনোদিন দেখা যায় নি। দেশপ্রেম, তেজ ও উদ্দীপনা, কাব্যরস ও কৌতুক, আদর্শবাদ ও ব্যঙ্গরচনার সমন্বয়ে এ রচনাগুলি যেরকম ভাস্বর, কেবল উর্দু কেন, ভারতীয় কোনো ভাষাতেই বোধ হয় সহজে

তার তুলনা মিলবে না। তাই সেদিন যে মওলানা আজাদের রচনার শক্তি ও আবেগে উত্তর-ভারতের স্তিমিতপ্রাণ মুসলমান-সমাজ টলে উঠবে তাতে বিচিত্র কি।

মওলানা আজাদ সেদিন মুসলমান-সমাজকে যে এভাবে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন, কেবলমাত্র রচনার সাহিত্যগুণ দিয়ে তা সম্ভব হয় নি। সাহিত্যরসে রসিকসমাজ মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তরুণসমাজকে উদ্বেলিত করেছিল মওলানা আজাদের নতুন রাজনৈতিক বাণী। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পরে ভারতবর্ষের মুসলমান-সমাজের ভাঙন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সে দুর্দিনের দিনে সার্ সৈয়দ আহমদ ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ও ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে মুসলমান-সমাজকে পুনর্জীবিত করবার চেষ্টা করেন। তখনকার পরিস্থিতিতে তাঁর এ কার্যক্রম মুসলমান-সমাজে নতুন উৎসাহ ও উদ্যম এনে দিল, কিন্তু সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য সার্ সৈয়দ আহমদ সমাজকে রাজনীতিবিমুখ করবার যে নীতি গ্রহণ করেন, পরবর্তী কালে তার ফল বিষময় হয়ে দেখা দেয়। তখন ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজে নতুন রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়েছে, নবীন উৎসাহ ও উদ্যমে হিন্দুসমাজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। সার্ সৈয়দ আহমদ হিন্দুসমাজের গুণগ্রাহী ছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষের কল্যাণ হোক এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর কার্যক্রমের ফলে কিন্তু দুই সমাজের মধ্যে সহযোগের বদলে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিল। সার্ সৈয়দ আহমদ চেয়েছিলেন যে, মুসলমান-সমাজ তখনকার মতন রাজনীতি বর্জন করে চলুক। রাজনীতি-বর্জন যে একদিন অনিবার্য ভাবে রাজনীতি-বিরোধে পরিণত হবে সার্ সৈয়দ আহমদ তা বুঝতে পারেন নি। তাই তাঁর শেষবয়সে সার্ সৈয়দ আহমদ নবগঠিত কংগ্রেসে যোগদান করেন নি, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতাও করেন নি। তাঁর অনুবর্তীরা কংগ্রেস বর্জন করে তুষ্ট থাকেন নি, তাঁদের হাতে মুসলমান-সমাজের রাজনীতি কংগ্রেসবিরোধী এবং জাতীয়তার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াল।

মওলানা আজাদ যেদিন সাহিত্য ও রাজনীতির আসরে নামলেন, তখন ভারতীয় মুসলমান-সমাজে সার্ সৈয়দ আহমদের অনুগামীদের একচ্ছত্র আধিপত্য। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সমস্ত সংস্পর্শ বর্জন ক'রে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করলেই মুসলমান-সমাজের কল্যাণ হবে। মওলানা আজাদের রচনা প্রথম দিন থেকেই এই দুই বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানল। তিনি ঘোষণা করলেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে ইংরেজ-শাসন দূর করাই মুসলমানের বাঁচবার একমাত্র পথ। মওলানা আজাদ আরও বললেন যে, ভারতবর্ষের মুক্তি কেবলমাত্র ভারতীয় মুসলমানের কাম্য নয়, ভারতবর্ষ স্বাধীন না হলে সমস্ত জগতের মুসলমান-সমাজই সাম্রাজ্যনীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। তাঁর এ রাজনৈতিক মতবাদে প্রবীণ নেতৃবৃন্দ প্রথমে আশ্চর্য ও পরে রুষ্ট হলেও তরুণসম্প্রদায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের আহ্বানে বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে সাড়া দিল।

১৯১২ সালে "আল হিলালে"র প্রথম সংখ্যায় জাতীয়তা, দেশের মুক্তি, গণতন্ত্র ও প্রগতির যে বাণী ধ্বনিত হয়েছিল, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মওলানা আজাদ অবিচলিত নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে তারই ঘোষণা করে গিয়েছেন। বংশানুক্রমে পীর মুরিদী যাঁদের ব্যাবসা এমন পরিবারের সন্তান প্রাচীনপন্থী মামুলি শিক্ষালাভ করে রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে বিপ্লবী মতবাদের বাহন হিসাবে দেখা দেবে, প্রথম-

দৃষ্টিতে এ কথা বিস্ময়কর মনে হতে পারে। ইসলামের বৈপ্লবিক আবির্ভাব ও যুগান্তকারী বাণীর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা কিন্তু এ পরিণতিতে বিস্মিত হবেন না। বুদ্ধির মুক্তি, সামাজিক গণতন্ত্র ও সকল মানুষের ঐক্যের বাণী নিয়েই ইসলামের প্রথম আবির্ভাব হয়, কিন্তু কালক্রমে ভারতবর্ষে তার যে রূপান্তর ঘটে, সেই পরিবর্তনের ফলে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান-সমাজের বদলে ইংরেজ ঐতিহাসিকের রচনায় মহম্মদীয় ধর্ম ও সমাজের উল্লেখ বারবার মেলে। ইসলাম অকুণ্ঠিতভাবে ঘোষণা করেছে যে, হজরত মহম্মদ নতুন কোনো ধর্মের প্রচার করেন নি, সকল দেশে সকল ভাষায় সকল পয়গম্বর এবং নবী যে চিরন্তন সত্য ঘোষণা করেছিলেন, আরব দেশে আরবী ভাষায় হজরত মহম্মদ তাই পুনর্বার প্রচারিত করেন। তাই কোরাণে বারবার বলা হয়েছে যে, সত্যিকার মুসলমান সমস্ত পয়গম্বর নবীকেই সমানভাবে ভক্তি করবেন, সকল সম্প্রদায়ের সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখবেন। প্রাচীনপন্থী পরিবারের আবহাওয়ায় প্রাচীনপন্থী শিক্ষালাভের ফলে মওলানা আজাদ ইসলামের প্রথম বিপ্লবী শিক্ষার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাই তখনকার দিনের ভারতবর্ষে মুসলমান-সমাজের যে দাস্য-রাজনীতি, সামাজিক শ্রেণীভেদ ও বুদ্ধিবিরোধী কুসংস্কার, তার বিরুদ্ধে যে তাঁর তরুণ মন বিদ্রোহ করবে, তাতে বিচিত্র কি। সকল প্রকারের স্বাধীনতার উপাসক বলেই তিনি সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। সমাজের সকল স্তরে সকলের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী ঘোষণার আহ্বানেই সাহিত্যিক ও দার্শনিক আজাদ বিপ্লবী রাজনৈতিকে রূপান্তরিত হলেন।

রাজনৈতিক সংগ্রামে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেও কিন্তু মওলানা আজাদ কোনোদিনই জ্ঞানযোগীর ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি। প্রতিদিনের সমস্যা ও প্রশ্নের সমাধান করেই সাধারণত রাজনৈতিক নেতার প্রতিষ্ঠা। সাহিত্যিক ও ভাবুকের দৃষ্টি দৈনন্দিন সমস্যাকে অতিক্রম করে মানুষের চিরন্তন সমস্যার প্রতি নিবদ্ধ। জ্ঞানযোগী প্রতিদিনের প্রয়োজনকে ভোলেন না, কিন্তু সাময়িক সমাধানে তাঁর মন তৃপ্ত হয় না। মওলানা আজাদের চরিত্রে যে সমদর্শিতা ও ন্যায়পরায়ণতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি, তার উৎসও এই জ্ঞানসাধনার মধ্যেই মিলবে। সাহিত্যিকের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দরদ নিয়ে তিনি ব্যক্তি ও সমাজের দুঃখক্লেশ অনুভব করেছেন, কিন্তু তাদের সমাধানে এনেছেন জ্ঞানযোগীর দুঃখসুখে সমবোধ এবং সর্বমানুষের প্রতি সহানুভূতি। বিতৃষ্ণা বা অনুরাগ, ভয় অথবা লোভ আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে বলেই বারবার আমাদের বিচারে ভুল হয়। রাগ অনুরাগ লোভ ভয় বর্জন করে কেবল বুদ্ধির অনাবিল দৃষ্টি দিয়ে কোনো প্রশ্নের যদি আমরা বিচার করি তবে কিন্তু ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের হিসাব এবং নিজের পছন্দ-অপছন্দকে বহুলাংশে বর্জন করতে পেরেছিলেন বলে মওলানা আজাদ সমস্ত সমস্যার যে নৈর্ব্যক্তিক বিচার করতেন অনুগামী ও বিরোধী সকলেই তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিত। জ্ঞানযোগীর যে নিস্পৃহতা, তার ফলে নিন্দা-প্রশংসাও তাঁকে সহজে স্পর্শ করতে পারত না। দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্যে এই যে অবিচল মনোভাব, তার ফলেই তাঁর ব্যক্তিত্বের অপূর্ব বিকাশ ভারতবর্ষের চিত্ত জয় করেছিল।

রাজনৈতিক সংগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব করেন, তাঁদের জীবন সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের বোধ হয় কোনো কথা বা কাজই ব্যক্তিগত সীমায় আবদ্ধ থাকে না। তাঁরা হয়তো তা রাখতে চানও না। সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজনৈতিক জীবনযাপন করেও মওলানা আজাদ কিন্তু সর্বদাই জনতার দৃষ্টি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন। তিনি যেভাবে সর্বসাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতেন, বোধ হয়

আর কোনো রাজনৈতিক নেতার জীবনে তার দৃষ্টান্ত মিলবে না। অসাধারণ বাগ্মী হয়েও বক্তৃতায় তাঁর অসাধারণ বিরাগ ছিল, এত কম বক্তৃতা বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোনো রাজনৈতিক নেতা করেন নি। রাজনৈতিক নেতা সাধারণতঃ জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান, জনগণের মনোযোগ না পেলে ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েন, কিন্তু মওলানা আজাদ যেভাবে জনগণের সংস্পর্শ এড়িয়ে জনতার দৃষ্টির আড়ালে জীবনযাপন করবার চেষ্টা করতেন, না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। সমস্ত জীবন যিনি জনতাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন, তাঁর মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষের জনতা যে বিপুল সমাবেশে তাঁর শবানুগমন করেছিল, তার নজির বোধ হয় কেবল এ দেশেই মিলবে।

আত্মপ্রচারে মওলানা আজাদ বিমুখ ছিলেন, তার ফলে কিন্তু জনতার কৌতূহল আরও বেশি করে তাঁর বিষয়ে জানতে চেয়েছে। তাঁকে নিয়ে যেসব সত্য-মিথ্যা গল্প প্রচারিত হয়েছে তার সংখ্যাও কম নয়। তিনি কলকাতার বাড়িতেই শিক্ষালাভ করেছিলেন, কোনোদিন কোনো বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা বারবার বলা হয়েছে যে, মওলানা আজাদ কায়রো শহরের আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বহুবার মওলানা আজাদ এ কথার প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজও বহুলোকের মন থেকে এ ভ্রান্ত বিশ্বাস কাটে নি। অল্পবয়সেই তিনি পাণ্ডিত্যের যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন অন্য একটি বহুল প্রচলিত গল্পে তার পরিচয় মেলে। মওলানা আজাদের বয়স তখনো কুড়ি বৎসর হয় নি, কিন্তু তিনি যে নিপুণতার সঙ্গে এক খ্যাতনামা পণ্ডিতের সঙ্গে পত্র মারফত আলোচনা চালিয়েছিলেন, তাতে পণ্ডিতবর মুগ্ধ হন এবং মওলানা আজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয়-লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি এ কথাও বলেন যে, মওলানা আজাদ এলে বাক্যালাপ করে দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। তরুণ মওলানা আজাদ যখন বর্ষীয়ান্ পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করতে এলেন পণ্ডিত তখন ভেবেছিলেন যে, মওলানা আজাদের হয়তো অসুখ করেছে, তাই তিনি নিজে আসতে পারেন নি, ছেলেকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আর-একটি গল্পও বহুপ্রচারিত। লাহোরে একটি বিদ্বজ্জনসভায় মওলানা আজাদকে প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি যখন এসে পৌঁছলেন তখন সেই প্রবীণ সুধীসভায় এই তরুণ যুবককে প্রথমে প্রবেশাধিকারই দেওয়া হয় নি।

পৃথিবীতে মানুষ যা চায়, মওলানা আজাদ তার কোনো কিছু থেকেই বঞ্চিত হন নি। বংশগৌরব অর্থ প্রতিষ্ঠা যশ— সব কিছুই তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে পেয়েছেন, কিন্তু মানুষের দুঃখের জন্য দরদ ও ন্যায়ের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে সমস্ত জীবন তাঁর সংগ্রাম ও সাধনার মধ্যেই কেটেছে। অসাধারণ শক্তি ও গুণের অধিকারী হয়েও তাই চিরদিন নিঃসঙ্গ ভাবেই তিনি দিন কাটিয়েছেন।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি মুক্তির পূজারী। সেই সত্যান্বেষণের সঙ্গে মিলেছিল অসাধারণ সহনশক্তি ও তিতিক্ষা। অপরাধ তিনি সহ্য করেন নি, কিন্তু অপরাধীকে ক্ষমা করতে তাঁর কখনো দ্বিধা হত না। বুদ্ধির স্বাধীনতা, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, ও দুঃখীজনের জন্য যে সহানুভূতি তাঁর সমস্ত কর্মপ্রেরণার মূলে, আমরা যদি সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতবর্ষের সেবা করি, তবেই তাঁর স্মৃতির প্রতি সত্যিকার মর্যাদা দেখানো হবে।

হুমায়ুন কবির

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ। শ্রীযুক্ত অমল হোম -প্রণীত। প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড্ সন্স্। মূল্য ২৸৹

রবীন্দ্রনাথকে যখন আমরা মনে মনে প্রণাম নিবেদন করি, স্মরণ করি— জীবনের এমন একটা দিনও তো দেখি নে যখন তাঁকে ভুলে থাকা যায়— তাঁরই ভাষায় তাঁকে সম্বোধন করে বলতে পারি : স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি তুমি। সেই স্বদেশের বাণীমূর্তি কবি, তাঁরই জীবনের ও চরিত্রের কয়েকটি দিক, লেখক এই গ্রন্থে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাতে যেমন আছে সক্ষম সাংবাদিকের নিপুণ তথ্য -সন্ধান ও পরিবেশন তেমনি দেখতে পাই বিদগ্ধ মনের সুরুচি ও সদ্‌বিচার। অর্বাচীন ছাড়া কেউ মনে করবে না— রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আছে ব'লেই লেখক রবীন্দ্রচরিত-আলোচনায় অনধিকারী। আমাদের দেশের সংস্কার এই যে, আদৌ শ্রদ্ধা। নইলে সত্যই যা মহান্ ও বিরাট তাকে ধারণা করা যায় না, চেনা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব ও বিশালতা সম্পর্কে আজও কোনো সন্দেহের অবকাশ কোথাও আছে কি? অবশ্য, মহাজনের কাছে ঋণ অস্বীকারের জন্য অনেক অধমর্ণ অনেক কুটিল ও অনুত্তম কৌশল অবলম্বন করে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঋণ-স্বীকারের পন্থা সকলেরই অনিন্দনীয় না হলেও— ঋণ-পরিশোধের কোনো প্রশ্নই ওঠে না— রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ স্বদেশবাসী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সেরূপ কোনো অস্বাভাবিক অস্বীকারের মনোবিকারে পীড়াগ্রস্ত নন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে, স্বদেশ সম্পর্কে, মহান্ মানবভাগ্য এবং সেই ভাগ্যকে অধিকার করার পন্থা সম্পর্কে যে-সব উক্তি করেছেন বা যে দিক-নির্দেশ করেছেন তাতে প্রায়শঃই আশ্চর্য ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে, এবং তার সত্যতা বা উপযোগিতা আজও তো নিঃশেষিত হয়ে যায় নি— এমন-কি, সব কি তাঁর দেশের লোকের, জ্ঞানী ও গুণীগণের ধারণার মধ্যেও এসেছে? যে সূর্যের উদয় দেখা যায় নি দিক্‌চক্রবালে তারই প্রথম আলোকস্পর্শ এসে পড়ে পূর্বাভিমুখী তুঙ্গ গিরিশিখরে। তেমনি তো যথার্থ যিনি কবি এবং মনীষী, তাঁরও ধ্যানধারণায়, উপলব্ধিতে ও জীবনে। তার এই একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে যে, সমসাময়িক ভারতের আর-একজন বিরাট পুরুষ মহাত্মা গান্ধী, নিজের জীবনে ও জাতির জীবনে 'সত্যের যে অভিনব পরীক্ষা'য় অগ্রসর হয়ে মানবসমাজে এক যুগান্তরের সূচনা করে গিয়েছেন, তার অনেক তত্ত্ব ও তাৎপর্য রবীন্দ্র-রচনায় তৎপূর্বেই বাঙ্ময় ও মূর্ত হয়ে উঠেছিল। কেননা, কবি যে স্বদেশ-আত্মারই বাণীমূর্তি, আর মানব-আত্মারও।

আলোচ্য গ্রন্থের পরিমিত আয়তনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পাঁচটি, বা ঠিক বলতে গেলে চারটি, প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, কেরাণী রবীন্দ্রনাথ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের চিঠি, অমৃতসর কংগ্রেস ও রবীন্দ্রনাথের চিঠি এবং সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-সমালোচনা। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রসঙ্গকে বস্তুতঃ একটি প্রসঙ্গই বলা চলে এবং গ্রন্থের এই অংশেই আমাদের নয়ন ও মন, আগ্রহ ও অভিনিবেশ, সর্বাগ্রে আকৃষ্ট হয় এবং বার বার ফিরে আসে। প্রথম ও শেষ প্রবন্ধের মধ্যে এই যোগ আছে যে, উভয়ত্রই রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের অপরিশোধ্য ঋণ আর সেই ঋণ আমরা কী ভাবে শোধ করছি অথবা কী ভাবে করা উচিত তারই নিপুণ আলোচনা আছে। অধিকাংশ আলোচনাই সারালো এবং ধারালো হয়েছে বহু টীকা-টিপ্পনী এবং 'সংযোজনী'র সমাবেশে। সুদক্ষ

সাংবাদিক অমল হোম মহাশয়ের কাছে আমাদের যা সংগত প্রত্যাশা তার কিছুই তিনি অপূর্ণ রাখেন নি।

পঞ্জাবের কুখ্যাত হত্যাকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথের যে উদ্‌বেগ, আবেগ, অভিজাত রোষ এবং সুদূরসম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিক্রিয়া তার একটি প্রোজ্জ্বল চিত্র এঁকে তুলেছেন অমল হোম— এজন্য লেখকের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। দেশব্যাপী নিদারুণ দুঃখের রাত্রিতে কেউ যখন কথা খুঁজে পায় নি, আর কথা বলতে সাহস করে নি, তখন একলা দেশের কবি কথা বলেছেন; দেশের চরম লজ্জা ও অপমানের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার ঊর্ধ্বে যেখানে তাঁর স্বদেশের শাশ্বতমহিমা, তাঁর আরাধ্য মানবতার নিরঞ্জন রূপ, তার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়েছেন— রবীন্দ্রনাথের এই সাহস ও এই অপ্রমত্ততার কথা ভাবলে আজও সত্যই আমাদের বুক দশ হাত হয়ে ওঠে এবং (মাপ কোরো কবি!) আমরা বাঙালি ব'লেও একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করি। রবীন্দ্রনাথ সেদিন সমস্ত ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, অবমানিত মানবতারও প্রতিনিধিত্ব করেছেন— উভয়েরই বাণীমূর্তিরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর নির্ভীক সত্তা।

পূর্বেই একপ্রকার বলেছি প্রথম ও শেষ প্রবন্ধে আছে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসীর, বিশেষতঃ বাঙালির, রবীন্দ্র-চর্যার চর্চা। হরির ভজনা হয় মিত্রভাবে, আর শত্রুভাবেও, পুরাকথা স্মরণ ক'রে এইটুকুই শুধু বলতে পারি। শত্রুভাবের ভজনায় শীঘ্র তাঁকে পাওয়া যায় অথবা আদৌ পাওয়া যায় কি না, তা ঠিক বলতে পারব না। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনকালে বিরূপ সমালোচনা সহ্য করেছেন অজস্র এবং আজও যে তার অন্ত হয়েছে তা অবশ্য নয়। এক-প্রকার অপ-সমালোচনা আছে যা পুকুরের পানার মতো (আশা করি কলিকাতা-বাসী বাঙালিরও একেবারে অপরিচিত নয়)— যতই না জলে ঢেউ তুলে দূর করে দাও, কিছুক্ষণ বাদে আবার চারি দিক থেকেই ঘিরে আসে। আর-এক-প্রকার সমালোচনার ভাবখানা সেই তারকার-মুখে-ছাই-দিয়ে-আসা হাউইয়ের মতোই। শেষ উপমাটি অবশ্য আংশিক। কারণ, এই-সব বাক্যের তুবড়িবাজি আর বিভ্রান্তমতির হাউইগুলি নিবতে কিছু সময় লাগে (ইতিমধ্যে ভালো ছাপা ও চক্‌চকে বাঁধাইয়ের গুণে— ভাষাও ঝক্‌ঝকে সন্দেহ নেই— হাতে হাতে ফেরে এবং 'কৃষ্টি'বানের সোফায় টেবিলে বিরাজ করে) এবং সূর্যনক্ষত্রের জ্যোতির কিছু হ্রাসবৃদ্ধি না ঘটালেও হাট-বাটের মানুষের চোখে অদ্ভুত ধাঁধা লাগায় সন্দেহ নেই— তাই প্রতিবাদেরও প্রয়োজন আছে স্বীকার করি। সে প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছেন অমল হোম যথোচিত জোর দিয়ে এবং যোগ্যতার সঙ্গে। জানি সব কথাই সার্থক নয় আর সব কর্ম নয় অবন্ধ্য। কালের পুতুল কলের পুতুলের মতোই দম ফুরিয়ে নিষ্ক্রিয় ও নির্বাক্ হয়ে যাবে— যেমন তার আগে তেমনি তার পরেও সেই বাণী ধ্বনিত থাকবে যার উদ্ভব মানব-আত্মার অতলস্পর্শী উপলব্ধিতে এবং আকাশস্পর্শী ধ্যানে। অতল মানেই 'রসাতল' নয় এবং আকাশ নয় শূন্য। সুতরাং, বিকৃত বা ভ্রান্ত রবীন্দ্র-সমালোচনার অমল হোম যা উত্তর দিয়েছেন তাই যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে। অখিল-পাণ্ডিত্য, এমন-কি তার ভানটুকুও না থাকাতে, আমাদের এই বিতর্কে যোগ দেওয়া অনাবশ্যক ছিল। যোগ দিতেও চাই নে। তবে একটি পুরাতন কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সে হল এই যে, আজ যা উগ্রভাবে 'আধুনিক', কালই তা বাসি ও বস্তাপচা'র পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। কতকগুলি আছে ক্ষণকালীন রুচি প্রবৃত্তি মনোভাব ও 'ভঙ্গী'— একান্তভাবে তার উপরেই নির্ভর করলে কোনো বড়ো সাহিত্য বা শিল্পই বেশিদিন টিকত না— শত শত বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে আজও আমাদের আনন্দ দিত না।

শেক্‌স্‌পীয়রের সমাজ নেই, রবীন্দ্রনাথের সমকালীন সমাজ বা রীতি-নীতি থাকবে না— তাঁরা, অর্থাৎ তাঁদের কৃতি, আছে ও থাকবে সেই গুণেই যাতে তাঁরা শাশ্বত মানবকে, মানবের প্রাণ মন আত্মাকে ধারণা করেছেন ও রূপ দিয়েছেন। তাঁদের সৃষ্টির একটি বাইরের নাম রূপ পরিচয় আছে, সেটি তার পরিহিত বসন-ভূষণ মাত্র— আর-একটি আছে স্থায়ী সত্তা, অজর অমর দেহ ও আত্মা; সেটি চিরমানবের সজীব সত্তার সঙ্গে অভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা উঠেছে র‍্যাঁবো-রিল্‌কের। এ প্রসঙ্গে দু দিকের সৃষ্টিই যিনি সাক্ষাৎভাবে ও সার্থকভাবে জানেন সেই বিদেশী অধ্যাপক (বিদেশী কেন বা বলব? কেউ আছেন সব-দেশী। কেউ বা স্বদেশেই প্রবাসী, যাঁরা ভাবেন বিলেতের আঁতুড়ঘরে তাঁদের মনের নাড়ী-কাটা, বিলেতী ধাই-মা'রই স্তন্যে প্রাণধারণ) পিয়ের ফালোঁ এস. জে.'র একটি লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃত করে দিই এখানে—

> এই 'মহত্তর ব্যক্তিত্বের সংশ্লেষ'[১] র‍্যাঁবোর সাহিত্যে নেই বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নন। মানবীয় সত্তার উপলব্ধি তাঁর কাব্যের মধ্যে সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গীণ রূপে রূপায়িত হয়ে ফুটেনি।· · নরক যেমন সত্য স্বর্গও তেমনি সত্য, বীভৎসের চাইতে সুন্দর অবাস্তব নয়, মানবীয় জীবনের অসংলগ্নতা ও অশান্তির অভিজ্ঞতা যে অর্থে অতলস্পর্শ হতে পারে পূর্ণতা ও শান্তির অভিজ্ঞতা সেই অর্থে অতলস্পর্শ হবে না কেন?··· আশা ও বিশ্বাস, পুণ্যের উপলব্ধি ও মানসিক স্থিতপ্রজ্ঞতা যে কত দীর্ঘ সাধনার সাপেক্ষ, কত বাস্তব পূর্ণতার পরিচায়ক, সেই কথা অনেকে হয়তো বোঝেন না।· · র‍্যাঁবো এমন অনেক-কিছু লিখেছেন যা রবীন্দ্রনাথ লেখেন নি, লিখতে হয়তো পারতেন না। পিকাসো এমন অনেক ছবি এঁকেছেন মাইকেল আঞ্জেলো যা আঁকতে পারতেন না, এজরা পাউণ্ড্ ও জয়্‌স্ এমন কাব্য ও উপন্যাস রচনা করেছেন দান্তে বা বাল্‌জাক যা রচনা করতে পারতেন না। তাঁরা মহৎ শিল্পী কবি বা ঔপন্যাসিক হলেও বিশ্বভূমিকায় তাঁদের স্থান কি মাইকেল আঞ্জেলো দান্তে ও বাল্‌জাকের উর্ধ্বে?· · র‍্যাঁবো· · শ্রেষ্ঠতম ফরাসী কবিদের মধ্যে গণ্য নন; রাসিন উগো বোদলের ভালেরি ক্লোদেল র‍্যাঁবোর উর্ধ্বে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু যে বিশ্বসাহিত্যের ভূমিকায় শ্রেষ্ঠতম কবিদের মধ্যে গণ্য, এই কথা কি অগ্রাহ্য হতে পারে? কেবল বহুমুখীনতা ও প্রাচুর্যের গুণেই নয়, **মানবীয় জীবনের অখণ্ড ও "অতলস্পর্শ" অভিজ্ঞতার গুণেও।**[২]

কথা উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টির মূল্য কী। যাঁরা 'সৃষ্টিকর্তার কাঁধের উপর চ'ড়ে ব্যায়ামকর্তার বাহাদুরি'[৩] দেখলেই বাহবা দেন, তান-বাটের মালসাট-ব্যতীত গান মাত্রই যাঁদের কাছে অনাদরণীয়, অন্তত অপাংক্তেয়, তাঁরা বলেন যথার্থ মূল্য, স্থায়ী মূল্য কিছু নেই। হবেও বা। সংগীততত্ত্বে আমরা আনাড়ি। অবসরে বা অনবসরে অ্যামেচারী চর্চায় বা চর্যায় এ বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করব তাও তো হয়ে ওঠে নি। সুতরাং জ্ঞানী ও গুণী -জন এ বিষয়ে কী বলেন সেইটে প্রথমে জানা দরকার। সকল মুনির অভিমত অবশ্য একরূপ হবার নয়। না হলেও, নিম্নসংকলিত উক্তির কী ইঙ্গিত, কী তাৎপর্য সেটি অধিকারী ব্যক্তিরা ভেবে দেখবেন—

---

১ জীবনানন্দ দাশের উক্তি

২ ছিন্নবাধা বালক: শারদীয় দেশ, ১৩৬৩, পৃ ১৮৩
রবীন্দ্রনাথ কতটা সামাজিক রীতিনীতির উর্ধ্বে, কিরূপ সংস্কারমুক্ত, তা আমরা অন্যত্র বলতে চেষ্টা করব। স্থূলাক্ষর আমাদের।

৩ দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, পৃ ৪৮২

আমাদের দেশের যথার্থ সঙ্গীত কেবল ধ্রুপদ ও কীর্ত্তনে আছে, আর সব ইসলামী ছন্দে গঠিত হইয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আমাদের সঙ্গীতে খুবই উন্নতি হইতেছিল, এমন সময়ে মুসলমানেরা আসিয়া সেটিকে এমনভাবে করতলগত করিল যে সঙ্গীততরুটি আর বাড়িতে পারিল না।· · ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতিতে বিজ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু সত্যকার সঙ্গীত রহিয়াছে কীর্ত্তনে— মাথুর বিরহ প্রভৃতি রচনা-বলীতে। কেননা উহাতে ভাব আছে। ভাবই সঙ্গীতের প্রাণ, সকল বিষয়ের গোপন উৎস। লোক-সঙ্গীতে গীতি-মাধুর্য্য অধিকতর। ধ্রুপদের বিজ্ঞান কীর্ত্তনের সঙ্গীতের সহিত মিলিত হইয়া আদর্শসঙ্গীতের সৃষ্টি করিবে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ধ্রুপদ গানই একমাত্র উপযোগী।[৪]

সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ অপরাধ নেবেন না, আমি তো স্বামী বিবেকানন্দের এবংবিধ উক্তিতে আশ্চর্য ভবিষ্যদ্‌বাণী এবং রবীন্দ্রসংগীতেরই দ্ব্যর্থরহিত সমর্থন ও প্রাণ-খোলা প্রশস্তি শুনতে পাচ্ছি। যে 'আদর্শ সঙ্গীতের' আকাঙ্ক্ষা ছিল এই মহাপ্রাণ ভাবুকের, প্রধানতঃ ধ্রুপদের দেহ ও কীর্তনের প্রাণ একত্র ক'রে, লোকসংগীতেরও রস আকর্ষণ ক'রে, রবীন্দ্রগীতিই তার উদ্দীপ্ত জীবন্ত প্রতিমা হয়ে উঠেছে। বদ্ধমূল সংস্কার একান্তই দুস্ত্যাজ্য না হলে, সংগীতরসিক ও সংগীতজ্ঞগণ স্বামীজির কথাগুলি নিয়ে একটু ভেবে দেখতে পারেন। তাতে দেখা যেতেও পারে, রবীন্দ্রসংগীতের অনুকরণ হয়তো ভয়াবহ (কোন্ অনুকৃতিই বা বিকৃতিতে গিয়ে শেষ হয় না ?), তবু রবীন্দ্রসংগীত (তার স্বভাবে ও স্বধর্মে) পরম আদরণীয়।

কানাই সামন্ত

মহাসোভিয়েট। শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী। বিচিত্রা, কলিকাতা। দাম তিন টাকা আট আনা।

লেখিকা সোভিয়েট ইউনিয়নে অল্প কয়েকদিন ঘুরেছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে সে বিরাট ও বিচিত্র ভূখণ্ডের সব-কিছু দেখা বা তার হালচাল সব বোঝা একেবারে অসম্ভব। তবু তারই মধ্যে ও দেশের সরকারের আনুকূল্যে যতটা দেখা সম্ভব তা তিনি দেখেছেন। যা দেখেছেন তাতে চিন্তার, বিস্ময়ের ও আনন্দের যথেষ্ট খোরাক পেয়েছেন, এবং এই উপভোগ্য বইখানিতে পাঠককে সে চিন্তা ও অনুভূতির ভাগ অতি সহজেই দিতে পেরেছেন।

প্রকৃতিকে জয় করে মানুষের কাজে লাগানো, এবং বহুমুখী শিক্ষায় অর্জিত আশ্চর্য কর্মকুশলতার সাহায্যে জনসাধারণের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য এনে দেবার অনলস চেষ্টা দেখে লেখিকার স্বভাবতই ভালো লেগেছে। বোধ হয় তাঁর সবচেয়ে ভালো লেগেছে উজবেকিস্তান দেখে। গণজীবনের সার্বিক উন্নয়নের যে বিরাট প্রচেষ্টা সারা সোভিয়েট দেশ জুড়ে অবিরত চলেছে, সে কর্মে সিদ্ধিলাভের চেহারাটা যেন উজবেকিস্তানে দেখতে পাওয়া যায়। যে প্রদেশে বিশ-পঁচিশ বছর আগেও মনুষ্যোচিত জীবনযাত্রা সম্ভব ছিল না, সেই অনুন্নত অস্বাস্থ্যকর কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভূখণ্ড এত অল্পকালের মধ্যেই একেবারে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন সেখানে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন, জীবনযাত্রার মান উন্নত, আধুনিক সুখসুবিধা সহজপ্রাপ্য। সকল প্রকার শিক্ষার সুযোগ থেকে কেউই বঞ্চিত নয়, এবং শিক্ষান্তে সকলেই কাজে নিযুক্ত। শিশু থেকে বৃদ্ধ কেউ অবহেলিত নয় ; শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্ম ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা মেয়েপুরুষ সকলেরই জন্য। সর্বত্র পারস্পরিক

৪ ভূমিকায় সংকলিত স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত : শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিক স্মৃতিগ্রন্থ : সাধন-সঙ্গীত (১৩৪৩)

সহযোগিতা ; "সুযুক্তি ও সুনিয়মে চালিত ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজে একে অন্যের জন্যে এমনভাবে ত্যাগ করছে যাতে উভয় পক্ষই সার্থক হয়।" একটি বিস্তৃত সুন্দর বাগান দেখাতে নিয়ে গিয়ে তাঁর রুশীয় সঙ্গিনী দোভাষী নাদিয়া যখন বলেন যে, সে বাগান স্থানীয় ছেলেমেয়েদের নিজ হাতে তৈরি, তখন লেখিকা বিস্ময় প্রকাশ করাতে নাদিয়াই বিস্মিত হন। "এতে তাদের ব্যক্তিগত লাভ কী?" এই প্রশ্নের উত্তরে নাদিয়া বলে ওঠেন, "তাদের দেশ সমৃদ্ধ হলে সুন্দর হলে লাভ নেই! এখানে তো তাদের ছেলেমেয়েরাই খেলে বেড়াবে।"

তুলনায় তখনই লেখিকার নিজের দেশের কথা মনে পড়ে যায়। একটা ছোট কাজও সুসম্পন্ন করা এ দেশে কি কঠিন! তিনি লিখছেন: "শিলিগুড়ি-কালিম্পং রাস্তায় খুঁড়িয়ে চলা কাজ দেখেছি।··মজুর আছে হাজারে হাজারে, কত ওভারসীয়ার বাবু, তার উপরে সাহেব, বড় সাহেব। মজুরেরা সেখানে সারি সারি দাঁড়িয়ে এক-একটি আধসেরি পাথর হাই তুলতে তুলতে এ ওর হাতে তুলে দেয়, ওভারসীয়ার বাবুরা তখন মৌজ করে চুরুট টুরুট খান।" কাজ যত মন্থর গতিতে চলে, মজুর থেকে কণ্ট্র্যাক্টর সকলেরই মুনাফা লাভ ততই বাড়ে, কাজেই ভালো করে বা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার কি প্রয়োজন? এই প্রসঙ্গে লেখিকার শেষ কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য: "লোভের বিষাক্ত কণ্টকটি তুলে নিলে যে সাধারণ মানুষই অসাধ্যসাধন করে তার বহু প্রমাণ দেখলাম ও দেশে।··এই সুন্দর পুষ্পশোভিত, সজল বায়ুবাহিত শান্তিতে, বিগত-মরুতাপ মানুষের আনন্দ দেখে বুঝলাম সেই বাণীর সত্যতা— ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো।"

ও দেশে সর্বত্র তিনি এবং তাঁর সঙ্গিনীরা অভিনন্দিত হয়েছেন ভারতীয় বলে। ভারতীয়রা যে শান্তির বাহক, তারা যে অহিংস! শুনলে গর্বও হয় লজ্জাও হয়। ভারতের মহাপুরুষরা প্রেম ও মৈত্রীর যে সাধনা করে গিয়েছেন, অপূর্ব যেসব শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করে গিয়েছেন, তা নিশ্চয়ই মৃত্যুঞ্জয়ী। সে কথা ভেবে যেমন আনন্দ হয় তেমনি অধোবদনে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, সে প্রেম মৈত্রী ও শান্তির মৃত্যুঞ্জয় রূপ আজকের দিনের ভারতবর্ষে আশ্চর্য রকম প্রচ্ছন্ন।

. এ বই পড়ে এক নতুন জগতের পরিচয় পেয়ে সম্ভবত অনেকেই খুশি হয়েছেন। যে দেশ সম্বন্ধে কিছুদিন আগেও অনেকের শুধু একটা বিরুদ্ধ ভাব নয়, ভীতি ও আতঙ্কও ছিল, সেখানে যে এত দিকে সাধারণ মানুষ এত এগিয়েছে, এমন সেবায় ও কর্মে সার্থক, আনন্দোজ্জ্বল জীবনযাপন করছে, তা আমার মত আরো দশ জন অজ্ঞ লোকের কাছে নিশ্চয়ই একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার। সে আবিষ্কারের পথ খুলে দিয়েছে বলে এ বই আমাদের কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারে। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখায় এমন-একটা আন্তরিকতার পরিচয় পাই যে, তাঁর কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়। তাঁর দেখবার চোখ আছে, বোঝবার বুদ্ধি আছে; তাঁর মন একাধারে জিজ্ঞাসু ও সংবেদনশীল। তিনি সাধারণ মানুষেরই প্রতিনিধি, কোনো দলের দলী নন; কারো সপক্ষে বা বিপক্ষে প্রচার চালানো তাঁর উদ্দেশ্য নয়। নতুন কিছু দেখে ভালো লাগলে তিনি খুশি হন, কিন্তু উদ্বেল ভাবাবেগে সম্বিৎ হারান না, যেহেতু মূল্যবোধ তাঁর সহজাত।

তাঁর লেখা সরস ও অনাড়ম্বর, পাণ্ডিত্যে বিশুষ্ক নয়, তত্ত্বজালে জটিল নয়; সোজা কথা ঘুরিয়ে বলে অসামান্য হবার প্রয়াস তাতে কোথাও নেই।

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

স্বীকৃতি: এই সংখ্যায় মুদ্রিত 'দোলনচাঁপা' চিত্রের ব্লক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

II সা -া । -ন্সা -রজ্ঞা -া রা I
দি ০ ০০ ০০ ০ ন

I জ্ঞা -া -া -পমা । -পজ্ঞা -া -রসা জ্ঞঋা । -া -সা -া ঋসা । -া -ন্া -দ্ন্া -সা I
যা ০ ০ ০০ ০০ ০ ০য় রে০ ০ ০ ০ দি০ ০ ০ ০০ ০

I ন্া সা -া -া । -া ন্সা -রজ্ঞা -া । -া জ্ঞা -পমা -পজ্ঞা । -া -ঋসা -ঋন্া -া I
ন যা ০ ০ য়্ বি০ ০০ ০ ০ যা ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০

I সা -া -া ন্া । -া সা জ্ঞা -রা । -সা সা -া -ঋসা । -ঋন্া -সা -ন্া -া I
দে ০ ০ স্বা র্ থ কো ০ ০ লা ০ ০০ ০০ ০ ০ ০

I দ্া প্া -া -া । -দ্প্া -দ্ম্া -া -া । ম্া প্া ন্া -া । -া -সন্া -সদ্া -া I
হ লে ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ছ ল না ০ ০ ০০ ০০ য়্

I ন্া -া -ন্সা ন্া । সা -া -া -ন্সা । -রজ্ঞা -া -পমা -পজ্ঞা । -া -ঋা -সা -া I
বি ০ ০০ ফ ল ০ ০ ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০

I জ্ঞঋা -া -সা -ন্া । -দ্ন্া -সা ন্া সা । -া -া II
বা০ ০ ০ ০ ০০ ০ স না ০ য়্

সা II সা মা -া -া । -জ্ঞা মা পা মা I
এ সে ছ ০ ০ ০ ক্ষ ণ ত

I পা -া -া জ্ঞা । জ্ঞা মা মা -া । -জ্ঞমা -জ্ঞমা -পা -া । -া [প]মা -া -জ্ঞরা I
রে ০ ০ ক্ষ ণ পূ বে ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ যা ০ ০০

I মজ্ঞা -া -রসা জ্ঞঋা । -া -সন্া -দ্ন্া -সা । ন্া সা -া -া । ন্া ন্া সা সা I
ই০ ০ ০০ বে০ ০ ০০ ০০ ০ চ লে ০ ০ জ ন ম কা

I ঋঋা -সসা -ন্া দ্া । প্া -া -া জ্ঞা । -া জ্ঞা রা জ্ঞা । -া জ্ঞা -পমা -পজ্ঞা I
টে০ ০০ ০ বৃ থা ০ য়্ বা ০ দ বি বা ০ দে ০০ ০০

I -া -রসা জ্ঞঋা সা । -ন্া -দ্ন্সা ন্া সা । -া -া II[১]
০ ০০ কু০ ম ০ ০০ন্ অ ণা ০ য়্

রহস্যদীপ
শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্দশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮০ শক

পত্রালাপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক সভায় আপনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমি বড় আনন্দ ও সান্ত্বনা পাইয়াছি। বিদ্যাসম্বন্ধে দেশের লোকের মনে সম্প্রতি যে ভেদবুদ্ধি জন্মিয়াছে তাহাতে মনে বড় বেদনা পাইয়াছি। কোনোকালেই বিদ্যাকে খণ্ডিত করিয়া দেখা উচিত নহে—বর্ত্তমান কালে তাহা আরো অনুচিত। কারণ, বর্ত্তমানে সকলজাতির মানুষ পরস্পরের গোচরে আসিয়াছে—এই ইন্দ্রিয়ের গোচরতাকে ভেদবুদ্ধির তিরস্করণিকার দ্বারা আবৃত করা, বিধাতার অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা। মহীশূরের ছাত্রদের মনকে সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ হইতে আপনি রক্ষা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন ইহা আপনারই যোগ্য কাজ হইয়াছে, আমিও এইরূপ কাজেরই ভার লইয়া চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি কিন্তু বড়ই বাধা। নিজেকে বড় একলা বোধ হয়। চিরকালই আমি যে কোনো কাজ করিয়াছি তাহা একলাই করিতে হইয়াছে। সঙ্গী সহায় আহ্বান করিবার শক্তি আমার নাই। তাহাতে অনেক সময়ে কাজের বিশুদ্ধ রূপ রক্ষা করিবার সুবিধা হয় কিন্তু মানুষের সঙ্গ ও সঙ্গতির অভাবে হৃদয় ব্যথিত ও শ্রান্ত হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় আমার মধ্যে যে কবি আছে সে আমাকে তিরস্কার করে। সে আমাকে বলে, "কোনো Institution গড়িবার জন্য তুমি কি সনন্দ লইয়া আসিয়াছিলে? সে তোমার কাজ নয় বলিয়াই সে কাজের যথার্থ সহায় তুমি পাও না। বিধাতা তোমাকে বঞ্চিত করিয়াই পথ দেখাইতেছেন।" বস্তুত institution অনেকের সহকারিতা ব্যতীত হয় না—কিন্তু কবির নিজের কাজটি বিনা সহায়ের কাজ। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই institution ভাঙে গড়ে এবং পরিবর্ত্তিত হয় কিন্তু গান জিনিষটি কালতরঙ্গের উত্থানের পতনের আঘাতে ডোবে না, তার উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়। সৃষ্টিকার্য্যের সেই চিরকালীন ভাসান-খেলায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল। আমি কিন্তু আমার বাঁশী ফেলিয়া হঠাৎ এঞ্জিনিয়ার সাজিয়া কালস্রোতের, মাঝখানে একটা দীপস্তম্ভ গড়িবার চেষ্টা করি কেন? সে কাজটা ভাল এ কৈফিয়ৎ পাকা কৈফিয়ৎ নহে। ভালর বহুধা রূপকে প্রয়োজনের খাতিরে নষ্ট করা ত ভাল নহে। ভালর কোন্ রূপের ভার আমার উপর ছিল? ক্লান্তির সময়ে এই সব তর্ক কেবলই মনের মধ্যে মথিত হইয়া উঠিতেছে। টমসন তাঁহার কেতাবে[১] আমাকে আমার বায়ুমণ্ডল হইতে ছিন্ন করিয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। ইহাতে কাজ সহজ হয়—রেখার স্পষ্টতা পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে সেই অতিস্ফুটতাই সত্যের অসম্পূর্ণতা। মানুষের কেবল যে ব্যক্তিত্ব আছে তাহা নহে তাহার সম্বন্ধ আছে—সেই সম্বন্ধ দূরব্যাপী এবং তাহা অতি-নির্দ্দিষ্ট নহে। আমার সেই

সম্বন্ধের সত্যটি টমসন দেখিতে পান না। তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া দেখিয়াছি যে তিনি ঠিকমত জানেন না যে, বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেনে এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে। আমার রচনায় সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব নাই, মিলন আছে তাহার কারণটি কেবলমাত্র আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতিতে নাই আমার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছে; সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বেড়ার ভিতর দিয়া ইহা বুঝা যায় না। আমার পিতার হৃদয়ে হাফিজ ও উপনিষদের এই সঙ্গম ঘটিয়াছিল— সৃষ্টির পক্ষে এই রূপ দুই বিষয়ের মিলনের প্রয়োজন আছে— সৃষ্টিকর্তার চিত্তের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আছেন নহিলে একভাবে সৃষ্টি হইতেই পারে না। কিন্তু কবির পক্ষে এ সকল তর্ক যদি ধৃষ্টতা হয় তবে মাপ করিবেন। ইতি ১৪ই কার্ত্তিক ১৩২৮

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহীশূর
২৪শে নভেম্বর ১৯২১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্রের উত্তরে প্রথমেই বলিয়া রাখি যে ডিসেম্বর মাসে খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে আমি দেশে যাইয়া কলিকাতায় হউক বা বোলপুরে শান্তিনিকেতনে হউক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনার প্রবাস-সময়ে শান্তিনিকেতনে একবার যাইয়াছিলাম— আপনার উপস্থিতিতে একবার যাইতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

Sylvain Levi মহাশয়ের সহিত লণ্ডনে একবার আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি মহোদয় লোক— তিনি শান্তিনিকেতনে আসিতেছেন শুনিয়া নিরতিশয় প্রীত হইলাম। তিনি শান্তিনিকেতনে যথার্থ শান্তি আনিবেন ও পাইবেন। আমি শান্তি লইয়া যাইতে পারি নাই, কিন্তু তথাপি মহতী শান্তি লাভ করিয়াছিলাম। আপনাকে সেদিন নূতন করিয়া পাইয়াছিলাম। তাহা কখনও ভুলিবার নহে।

আশা করি আমাদের দেশের মনীষীগণ বোলপুরে Sylvain Levi মহোদয়ের সহিত মিলিত হইবেন। তবে আমি নামজাদা মনীষীদের প্রতি বেশী ভরসা রাখি না। অনেককেই দূর হইতে বুঝিবার যত সুযোগ হয় নিকট হইতে ততটা হয় না। আমার ভয় হয় পাছে অধ্যাপক লেভি আমাদের আগন্তুকতুচ্ছতা ও কার্পণ্যবিকার দেখিয়া ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়েন। তবে আপনি আছেন······ আর ভারতের চাষা আছে। আর আছে বঙ্গজননী।

Heritage of India Seriesএ Thompson যাহা আপনার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়াছি। সে বিষয়ে তাহার সহিত আমার লেখালেখি চলিতেছে।

আমার মতে Europeএ সমালোচকের দল ভারতীয় সাহিত্য বা কলাবিদ্যা সম্বন্ধে সত্য ধারণায় পঁহুছিতে শীঘ্র পারিবে না। এক ধাপ অগ্রসর হইয়া দুই ধাপ পিছাইয়া যাইবে। ভারত একটা মস্ত challenge to the rest of the world (অবশ্য ভারতের Moplah বা Nankhana Sikh মোহান্ত বা political agitator নহে)। এই challenge সমুচিতভাবে গ্রহণ করা সময়সাপেক্ষ।

এখন উহাদের সমালোচনার সময় নহে, বুঝিবার সময়।

দুইটি ভারতপন্থীর একটিকে সহজে গ্রহণ করিবে আর অপরটিকে হেঁয়ালি বলিয়া ত্যাগ করিবে ইহা সত্য হইতে পারে না। দুইজনেই ভারতবর্ষের সাধিত 'life elemental', 'life universal', প্রচার করিতেছেন। বহুরূপী বহুভোগী মানুষ ইহাতে তৃপ্তি আস্বাদ করিতে পারে না। বলে ইহা অপ্রাকৃত— অথবা monotonous and empty, শূন্য ও একঘেয়ে।

Thompson একবার translation করিয়া দেখিতে চায়, দেখুক। কিন্তু শুধু translationএর কর্ম নয়— transvaluation চাই।

Europe ও Americaর প্রাকৃতজন— massesরা— আর defeated peoples যাহারা ভোগপথের শেষে ফকিরী বা কপ্‌নি গ্রহণ করিয়াছে— তাহাদের পক্ষে life elemental, life universal যতটা নিকট, ততটা Renaissanceএর উত্তরাধিকারী সমাখণ্ড সাহিত্যিকদিগের পক্ষে নহে।

আমাদের পক্ষে কিন্তু Renaissanceএর বিচিত্র ভোগ নিতান্ত বিচিত্র নহে। ভারতে কত অগণিত ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সুতরাং বহুরূপে বহুরসে আমাদের রসভঙ্গ হয় না। তবে আমরা সেই খণ্ডরূপ ও খণ্ডরসকে বিশ্বরূপের একরসে পরিণত করি— সেইটা life elemental, life universal। ভারত এই মধু বিতরণ না করিলে কে করিবে। তবে যাহাদের জীবন অত্যন্ত তিক্ত ও বিস্বাদ, তাহারাই মধু আস্বাদে মধুময় হইবে। মধু কিন্তু সকলের জন্য।

কিন্তু বহু সামগ্রী আহরণ না করিলে— বহু চয়ন না করিলে— আমরা এই একরসে পরিণত করিব কোন্ অ-বস্তু? আর আমাদের ভাণ্ডার শূন্য থাকিলে বিতরণ করিব কি?

সুতরাং সমস্যা যেমন উহাদের, সমস্যা তেমনি আমাদের। সত্যই ইহা একই সমস্যা— সমগ্র মানব-জীবনের বিষম হেঁয়ালি।

কেহ কাহাকে ছাড়িলে— ঘৃণায় হউক অবিশ্বাসে হউক বর্জ্জন করিলে— এ সমস্যার পূরণ হইবে না।

Thompson বঙ্গসন্তানকে বর্জ্জন করিয়া বঙ্গের ঠাকুরকে লইতে পারিবে কি— ভারতপন্থাকে ছাড়িয়া ভারতপন্থীকে চিনিতে চিনাইতে পারিবে কি?[২]

আপনার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

---

১ E. J. Thompson: *Rabindranath Tagore/His Life and Work.* The Heritage of India Series, Association Press, Calcutta, 1921. এই পুস্তক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে উৎসর্গীকৃত। টমসন সাহেবের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অপর গ্রন্থ: *Rabindranath Tagore/Poet and Dramatist*, Oxford University Press, 1926.

২ পত্র দুইখানি শান্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক চিঠির প্রতিলিপি একসময়ে করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার ফলে সেগুলি রক্ষা পাইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের মূল চিঠিটিও তাঁহার নিকট রক্ষিত আছে; ইহার প্রতিলিপি শ্রীসুধীরচন্দ্র কর ইতিপূর্বে যুগান্তরে (রবিবার ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৬৬) "শান্তিনিকেতনে আসন্ন বিশ্বশান্তিবাদী সম্মেলন" প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন; পত্রালাপের সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য পুনর্মুদ্রিত হইল। ঐ প্রবন্ধে লেখক জানাইয়াছেন যে, আচার্য শীল মহাশয়ের পত্রের তারিখ অক্টোবর হওয়া সম্ভব— খামে পোস্টমার্ক হইতে তিনি এইরূপ অনুমান করেন।

ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কালিদাসের দুষ্মন্ত দৈত্যরণে ইন্দ্রকে সাহায্য করিয়া স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন "অহো উদাররমণীয়া পৃথিবী"। অথচ তিনিই কয়েক দিন মাত্র আগে রাজসভায় শকুন্তলাকে দেখিয়া চিনিতে পারেন নাই। কাছের দেখায় ও দূরের দেখায় কত প্রভেদ। যে-শকুন্তলাকে তিনি তপোবনে দেখিয়াছিলেন সে কাছের মানুষ ছিল না, দুষ্প্রাপ্যতার দিগন্ত তাহাকে ঝাপসা করিয়া রাখিয়া তাহার সুকুমার মুখমণ্ডলের উপরে একটি মায়াময় অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছিল। রাজসভায় সেই অবগুণ্ঠন খুলিয়া শকুন্তলা যখন নিজেকে রাজার ধর্মপত্নী বলিয়া পরিচয় দিল তখন রাজা আর চিনিতে পারিলেন না। আবার কাছের দেখায় ও দূরের দেখায় কত প্রভেদ।

এখন, দূরত্বের তারতম্যে বস্তুর রূপের তারতম্য— এই যে ব্যাপারটা, এটা কি দুষ্মন্তের চোখের প্রকৃতি, না, স্বয়ং কালিদাস নিজের চোখের প্রকৃতিকে নায়কের উপরে আরোপ করিয়াছেন? কেবল নায়কের দৃষ্টি বলিয়া মনে হয় না, কবির দৃষ্টি বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার অনেকগুলি কাব্যে, আপাততঃ মেঘদূত ও রঘুবংশের দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে, শকুন্তলার দৃষ্টান্তের তো সবিশেষ উল্লেখই করিলাম, উচ্চাকাশ হইতে পৃথিবীর সৌন্দর্যের অভিনবত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। একই দৃষ্টির এতগুলি দৃষ্টান্ত আকস্মিক হইতে পারে না। কালিদাসের কবিপ্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ এই যে, বস্তুস্বরূপের বোধের জন্য দূরত্বের কামনা করে। কাছের জিনিস যে তাঁহার চোখে পড়ে না তাহা নয়, প্রাণভয়ে ভীত ধাবমান মৃগের কি সুন্দর বাস্তবানুগ চিত্র। কিন্তু মৃগ যে ধাবমান! প্রতিটি মুহূর্ত যে তাহার দূরত্ব, সেইসঙ্গে তাহার সৌন্দর্য বিবর্ধন করিতেছে। গতিশীলতা যে দূরত্বের অনুষঙ্গ। সেইজন্য মেঘ তাঁহার এত প্রিয়, মেঘ যুগপৎ দূরস্থ ও গতিশীল। সেইজন্য রথবেগের বর্ণনা তাঁহার এত প্রিয়। মোট কথা বুঝি এই যে, দূরত্বের অঞ্জন চোখে না পরিলে সৌন্দর্য ধরা পড়িত না তাঁহার কাছে। শকুন্তলার কবির পক্ষে মৃচ্ছকটিক নাটক রচনা বোধ করি সম্ভবপর ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের বেলায় অনুরূপ একটা ব্যাপার লক্ষ করি। তিনি সারাজীবন সীমা ও অসীমের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় সীমার কোটি হইতে অসীমকে, অসীমের কোটি হইতে সীমাকে দেখিয়াছেন, সুন্দর দেখিয়াছেন, স্বরূপস্থ দেখিয়াছেন। এক দিকে বস্তু ও ঘটনা, অন্য দিকে কবি; মাঝখানে দূরত্বসৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত দুয়ে শুভদৃষ্টি ঘটে না। ডায়েরি লিখিতে পারেন না কবি স্বীকার করিয়াছেন। সে এই কারণে। রোজনামচা যে রোজকার ব্যাপার, মাঝখানে দূরত্ব কই। এই একই কারণে সাময়িক কবিতা রচনায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। এক সময়ে অনেক সমালোচক অক্ষয়কুমার বড়ালের এষা কাব্য ও রবীন্দ্রনাথের স্মরণ কাব্যের তুলনা করিয়া এষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এষা উচ্চাঙ্গের কাব্য কি না জানি না, স্মরণ নয় নিশ্চয়। ঘটনার বড় বেশি কাছে তখন তিনি ছিলেন। দূরে থাকা ও কাছে থাকার ফলে কাব্যরসের তারতম্যের এমন অনেক দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসাহিত্য হইতে উদ্ধার করা সম্ভব। সেটা ঠিক এখানে আলোচ্য নয়। কেবল এইটুকু মানিয়া লইলেই চলিবে যে, সীমার কোটি হইতে যখন তিনি

অসীমকে দেখেন, অসীমের কোটি হইতে যখন সীমাকে দেখেন, তখনই তিনি তাহাদের সুন্দর দেখেন, স্বরূপে দেখেন। এইভাবে দেখাই তাঁহার পক্ষে যথার্থ দর্শন।

পূর্বে লিখিত একটি প্রবন্ধে আমি বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, কবি কড়ি ও কোমল কাব্যে সীমার কোটি হইতে অসীমকে দেখিয়াছেন। তার পরেই তাঁহার দোদুল্যমান চিত্ত অসীমের কোটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবারে অসীম হইতে সীমাকে দর্শন। সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালি অসীমের কোটির কাব্য। মাঝখানে রহিল মানসী— এ কাব্যে কবির এক কোটি হইতে অন্য কোটিতে সংক্রমণের চিহ্ন। আরো একটি কারণে মানসী কাব্যের বিশিষ্টতা। কড়ি ও কোমল পর্যন্ত কাব্য রচনা কালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একটি সংকীর্ণ পরিধির মানুষ, প্রধানতঃ তাহা পারিবারিক ও আত্মীয়স্বজনের গণ্ডি। সোনার তরী কাব্য রচনাকালে তিনি বৃহত্তর লোকসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। মানসীর এক দিকে এই সংকীর্ণ গণ্ডি, অন্য দিকে বৃহত্তর লোকসমাজ। এই সংক্রমণের চিহ্নও বহন করিতেছে মানসী কাব্য। সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালি এক কাব্যগুচ্ছের অন্তর্গত, ইহাদের মৌলিক প্রেরণা ও ভাবনা এক বই দুই নয়, আর ইহাদের শিল্পরীতিও অভিন্ন। তবে একটি হইতে অপরটির যে প্রভেদ তাহা প্রাহ্ণ মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণের প্রভেদ— তিনটিই কবি-অভিজ্ঞতার একই দিবসের অন্তর্ভুক্ত।

এখন, এই কাব্যগুচ্ছকে অনেকে অনেক ভাবে দেখিয়াছেন ও আলোচনা করিয়াছেন। সোনার তরী কবিতাটির অপব্যাখ্যা ও জীবনদেবতা-আইডিয়ার অতি ব্যাখ্যা আলোচনার পথ দুর্গম না করিয়া তুলিলে কাব্যগুলিকে আরো অনেক সহজে রসিকের হৃদয় গ্রহণ করিত। বস্তুত রসিক-হৃদয়ের কাছে দুরূহ এমন কিছু এ কাব্যগুলিতে আছে মনে করি না। সত্য কথা বলিতে কি, আমার কাছে কাব্য-তিনখানি সুখের মতো "সহজ সরল"। আমার কাছে এই গুচ্ছটি লৌকিক প্রেমের, লৌকিক সৌন্দর্যের ও লৌকিক আনন্দের কাব্য। তবে সেই লৌকিক প্রেম লৌকিক সৌন্দর্য ও লৌকিক আনন্দ অসীমের কোটি হইতে দৃষ্ট, তাই হঠাৎ তাহাদের অতিলৌকিক ও অলৌকিক বলিয়া ভ্রম হয়। আর কিছুই নয়, কল্পনার স্বর্গভ্রষ্ট অরূপ রশ্মি পড়িয়াছে লৌকিক প্রেমে, লৌকিক সৌন্দর্যে তাই এমন দৃষ্টিবিভ্রম। রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুতন্ত্রহীনতার অভিযোগ যাঁহারা করিয়া থাকেন মনগড়া অভিযোগের কালো চশমা জোড়া খুলিলে তাঁহারা খুশি হইতেন, দেখিতে পাইতেন যে বাংলা আর কোনো কাব্যে লৌকিক প্রেম লৌকিক সৌন্দর্য ও লৌকিক আনন্দ এমন অপরূপ শিল্পমূর্তি লাভ করে নাই। আগেই বলিয়াছি যে, কাব্যগুলি সহজ ভাবে গ্রহণের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল সোনার তরীর অপব্যাখ্যা ও জীবনদেবতার অতিব্যাখ্যা। সে বাধা এখনো সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে মনে হয় না। কিন্তু সরাসরি এগুলিকে প্রেম ও সৌন্দর্যের কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে বাধা নিতান্তই কাল্পনিক। বর্তমান প্রবন্ধ সেই প্রচেষ্টা। কেবল মনে রাখা অত্যাবশ্যক লৌকিক প্রেম সৌন্দর্য ও আনন্দ অসীমের দূরত্ব হইতে নিরীক্ষিত।

গাজিপুরে বাসকালে তিন-চার মাসের মধ্যে যে কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন সেগুলির মূল প্রেরণা একটা নিদারুণ নৈরাশ্য। এমন ঘননৈরাশ্যপূর্ণ কবিতাসমষ্টি রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল।

তবে সত্যমিথ্যা কে করেছে ভাগ
কে রেখেছে মত আঁটিয়া।..

কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে।..
সেই যেখানে জগৎ ছিল এককালে
সেইখানে আছে বসিয়া।..

এ মনোভাব রবীন্দ্রসাহিত্যে আগেও নাই, পরেও নাই। মানসী রচনাকালে ইহাই তাঁহার মানসিক অবস্থা।

আসল কথা কয়েক বৎসর পূর্বেকার একটি মৃত্যুশোক তাঁহার মনে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল এ-সব তাহারই প্রতিক্রিয়া।

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই,
নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে
কোথাও কি আছে প্রভু হেন বজ্রপাত!

আছে সেই সূর্যালোক নাই সেই হাসি,
আছে চাঁদ, নাই চাঁদমুখ।
শূন্য পড়ে আছে গেহ, নাই কেহ, নাই কেহ
রয়েছে জীবন নেই জীবনের সুখ।

নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনতর।

মৃত্যুর দুঃখ নানারূপ মূর্তি ধরে জীবনে, যাহা হইলে হইতে পারিত অথচ হইয়া ওঠে নাই তাহা অন্যতম মূর্তি।

কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে গেছে চলে
কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা বলে।
কল্পনার সত্য রাজ্য দেখাই নি তারে,
বসাই নি এ নির্জন আত্মার আধারে।

আবার—

নিমেষে ঘুরিল ধরা, ডুবিল তপন,
সহসা সম্মুখে এল ঘোর অন্তরাল,
নয়নের দৃষ্টি গেল রহিল স্বপন,
অনন্ত আকাশ আর ধরণী বিশাল।

কিন্তু এমন নিরেট নৈরাশ্যের ভার মানুষের মন দীর্ঘকাল বহিতে পারে না। তখন সে ঐ পাষাণের মধ্যে ফাটলের সন্ধান্ করে। মানুষের সৌভাগ্য এই যে অদৃষ্ট অনুসন্ধিৎসাকে বিড়ম্বিত করে না, পাষাণের ফাঁকে ফাঁকে উষার আলো দেখা দিতে থাকে।

হয়তো বা এখনি সে এসেছে হেথায়
মৃদুপদে পশিতেছে এই বাতায়নে,
মানসমুরতিখানি আকুল আমায়
বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন আলিঙ্গনে।

তারি ভালোবাসা তারি বাহু সুকোমল
.. ..
বহিয়া আনিছে এই পুষ্প পরিমল,
কাঁদায়ে তুলিছে এই বসন্ত বাতাস।

কবিতাটির ছত্রে ছত্রে উষার অস্পষ্ট আভাস।

তবে তাই হোক, হোয়ো না বিমুখ,
দেবী তাহে কিবা ক্ষতি।
হৃদয়-আকাশে থাক্‌-না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি।

এবারে আলো আর-একটু স্পষ্ট। কিন্তু তার পরেই কম্পমান আলো অন্ধকারের বন্ধন কাটাইয়া একটা অচঞ্চল স্থায়ী মূর্তি লাভ করিয়াছে।

অনন্ত প্রেমের অন্তহীন মূর্তিমেখলা—

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শত বার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
.. ..
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।

এখানে প্রায় আমরা মানসসুন্দরী কবিতার মর্মস্থলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি। অনন্ত প্রেম, মানসিক অভিসার ও সুরদাসের প্রার্থনার মতো কবিতায় মনে পড়িয়া যায় পরবর্তী কালের—

শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।..

নয়নসম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

কবি দুঃখের অভিজ্ঞতা মন্থন করিয়া যে সত্য উদ্ধার করিলেন তাহা এই যে, মৃত্যুতে সব শেষ হয় না। প্রিয়জন নিখিলে সৌন্দর্যরূপে, স্মৃতিতে প্রেমরূপে থাকিয়া যায়। এখন, এই অভিজ্ঞতাজাত সত্যের উপরে পরবর্তী কাব্যগুচ্ছের প্রতিষ্ঠা। স্মৃতিলোকশায়ী প্রেম সোনার তরী কাব্যের মৌলিক প্রেরণা— মানসসুন্দরীতে ইহার পরিপূর্ণতম প্রকাশ। নিখিলশায়ী সৌন্দর্য চিত্রা কাব্যের মৌলিক প্রেরণা— উর্বশীতে ইহার পরিপূর্ণতম প্রকাশ। আর, সংসারের আড়ম্বরহীন কর্তব্যগুলির মধ্যে, অকিঞ্চিৎকর ঘটনা ও দৃশ্যগুলির মধ্যে যে প্রাথমিক জীবনরস ও আনন্দ আছে তাহাই হইতেছে চৈতালি কাব্যের মৌলিক প্রেরণা। চৈতালির সুরগ্রাম খাদে বাঁধা, স্তিমিতকণ্ঠ মানসসুন্দরী বা উর্বশীর উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হয় নাই, হয়তো বা অভিজ্ঞতার তারতম্যে তাহা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু মৌলিক প্রেরণাটি বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নয়।

কাজেই লৌকিক প্রেম লৌকিক সৌন্দর্য ও লৌকিক আনন্দকে কাব্যগুচ্ছের মৌলিক প্রেরণা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই সঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে লৌকিক প্রেম সৌন্দর্য ও আনন্দ অরূপ রশ্মিতে প্লাবিত এবং কাব্যত্রয়ে চিত্রিত মানবজীবন কল্পনার এক অতিদূর অন্তরীক্ষলোক হইতে দৃষ্ট।

২

কল্পনার অন্তরীক্ষলোক হইতে "ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি" প্রেমে সৌন্দর্যে ও আনন্দে অপরূপ প্রতিভাত হইয়াছে। সে অপরূপত্ব এমনই অপার্থিব যে পৃথিবীর অংশকে "স্বর্গখণ্ড" মনে হইয়াছে, আরও রহস্যের বিষয় এই যে, স্বর্গ হইতে বিদায়ের ক্ষণে দীনা হীনা পৃথিবীকেই স্বর্গ মনে হইয়া তাহার অপরিপূর্ণতাই স্বর্গের দিব্য-পদ লাভ করিয়াছে। ভূতলে থাকিয়া ভূতলকে এমন মধুর মনে হয় নাই, যেমন মধুর মনে হইল দূরে সরিয়া দাঁড়াইবামাত্র। সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি কাব্যত্রয়ের ইহাই দৃষ্টিবৈশিষ্ট্য। তবে তিনে কিছু প্রভেদ আছে, কোথাও প্রেম কোথাও সৌন্দর্য কোথাও আনন্দ বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে। তবে এই পার্থক্যটুকুর উপরে তেমন জোর দিবার আবশ্যক নাই, যেহেতু চিত্রার অন্তর্গত স্বর্গ হইতে বিদায় বা প্রেমের অভিষেক অনায়াসে সোনার তরীতে সন্নিবেশিত হইতে পারিত। আবার, সোনার তরীর নিরুদ্দেশ যাত্রা চিত্রায় সন্নিবিষ্ট হইলে স্থানাত্যয়দোষ ঘটিত মনে হয় না। তেমনি সোনার তরীর অন্তর্গত চতুর্দশপদীগুলি স্বভাবধর্মে চৈতালির আশ্রয় দাবি করিতে পারিত। আর চৈতালির 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে' চিত্রার কবিতাগুলির সহিত আত্মীয়তা ঘোষণা করিতেছে।[১] এসব কবিতার স্থানচ্যুতি রেলগাড়ির এক শ্রেণীর যাত্রীর অন্য শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বসিবার মতো।

মানসসুন্দরীকে বাংলা কাব্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা বলিলে বোধ করি অন্যায় হইবে না। আগে বলিয়াছি যে, মৃত্যুর পরে প্রিয়জন স্মৃতিতে প্রেমরূপে থাকিয়া যায় এই উপলব্ধি ঘটিয়াছিল মানসী কাব্য রচনাকালে কবির। মানসসুন্দরীর মানসী প্রিয়জনের সেই বিদেহিনী মূর্তি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'মানসী মানসেই আছে'। মানসেই আছে বই-কি। কিন্তু এখানে সেই মানসীকে বাস্তবলোকে তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন। আর সে বাস্তব কেবল একটি জন্ম বা ইহজন্মের মধ্যে আবদ্ধ নয়, পূর্বজন্ম ও পরজন্ম পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গিয়াছে।

জানি, আমি জানি, সখী,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোখি
সেই পরজন্ম পথে—

কিন্তু তাহাতেও মন তৃপ্তি মানে না—

কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ,
পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে নাকি তুমি
আমারি জীবন-বনে সৌন্দর্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি ?

১ "এর (চৈতালির) প্রথম কয়েকটি কবিতায় পূর্বতন কাব্যের ধারা চলে এসেছে। অর্থাৎ সেগুলি যাকে বলে লিরিক।"
—কবিলিখিত চৈতালির সূচনা।

আর ইহজন্মের মধুর রহস্য তো আগেই বিবৃত হইয়াছে,

তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কি খেলা খেলাতে
সখী,

• •   • •

ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

'এখন' কখন? পরিণত বয়সে মনে করিবার কারণ নাই। মৃত্যু দুস্তর দূরত্ব সৃষ্টি না করিলে বাস্তবময়ী "মানসসুন্দরী" হইয়া উঠিত কি না সন্দেহ। বস্তুকে যথার্থরূপে দর্শনের জন্য রবীন্দ্রনাথের মন যে দূরত্বের অপেক্ষা রাখে এখানে মৃত্যু সেই দূরত্ব সৃষ্টি করাতে ইহজন্মের খেলার সঙ্গিনী পূর্বজন্ম ও পরজন্মের সঙ্গিনীতে পরিণত হইয়া বাস্তবময়ী মানসসুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যু একদফা বাস্তবকে অপসারিত করিয়াছে, তার পরে কবি হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাকে পূর্বজন্ম ও পরজন্মের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছেন, নীহারিকাসংহত তারকা পুনরায় নীহারিকায় পরিণত হইয়াছে। তাই নিতান্ত লৌকিক প্রেমকে অলৌকিক বলিয়া মনে হয়।

কবি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবেন যে "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান"! তার উৎসের গভীরে কোথাও নরনারীর প্রেমের অভিজ্ঞতা অবশ্য বর্তমান।

সত্য ক'রে কহ মোরে হে বৈষ্ণবকবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?

কিন্তু প্রেমের নেত্রে দৃষ্ট "ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি"র নিপুণতম বিন্যাস 'প্রেমের অভিষেক' ও 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতা দুটিতে। স্বর্গে গিয়া পুণ্যবান ব্যক্তি দেখিল যে স্বর্গ তেমন কাম্য নয় যেমন মনে হইয়াছিল দূর হইতে।

শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে।

ক্ষয়িতপুণ্য ব্যক্তি স্বর্গ হইতে বিদায়কালে বুঝিল—

অশ্বত্থশাখার
প্রান্ত হ'তে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে।

অপর পক্ষে দূরগত পৃথিবীর কি মধুর চিত্র—

দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূরস্বপ্নসম, যবে কোনো অর্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি নির্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো— নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি
গ্রন্থি শরমের, মৃদু সোহাগচুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর।

এই অপরূপ প্রেমসমৃদ্ধ সৌন্দর্যের মূলে আছে বস্তুর ব্যবধান। পৃথিবী দূরস্থ বলিয়াই সুন্দর, যেমন নিশ্চয় এক কালে দূরস্থ স্বর্গকে সুন্দর মনে হইয়াছিল। তবে কি আবার এমন সময় আসিবে যখন পদতলগত পৃথিবীকে আর এমন মধুর মনে হইবে না? নিশ্চয়! কারণ, "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী"। স্বর্গও নয়, মর্ত্যও নয়, কবি দূরত্বকে ভালোবাসেন।

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে কথা যে যাই পাসরি।

হঠাৎ 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি পূর্বোক্ত ধারণা সম্বন্ধে মনে সংশয় জাগ্রত করিয়া দিতে পারে। মনে হইতে পারে এ যে গৃহের বনিতার বন্দনা। গৃহের বনিতার বন্দনা সত্য কিন্তু গৃহের মধ্যে নয়, গৃহ হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়াই তাহার যথার্থ মূর্তি দর্শন সম্ভব হইয়াছে।

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তীসতী
বিচরে নলের সনে· ·
হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে।

সেখানেই প্রেমের সার্থকতা। তবে এখানে কিরকম অবস্থা?

হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন— সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার

সেই পুরাতন কথা— বস্তু ও দ্রষ্টার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান প্রতিষ্ঠিত না হইলে বস্তু তাহার স্বরূপ প্রকাশ করে না রবীন্দ্রনাথের চোখে। সে বস্তু প্রেম হইতে পারে, সৌন্দর্য হইতে পারে, আনন্দ হইতে পারে।

বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে একটি যথাযোগ্য মূর্তিদানের উদ্দেশ্যে কবিকে চরাচর সন্ধান করিয়া উর্বশীকে আবিষ্কার

করিতে হইয়াছে। এ উর্বশী পৌরাণিকী নয় বা বিদেশিনীও নয়— রবীন্দ্রনাথের মনের সৌন্দর্যপ্রতীক। তবে উর্বশী কেন? উর্বশীর সহিত অনেক সৌন্দর্যের অনেক মাধুর্যের অনেক রসরহস্যের ইতিহাস জড়িত— পাঠকে ও উর্বশীতে স্থায়ী একটা চলাচলের পথ গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই উর্বশীর প্রয়োজন। কিন্তু আসল কারণটা অন্যত্র। উর্বশীর চেয়ে সুদূরতমা মানুষের কল্পনার অতীত। সে সুদূরের স্বর্গনিবাসিনী। এখানেই তাহার বিশেষ মূল্য কবির চোখে।

এক প্রান্তে—

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী

অন্য প্রান্তে—

আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে।

এক দিকে প্রাত্যহিক সংসার, অন্য দিকে কল্পনার প্রত্যন্ততমসীমাশায়ী বিশ্বের আদিমতম প্রভাত। দূরত্বের ধনুর্গুণ পূর্ণতম বিস্ফারিত, আর একটু টানিলেই ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা। উর্বশী শুধু আদিম নারী নয়, সে নারীর আদিম (basic) রূপ। প্রত্যেক নারীর মধ্যে একবিন্দুপরিমাণ উর্বশীর ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান, কিন্তু মূল উর্বশী সকল সম্বন্ধের অতীত, নর ও নারী দুয়েরই। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ইহাই প্রকৃত রূপ ও রহস্য। সে যেন জলতলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব, ধরাছোঁয়ার বাহিরে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব যাঁহারা আলোচনা করিবেন উর্বশীর শরণাপন্ন না হইয়া তাঁহাদের উপায় নাই।

বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে আরো কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রূপদানের চেষ্টা করিয়াছেন চিত্রা কাব্যে— যদিচ সেগুলি উর্বশীর মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে মনে হয় না। বিজয়িনী কবিতার "অচ্ছোদসরসীনীরে" স্নান সাঙ্গ করিয়া এইমাত্র যে রমণী উঠিল— সে ও উর্বশী ভিন্ন নয়, দুজনেই সদ্য বারিরাশি-সমুত্থিতা। সে নারী বিশুদ্ধ সৌন্দর্যময়ী বলিয়াই কন্দর্প—

পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন-পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

আবেদন কবিতার রাজরাজেশ্বরী আর-একটি সৌন্দর্যপ্রতিমা। ভৃত্য (কবি) তাহার মালঞ্চের মালাকর হইবার দাবি জানাইয়াছেন। এ কাব্যে যে কবি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ[২]। চিত্রা কাব্যে পাষাণসুন্দরী নামে একটি চতুর্দশপদী আছে। কাব্যাংশে ইহার অসামান্যতা এমন কিছু নয়। কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্ব বিচারে ইহার প্রয়োজন আছে। উর্বশী, বিজয়িনী, রাজরাজেশ্বরীর মতো ঐ পাষাণসুন্দরীও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীক। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের মানব-সম্বন্ধের প্রতি উদাসীন না হইয়া উপায় নাই। কাহারও নয় বলিয়াই সে সকলের, সময়-বিশেষের স্থান-বিশেষের নহে বলিয়াই তাহা চিরকালের ও চিরদেশের। আগে যে দূরত্বের কথা বলিয়াছি মানব-সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া এখানে সেই দূরত্বের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

---

২ এবার ফিরাও মোরে ও জীবনদেবতা শীর্ষক কবিতাগুলির কথা তুলি নাই। কিন্তু সভয়ে বলি, কাব্যাংশে কোনোটিকেই উপরে উল্লিখিত কবিতাগুলির সমান মনে হয় না।

চৈতালি কাব্যের 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

চৈতালি তেমনি এক টুকরো কাব্য, যা অপ্রত্যাশিত। স্রোত চলছিল যে-রূপ নিয়ে অল্প-কিছু বাইরের জিনিসের সঞ্চয় জমে ক্ষণকালের জন্তে তার মধ্যে আকস্মিকের আবির্ভাব হল।

আমার তো মনে হয় সোনার তরী ও চিত্রার অন্তে চৈতালি কাব্য না অপ্রত্যাশিত, না আছে তার মধ্যে কিছু আকস্মিক। বরঞ্চ পূর্বধারার পরিণতি রূপে এটাই ছিল সবচেয়ে প্রত্যাশিত। প্রমাণস্বরূপ সোনার তরীর কতকগুলি চৈতালিধর্মী চতুর্দশপদীর উল্লেখ করা যাইতে পারে; আগেও উল্লেখ করা হইয়াছে।

তার পরে চৈতালির নিরলংকৃত ভাষার রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন কবি।

অলংকার প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষবোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে এটাই যথেষ্ট তখন তার উপরে রঙ লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না।

আরও একটা কারণ থাকা অসম্ভব নয়। সোনার তরী ও চিত্রার অলংকার-ঐশ্বর্যে মণ্ডিত ভাষার গুণকে আর অধিক টানা বোধ করি সম্ভব ছিল না, অন্ততঃ সাময়িক ভাবে। তা ছাড়া প্রাত্যহিক জীবনের অনাড়ম্বর ঘটনাসমূহ ও আপাত-অকিঞ্চিৎকর সুখদুঃখ বর্ণনার ভাষা স্বভাবতই সহজ সরল হইতে বাধ্য।

কড়ি ও কোমল কাব্যের প্রতিক্রিয়ায় কবি অসীমের কোটিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কল্পনার উচ্চাকাশ হইতে পৃথিবীর প্রেম ও সৌন্দর্য চোখে পড়িতেছিল, এবারে সে বেগ মন্দীভূত, কবি পুনরায় ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আর, যতই নামিতেছেন ততই তাঁহার চোখে সংসারের অতিপরিচিত দৃশ্যগুলি ক্রমশ প্রকট হইয়া উঠিতেছে। সে দৃশ্যগুলি এতকাল "অতিপরিচিত অবজ্ঞায়" আচ্ছন্ন ছিল, এখন উচ্চলোক হইতে দৃষ্ট হইয়া, অন্তরীক্ষচারী রথ হইতে দুষ্মন্তের পৃথিবীর দর্শনের অভিজ্ঞতার মতো, বড় সুন্দর, বড় আশ্চর্যবোধ হইতেছে। সংসার কী আনন্দে প্রত্যহের বিড়ম্বনাকে বহন করে তখনই কতক বুঝিতে পারা যায়। "সামান্যলোক"কে তখন আর সামান্য মনে হয় না, নিত্যকার প্রভাত "অমৃতের স্রোতে" দুলিতে থাকে, তখন খেয়ানৌকার পারাপারকে সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের চেয়ে গুরুতর ঘটনা বলিয়া মনে হয়, আর না বলিয়া উপায় থাকে না যে—

> দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান
> দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

এবং মনে খেদ হইতে থাকে যে—

> একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ!

"মূর্খাধম ভৃত্য" তখন "সে-ও পিতা আমিও পিতা"র গৌরবে মনিবের সঙ্গে একাসনভুক্ত হয়। আর তখন বাৎসল্য কৌতুকে—

> জননীর প্রতিনিধি,
> কর্মভারে অবনত অতিছোটো দিদি।

এবং—

> পশুশিশু, নরশিশু, দিদি মাঝে পড়ে
> দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়ডোরে।

উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

শুধু কি সংসারের এই অকিঞ্চিৎকর দৃশ্যগুলি! সমস্ত সংসারটাই এক অপূর্ব মাহাত্ম্য লাভ করে, দেবতার বিদায়, পুণ্যের হিসাব ও বৈরাগ্য কবিতাগুলিতে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আর বাংলাদেশের হেমন্তের অতিপরিচিত মধ্যাহ্ন হেমকান্তপটে ক্ষোদিত চিত্রের অপরূপতায় স্বর্গের সৌন্দর্যকে লাঞ্ছিত করিতে থাকে। চৈতালি কাব্য চিরন্তনতার সোনার ফ্রেমে বাঁধানো প্রত্যহের আশ্চর্য চিত্র।

অসীমের কোটি হইতে ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি দর্শন-অন্তে কবি পুনরায় ভূতলে পদার্পণ করিলে অভিজ্ঞতার একটি চক্রাবর্তন সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু তখনই আবার নিত্যদোলায়মান কবিচিত্ত নূতন অভিজ্ঞতার প্রেরণায় দূরত্বের সন্ধান করিতে লাগিল। এবারে আর কল্পনার অন্তরীক্ষলোক নয়, এবারে ইতিহাস পুরাণ ও প্রাচীন কাব্যের মানসলোকে কবির "সুদূরে"র সন্ধান আরম্ভ হইল। অতঃপর লিখিত হইবে কথা ও কল্পনা, এবং কাহিনীর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যগুলি। আর সেইসঙ্গে নৈবেদ্যর চতুর্দশপদী কবিতা। সোনার তরী ও চিত্রার অন্তে যেমন ও যে-কারণে চৈতালির চতুর্দশপদী, কথা, কল্পনা ও কাহিনীর অন্তে সেই-রকম ও সেই কারণে নৈবেদ্যর চতুর্দশপদী। সঙ্গে আছে অবশ্য ক্ষণিকা— ক্ষণিকা কবির ভূমি-স্পর্শ মুদ্রা, মানসলোক ভ্রমণ করিবার সময়েও ক্ষণিকার কাব্যে তিনি পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া আছেন। কিন্তু এসব প্রসঙ্গান্তর, যাহার বিস্তারিত আলোচনা কেবল বারান্তরেই সম্ভব।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

জ্যোতির্মিন্দ্র দাশগুপ্ত

সমকালীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক কে? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। কিন্তু সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিকের নাম করতে গেলে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। প্লেটো থেকে হেগেল পর্যন্ত দর্শনের দিকপালদের যে ধারা, রাসেল তার অনুগমন করতে স্বীকৃত নন; প্রচলিত অর্থে দর্শন বলতে যা বোঝায় রাসেল তা কোনোদিনই পছন্দ করেন নি। তবুও উত্তরকালের ঐতিহাসিকের কাছে রাসেলের নাম ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের সঙ্গে উচ্চারিত হবার সম্ভাবনা সর্বাধিক। অন্তত বিংশ শতাব্দীর আর কোনো দার্শনিক দর্শনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত মূল্যবান দান রেখে যেতে সমর্থ হন নি।

২

১৮৭২ সালের ১৮ মে ব্রিটেনের এক অভিজাত লর্ড পরিবারে বার্ট্রাণ্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেলের জন্ম। পিতামহ লর্ড জন রাসেল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সচ্ছল পরিবারে নিজের ঘরে শিক্ষাজীবনের শুরু। সত্যিকারের বাইরের জগতের সঙ্গে রাসেলের পরিচয় ঘটে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে। ইতিপূর্বে অগ্রজের কাছে গণিতশিক্ষাকালে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ অংশগুলি রাসেলের মনে সংশয় জাগিয়ে তোলে। যার প্রমাণ নেই তাকে সত্য বলে মানতে চায় নি রাসেলের মন। এদিকে খ্রীস্টধর্মের নিহিত ধারণাগুলিকে মেনে নেবারও কোনো যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ না পাওয়ায় ধর্মের বিকল্প দর্শনের প্রতিও রাসেলের মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। তবে নিশ্চয়তাসম্পন্ন জ্ঞানের অনুসন্ধান ও ধর্মীয় প্রবৃত্তির যুক্তিস্বচ্ছ সন্তোষবিধানের আগ্রহই রাসেলকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগে পাঠগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে[১]।

কেম্ব্রিজে রাসেলের পরীক্ষক ছিলেন হোয়াইটহেড। পরে সমকালীন দর্শনের অন্যতম যুগান্তকারী রচনা *Principia Mathematica* পুস্তকটি এই শিক্ষক ও ছাত্রের মিলিত প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়।

কেম্ব্রিজে সেই সময়ে (উনিশ শতকের শেষ দশকে) রাসেলের বন্ধুবর্গের নাম না করলে রাসেলের চিন্তা-বিবর্তন ভালোভাবে বোঝা যাবে না। ছাত্রজীবনে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন মূর (G. E. Moore)— বলা বাহুল্য ইনিও এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান, ক্লাসিক্‌স্‌-এ সুপণ্ডিত লাওয়েস ডিকিনসন, এবং পরে শিক্ষকজীবনে অর্থনীতিবিদ্‌ কেইনস্‌ ও প্রাক্তন ছাত্র উইট্‌গেনস্টাইন—এঁদের সাহচর্য রাসেলের জীবনে নানাভাবে দিশারী আলোর কাজ করেছিল।

১৮৯৬ সালে রাসেলের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি জার্মানির সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের ইতিহাস ও চিন্তাধারা আলোচনা করেন। অথচ রাজনীতির প্রতি তখনও বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। গণিত ছাড়া আর অন্য কোনো দিকে সিদ্ধিলাভের আশা তিনি তখনও পোষণ করতে পারেন নি। চিন্তার এই রাজ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভের মোহ তখন তাঁকে দিবাস্বপ্নের মত আবিষ্ট রাখত। ১৮৯৭ সালে তাঁর প্রথম গণিতবিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—*An Essay on the*

---

১ *Portraits from Memory*: Bertrand Russell: 1956: p. 19.

Foundations of Geometry— প্রচলিত জ্যামিতিক জ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তরগুলিকে নতুন যুক্তির আলোতে যাচাই করার প্রচেষ্টা এই গ্রন্থটি। অবশ্য গণিতের নতুন যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি, প্রচলিত মতের খণ্ডন এবং তারই পরিণতি হিসাবে দর্শনশাস্ত্রের এক অভিনব চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে আরও পরে— ১৯১০ সালে, যখন হোয়াইটহেডের সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টায় *Principia Mathematica* প্রকাশিত হয়।

৩

অভিনবত্বে ও মৌলিকত্বে *Principles of Mathematics* (১৯০৩) এবং *Principia Mathematica* (১৯১০-১৩) রাসেলের দার্শনিক জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল। অনেকের মতে দর্শন-জগতে প্রাচীন 'মেটাফিজিকাল' ধারারও অবসান এই সময় থেকে ; এবং নতুন বিশ্লেষণধর্মী বাস্তববাদের ভিত্তিপ্রস্তর রচিত হয় এ দুটি গ্রন্থে। এখানে গণিতশাস্ত্রের যুক্তিগত ভিত্তি আলোচিত হয়েছে। অথবা বলা যায় যে, যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তিই নতুন করে নতুন আলোতে বুঝবার এক কঠোর সাধনা এই দুটি গ্রন্থ। এখানে রাসেলের বক্তব্য অভিনব— গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞান সমার্থক। অ্যারিস্টটলের ধারা অনুসারে যুক্তি ছিল দর্শনের অন্তর্গত। গণিতের জন্য ছিল আলাদা জগৎ। অতএব সমালোচকেরা অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এই প্রয়াসের 'আপাত-অর্থহীনতা'য়। রাসেলের নিজের কথায়

"This thesis was, at first unpopular, because logic is traditionally associated with philosophy and Aristotle, so that mathematicians felt it to be none of their business, and those who considered themselves logicians resented being asked to master a new and rather difficult mathematical technique."[২]

গণিতশাস্ত্র ও যুক্তিবিজ্ঞানের এই বিরোধের অবসান ঘটান রাসেল। অতীতে গণিতশাস্ত্রে কতগুলি প্রতিজ্ঞাকে (proposition) স্বতঃপ্রমাণিত বলে ধরে নেওয়া হত। উদাহরণ, ইউক্লিডের "অ্যাক্‌সিয়ম"। এদের কোনো প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন স্বীকার করা হত না। শুধু দেখানো হত যে, এগুলি মেনে নিলে পরবর্তী অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা এর থেকে সত্য ব'লে প্রমাণ করা যায়। এ ছাড়াও গণিতশাস্ত্র আরো কতগুলি ধারণা (concept) মেনে নিয়ে থাকে এবং তারও সপক্ষে কোনো প্রমাণ দেয় না। উদাহরণ, পাটিগণিতে সংখ্যার ধারণা এবং যোগ ও বিয়োগের অনুসৃত পদ্ধতি।

রাসেল প্রমাণ করলেন যে, এ ভাবে এ বিষয়গুলিকে ধরে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কতগুলি এক-ধরনের ধারণার সমর্থন যুক্তিবিজ্ঞানে পাওয়া যেতে পারে যার দ্বারা এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব। এখানে রাসেলের বিখ্যাত আদিম ধারণার তত্ত্ব (primitive ideas) অবতারণা করা হয়। এদের সংখ্যা খুব কম এবং সংজ্ঞানির্দেশ অসম্ভব। রাসেলের ভাষায়, এগুলি হল, "assertion, proposition, propositional function, or and not" ; দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন আদিম প্রতিজ্ঞা বা primitive proposition। এই অতি অল্প কয়েকটি উপাদানের সাহায্যে সমস্ত গণিতশাস্ত্র যুক্তি দ্বারা স্থির করে নেওয়া সম্ভব। অবশ্য এ কাজ যে খুব সহজ নয় তার প্রমাণ হচ্ছে যে, মাত্র মৌলিক সংখ্যা ১-এর সংজ্ঞা নির্দেশ সম্ভব হয়েছে *Principia Mathematica* নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৩৬৩ পাতা খরচ করার পর।

২ *Principles of Mathematics* : 2nd edition : 1937 : p. v.

রাসেলের এই বিরাট সাধনায় পূর্বসূরীদের দান তিনি সবসময়েই স্বীকার করেন। বিশেষ করে ক্যান্টর, ফ্রিজি ও পিনোর গবেষণা দর্শনক্ষেত্রে রাসেল-বিপ্লবের অন্যতম সহায়ক হয়েছিল। এই সাধনার অন্যতম সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, পাটিগণিত এবং সাধারণভাবে গাণিতিক তত্ত্বগুলি অবরোহধর্মী যুক্তিধারার সম্প্রসারণবিশেষ। আরো প্রমাণিত হল যে, পাটিগণিতের প্রতিজ্ঞা সংশ্লেষণী নয়[৩]; কাণ্ট ভেবেছিলেন যে এগুলি সংশ্লেষণী বা synthetic।

৪

যুক্তিবিজ্ঞানের হিমশীতল ঘর থেকে এবার রাসেলের মনে হল যে, দর্শনের এক বিরাট অংশকে নতুন যুক্তির বিশ্লেষণী আলোতে পরীক্ষা করা যায়। বাক্যে পদের বিশুদ্ধ বিন্যাস বা syntax অনুসরণ করে দর্শনের অনেক অসত্য দূর করা যায় এবং সত্য আবিষ্কার করা যায়। অবশ্য কারনাপের (Carnap) মত, সমস্ত দর্শনকেই এই ভাবে বিচার করা যায়, এ কথা রাসেল বিশ্বাস করেন না। এ বিষয়ে অন্যান্য আরো অনেক ক্ষেত্রের মত রাসেলের সীমাজ্ঞান অত্যন্ত প্রখর— যা পরবর্তী কালে "লজিকাল পজিটিভিস্ট"দের অনেকের মধ্যেই ছিল না এবং আজও নেই। রাসেল তাঁর এই চিন্তাধারার উপযোগ "বর্ণনা-তত্ত্ব" (theory of descriptions) দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল,

Every proposition which we can understand must be composed of constituents with which we are acquainted.

বর্ণনামাত্রই অসম্পূর্ণ প্রতীকের উদাহরণ। যে-কোনো শব্দসমষ্টি নিজগুণে অর্থবহ হতে পারে না— একমাত্র প্রতিজ্ঞার উপাদান হিসাবে তার অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু অর্থটি লাভ করতে হলে প্রতিজ্ঞাটি এমন ভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যে, শব্দগুলি যে বস্তুর বর্ণনা তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে।[৪]

শব্দ ও বাক্য -বিন্যাস নিয়ে এই চর্চা কিন্তু নিছক যুক্তিবিলাস নয়। অতীতের মেটাফিজিক্‌সের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এবং বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন করে সবরকম ভাবালুতা ত্যাগ করে শীতল সত্য লাভের জন্য এই কঠোর প্রয়াস। যুক্তিসমীক্ষার এই পথ আমাদের হয়তো হিউমের পথে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে— অবশ্য হিউমের জীর্ণ ও সংকীর্ণ মনস্তত্ত্বের জগতকে এড়িয়ে চলবে এই প্রস্তুতি। অনেকটা এই কারণেই রাসেলের দর্শনকে অতীতের দার্শনিকদের লেখার মত এক জায়গায় সুসম্বদ্ধ রূপে পাওয়া যায় না। চমকপ্রদ কথার জালে বিমূর্ত তর্কশাস্ত্রের দ্বারা, বিরাট এক দার্শনিক তত্ত্বরচনার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের গঠন স্বরূপ জানা যায়, এ কথা অতীতে বার বার শোনা গেছে— এখনো চেষ্টা

---

৩ "From Frege's work it followed that arithmetic, and pure mathematics generally, is nothing but a prolongation of deductive logic. This disproved Kant's theory that arithmetical propositions are 'synthetic' and involve a reference to time"—*A History of Western Philosophy*: B. Russell: 1946: p. 858.

৪ "All phrases (other than propositions) containing the word *the* (in the singular) are incomplete symbols; they have a meaning in use, but not in isolation. Thus the 'author of Waverley' has no meaning when taken by itself, but in proposition it has meaning. But it has meaning only when the proposition can be re-stated in such a way that the only terms which occur stand for objects with which we are acquainted"—*Bertrand Russell* by Alan Dorward: 1951.

করলে শোনা যায়। অপরপক্ষে প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিককুল বলেন যে, নিরবয়ব তত্ত্বের দ্বারা নির্ভরযোগ্য জ্ঞানপ্রাপ্তি সম্ভব নয়— এ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতিসাপেক্ষ। আর-এক ধাপ এগিয়ে রাসেল ঘোষণা করলেন যে, পূর্বোক্ত দার্শনিকরা শুধুমাত্র অসার্থক নয়, তাদের যুক্তিগুলিকে একে একে খণ্ডনপূর্বক ভ্রান্ত প্রমাণ করা যায়। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, পৃথিবী সম্বন্ধে আমরা যা জানি তা হল ইন্দ্রিয়ানুভূতিনির্ভর। এই জানাকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সাজানো সত্যসন্ধানীর অন্যতম কাজ। আমাদের পৃথিবীতে আছে অনেক বস্তু ও তাদের সম্পর্ক[৫]। জটিল বস্তু অনেকগুলি সহজ বস্তু-সত্তার সম্পর্কপ্রসূত।

৫

বস্তুর রূপ প্রসঙ্গে রাসেলের বক্তব্য কিঞ্চিৎ অভিনব। ব্যক্তির অনুভূতি থেকে আমরা বস্তুর রূপ নির্মাণ করতে পারি— রাসেলের এই অভিমত। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় যে চেয়ার বা টেবিল দেখি তা রাসেলের মতে আসলে যুক্তির নির্মাণ— লজিক্যাল কন্‌স্‌ট্রাক্‌সন্‌। একই বস্তুকে বিভিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। বস্তুর বিভিন্ন দিকের সাক্ষাৎ পাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখলে। রাসেল এই দিকগুলির নাম দিয়েছেন sense-datum। টেবিলের সম্পূর্ণ সাক্ষাৎ আমরা পাই না— পাই কয়েকটি দিকের। ইন্দ্রিয় দ্বারা যতটুকু সাক্ষাৎভাবে জানতে পারি তারই নাম sense-datum। এবং সাক্ষাৎকারীর এই টেবিলের দিকগুলির অভিজ্ঞতার নাম sensation। রাসেলের কথায়—

> . . an aspect of a "thing" is a member of the system of aspects which *is* the "thing" at that moment. All the aspects of a thing are real, whereas the thing is a mere logical construction.[৬]

রাসেলের এই বিশ্লেষণ অনেক সমালোচনার সূত্রপাত করেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, রাসেল নিজে সব অসুবিধার অবসান ঘটিয়ে অভিনব কোনো দর্শনশাস্ত্র রচনার দাবি কখনো করেন নি। এখানে তিনি শুধু যুক্তিবাদী-বিশ্লেষণী দার্শনিক ধারার প্রকৃতি ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন।

৬

রাসেল-দর্শনের সবচেয়ে অভিনব অংশ হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের অনুসরণে বস্তু ও মানসের প্রকৃতি ও সম্পর্ক নির্ধারণ। রাসেলের মতে আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে মনস্তত্ত্ব ক্রমাগত বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। অপর দিকে সমকালীন পদার্থবিজ্ঞানের যুগান্তকারী গবেষণার ফলে পদার্থবিজ্ঞান বস্তুর বস্তুত্ব কমিয়ে আনছে। এর ফলে জেমস্‌ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের কল্পিত ধারণা অনুসারে যে 'নিরপেক্ষ উপকরণে'র তত্ত্ব অনুমান করা যায়, তা গ্রহণ করলে উপরোক্ত আপাত-অসংগতি বিলুপ্ত হয়। ফলে বস্তু ও চিত্তের দ্বৈতত্ব লোপ পায়।

রাসেল দেখিয়েছেন যে, বস্তুর যে ক্ষুদ্রতম কণা তা আসলে কতগুলি সংঘটনের সমষ্টি। এই সংঘটনের সমষ্টি এক-এক বিশেষ পদ্ধতিতে সাজালে এক-একটি বিশেষ বস্তু রূপায়িত হয় অর্থাৎ বস্তুমাত্রই এক

৫ Cf. *Philosophical Essays* : B. Russell : 1910 : pp. 169.

৬ *History of Western Philosophy* : B. Russell ; 1947 : pp.

বিশেষ পদ্ধতিতে সাজানো সংঘটনের সমষ্টি। *The Analysis of Matter* গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করার পর *The Analysis of Mind* গ্রন্থে অদ্বৈতত্ত্বের অপর সমস্যা আলোচনায় রত হন। এখানে তাঁর সিদ্ধান্ত হল যে, চিত্ত ও বস্তু একই উপকরণের বিভিন্নরূপে ও পদ্ধতিতে সমষ্টিকরণ। চেতনা মানবচিত্তের কোনো বিশেষ চরিত্রের স্থান পেতে পারে না। মানবচিত্তের চেতনা কতগুলি সংবেদন ও চিত্রকল্পের একত্র গ্রন্থন। এ দুটির চেতনা বলে কোনো অন্তর্নিহিত গুণ নেই। এরা বিশেষ কোনোভাবে যূথবদ্ধ হলে যে বিশেষত্বের উদয় হয় তাকে আমরা সাধারণভাবে চেতনা বলে থাকি। রাসেলের কথায়—

The distinction of matter and mind came into philosophy from religion, although, for a long time, it seemed to have valid grounds. I think that both matter and mind are merely convenient ways of grouping events. Some single events, I should admit, belong only to material groups, but others belong to both kinds of groups, and are therefore at once mental and material. ৭

নির্জলা জড়বাদী ও নির্ভেজাল ভাববাদী দর্শনের পায়ের তলা থেকে এর আগে কখনও এত ভালো ভাবে কেউ মাটি সরিয়ে নিতে পারেন নি।

৭

দর্শনরাজ্যের বিদ্বৎ-সমাজে রাসেলের পরিচয় কঠোর যুক্তিবৈজ্ঞানিক রূপে। কিন্তু তাঁর জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ হয়েছে অন্য মহল থেকে, অন্য পথে। সামাজিক ও রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ ও নানাবিধ রচনা বক্তৃতা বেতার-আলোচনা ও টেলিভিসন-বক্তৃতা প্রভৃতি রাসেলের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। আগে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তাকে দর্শনের অন্যতম অঙ্গ বলে ধরা হত, আজও হয়। প্লেটো থেকে হেগেল— অনেকেরই কাছে বিশ্বরহস্য ও সমাজরহস্য এই দুই সমস্যারই চাবিকাঠি হিসাবে দর্শন প্রযুক্ত হয়েছে। দুটি ধারার এরূপ একাত্মীকরণে অতীতে ইতিহাসে মানবসমাজের উন্নতি হয়তো কিছু হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ভ্রান্তিযোগ সমাজের শত্রু হিসাবে কাজ করেছে। প্রমাণহীন আত্মকেন্দ্রিক কতগুলি অসংলগ্ন চিন্তাকে একত্র করে বড় বড় দার্শনিক যুক্তির বিদগ্ধ সজ্জায় সাজিয়ে যে সমাজদর্শনের সমর্থন দার্শনিকেরা যুগে যুগে খুঁজেছেন এবং পেয়েছেন তাতে ক্ষতি হয়েছে দু-দিক থেকে। এই মূল্যসত্যের নিকট বস্তুসত্যের আত্মসমর্পণে দর্শন আপনার বৈজ্ঞানিক সত্তা বার বার হারিয়েছে, অপর দিকে সাধারণ মানুষ এই ধূম্রজালে সব যুগেই বিভ্রান্ত হয়েছে।

সামাজিক আলোচনার ক্ষেত্রে অন্যতম লেখক এবং নিজক্ষেত্রে অন্যতম দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও রাসেল সবসময়ে পূর্বোক্ত মর্মান্তিক সমীকরণে বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। এদিক থেকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পরিষ্কার ভাবে স্বীকার করেন রাসেল যে, দর্শনের সঙ্গে দার্শনিকের রাজনীতির কোনো প্রত্যক্ষ বা প্রয়োজনীয় যোগসূত্র নেই। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক লিওম্যান বলেছেন—

I see no necessary relation between Russell's epistemology or his metaphysics and his

৭ *Our Knowledge of the External World,* Rev. ed., 1926 : p. 89. B. Russell.

social philosophy. In the light of his metaphysical ideas he might as easily become a conservative absolutist as an experimental relativist. . . . . He makes a sharp distinction between science and morals. In fact, he carries his distinction so far as to make an absolute separation, a substantive dualism."[৮]

লিণ্ডম্যানের উক্তিতে রাসেল তাঁর পূর্ণসম্মতি জানিয়েছেন।

সমাজতত্ত্ব কতগুলি মূল্যসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মূল্যসত্য নির্ধারণ করে সামাজিক বক্তব্যের গতি ও প্রকৃতি। এবং মূল্যায়নের ক্রমপর্যায়ে এই অনেক মূল্যের (value) মধ্যে একজন বিশেষ সমাজদার্শনিকের লেখায় কোনো একটি বিশেষ মূল্য বেশিমাত্রায় প্রাধান্য লাভ করে থাকে। এদিক থেকে রাসেলের লেখায় যে মূল্যটি সর্বপ্রধান তা হল স্বাধীনতা। মানবিক মুক্তি তার চরিত্রগত বিকাশলাভের প্রধানতম পথ। সৃষ্টিশীলতার প্রথম এবং পরম উৎস মুক্তচিন্তার প্রবাহ।

নিরঙ্কুশ একনায়কত্বের অচলায়তনে জীবন ব্যর্থ হতে বাধ্য। নিজের মনের মত করে বাঁচার মত আনন্দ অনন্য। স্বাধীনতার প্রতি রাসেলের এই আসক্তি কোনোদিনই কমে নি। দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছরের রাজনৈতিক জীবনে রাসেল অনেক উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর চিন্তা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রসঙ্গে তাঁর মৌলিক সিদ্ধান্ত আজও অপরিবর্তিত। রাসেলের মতে স্বাধীনতা পরম সম্পদ। স্বাধীনতা ব্যতীত ব্যক্তিত্বের প্রসার অসম্ভব। আজকের যুগে জীবন ও শিক্ষা এত জটিল হয়ে উঠেছে যে, সমস্ত সমস্যার মুক্ত ও সম্যক্ আলোচনার মধ্য দিয়েই কেবল সত্যসন্ধান সম্ভব। চিন্তারাজ্যে স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির বৈপরীত্য, বিরোধ ও আলোচনা এক এক করে অজ্ঞানের কাঁটা সত্যের পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারবে—

Out of such diverse opinions come an intelligent relativity of belief which will not readily fly to arms; hatred and war come largely of fixed ideas or dogmatic faith. Freedom of thought and speech would go like a cleansing draught through the neurosis and superstitions of the 'modern' mind."[৯]

এর থেকেই বোঝা যায় যে, রাসেলের স্বাধীনতা-প্রসঙ্গে ধারণার সঙ্গে হেগেল বা তাঁর শিষ্যদের (দক্ষিণ ও বাম এই দুই পন্থীদের কথা বলছি) ধারণার কোনো সম্পর্ক নেই। ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তিপথের সকল বাধা অপসারণের নামই স্বাধীনতা[১০]— বলেন রাসেল। এবং এই স্বাধীনতা সম্প্রসারিত করতে হলে দুটি পথের মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে— ক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন এবং ইচ্ছার দমন।

৮

সাম্প্রতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উচ্চমার্গ বিশ্লেষণে রাসেলের 'ক্ষমতাতত্ত্ব' খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রাসেল নিজেও বলেন যে, তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায়, এবং তার চেয়েও বড় কথা হল রাষ্ট্রব্যবস্থায়, সাধারণ বিচারে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল 'ক্ষমতা'—

---

৮ *The Philosophy of Bertrand Russell*—ed. by Paul A. Schilpp: essay by Edward Lindeman: 3rd edition: 1951.

৯ *The Story of Philosophy*: Will Durant: Chapter on Russell: pp. 483.

১০ Cf. *Freedom*: A symposium: ed. Ruth Anshen: essay by B. Russell.

To my mind, the important matter in politics is the question of power. Those who have power tend to be unjust to those who have not. This is the argument for democracy and the basic objection to the communist regimes of the present day.

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত *Power* নামক গ্রন্থে এই ক্ষমতাতত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ক্ষমতার ধারণা সমাজ ও রাষ্ট্রবিশ্লেষণের প্রধানতম সহায়ক। পদার্থবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব যেমন energy, সমাজবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব তেমনি power। 'এনার্জি'র মত ক্ষমতার বহু রূপ। এক থেকে অন্য রূপে ক্ষমতার রূপান্তর সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণের প্রধান বিষয়বস্তু। ক্ষমতার কোনো বিশেষ রূপকে (যেমন অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে) অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া মারাত্মক ভ্রান্তিযোগের সূচনা করতে পারে। মার্ক্সবাদী ইতিহাস দর্শনের একদেশদর্শিতার বিরুদ্ধে রাসেলের অভিমত এই আলোচনা থেকে বোঝা যেতে পারে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হল যে, মার্ক্সবাদ যে যুগে পৃথিবীর বিদ্বজ্জনসমাজের কাছে নিজের আসন পাকা করে নিয়েছিল, সে যুগেও রাসেল তাঁর মার্ক্সবাদ-বিরোধিতার কথা ঘোষণা করতে ভোলেন নি। সর্বাত্মক রাজনীতির কালোছায়ার সন্ত্রাসে সেইসব বুদ্ধিজীবীরা আজ জোর গলায় মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের যুক্তিগুলি তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল ১৮৯৬ সালে তাঁর *German Social Democracy* নামক গ্রন্থে এই আলোচনা করেছিলেন!

ক্ষমতাতত্ত্বের সবচেয়ে বড় দান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নূতন সংজ্ঞাপ্রদানে। রাষ্ট্রবিষয়ক জ্ঞানের নাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান —প্রচলিত এই সংজ্ঞা সংকীর্ণ, সমাজের বুকে ক্ষমতার খেলা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু হওয়া উচিত। অথচ প্রচলিত সংজ্ঞার্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান-আলোচনার এইপ্রকার সম্প্রসারণ হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করা হয় নবসংজ্ঞানির্ণয়-আন্দোলন। এঁরা বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান মূলত ক্ষমতার আলোচনা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এর এক বিশেষ অংশ মাত্র। সমগ্রভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষমতা বিশ্লেষণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়ের পরিধি এবং পরিধির এরূপ সম্প্রসারণের ফলে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার কলাকৌশলগুলি আরও ভালো ভাবে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে। ফলে, সাম্প্রতিক সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতা রাজনৈতিক আলোচনাতেও আমদানি করা সম্ভব হবে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োগও এর ফলে এই ক্ষেত্রে সহজতর এবং অধিক ফলবতী হবে। ক্ষমতা-সংজ্ঞার সমর্থনে চার্লস মেরিয়াম, হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল, জর্জ ক্যাট্‌লিন এবং মর্গেন্‌থোর গবেষণার অনেক আগে রাসেল[১১] ১৯১৬ সালে এবং ১৯২০ সালের প্রকাশিত গ্রন্থে আলোচনা করেন। আজও তাঁর *Power* গ্রন্থটি এ বিষয়ে অদ্বিতীয় রচনা।

ক্ষমতাতত্ত্বের জনপ্রিয়তা রাসেলের সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করার প্রয়াসের সহায়ক হয়েছে। এদিক থেকে সাম্প্রতিক গবেষণা রাসেলের ভালো না লাগার কোনো কারণ নেই। অতীতে রোপণ-করা চারাগাছটি পরবর্তীকালের গবেষণার আলো-হাওয়ায় ধীরে ধীরে বেড়ে চলবেই। ল্যাসওয়েল বলেন যে, ক্ষমতার চাহিদা আসে মানুষের কতকগুলি মূল্যবোধের সন্তোষবিধানের প্রয়াসে

The political act takes its origin in a situation in which the actor strives for the

---

১১ Cf. (a) *Principles of Social Reconstruction*: 1916. (b) *Practice and Theory of Bolshevism*: 1920.

attainment of various values for which power is a necessary (and perhaps also sufficient) condition."[১২]

অবশ্য রাসেল এ পথকে তাঁর পরবর্তী লেখায় মেনে নিয়েছেন এবং *Power* গ্রন্থে অনেক স্থানেই ক্ষমতার উদ্ভব যে মানুষের চিরন্তন প্রসিদ্ধি-লাভের প্রবৃত্তি থেকে হয়ে থাকে তা স্বীকার করে নিয়েছেন।

৯

সমাজ ও রাষ্ট্র -বিজ্ঞানে রাসেলের আর-একটি উল্লেখযোগ্য দান মনস্তত্ত্ব প্রসঙ্গে। উনিশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটেনে রাষ্ট্রালোচনা প্রধানত ভাববাদের দ্বারা আবিষ্ট ছিল। উপযোগবাদের অন্তিম শয্যার পাশে গ্রীন ব্র্যাডলি ও বোসাঙ্কের দর্শনের তখন অবাধ প্রাধান্য। রাজনীতিতে তখন নীতিবোধ, ব্রহ্মতত্ত্ব, মানুষের সঙ্গে পরম ব্রহ্মের যোগ ইত্যাদি বড় বড় কথার রাজত্ব। মুর ও রাসেলের দর্শন এই আন্দোলনের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত হানতে উদ্যত হলেন। তবে, একমাত্র রাসেলই ভাববাদী চিন্তার রাজনৈতিক অনুপপত্তির প্রতি বিদ্বৎ-সমাজ ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; সংস্থাপিত প্রশ্নগুলির প্রকৃতি পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হলেন। এবারে প্রশ্নগুলি আকারে ছোট হল, পরিধিতে সংকীর্ণতর হল, অথচ কার্যকারিতায় এবং সমস্যার সমাধান-সম্পাদনায় আরো উপযোগী বলে প্রতীয়মান হল।

মানুষের আচরণ প্রসঙ্গে উঠল প্রথম প্রশ্ন। সামাজিক আচরণকে বুঝতে হলে সমাজের অন্তর্গত মানুষের আচরণকে বুঝতে হবে, এই বোঝার আলোতে অনেক রহস্যের সমাধান সম্ভব হবে। সবার উপরে মানুষ সত্য এ কথা জেনেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মনে প্রশ্ন থেকে যায় যে, মানুষের মধ্যে কি সত্য—প্রবৃত্তির তাড়না, না, বুদ্ধির চালনা? রাসেল দেখলেন যে মানুষমাত্রই দেবত্ব ও পশুত্বের সংমিশ্রণ। নিছক প্রবৃত্তির তাড়নায় যেমন সে অনেক কাজ করে, শুভবুদ্ধির প্রেরণায় তেমন বহু অসাধ্যকেও সে সাধ্যায়ত্ত করতে পারে। উপযোগবাদী ও ভাববাদীরা ধরে নিয়েছিলেন যে, মানুষ সর্বক্ষেত্রে র্যাশনালিস্ট। অপর পক্ষে Le Bon এবং ম্যাকডুগাল সর্বক্ষেত্রেই মানুষকে প্রবৃত্তিচালিত বলে ধরে নিয়েছিলেন। রাসেল এই দুটি পথ ত্যাগ করে তৃতীয় পথের অনুসন্ধান করলেন। তবে তাঁকেও স্বীকার করতে হল যে, মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তিচালিত ক্রিয়া শুভবুদ্ধি-চালিত ক্রিয়ার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ঘটে থাকে।[১৩] অতএব রাজনীতিতে প্রবৃত্তির সমস্যার প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, শুভবুদ্ধির প্রসারকল্পে মানবিক ও সামাজিক প্রয়াস একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। দুটি পথ একই সঙ্গে সম্ভব। ফ্রয়েডের মত নৈরাশ্যবাদীর শেষবয়সের রচনায় কিছু পরিমাণে ও সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে এরিক্ ফ্রম প্রভৃতির রচনায়, সংশোধনবাদী পথের নিদর্শন পাওয়া যায়। এরিক্ ফ্রম বলেন, আদর্শ সমাজ গঠন করতে হলে মানসিক সুস্থতার দিকে নজর দিতে হবে— এবং সুস্থ মানুষ অর্থে আমরা বুঝব উপযোগসৃষ্টিকারী এবং সত্তাবিকলনহীন মানুষ; যে মানুষ পৃথিবীর সঙ্গে নিজের সত্তাসংগতি খুঁজে নিতে সমর্থ, এবং যে বহির্জগতের বাস্তবতার সঙ্গে শুভবুদ্ধির মাধ্যমে পরিচিত হতে পারে, যে নিজের অনন্য ব্যক্তিসত্তা উপলব্ধি করতে পারে, আবার একই সঙ্গে অপরের সঙ্গে মিত্রতা রচনা করতে পারে; যে অযৌক্তিক ক্ষমতার দ্বারায়

১২ *Power and Society*: Lasswell and Kaplan: 1946.

১৩ "impulse has more effect than conscious purpose in moulding men's lives"—*Principles of Social Reconstruction*: B. Russell: 1916.

আশ্রয় নেয় না, নিজের বিবেকের যুক্তিসিদ্ধ নির্দেশ মেনে চলে, জীবনের চলার পথে প্রতিপদে নতুন করে প্রাণলাভের প্রত্যাশী এবং যে জীবনকে সবচেয়ে বড় সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতে অঙ্গীকৃত[১৪]।

প্রবৃত্তিজনিত আবেগময়তার বিষফল পরমাণবিক ও স্পুটনিক -যুগে আরও বেশি প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যেমন নানাবিধ সুখস্বপ্ন সফল করে তুলেছে তেমন আবার বিশ্বধ্বংসী মহাযুদ্ধের সন্ত্রাসেরও দুঃস্বপ্ন বহন করে এনেছে। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী রাসেল তাই বলে বিজ্ঞানকে দায়ী করেন নি। তাঁর মত, প্রবৃত্তিচালিত ক্ষমতা— অন্ধ মানুষের হাতে বিজ্ঞানের কলাকৌশল অভিশাপ— দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের পর তৃতীয় মহাযুদ্ধের চিন্তা আজও মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এক উন্মত্ত নাটকের অপেক্ষায় যেখানে যবনিকাপতনের সঙ্গে দেখা যাবে সমস্ত পৃথিবীর ধ্বংস। তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিশেষত্বই হল যে, এ যুদ্ধে বিজয়ীকে আসলে পরাভব স্বীকার করতে হবেই। কারণ, জয়লাভের পর পরমাণবিক অস্ত্রের কৃপায় দেখা যাবে যে জয়পতাকা যে-মাটির উপর উড়ছে তা আসলে শ্মশান। অথচ এতসব জানা সত্ত্বেও রাজনীতিবিদ্‌দের চেতনায় এখনও এই সাধারণ সত্যের আলো অনুপস্থিত। যুক্তির সহজ বিশ্লেষণে যে সত্য আহরণ করা যায় দেশজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন নেতাদের চোখে সে সত্য ধরা দেয় না— কারণ যুক্তি তাদের কাছে আপাঙ্‌ক্তেয়, নেশাগ্রস্ত আবেগময়তার পথে চলা তাদের অভ্যাস এবং প্রবৃত্তিচালিত সাধারণ মানুষ অতি সহজেই তাদের এই মর্মান্তিক খেলার উৎসাহী দর্শক অথবা সমর্থকে পরিণত হয়।

যুদ্ধের বীজ মানুষের প্রাণে—তার অন্তঃস্থ পশুত্ব প্রবৃত্তিতে। কিন্তু প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত হলেও তা সংশোধনসাপেক্ষ। এ সংশোধন আয়াসলভ্য, কিন্তু অসম্ভব নয়। রাসেল বলেন, মানুষের শুভবুদ্ধি এক্ষেত্রে শাসকের কাজ করতে পারে। আমাদের আচরণ অপরিবর্তনীয় নয়। এই আচরণ ঈশ্বর অথবা ইতিহাস কর্তৃক পূর্বনির্দিষ্ট নয়। মানসিক দ্বন্দ্বে নির্ধারিত হয় দেবত্ব অথবা পশুত্বের জয়। এ ক্ষেত্রে সমাজসেবীর কর্তব্য প্রথমোক্ত উপাদানের সহায়তা করা। উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবেশন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যপ্রয়াস এবং উন্নতি এ পথের সহায়ক। এমন কি শুভপ্রচার এবং বাস্তবজগতের তথ্যগুলির সত্য প্রসারও এ পথের সহায়তা করে। আসল কথা হল, যুক্তি ও শুভবুদ্ধির প্রতি মানুষের আসক্তি—যদি তা জন্মানো যায় তাহলেই সমস্যার অর্ধেক সমাধান; এবং রাসেল বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বসংকটের জটিলতা দিন দিন যেভাবে বাড়ছে, তাতে আজ নয় তো কাল এ আসক্তি দেখা দেবেই[১৫]—অবশ্য এটা তাঁর বিশ্বাস, বিজ্ঞানসম্মতি-লব্ধ গবেষণার ফল নয়।

১০

সমকালীন বিচারে রাষ্ট্রদার্শনিকের স্থাননির্ণয়ে সবচেয়ে ভালো কষ্টিপাথর হল সমাজবাদ। রাসেল সমাজবাদ প্রসঙ্গে কি মতবাদ পোষণ করেন তা জানতে পারলে তাঁর রাষ্ট্রালোচনা অনেকাংশে পরিষ্কার ও সাবয়ব

১৪ *The Sane Society*: Erich Fromm: 1956: pp. 275.

১৫ "The future of man is at stake, and if enough men become aware of this, his future is assured. Those who are to lead the world out of its troubles will need courage, hope and love. Whether they will prevail, I do not know; but beyond all reason, I am unconquerably presuaded that they will"—*Human Society in Ethics and Politics*: 1954.

হয়ে উঠবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইতিহাসের সংকীর্ণ ব্যাখ্যায় রাসেলের সমর্থন নেই। মার্ক্সবাদী ইতিহাসদর্শন তাই বর্জনীয়। সবচেয়ে বড় কথা হল যে, ইতিহাসের কার্যকারণ সম্বন্ধ-প্রসঙ্গে কোনো সরল সূত্র রাসেল মানতে অসমর্থ। ইতিহাসের সূত্র হিসাবে অর্থনীতি অপেক্ষা ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে তিনি বেশি প্রাধান্য দেন, যদিও অর্থনীতির ভূমিকা ইতিহাসে তাঁর লেখায় অস্বীকৃত নয়। একমাত্র রাসেলের লেখায় দর্শনের ইতিহাসকে সামগ্রিক সামাজিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়েছে।

প্রথমজীবনে রাসেল উদারনৈতিক মতাবলম্বী ছিলেন। পরে লেবার পার্টিতে যোগ দেন। ফেবিয়ান সোসাইটির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিন্তু বলশেভিকবাদ-উপাসনার উন্মাদনা যখন প্রবল, রাসেল সেই সময়েই পরিষ্কারভাবে ডিক্টেটরীর কুফল সম্পর্কে জনমতকে বিশেষ করে সমাজবাদীদের সাবধান করে দেন। সেদিন সকলেই রাসেলকে অভিজাত সোশ্যালিস্ট বলে পরিহাস করলেও পরে সবাই সেই একই কথা আরও উদ্ধত ভাষায় স্বীকার ও প্রচার করতে বাধ্য হয়েছেন। রাজনৈতিক জীবনে প্রথম মহাযুদ্ধে যুদ্ধবিরোধী প্রচারে কারাবরণ ব্যতীত রাসেলের এইটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। তাই ১৯২০ সালে প্রকাশিত কমিউনিজ্‌ম প্রসঙ্গে তাঁর বহুনিন্দিত[১৬] গ্রন্থ যখন অপরিবর্তিত অবস্থায় ১৯৪৮ সালে পুনঃপ্রকাশিত হয় তখন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন।

রাসেলের সমাজবাদ প্রথমে নৈরাজ্যবাদের প্রভাবান্বিত ছিল। গিল্ড সোশ্যালিজমেও আসক্তি তৎকালীন গ্রন্থে সুস্পষ্ট। পরে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রতি তিনি মুক্তকণ্ঠে সমর্থন জানান। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ তিনি স্বীকার করেন, তবে একমাত্র প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। চিন্তার রাজ্যে পূর্ণস্বাধীনতা এবং সামাজিক সংগঠনক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিকেন্দ্রীকরণ রাসেলের সমাজবাদের অন্যতম উপাদান। গণতান্ত্রিক সমাজবাদী চিন্তাধারা ও কিছুপরিমাণে সাম্যবাদী মহলের বিদ্রোহী চিন্তাধারায় এই তত্ত্বের নিশ্চিত সমর্থন পাওয়া যায়— এই প্রসঙ্গে জিলাসের *The New Class* গ্রন্থ ও হাঙ্গেরী-বিপ্লবের দলিল স্মর্তব্য। সময়ের প্রবাহে রাসেলের চিন্তা এ দিক থেকে প্রাচীনতা-প্রাপ্ত হয় নি বরং তার নবীনতা অনেক সময়েই নবীনদেরও চিত্তচাঞ্চল্য জাগিয়েছে।

১১

সবশেষে আবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে না ফিরলে আলোচনা অসমাপ্ত থাকবে। উনিশ শতকের আভিজাত্যের শেষ বিদগ্ধ প্রতীক রাসেল। বন্ধুদের মধ্যে মূর, কেইনস্‌, বার্নার্ড শ, ওয়েলস্‌— এঁরা আজ সবাই অন্য জগতে। গত যুগের জীবন্ত প্রতিনিধি একমাত্র রাসেল। অথচ এখনও তাঁর লেখনী অক্লান্ত।

সারাজীবন রাসেল অচলায়তনের বিরোধিতা করেছেন। সেজন্য কারাবরণ যেমন তাঁর জীবনের অপরিচিত ঘটনা নয়, তেমনি অধ্যাপনার বৃত্তি ও ব্রত থেকে পৌনঃপুনিক অপসারণও তাঁর ধৈর্য পরীক্ষা করেছে। 'পুঁজিবাদী'রা চিরদিন রাসেলকে সমাজবাদী বলেছে, 'সমাজবাদী'রা অভিজাত বলে নিন্দাবাদ কম করে নি আর 'সাম্যবাদী'রা বিভিন্ন ভাষায় অপবাদ রটিয়েছে— অবশ্য সম্প্রতি তাঁর *Human Knowledge* পুস্তকটির রুশ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে মস্কোতে। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার এবং অর্ডার অব মেরিট পাওয়ায় জনমত আজ শ্রদ্ধা অর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। গণতান্ত্রিক জগতের

১৬ *The Practice and Theory of Bolshevism* ; B. Russell : 1920.

আজ তিনি প্রধানতম দার্শনিক। গণতন্ত্রের সংগ্রামেও অন্যতম পথিক। তাই রাসেলের জীবনীলেখকের[১৭] সিদ্ধান্ত আমাদেরও সিদ্ধান্ত— রাজনৈতিক বা আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ে যে-পৃথিবী দীক্ষা নিতে চায়, রাসেল অকম্পিত কণ্ঠে তাকে তাঁর অনাস্থা-জ্ঞাপন করেছেন। সেই সঙ্গে এ কথাও তিনি জানিয়েছেন যে, সংশয়বাদীর সন্ত্রস্ত হবার কোনো কারণ নেই। এ কথা সত্য যে নঙর্থক সংশয়মাত্র নিষ্ফল, কিন্তু সুস্থ সংশয়বাদী সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

১৭ *Bertrand Russell—The Passionate Sceptic* : Alan Wood : 1957 : pp. 244.

বার্টাণ্ড রাসেল

ব্রিটিশ কাউন্সিল

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙলা লেখায় বিরামচিহ্ন

রাজশেখর বসু

খাদ্য গলাধঃকরণের জন্যে যেমন গ্রাসের বিভাগ, অধ্যয়নের সুবিধার জন্যে যেমন গ্রন্থের অধ্যায়বিভাগ, তেমনি অর্থবোধের সুবিধার জন্যে বিরামচিহ্ন দিয়ে বাক্যের বিভাগ করা হয়। বিষয়টির সাহিত্যিক গুরুত্ব বিশেষ কিছু না থাকলেও উপেক্ষার যোগ্য নয়।

সেকালে আমাদের লিখিত ভাষায় শুধু দু রকম বিরামচিহ্ন ছিল— এক দাঁড়ি আর দুই দাঁড়ি। প্রাচীন সাহিত্য প্রধানত পদ্যে লেখা হত। কাগজপত্র দুর্লভ ছিল, সেজন্য পঙ্‌ক্তিভাগ না করে একটানা লেখা হত, শব্দের মধ্যেও প্রায় ফাঁক থাকত না। দাঁড়ির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ছন্দের চরণ পৃথক করা। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজী punctuation পদ্ধতির অনুসরণে বাঙলায় কমা সেমিকোলন ড্যাশ হাইফেন বিস্ময়চিহ্ন প্রশ্নচিহ্ন প্রভৃতি চালিয়েছিলেন। সেকালের ইংরেজী বইএ কমা চিহ্নের বাহুল্য দেখা যেত। বিদ্যাসাগর সেই রীতিই মেনে নিয়েছিলেন, বরং কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে। বেতাল পঞ্চবিংশতি (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) থেকে একটু নমুনা দিচ্ছি—

> মধ্যরাত্র সময়ে, এক দুর্দান্ত রাক্ষস আসিয়া, কহিল, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া আসিয়াছি, তোমার ভার্যাকে ভক্ষণ করিব। যদি তুমি, প্রশস্ত মনে, স্বহস্তে দ্বাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের মস্তকচ্ছেদন করিয়া, আমার হস্তে দিতে পার, তাহা হইলে, তোমার প্রিয়তমার প্রাণবধে ক্ষান্ত হই।

আজকাল ইংরেজী লেখায় কমার প্রয়োগ খুব কমে গেছে, আধুনিক লেখকরা পাঠকবর্গকে নিতান্ত নির্বোধ মনে করেন না, অর্থ সুগম করবার জন্যে বেশী কমা দেওয়া এখন অনাবশ্যক গণ্য হয়। বাঙলা লেখাতেও আজকাল বিদ্যাসাগরীয় প্রাচুর্য দেখা যায় না, কিন্তু আধুনিক ইংরেজী রীতির তুলনায় বাঙলায় কমার প্রয়োগ এখনও অত্যধিক।

বাঙলা লেখায় কমার সংখ্যা কমালে কিছুমাত্র ক্ষতি হবে মনে করি না। বাঙালী পাঠক এখন সাবালক হয়েছে, চলি-চলি-পা-পা করে তাকে পদে পদে সাহায্য করবার দরকার নেই। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। Vincent Smithএর *Early History of India*র ভূমিকায় আছে—

> The illustrious Elphinstone, writing in 1839, observed that in Indian History no date of a public event can be fixed before the invasion of Alexander.

উদ্ধৃত বাক্যে thatএর পর কমা নেই। কিন্তু বাঙলা লেখায় অনুরূপ ক্ষেত্রে 'যে' শব্দের পর কমা যেন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। উক্ত বাক্যটি বাঙলায় লেখা হবে— এলফিনস্টোন লিখেছেন যে, ভারত-ইতিহাসে আলেকজান্দারের আক্রমণের পূর্বে কোনও ঘটনার তারিখ নির্ধারণ করা যায় না।

আধুনিক ইংরেজী বইএর সঙ্গে যদি বাংলা বইএর তুলনা করা হয় তবে দেখা যাবে, আমরা অনেক বেশী এবং অনেক ক্ষেত্রে অকারণে কমা দিয়ে লেখা কণ্টকিত করি। কমার অতিপ্রয়োগ আমাদের কম্পোজিটর আর প্রুফরীডারদেরও মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। লেখক সংযমী হলেও নিস্তার নেই, ছাপা-

খানার কর্মীরা মনে করেন কপিতে ভুল আছে, তাই তাঁরা যথেচ্ছা কমা বসিয়ে দেন। আমাদের লেখক আর মুদ্রকরা যদি গতানুগতিতা ত্যাগ করে এ বিষয়ে একটু মন দেন তবে লেখার আর ছাপার উপকার হবে।

প্রশ্ন আর বিস্ময় চিহ্নকে রবীন্দ্রনাথ সুনজরে দেখতেন না। তিনি বলেছেন, অধিকাংশ স্থলে প্রকরণ বা context থেকেই প্রশ্ন বা বিস্ময় বোঝা যায়, চোখে আঙুল দিয়ে পাঠককে হুঁশিয়ার করবার দরকার নেই।

এক কালে বিস্ময়চিহ্ন বা note of admiration দুই উদ্দেশ্যে চলত— বিস্ময় প্রকাশ আর সম্বোধন। আজকাল বাঙলায় সম্বোধনে এই চিহ্ন কম দেখা যায়, ইংরেজীতে আরও কম। সম্বোধন স্থলেও কমা চলে। সংস্কৃত পদ্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়া প্রভৃতি পদের বাঁধাধরা স্থান নেই, সেজন্য কমা সেমিকোলনের প্রয়োগ অসম্ভব। অগত্যা আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিতদের অনেকে আধুনিক হবার মানসে ইংরেজী বিস্ময়-চিহ্নকে দেবভাষায় পাঙ্‌ক্তেয় করেছেন এবং সর্বত্র সম্বোধন পদের পর বসাচ্ছেন। যেমন—

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্!
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাধিকর্ত্রে।
অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস!
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ॥

সংস্কৃত পদ্যে এই চিহ্ন যেমন অশোভন তেমনি অনাবশ্যক। আশা করি এই উৎকট রীতি পরিত্যক্ত হবে।

হাউসা দেশে

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কানো, ১০ অগষ্ট ১৯৫৪ মঙ্গলবার। আমীর তারপরে যথারীতি তাঁর প্রজাদের কাছে উপদেশবাণী প্রচার ক'রলেন— জিনিসটা আধুনিকভাবে হ'ল লাউড-স্পীকার মারফত। আমরা দূর থেকে তার আওয়াজ কিছু কিছু শুনতে পেলুম। আসল ব্যাপার তো হ'য়ে গেল, কিন্তু ভিড় কমবার উপায় নেই। সবাই এসেছে একটু উৎসবের আনন্দ করবার জন্য। দলে দলে এখানে ওখানে সেখানে ঢোলক বাজিয়ে লোকে গান শুরু করে দিয়েছে, আর তা ছাড়া নানান রকমের খেলা আর ক্রীড়াকৌতুক ছোটো ছোটো দলে শুরু হয়েছে।

আমরা সাড়ে-দশটার দিকে রেসিডেন্সিতে ফিরলুম। অন্য অতিথিরা চলে গেলেন, শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী জন্‌স্টনের সঙ্গে আমি প্রাতরাশ শেষ ক'রলুম। তার পরে সিন্ধী বন্ধুরা এলেন, পূর্বের ব্যবস্থা-মতন আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে চ'ললেন। প্রথমে তাঁরা আমায় নিয়ে গেলেন এখানকার হাওয়াই জাহাজের আড্ডায়। এখানে একটী হাওয়াই জাহাজ সোজা ভারতবর্ষ থেকে আস্‌ছে— "চার্টার্ড প্লেন" অর্থাৎ সমগ্র প্লেনটী ভাড়া করা। সিন্ধী ব্যবসায়ীদের যে-সব লোকজন পশ্চিম আফ্রিকায় কাজ নিয়ে আছে তাদের আড়াই তিন বছর অন্তর বদলী করা হয়। কতকগুলি সিন্ধী ভদ্রলোক সপরিবারে আসছেন, তাঁরা এই অঞ্চলের নানা সিন্ধী দোকানের কর্মচারী বা মালিক। তাঁরা যাদের কার্য্যভার নেবেন, সেইসব অবসরপ্রাপ্ত সিন্ধীরা আর তাঁদের পরিবারেরা এই প্লেনেই আবার দেশে ফিরে যাবেন। এই ভাবে প্লেন ভাড়া ক'রে কর্মচারীদের অদল-বদল হচ্ছে সিন্ধীদের রীতি। আমরা যখন পৌঁছলুম তখন প্লেন এসে গিয়েছে, যাত্রীরা সবাই নেমে গিয়েছেন, আর হাওয়াই আড্ডার রেস্তোরাঁয় জমায়েত হয়েছেন। চেলারামের দোকানের কর্মীরা এই স্বজাতীয়দের সঙ্গে শিষ্টাচার ক'রলেন। মদ্য-পানও চল্‌ল। দুই-একজন এখানে নেমে গেলেন, বাকি সব লেগস, আক্রা প্রভৃতি নগরের দিকে রওনা হ'লেন। আমি প্রায় পৌনে-বারোটার সময় সিন্ধী বন্ধুদের সঙ্গে একটু পুরোনো শহরের ভিতর দিয়ে চেলারামের দোকানে এসে উপস্থিত হলুম। যথারীতি, এঁদের নিজেদের বাড়িতেই দোকান। উপর তলায় এঁদের থাকবার জায়গা, আর নীচের তলায় খ'দ্দেরদের দেখাবার জন্য নানারকম জিনিসের পসার। নানান রকম দ্রব্যসম্ভারের জন্য আছে গুদামঘর, বাড়ির পিছনে। এই ছোট্ট শহরের প্রায় সব সিন্ধী ব্যবসায়ী আর কর্মচারী আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করবার জন্য আহূত হয়েছিলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন হিন্দু, কিন্তু কাম্বে বা খম্বাৎ শহর থেকে আগত তিনজন গুজরাটি মুসলমান ব্যাপারীও নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। খম্বাতী গুজরাটিদের কারবার হ'চ্ছে ভারতবর্ষের এক অতি প্রাচীন রপ্তানী ব্যবসায় অবলম্বন ক'রে। ভারতবর্ষের লাল কালো সাদা নীল নানা রকমের শক্ত পাথর কেটে কেটে গোল বা মাদুলীর আকারের দানা অতি প্রাচীন কাল থেকে আফ্রিকায় রপ্তানী হ'য়ে আসছে। এই সব পাথরের সাধারণ ইংরেজি নাম হ'চ্ছে agate অ্যাগেট বা আকীক, আর এই আকীক নানা রঙের হয়— লাল কালো সাদা হ'লদে নীল প্রভৃতি। এই পাথর অত্যন্ত শক্ত, আর একে কেটে ঘষে' মেজে এর মধ্যে ছেঁদা ক'রে দেহে ধারণ করবার নানা মণি বা

অলঙ্কার হয়। স্মরণাতীত কাল থেকে এই সব আকীকের দানা বা মাদুলী আফ্রিকান লোকেদের কাছে পরম আদরের বস্তু। আর সমগ্র আফ্রিকায়, যেখানে আধুনিকতা এখনো ঢোকেনি, এই আকীকের দানার গহনার রেওয়াজ বেশ জোরের সঙ্গেই চ'লেছে। পশ্চিম আফ্রিকায় ইংরেজিতে এই দানাকে Aggrey beads বলে। খম্বাত বা কাম্বে নগরী অতি প্রাচীন কাল থেকে এই আকীকের কাজের প্রধান কেন্দ্র; আর আফ্রিকায় আকীকের যে চাহিদা আছে, কেবল ভারতবর্ষই তা মেটাতে পারে। এই পুরাতন বেসাতির কাজে নিযুক্ত আছেন কানোতে তিনটী গুজরাটি মুসলমান ভদ্রলোক। এঁদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে আলাপ হ'ল, ফজলে হোসেন, আর দ্বিতীয় জনের নাম ইউসুফ আলী খম্বাতী। ফজলে হোসেন একজন অতি সুদর্শন সদালাপী যুবক। এই ব্যবসার সম্বন্ধে আমাকে অনেক খবর দিলেন। ব'ললেন যে, ইয়োরোপীয় রুচির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে আকীকের গয়নারও আদর ক'মে আসবে। তখন তাঁদের অন্য ব্যবসার কথা চিন্তা ক'রতে হবে তবে উপস্থিত কালে তাঁদের এই ব্যবসায় বেশ ভালোই যাচ্ছে। পরে শ্রীযুক্ত পরশুরাম মনসুখানি তাঁদের দোকানে আফ্রিকান মেয়ে খরিদদারদের জন্য যেভাবের আকীকের মালা—দানা আর মাদুলী প্রভৃতি—বিক্রি হয়, তার নমুনা দেখালেন। এই মুসলমান স্বদেশবাসীদের সঙ্গে সিন্ধী হিন্দুরা বেশ সদ্ভাবের সঙ্গে আছেন দেখে বড়ো আনন্দ হ'ল।

নানা প্রসঙ্গে আলাপ ক'রতে ক'রতে আমাদের ভোজের পর্ব আরম্ভ হ'ল আর যথারীতি এই সিন্ধী ভোজনের পর্ব চুকল সাড়ে-তিনটেয়। বলা বাহুল্য, এখানেও ভোজনপর্বের সঙ্গে সঙ্গে পানপর্বেরও ব্যবস্থা ছিল প্রচুর। প্রত্যেককেই মদ খাওয়াবার জন্য ওরা পীড়াপীড়ি করে, আর আধ ঘণ্টা পর পর ভোজনের একটী করে পদ আসে, আর বেশির ভাগই মাংস। খেতে খেতে কাম্বের মুসলমান ব্যাপারীদের সঙ্গে কথা হ'ল— আকীকের মালা প্রভৃতি তৈরীর কথা এরা আমায় বুঝিয়ে দিলেন; ব'ললেন, যদি আকীকের জিনিসের দরকার হয়, তাহ'লে ওঁদের কাম্বেতে স্থিত কারখানায় যেন খবর দিই। আমাকে সিন্ধীরা কিছু ব'লতে অনুরোধ ক'রলেন— আমি ভারতবর্ষের সংস্কৃতি নিয়ে দুকথা ব'ললুম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, "এই ভারতের মহামানবের মেলা"র আশয় নিয়ে কিছু ব'ললুম। সন্ধ্যে পর্য্যন্ত হাতে কিছু সময় আছে— সিন্ধী বন্ধুরা ঠিক ক'রলেন যে শহরটা আমায় একটু ঘুরিয়ে আনবেন। আমি সানন্দে সম্মত হ'লুম। আমরা পুরোনো শহরের ভিতরে গেলুম। কানোর বাড়িগুলি অদ্ভুত হ'লেও, চোখে নোতুন জিনিস ব'লে ভালোই লাগ্‌ল। নাইজিরিয়ায় এক ইংরেজী পত্রিকায় কানোর বাস্তুরীতি সম্বন্ধে একটী বড় সচিত্র প্রবন্ধ পড়েছিলুম, তাতে একজন ধনী ব্যবসায়ীর বসতবাটির নকশা আর নানা ছবি ছিল। ওদের বাস্তু সম্বন্ধে এই ভাবে একটু ধারণা থাকায়, বাইরে থেকে হ'লেও বাড়িগুলির বৈশিষ্ট্য যেন চেনা-চেনা লাগ্‌ল। ঈদের উৎসব, চার দিকে কালো চেহারার হাউসারা মেয়ে-পুরুষ কাচ্চা-বাচ্চা ভালো কাপড় প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর দুই-একটা সাবেক ধরণের ভোজনশালায় খুব খরিদ্দারের ভীড়। আজ প্রতি ঘরেই কোরবানীর ভেড়ার মাংস খাবে। সিন্ধী বন্ধুরা প্রস্তাব ক'রলেন, আমি আমীরের প্রাসাদে গিয়ে আমীরের সঙ্গে শিষ্টাচার-সম্মত দর্শন আর সাক্ষাৎ-আলাপ ক'রে আসি। আগেই বলেছি, আমীরের প্রাসাদ একটী সেকেলে লাল মাটির তৈরী বাড়ি— বেশির ভাগই একতলা, অনেকটা জায়গা জুড়ে'। দুধারে উঁচু লাল মাটির দেয়াল, একটা লম্বা রাস্তা দিয়ে প্রাসাদের দ্বারে ঢুকতে হয়। এই রাস্তার মুখে কতগুলি সেপাই

আর অন্য লোক ছিল, এরা আমীরের কর্মচারী। সিন্ধী বন্ধুরা মোটর বাইরে রাখলেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে চ'ললেন। সেপাইদের কৈফিয়ত দিতে হ'ল— আমরা আমীর-দর্শনে চলেছি। আজ রাজপ্রাসাদ অবারিত-দ্বার। দলে দলে আমীরের প্রজারা তাদের রাজাকে দেখতে যাচ্ছে, আর কখন দেখা হবে এই আশায় বাইরে অনেকক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা ক'রছে। দূর দূর গ্রাম থেকে সব লোক এসেছে। কোনো-কোনো জায়গায় তারা দলবদ্ধ হ'য়ে বসে ঢোলকের বাজনা বাজিয়ে নাচের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠসঙ্গীত ক'রছে। সিন্ধী বন্ধুরা সকলেই হাউসা ভাষা বেশ ভালো ক'রে শিখেছেন। এঁদের জিজ্ঞাসা করায় এঁরা একটু শুনে আমায় ব'ললেন যে, এই সব গান হ'চ্ছে যুদ্ধের গান, আর আমীরের পূর্ব-পুরুষদের প্রতাপের গান। আমাদের রাজপ্রাসাদের প্রধান দরজার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই, আমীরের দরবারের কতকগুলি কর্মচারী এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল'। সিন্ধী বণিক্‌দের এদের সঙ্গে জানাশোনা ছিল, সিন্ধীরা ব'ললেন যে, তাঁরা আজকে শুভ পর্ব-দিনে আমীরকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন, আর সঙ্গে এনেছেন ভারতবর্ষ থেকে আগত ভারত সরকারের প্রেরিত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যিনি একাধারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর পশ্চিম-বঙ্গ রাজ্যের পার্লামেণ্টের একজন মুখিয়া। তারা বেশ খুশি হ'য়েই যেন আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল, আর আমাদের বস্‌বার জন্য চেয়ার আনিয়ে দিলে— আমরা আমাদের দলে বারো-চোদ্দ জন ভারতীয় ছিলুম, আমরা চেয়ারে ব'সে অপেক্ষা ক'রতে লাগ্‌লুম। শুনলুম, আমীর তখন তাঁর রাজ্যের কতগুলি অধীনস্থ সামন্তরাজা আর জমিদারের সঙ্গে আলাপ ক'রছিলেন, একটু পরেই আমাদের ডেকে পাঠালেন।

আমাদের প্রায় বিশ মিনিট অপেক্ষা ক'রতে হ'ল। ইতিমধ্যে আমীরের এক ভাইপো এলেন। ইনি ইংরেজি বলেন। ইনি নীল আর কালো রঙের হাউসা দরবারী পোষাক প'রে ছিলেন। পরে ইনি আমাদের রাজপ্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। কতগুলি মাঝারী আকারের ঘর, লাল মাটির তৈরী, পরিপাটি ক'রে নিকানো। ঘরের মধ্যে চেয়ার সাজানো আছে, আর মেঝেতে একটু মোটা কাজের গালিচা পাতা। এরকম ঘর মনে হ'ল গ্রীষ্মকালের পক্ষে বেশ আরামপ্রদ। প্রাসাদের মধ্যে ছোট্ট একটা বাগান আছে। সেটা দেখাবার জন্যেও আমাদের নিয়ে গেল। বাগান ব'লতে বিশেষ কিছু নয়। দু-চারটে খুদে-খুদে' গাছ আর কতগুলি টবে পাতা-বাহার গাছ আর ফুলের গাছ; আর যতদূর মনে হ'চ্ছে এক পাশে আমাদের নিমের মতন একপ্রকার বড়ো গাছ। এই মরুভূমির দেশে বাগান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই কদিনের বৃষ্টিতে বেশ তাজা দেখাচ্ছিল বটে, কিন্তু গাছপালাগুলি মনে হ'ল মড়্‌ঞ্চে— নিষ্প্রভ। প্রাসাদের এই অংশে নানা রকমের লোক যাওয়া আসা ক'রছে। উজ্জ্বল পোশাক-পরা দরবারী নকীব হরকরা প্রভৃতিও ঘুরছে। তারপরে আমাদের আমীরের একটা খাস-কামরায় নিয়ে গেল— এইখানে তিনি বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে দেখা করেন। এখানে অনেকগুলি চেয়ার সাজানো আছে, তাতে আমাদের ব'সতে দিলে। সামনে একটা সিংহাসন-মত বড়ো কাঠের চেয়ার— সেইটে আমীরের রাজাসন। তার আশ-পাশে আঁরো কতকগুলি চেয়ার, এগুলি অমাত্য আর মন্ত্রীদের বসবার জন্যে। ঘরটা লাল মাটির তৈরী আর কার্পেট-পাতা। আমরা আমীরের জন্যে অপেক্ষা ক'রতে লাগ্‌লুম। ঠিক পাঁচটার সময় আমীর এসে ঘরের মধ্যে দেখা দিলেন। তাঁর আসবার আগে নকীব বা ঘোষণাকারী হাউসা ভাষায় চীৎকার ক'রে আমীরের বিরুদ বা উপাধিগুলি ব'লতে লাগ্‌ল, এই ভাবে জানিয়ে দিলে যে আমীর সভায় 'বিজয়' করবার জন্যে আসছেন।

আমীরের সঙ্গে সঙ্গে আরো সাত-আট জন লোক এলেন— সভাসদ্ আর অমাত্য। আমীর সিংহাসনে ব'সলেন— আমরা উঠে দাঁড়িয়েছিলুম, আমীরের সঙ্গে একে একে করমর্দন ক'রতে লাগ্‌লুম আর সিন্ধী বন্ধুদের নির্দেশমত আমিও আর সবাইয়ের সঙ্গে ডান হাতে ঘুষি পাকিয়ে তুলে হাউসা কায়দায় আমীরের স্বাগত ক'রলুম আর ব'ললুম 'ঈদ মোবারক'। আমীরকে দেখে বেশ বুদ্ধিমান্ আর সৌজন্যের অবতার ব'লে মনে হ'ল। হাউসা দরবারী পোশাক পরা, মাথার পাগড়ির খানিকটা কাপড় দিয়ে নাকের নীচে মুখটা ঢাকা। শুনলুম উনি ইংরিজি জানেন কিন্তু হাউসা ভাষায় দেভাষী মারফত আমার সঙ্গে আলাপ ক'রলেন— এঁর ভাইপো দোভাষীর কাজ ক'রলেন। সিন্ধী বন্ধুরা হাউসা ভাষাতেই কথা ব'ললেন। আমি জানতুম যে কানো হ'চ্ছে হাউসা সংস্কৃতির কেন্দ্র। আর কানো দরবারের হাউসা ভাষার প্রতিষ্ঠা অন্য স্থানের হাউসা ভাষার উপরে। এদের ভাষা কানে বেশ মিষ্টি লাগ্‌ল। এদের ভাষায় শিষ্টাচার আর সৌজন্য প্রকাশক অনেক বাক্যের প্রয়োগ আছে। আমীর ভারতবর্ষ সম্পর্কে দু-চার কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধা, ভারতবর্ষ বিষয়ে অপূর্ব কৌতূহল। শ্রীযুক্ত নেহেরুর সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সঙ্গেই জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমি ব'ললুম, আপনি একবার আমাদের দেশ ঘুরে আসুন না। আমীর তাতে মৃদু হাস্য ক'রে ব'ললেন— ভগবানের ইচ্ছা হ'লেই যাবো। ভারতীয় বণিক্‌দের তারিফ ক'রলেন। সকালে আমরা যে মিছিল দেখেছিলুম তার উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আরব পুরাণোক্ত ইব্রাহিম আর ইসমাইলের কাহিনী শুনিয়ে দিলেন। সেটা অবশ্য হাউসা দরবারী রেওয়াজের রীত রসমের বাইরের বস্তু। মিনিট কুড়ি এই ভাবে রাজদর্শন-পর্ব সমাধা ক'রে আমরা বিদায় নিলুম। রাজপ্রাসাদ থেকে বেরোবার সময় অন্য অন্য দরবারিয়াদের সঙ্গে শিষ্টাচার বিনিময় ক'রতে হ'ল— পরস্পরের দিকে ঘুষি দেখানো আর হাসিমুখে 'ঈদ মোবারক' বলা।

বাইরে এসে দেখলুম, গান বাজনা নাচে নিযুক্ত হাউসা জনসাধারণের সংখ্যা আরো বেড়েছে। বাইরে তখনো বেশ রোদ্দুর আছে। সিন্ধী বন্ধুরা আমাদের নিয়ে গেলেন কানোর আরবী মাদ্রাসার বা কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের বাড়িতে। ইনি হ'চ্ছেন একজন বেশ দীর্ঘকায় খার্তুম নগর থেকে আগত সুদানী ভদ্রলোক। এঁর নাম হ'চ্ছে আওয়াদ (আওয়াজ) মাহমূদ আহ্‌মদ। এঁর বাড়িটি একটু আধুনিক ধরণের। এঁর বৈঠকখানার ঘরে নিয়ে গেলেন, সেটি ইংরিজী ধরণে সাজানো আর পণ্ডিতের ঘর যেরূপ সাজানো উচিত— নানা কেতাবপত্র ছড়ানো। এঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিলেন আরো কতকগুলি ভদ্রলোক। তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ত্রিপলি থেকে আগত দুজন আরব বণিক্‌ও ছিলেন। আমি ত্রিপলি হ'য়ে আসছি শুনে এঁরা খুব খুশি হ'লেন। এঁদের সঙ্গে কথা হ'ল ইংরিজিতেই। প্রিন্সিপাল আহমদ ইংরিজিও বেশ জানেন। আমি মাঝে মাঝে দু-চারটে আরবী বাক্যের বুকনি দিয়ে নিজের স্বল্প-পুঁজির বিদ্যা জাহির করবার লোভ সংবরণ ক'রতে পারলুম না। নিজের পরিচয় ইংরিজিতে দিলুম, Chairman of the Legislative Council or Senate of West Bengal in India, তার পরে আরবীতে ব'ললুম, "আস্-সদর আল্-মজলিস আশ্-শুয়ুখ আল-বঙ্গালা আল্-মগ্‌রবী ফী জুমহুরিয়াৎ অল্-হিন্দ"। সুদানের লোকেরা মিশ্র আরব ও নিগ্রো বা আফ্রিকান; আর এরা একরকমের আরবীই বলে, যদিও সুদান দেশের দক্ষিণে বিশুদ্ধ আফ্রিকান নানা জাতির লোকও বাস

করে যারা আরবী জানে না— নিজের নিজের ভাষা বলে। ইসলাম ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আরবীভাষী সুদানী মু'অল্লিম বা শিক্ষকেরা সাহারা মরুর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের মুসলমান আফ্রিকান দেশগুলিতে এসে ধর্মগুরুর আর শিক্ষাগুরুর কাজ করেন। যেমন সাহারার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ত্রিপলি তিউনিস্ আলজিয়ার্স আর মোরোক্কো থেকে আরবী শিক্ষক আর মুসলমান ধর্মগুরুরা কাজ ক'রে এসেছেন। প্রিন্সিপাল মহাশয়কে বেশ আধুনিক ভাবের মানুষ ব'লে মনে হ'ল। ইউরোপে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে ইসলাম আর আরবী ভাষা নিয়ে যা কাজ হয়েছে ও হ'চ্ছে তার খবরও রাখেন। ভারতবর্ষ হ'তে আগত একজন অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয়ও হ'ল তাতে তিনি খুশি হ'লেন, আর আমিও এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে বেশ আনন্দ লাভ ক'রলুম।

এর পর আমরা নতুন শহরের দিকে গেলুম। পথে রেলওয়ে স্টেশনের পাশে দেখলুম স্তূপাকার করে পিরামিডের মত ঢেরী বা স্তূপ বানিয়ে চীনেবাদাম এনে রেখে দেওয়া হয়েছে। এই চীনেবাদামের স্তূপ বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্য তেরপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। মালগাড়ি ক'রে রেল-যোগে এইসব চীনেবাদাম দক্ষিণে সমুদ্রতীরে বন্দরে যাবে, সেখান থেকে বিদেশে যাবে। নাইজিরিয়া থেকে তেলের জন্য দুরকমের ফল বাইরে খুব রপ্তানী হয়— এক হচ্ছে উত্তর নাইজিরিয়ার চীনাবাদাম, আর দুই, দক্ষিণ নাইজিরিয়া Palm Oil Nut বা তেল-সুপারী ফল। নাইজিরিয়ার আর্থিক সম্পদ প্রধানতঃ এই দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করে।

সন্ধ্যের মুখে আমরা শ্রীযুক্ত Dr. G. P. Bargery ডক্টর বার্জারি সাহেবের বাসায় এসে উপস্থিত হ'লুম। গত রাত্রে শ্রীযুক্ত জন্স্টন সাহেবের বাড়িতে এঁর সঙ্গে আহার হয়েছিল, আর কথা ছিল এঁর সঙ্গে হাউসা ভাষা সম্বন্ধে দু-চারটে খবর নেবো। বার্জারি সাহেব খুব আনন্দের সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগলেন, কী ভাবে তাঁর বাইবেল-অনুবাদের সংশোধন চ'লছে তা একটু দেখালেন। হাউসা ভাষায় কোনো কোনো বিষয়ে প্রগতিলাভ ক'রছে, সেইজন্যে বাইবেলের অনুবাদও বদলাতে হ'চ্ছে।

হাউসা ভাষার শব্দ-দ্বৈত নিয়ে কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা সংস্কৃতে পাওয়া যায় না কিন্তু আমাদের আধুনিক সমস্ত আর্য্য ভাষায় পাওয়া যায়। যেমন একটা বিশেষণ শব্দকে দু'বার ব'ললে, বাঙলা ভাষায় তার দ্বারা হয় বহুত্বের ভাব আনে, অথবা সেই বিশেষণের ভাবটাকে একটু হালকা ক'রে দেয়। যেমন 'জা' বা লাল 'জা-জা'—লাল-লাল, ঈষৎ লাল অর্থে প্রয়োগ হয়। সেই রকম 'ফারি'—সাদা, কিন্তু 'ফারি-ফারি'—সাদাটে ভাবের। 'দা-সাউরি' অর্থে শীঘ্র, কিন্তু 'দা-সাউরি-দা-সাউরি' অর্থাৎ খুব শীঘ্র। 'সান্নু' মানে ধীরে, 'সান্নু সান্নু' মানে আস্তে আস্তে বা খুব ধীরে। বাঙলা অনুপ্রাস শব্দের মতনও এদের ভাষায় শব্দ ব্যবহার আছে। যেমন বাঙলায় 'চর', চরচর বা চড়চড়—তেমনি হাউসাতে 'চিকা' মানে পূর্ণ করা, 'চিচ্চিকা' ('চিক্‌চিকা' থেকে)=অনেক জিনিস পূর্ণ করা, বা এক জিনিসই বহুবার পূর্ণ করা। এই-সব শব্দদ্বৈত বিভিন্ন ভাষার একটী তুলনামূলক আলোচনার লক্ষণীয় বিষয়।

শ্রীযুক্ত বার্জারির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা হাওয়াই জাহাজের আড্ডায় গেলুম। এখানে হাউসা দেশের আর আশ-পাশের অঞ্চলের শিল্পদ্রব্য বা curio বিক্রি করে এই রকম দোকানীদের একটা মহল্লা বা বস্তী আছে। কানোর দক্ষিণে Bida বিডা শহরে পিতলের তৈজসপত্র বিক্রি করে— যেমন কটোরা বা বাটি, থালা এবং অন্য পাত্র। শ্রীযুক্ত জন্স্টনের বাড়িতে সাজানো এইরকম তৈজস দেখি। এইসব পিতলের পাত্রের গায়ে বিশুদ্ধ আফ্রিকান নকশা বেশ জোর হাতে খোদাই করা। কিন্তু এখানে সে জিনিস

পেলুম না। কতগুলি অত্যন্ত বাজে বিদেশী-যাত্রী-ভোলানো হাউসা পিতলের খেলনা ও অন্য তৈজস দেখলুম, সেগুলি ছোঁবারও ইচ্ছে হ'ল না। শুনলুম সে জিনিস খাঁটি পেতে হলে সেই বিডাতে ছুটতে হবে।

সিন্ধী বন্ধুরা আমাকে জন্‌স্টন সাহেবের বাসায় পৌঁছে দিলেন। স্নান ক'রে একটু বিশ্রাম ক'রে সায়মাশের জন্যে তৈরী হ'য়ে নেওয়া গেল। জন্‌স্টন সাহেব আর চার জন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করেন—এঁরা সকলেই ইয়োরোপীয়। এঁদের সঙ্গে আলাপ ক'রে খুশি হ'লুম। এঁদের সঙ্গে ছিলেন Captain Maiden মেড্‌ন্‌— ইনি ভারতবর্ষে ফৌজের অফিসার ছিলেন। এগারো নম্বরের রাজপুত পদাতিক দলের অফিসার ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইনি অংশ গ্রহণ করেন। এখন ভারতীয় সেনাদল থেকে অবসর নিয়ে আফ্রিকাতে ডেরা ক'রেছেন। মনে হ'ল, ইনি পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় তুলোর চাষের আর তুলোর ব্যবসায়ের কাজে নিযুক্ত। ভারতবর্ষের ব্যাপার সম্বন্ধে একটু সহানুভূতিশীল ব'লে মনে হ'ল। খুব হুঁশিয়ার লোক, আর অনেক খোঁজ-খবর রাখেন, সেজন্যেই যা-তা কথা বলেন না। এঁর সঙ্গেই বেশির ভাগ আলাপ হ'ল। আর একজন ছিলেন, লেগসের জার্মান কন্‌সাল— Mr. Deuzer দেন্‌ৎসর। সকালে এঁর সঙ্গে আমরা এক গাড়িতে মিছিল দেখতে গিয়েছিলুম। আর ছিলেন সস্ত্রীক Watt ওয়াট ব'লে একজন ইংরেজ কর্মচারী, যিনি এখানকার একটী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত। এঁদের সকলের সঙ্গে আর জন্‌স্টন দম্পতীর সঙ্গে নানা গল্পগুজবে আমাদের নৈশভোজন সমাপ্ত হ'ল,—সেই সওয়া-আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত সদালাপ চল্‌ল।

তার পরের দিন ভোর চারটেয় আমাকে তৈরী হ'তে হবে। ছটার দিকে হাওয়াই আড্ডায় প্লেন আসবে। এই প্লেনে ক'রে আমি সোজা আক্রা যাবো— গোল্ড-কোস্ট বা ঘানা দেশে আবার ফিরবো। শ্রীযুত জন্‌স্টন এত ভদ্র ও বিনয়ী যে তিনি নিজেই ভোরের বেলা আমাকে তাঁর গাড়ি ক'রে হাওয়াই জাহাজের আড্ডায় পৌঁছে দেবেন ব'ললেন। তাঁর মোটর-চালক হাউসা মুসলমান, তার জাতির পর্বদিন ঈদ ব'লে তাকে তিনি বিকেলবেলা থেকে সারা রাত্তির ছুটি দিয়েছেন; কাজেই তিনিই আমাকে নিয়ে যাবেন তাঁদের এই সৌজন্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রলুম। এঁরা এমন সহজভাবে আর সহৃদয়তার সঙ্গে কথাবার্তা কইলেন যেন ওঁদের অতিথির মনে কোনো সংকোচ বা কিন্তু-কিন্তু ভাব না থাকে।

বুধবার ১১ই অগষ্ট, ১৯৫৪। ভোর সাড়ে-তিনটেয় ঘুম ভেঙে গেল। সাড়ে-চারটের ভিতর তৈরী হ'য়ে নিলুম। শ্রীযুক্ত জন্‌স্টন ঐ সময় হাওয়াই জাহাজের আড্ডায় টেলিফোন ক'রে জানলেন— হাওয়াই জাহাজ ঠিক সময়েই আসছে। পৌনে-ছটায় আমরা হাওয়াই আড্ডায় এসে পৌঁছলুম— প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই B. O. A. C. প্লেন এসে অবতীর্ণ হ'ল। আমার মালপত্র শ্রীযুক্ত জন্‌স্টনের তদারকে ওজন হ'ল। বেশি ওজন হওয়ায় তিন পাউণ্ড অধিকন্তু দিতে হ'ল। এই হাওয়াই জাহাজে ইংলণ্ড থেকে শ্রীযুক্ত জন্‌স্টনের একটি বন্ধু এসে উপস্থিত হ'লেন। আমার প্রতি শ্রীযুক্ত জন্‌স্টনের অমায়িক হৃদ্যতা বিশেষ ক'রে মনে রাখবার কথা। অন্য যাত্রীরা নাম্‌ল। রেস্তোরাঁয় এসে একটু পান-ভোজন ক'রে নিলে। ইতিমধ্যে আমারো সিন্ধী বন্ধুরা শ্রীযুক্ত পরশুরাম মনসুখানী আর তা-ছাড়া কানো শহরের তিন জন মুসলমান গুজরাটি ব্যাপারী, এঁরাও আমার প্রত্যুদ্‌গমনের জন্যে অত ভোরেও এসে হাজির হ'লেন। শ্রীযুক্ত ফজলভাই আমার ছবি নিলেন, একলা, আর অন্য বন্ধুদের সঙ্গে। এই জাহাজে আমার সহযাত্রী হ'লেন জার্মান কনসাল ডেন্‌ৎসর সাহেবও।

সাতটার সময় আমাদের প্লেন ছাড়্‌ল, আমরা দক্ষিণমুখো আক্রার দিকে রওনা হলুম।

'অভিসার' কবিতার উৎস-সন্ধানে

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১৮৮২ খৃস্টাব্দে স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের উপর এই গ্রন্থখানির প্রভাব সুদূরপ্রসারী। একটি সম্পূর্ণ নূতন জগৎ যেন রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল। প্রাচীন ভারতের এক নবতন রূপ তরুণ কবিকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিল। তিনি এই গ্রন্থখানির মধ্যে অসংখ্য কবিতা ও নাটকের উপাদান খুঁজিয়া পাইলেন। বঙ্গসাহিত্যও কবির লেখনীপ্রসূত নব নব কাব্য-সম্পদে বিভূষিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উল্লিখিত গ্রন্থের সাহায্যেই উত্তরভারতীয় মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের লুপ্তস্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। নেপালে মহাযান বৌদ্ধধর্মের যেসকল পুঁথি রক্ষিত ছিল, সেইগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই যদিও এই গ্রন্থের প্রধান রচয়িতা ছিলেন তথাপি স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-মহাশয়ও তাঁহাকে সম্পাদনকার্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। বহু গ্রন্থের পরিচয় শাস্ত্রি-মহাশয়েরই রচনা।[১]

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খৃস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলির রচনাকাল— কার্তিক ১৩০৪ - অগ্রহায়ণ ১৩০৬ (খৃস্টীয় ১৮৯৭-৯৯ সাল)। সুতরাং প্রত্যক্ষতঃ 'কথা' কাব্যের অন্তর্গত বৌদ্ধ আখ্যানমূলক কবিতাগুলির মূল উৎস যে রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থই, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকিতে পারে না। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে মহাযান বৌদ্ধসাহিত্যের পুঁথিগুলির যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা হইতে বৌদ্ধ আখ্যানগুলির মাধুর্য সাধারণের পক্ষে উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য, এমন কি অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-মহাশয়ের মত সাহিত্যরসিক মনীষীও প্রসিদ্ধ 'অবদানশতক' গ্রন্থের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন: "The stories are puerile and of little interest· ·"।[২] কিন্তু এইসকল অতি সাধারণ আখ্যানভাগ অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অপূর্ব কবিতারাজি সৃষ্টি করিয়াছেন। 'দশরূপক' প্রণেতা আচার্য ধনঞ্জয় সত্যই বলিয়াছেন—

> রম্যং জুগুপ্সিতমুদারমথাপি নীচ-
> মুগ্রং প্রসাদি গহনং বিকৃতং চ বস্তু।

---

১ দ্রু "It was originally intended that I should translate all the abstracts into English, but during a protracted attack of illness, I felt the want of help, and a friend of mine, Bábu Haraprasád Sástrí, M.A., offered me his co-operation, and translated the abstracts of 16 of the larger works. His initials have been attached to the names of those works in the table of contents."—R. L. Mitra: *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal. Preface,* p. xliii.

২ অথচ এই 'অবদানশতকে'রই একটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'পূজারিনি' কবিতা রচনা করেন।

যথাংগ্যবস্তু কবিভাবকভাব্যমানং
তন্নাস্তি যন্ন রসভাবমুপৈতি লোকে।

রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ঐসকল অতিসাধারণ, এমন কি অনেকস্থলে জুগুপ্সাব্যঞ্জক, কাহিনীকে অপূর্ব কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। ইহা যে শুধুই অলস, নিষ্প্রয়োজন ঔৎসুক্য পরিতৃপ্তির উপায়মাত্র, তাহা নহে; রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও বহুলপরিমাণে এইজাতীয় তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যেই হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয়।

২

'কথা' কাব্যের 'অভিসার' কবিতাটির[৩] মূল 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' বলিয়া কবি নির্দেশ করিয়াছেন। 'বোধিসত্ত্ববদানকল্পলতা' গ্রন্থের রচয়িতা কাশ্মীরীয় কবি ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস। রচনাকাল খৃস্টীয় ১১শ শতকের মধ্যভাগ।[৪] রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে নেপাল হইতে প্রাপ্ত এই সুবিস্তৃত কাব্যখানির বিবরণ প্রথম লিপিবদ্ধ হয়।[৫] স্বয়ং রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই অংশের রচয়িতা। 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র দ্বিসপ্ততিতম অবদানে সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সেই অংশের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

Upagupta was intended by his father, Gupta of Mathura, to be a disciple of Sonavásí. Upagupta had deep reverence for Sonavásí. Vàsavadattá, a prostitute, finding Upagupta very handsome, desired him to call at hers. Upagupta said, "This is not the proper time for going to a prostitute; I shall call at the proper time." Some time after this, Vàsavadattá poisoned one of her paramours at the instigation of another. She was sentenced to be killed with torture. The executioner cut her nose, her ears, her hair, and took away her clothes. Upagupta, thinking that to be a proper time for seeing a prostitute, appeared before Vásavadattá, and instructed her in his faith, which gave her great consolation. Upagupta became an Arhat; he conquered Káma and commanded him to exhibit Sugata's beauty. Káma transformed himself into Sugata, assuming a brilliant form with large eyes shut in meditation, and still eye-brows. Upagupta converted eighteen lacs of the people of Mathurá."[৬]

---

৩ রচনাকাল "১৯ আশ্বিন, ১৩০৬."

৪ তু° ". . . . . the extensive Avadāna book of the Kashmirian poet Kṣemendra, the Avadánakalpalatā, which was completed in 1052 A.D. . . "—Winternitz: *History of Indian Literature*, Vol. II, p. 293.

৫ এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত *Bibliotheca Indica* গ্রন্থমালায় ক্ষেমেন্দ্রের 'অবদানকল্পলতা' পরবর্তীকালে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল সংস্কৃত পাঠের সহিত উহার তিব্বতী ভাষান্তরও উক্ত সংস্করণে পাশাপাশি মুদ্রিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য: *Avadāna-Kalpalatā* (Sanskrit and Tibetan)—Author Kṣemendra—Editors: Saratcandra Dāsa, H. M. Vidyābhuṣaṇa and Satīścandra Vidyābhūṣaṇa.—1889-1917.—2 Vols. in 24 fascicles." 'অভিসার' কবিতার রচনাকালে উপগুপ্তের কাহিনীসম্বলিত মূলগ্রন্থের অংশ প্রকাশিত হয় নাই।

৬ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, p. 67.

৩

'উপগুপ্ত-অবদানে'র এই অস্থি-কঙ্কাল অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ইন্দ্রজাল সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে। ক্ষেমেন্দ্রের মূল সংস্কৃত গ্রন্থেও উদ্ধৃত সন্দর্ভ হইতে অধিকতর মাধুর্য নাই।[৭] মূলে বাসবদত্তার চরিত্র নিরতিশয় ঘৃণ্য, সে মথুরানগরীর প্রধানা রূপাজীবা মাত্র—গন্ধবিক্রয়ী গুপ্তপুত্র উপগুপ্তের দেহসৌন্দর্যে সে বিমোহিত হইয়াছে। বিশ্বস্ত দূতীকে উপগুপ্ত সকাশে পাঠাইয়া সে আপনার অন্তরের প্রণয় নিবেদন করিয়াছে—

সঞ্জাতরাগসংবেগা গণিকা সংগমার্থিনী।
বিসৃজ্যাভিমতাং দূতীং ভাবং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ।—বোধি. ৭২. ৭

কিন্তু গুপ্তপুত্র স্মিতমধুর ভাষণে তাহার সেই প্রেমনিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে—

স স্বৈরমর্থিতো দূত্যা সস্মিতস্তামভাষত।
অয়ং নাভিমতঃ কালস্তস্যাঃ সন্দর্শনে মম।—ঐ. ৭২. ৮

উপগুপ্তের প্রতি গণিকা বাসবদত্তার প্রণয় অনেকটা বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার অনুরাগেরই অনুরূপ। উভয়েই কামপ্রবৃত্তি ও গণিকাসুলভ অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য নিরীহ পূর্ব প্রেমিককে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

নাস্মাকমেতদ্ বাণিজ্যং ত্যজ্যতে যদি বিত্তবান্।
ন ধর্মায় ন কামায় বয়মর্থায় নির্মিতাঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা মাতুঃ সংমতে দ্রবিণার্থিনী।
বরাসবেন ন্যবধীৎ সবিষেণ বণিক্সুতম্।—ঐ. ৭২. ১৬-১৭

শেষ পর্যন্ত নিজের এই দুষ্কৃতির উপযুক্ত নিগ্রহও তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। মুক্তকেশী মুক্তবসনা হইয়া তাহাকে বধ্যভূমিতে যাইতে হইয়াছে; হস্তপাদ, কর্ণ-নাসিকা ছেদন করিয়া তাহার অতীতের রূপসৌভাগ্যগর্ব রাজপুরুষগণ হরণ করিয়াছে—শোণিতক্লিন্নভূমিতে শয্যা বিছাইয়া তাহাকে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে— যে মথুরাবাসী নাগরিকবৃন্দ একদা মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত তাহার অপরূপ দেহসুষমাদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহার চতুর্দিকে বিচরণ করিত আজ তাহারাই বাসবদত্তাকে ঘৃণার সহিত পরিহার করিয়াছে, একমাত্র পুরাতন দাসীই বাসবদত্তার বিকৃত দেহের পার্শ্বে বসিয়া বধ্যভূমিতে প্রতীক্ষমাণ মাংসলোলুপ গৃধ্র গোমায়ু প্রভৃতির কবল হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছে। উপগুপ্ত বাসবদত্তার এই শোচনীয় পরিণামের সংবাদ শ্রবণ করিয়া বধ্যভূমিতে উপনীত হইলেন। তখন বাসবদত্তার চেতনা কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে—উপগুপ্তের প্রতি অনুরাগবাসনা মৃত্যুপথযাত্রিণী এই নৃশংস গণিকার চিত্ত তখনও আচ্ছন্ন করিয়া আছে।

---

৭ তু° "The huge collection of legends, too, in which Kṣemendra has recast the Buddhist Avadānas in the style of ornate court poetry, contains more edifying stories than skilfully and tastefully narrated ones. The Buddhist tendency of self-sacrifice is here brought to a climax with such subtelety, the doctrine of Karman is applied so clumsily, and the moral is pointed in such an exaggerated manner, that the story often achieves the reverse of the desired result."—Winternitz: *HIL*, Vol. II, p. 293.

তখনও আপন রূপলাবণ্যের দ্বারা উপগুপ্তকে বিলোভিত করিবার ইচ্ছা বাসবদত্তার অন্তর হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই—

দাস্যা নিবেদিতং দৃষ্ট্বা তমায়াতং শশিদ্যুতিম্।
পূর্বাভিলাষশেষেণ সা লজ্জাকুটিলাভবৎ।
অন্তঃপ্রবিষ্টঃ কেনাপি বাসনাভ্যাসবর্ত্মনা।
ন কস্যাঞ্চিদবস্থায়াং রাগস্ত্যজতি দেহিনাম্।
জঘনাবরণং কৃত্বা দাস্যা বসনপল্লবম্।
সা স্তনস্তস্তহস্তা তং বভাষে বিনতাননা।
প্রযত্নেনাপি মহতা নায়াতস্ত্বং ময়ার্থিতঃ।
অধুনা মন্দভাগ্যায়াস্তব সন্দর্শনেন কিম্।
যদা সমভবৎ কোঽপি ভাগ্যসৌভাগ্যবিভ্রমঃ।
ন দর্শনস্য কালোঽয়মিত্যুক্তং ভবতা তদা।
কৃত্তাঙ্গী রুধিরাদিগ্ধা চ্যুতাহং ক্লেশসাগরে।
কালঃ কমলপত্রাক্ষ কিময়ং দর্শনস্য মে।

উপগুপ্ত বাসবদত্তার এই হৃদয়বিদারক শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ও করুণ বচন শুনিয়া যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইলেন— তাঁহার হৃদয়ে অনুশোচনা জন্মিল। ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে বাসবদত্তাকে উদ্দেশ করিয়া উপগুপ্ত বলিতে লাগিলেন—

তোমার চন্দ্রসদৃশ কান্তি, সুবর্ণকদলীসদৃশ দেহের অপূর্ব লাবণ্য, পদ্মের ন্যায় মুখমণ্ডল, অথবা কুবলয়দলেরও ক্লৈব্যবিধায়ি লোচনদ্বয় কোনটিই আমার ঈপ্সিত নহে। আমি শুধু আসিয়াছি কামের পরিণামবিরসতা দেখিবার জন্য। একদিন তোমার এই দেহ বরসৌরভবাসিত ও নানা বিচিত্রভূষণ ও অংশুকের দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল, আজ সেই শোভার কি পরিণাম হইয়াছে দেখ! ইহাই বৈষয়িক বস্তুর স্বভাব। নানাবিধ ব্যসনের আকর, অস্থি-মাংস-মজ্জার সমাহার মাত্র, জুগুপ্সিত এই দেহের প্রতি শুধু মোহবশতই প্রাণিগণ আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিস্যন্দিনি দুরামোদে বিকৃত-চ্ছিদ্রসঙ্কুলে।
অহো মোহান্মনুষ্যাণাং কায়েঽপি প্রিয়ভাবনা।

সুগতোপাসনাই এই দুঃখস্কন্ধ হইতে উদ্ধার লাভের একমাত্র পন্থা। সেই কল্যাণমিত্র ভগবান তথাগতের অনুশাসন যাহারা প্রণিধান সহকারে শ্রবণ করিয়াছে, তাহারা আর কখনও এই নরকসদৃশ শরীরের প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হয় না।

উপগুপ্তের এই উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তার হৃদয়ে বিরাগের সঞ্চার হইল,— এই সংসার হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া সেই গণিকা পুণ্য ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করিল এবং 'স্রোতাপত্তি' ফললাভকরতঃ এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিল। তখন মথুরাবাসিগণও বাসবদত্তার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া যত্নসহকারে তাহার দেহ-সৎকার করিল।

৪

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ক্ষেমেন্দ্রের 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' গ্রন্থখানি প্রাচীন বৌদ্ধ অবদান-সমূহেরই সংকলন মাত্র। 'উপগুপ্ত-অবদানে' বর্ণিত উপগুপ্ত-বাসবদত্তা সম্পর্কিত কাহিনীটিও পূর্বতন অবদান সাহিত্য হইতেই সমাহৃত হইয়াছে। প্রাচীন মিশ্র বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাযান সম্প্রদায়ের অবদান-

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন—'দিব্যাবদান' নামক গ্রন্থের ষড়্‌বিংশতিতম অবদানে ('পাংশুপ্রদানাবদান') প্রাসঙ্গিকভাবে উপগুপ্ত কর্তৃক বাসবদত্তার উদ্ধারের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উল্লিখিত গ্রন্থে 'দিব্যাবদানমালা' এই নামে গ্রন্থখানির উল্লেখ আছে বটে, তবে পুঁথিখানি খণ্ডিত অবস্থায় ছিল বলিয়া দ্বাবিংশতিতম অবদান পর্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।[৮] সুতরাং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থ হইতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'উপগুপ্ত-অবদান' কাহিনীর সহিত পরিচয় লাভ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ই. বি. কাউএল্ (E. B. Cowell) এবং আর. এ. নীল্ (R. A. Neil), কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুইজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের সুযোগ্য সম্পাদনায় 'দিব্যাবদান' গ্রন্থের রোমান হরফে মুদ্রিত একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৯] এই গ্রন্থের ৩৫২-৩৫৫ পৃষ্ঠায় উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার কাহিনীটি লিপিবদ্ধ আছে। 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র কাহিনীর সহিত 'দিব্যাবদানে'র অন্তর্গত কাহিনীর ঘটনাগত কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু 'দিব্যাবদানে'র রচনাশৈলী এমনই প্রসাদগুণাঢ্য ও নিরাড়ম্বর যে আপাত-দৃষ্টিতে অতি সাধারণ ঘটনাবলীও কাব্যোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'দিব্যাবদানে'র রচনাশৈলী সম্পর্কে সুপণ্ডিত সম্পাদকদ্বয় যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা হইতে অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

The Divyâvadâna, unlike the Mahâvastu, is generally written in fairly correct Sanskrit; some parts of it indeed might almost be taken as a model of an unaffected prose style; simple as it is, it has a force of its own from its artless pathos and directness.[১০]

উপগুপ্ত-বাসবদত্তা সম্পর্কিত কথাংশের রচনাশৈলী সম্পর্কে এই মন্তব্য যথার্থ। রবীন্দ্রনাথ 'দিব্যাবদানে'র এই মুদ্রিত সংস্করণের সহিত পরিচিত ছিলেন কি না, বর্তমানে তাহা সুনিশ্চিতভাবে নির্দেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র উপগুপ্ত-অবদান হইতে 'দিব্যাবদানে'র কথাংশ যে বহুলপরিমাণে কাব্য-রসসিক্ত সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না— এবং রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে 'দিব্যাবদানে'র অন্তর্গত কথা ভাগেরই আকর্ষণ সমধিক হওয়া স্বাভাবিক। বাসবদত্তার রাজদণ্ডজনিত শরীরবিকৃতির কথা শ্রবণ করিয়া উপগুপ্ত যখন শ্মশানাভিমুখে চলিয়াছেন, সেই অংশের বর্ণনা 'দিব্যাবদানে' সত্যই হৃদয়বিদারক—

যাবদ্ একেন দারকেনোপস্থায়কেন ছত্রমাদায় প্রশান্তেনের্য্যাপথেন
শ্মশানমনুপ্রাপ্তঃ, তস্যাশ্চ প্রেষিকা পূর্বগুণানুরাগাৎ সমীপেঽবস্থিতা
কাকাদীন্ নিবারয়তি। তয়া চ বাসবদত্তায়া নিবেদিতম্, আর্য্যদুহিত-
র্যস্ত ত্বয়াহং সকাশং পুনঃ পুনরনুপ্রেষিতা অয়ং স উপগুপ্তোঽভ্যাগতঃ,
নিয়তমেষ কামরাগার্ত্ত আগতো ভবিষ্যতি। শ্রুত্বা চ বাসবদত্তা কথয়তি।
"প্রণষ্টশোভাং দুঃখার্ত্তাং ভূমৌ রুধিরপিঞ্জরাম্।
মাং দৃষ্ট্বা কথমেতস্য কামরাগো ভবিষ্যতি।"

৮ দ্র° *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, pp. 304 ff.

৯ *The Divyāvadāna,*/A Collection of Early Buddhist Legends/Now First Edited From/The Nepalese Sanskrit MSS. in Cambridge and Paris./By E. B. Cowell, M.A. and R. A. Neil, M.A./Cambridge: At the University Press. 1886.

১০ ঐ. Preface, pp. vii-viii.

ততঃ প্রেষিকামুবাচ। "যৌ হস্তপাদৌ কর্ণনাসং চ মহ্বীয়াদ্ বিকর্ত্তিতৌ
তৌ প্রেষয়েতি।" ত্বয়া যাবচ্ছ্রেষয়িত্বা পট্টকেন প্রচ্ছাদিতা। উপগুপ্তশ্চাগত্য
বাসবদত্তায়া অগ্রতঃ স্থিতঃ। ততো বাসবদত্তা উপগুপ্তমগ্রতঃ স্থিতং দৃষ্ট্বা কথয়তি
আর্য্যপুত্র যদা মহ্বীয়ং স্বস্থভূতং বিষয়রত্যানুকূলং তদা ময়া আর্য্যপুত্রস্ত
পুনঃ পুনর্দূতী বিসর্জিতা, আর্য্যপুত্রেণাভিহিতম্‌-'অকালস্তে ভগিনি মম
দর্শনায়েতি।' ইদানীং মম হস্তপাদৌ কর্ণনাসৌ চ বিকর্ত্তিতৌ স্বরুধির-
কর্দ্দম এবাবস্থিতা, ইদানীং কিমাগতোঽসি।"

৫

রবীন্দ্রনাথ 'অভিসার' কবিতায় মূল উপাখ্যানের বহু পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। মূলে উপগুপ্ত তখনও গন্ধাপণিক; হৃদয় কামবিমুখ বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তথাগতের সদ্ধর্মে দীক্ষিত হন নাই। কিন্তু অভিসার কবিতায় দেখি—

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার প্রথম সাক্ষাৎকারের মধ্যে আকস্মিকতা ও নাটকীয়তার সঞ্চার করিয়া ঘটনাটিকে রহস্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন—দূতীর মুখ দিয়া নহে, শ্রাবণ-নিশীথিনীর ঘনমেঘাবৃত গগনতলে ক্ষীণ প্রদীপালোকে অভিসার-সজ্জিতা বাসবদত্তা স্বয়ং তরুণ উপগুপ্তের নিকট আপন প্রণয় ব্যক্ত করিয়াছে—

কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে, নয়নে জড়িত লজ্জা,
'ক্ষমা করো মোরে, কুমার কিশোর,
দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর—
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর, এ নহে তোমার শয্যা।'

উপগুপ্তের সহিত বাসবদত্তার প্রথম দর্শনও যেমন আকস্মিক, অচিন্তিতোপনত, মৃত্যুপথযাত্রিণী বাসবদত্তার সহিত অন্তিম সাক্ষাৎও তদ্রূপ আকস্মিক। এবারে একক উপগুপ্ত চলিয়াছেন, চৈত্ররজনী জ্যোৎস্নাধবলিত—

বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল পারুল রজনীগন্ধা।

বাসবদত্তা আজ নগরীর বহির্ভাগে পরিত্যক্ত—মথুরাবাসিগণ আজ তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু অন্য কারণে—

নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ।
রোগমসী-ঢালা কালী তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুরপরিখার
বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার বিষাক্ত তার সঙ্গ।

উপগুপ্ত বাসবদত্তার রোগশীর্ণ দেহ নিজ অঙ্কে তুলিয়া লইলেন, শুষ্ক অধরে জল ঢালিয়া দিলেন, শীত চন্দনপঙ্কে

বাসবদত্তার দেহ লিপ্ত করিয়া দিলেন। আজ আবার জ্যোৎস্না-বিধৌত, কোকিল-কূজন-মুখরিত, পুষ্পসৌরভবাসিত রজনীতে অসীম গগনতলে উপগুপ্তের সহিত বাসবদত্তার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে—

'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়'
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়,—
'আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি, বাসবদত্তা।'

৬

প্রত্যেক কবিই স্বতন্ত্র স্রষ্টা, সেইজন্যই প্রাচীন ভারতীয় কাব্যবিচারকগণ কবিকে 'প্রজাপতি' রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। ইতিহাসের সর্বজনগোচর উপাদানকে তাঁহারা নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রতিভার ও অনুভূতির সাহায্যে একটি বিশিষ্ট রূপ দান করিয়া থাকেন—সেইজন্য একই বিষয় লইয়া রচিত কাব্য বিভিন্ন কবির লেখনীতে বিভিন্ন রূপে ও রসে সঞ্জীবিত হইয়া থাকে। ইতিহাসের উপাদান তাঁহাদের নিকট স্ব স্ব আদর্শ ও অনুভূতিকে রূপ দিবার উপকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেইজন্যই আচার্য আনন্দবর্ধন স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করিয়াছেন—

ইতিবৃত্তবশায়াতাং ত্যক্ত্বানমুগুণাং স্থিতিম্।
উৎপ্রেক্ষ্যোঽপ্যন্তরাভীষ্টরসোচিতকথোন্নয়ঃ।
সন্ধি-সন্ধ্যঙ্গঘটনং রসাদিব্যক্ত্যপেক্ষয়া।
নতু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতি সম্পাদনেচ্ছয়া।

সুতরাং সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাহিনীর যে রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'অভিসার' কবিতায় সংঘটন করিয়াছেন, তাহাতে আপত্তির কিছুমাত্র নাই। কিন্তু, একটি প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়: কাহিনীর এই রূপান্তর সাধনের উদ্দেশ্য কি? কেবলমাত্র মূল কাহিনীর নগ্ন বীভৎসতাকে একটি অপূর্ব কাব্যসুষমায় আবৃত করিবার তাগিদেই কি রবীন্দ্রনাথ ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে অভিনবত্ব-সঞ্চারের আয়োজন করিয়াছিলেন, না অন্য কোনও গভীর উদ্দেশ্য কবির হৃদয়ের অবচেতন স্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিয়াছে ও কবির লেখনীকে আপনার অজ্ঞাতসারেই সঞ্চালিত করিয়াছে? 'অভিসার' কবিতার আলোচনায় এই প্রশ্ন যে অপ্রাসঙ্গিক নহে, তাহা রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব।

৭

রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে ভগবান্ বুদ্ধ ও তাঁহার প্রচারিত ধর্মের প্রতি চিরদিনই গভীর শ্রদ্ধা বিরাজমান ছিল। রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে বুদ্ধ শাক্যমুনিকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের দুইটি প্রধান মার্গ— একটি মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও অপরটি হীনযান বৌদ্ধধর্ম রূপে প্রখ্যাত। হীনযান বৌদ্ধধর্মের বাহন মুখ্যতঃ পালিভাষা; অপরপক্ষে মহাযান বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে।[১১] হীনযান বৌদ্ধধর্মে তথাগতপ্রতিপাদিত ধর্মের শুষ্ক তত্ত্বের দিক্‌টা যেমনভাবে প্রকাশিত হইয়াছে,

---

১১ তু° "যেমন বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে কেবলমাত্র শাঙ্করভাষ্য পড়িলে ভারতে প্রচলিত বেদান্তকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হইল মনে করা যায় না, সেইরূপ পালিগ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যায় এবং যাহা অবলম্বন করিয়া সাধারণত য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকদিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন, বৌদ্ধধর্মের মর্মগত সত্য-সন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে।"—বুদ্ধদেব, পৃ. ৪০

তাহার মাধুর্যের দিক্‌টা ঠিক ততখানি প্রাধান্য লাভ করে নাই। এই জগৎ দুঃখময়, এই জগৎ ক্ষণিক,—ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভই সংসার-দাবানল-দগ্ধ মানবের একমাত্র কাম্য। শূন্যরূপ পরমতত্ত্ব বা নির্বাণ লাভই হীনযানপন্থী বৌদ্ধগণের জীবনের চরম লক্ষ্য। হীনযানধর্ম প্রধানতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, নিজে নির্বাণ লাভ করিতে পারিলেই জীবনের লক্ষ্য সিদ্ধ হইল। অন্যান্য দুঃখার্তগণকেও তাহাদের শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করিয়া জগতের দুঃখভার লঘু করা হীনযানী স্থবিরগণের সাধনপদ্ধতি নহে। নির্বাণও হীনযানমতে নেতিবাচক, তাহার মধ্যে মাধুর্যের আস্বাদ আছে বলিয়া মনে হয় না। অপরপক্ষে, মহাযান বৌদ্ধধর্মে মৈত্রী ও করুণার ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বের দিক্ নহে, নেতিবাচক শূন্যতারূপ নির্বাণ নহে, কিন্তু প্রেমের দিক্, করুণার দিক্, জগতের সত্যত্ব স্বীকার করিয়া জাগতিক দুঃখ হইতে জীবগণকে উদ্ধার করিবার অকৃত্রিম আগ্রহ—ইহাই হইতেছে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রধান লক্ষণ। এই মহাযান বৌদ্ধধর্মই প্রাচীন কালে ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া চীন, জাপান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের এই করুণাঘন প্রেমিকরূপের বিকাশ ভারতবর্ষের জনসাধারণ ভুলিতে বসিয়াছে। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—

কোনো বৃহৎ ধর্মই একটিমাত্র সরল সূত্র নহে, তাহাতে নানা সূত্র জড়াইয়া আছে। সেই ধর্মকে যাহারা আশ্রয় করে তাহারা আপনার প্রকৃতির বিশেষত্ব অনুসারে তাহার কোনো একটা সূত্রকেই বিশেষ করিয়া বা বেশি করিয়া বাছিয়া লয়।

অপিচ—"ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের যে সম্প্রদায়ের রূপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা হীনযান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ের দিক্‌টা প্রকাশ করে।" 'বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ' : ঐ, পৃ. ৫৮

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। সকলেই জানেন এই ধর্ম হীনযান এবং মহাযান এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই দুই শাখার মধ্যে প্রভেদ গুরুতর। আমরা সাধারণত হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের ধর্মকেই বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছি।

তাহার একটি কারণ, মহাযান-সম্প্রদায়ী বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষে আমরা দেখিতে পাই না। দ্বিতীয় কারণ, যে পালি-সাহিত্য অবলম্বন করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাহার মধ্যে মহাযান সম্প্রদায়ের মতগুলি পরিণত আকার ধারণ করে নাই।—বুদ্ধদেব, পৃ. ২৯

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধসাহিত্য বিশেষ অনুসন্ধিৎসা ও অনুরাগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হীনযান বৌদ্ধধর্মের শুষ্ক তত্ত্বান্বেষণ ও ব্যক্তিগত মুমুক্ষাপ্রবণতা অপেক্ষা মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রেম ও ভক্তির দিক্‌টাই তাঁহার কবিচিত্তকে সমধিকভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। শুষ্ক পুরাতত্ত্বের উপাদান সংকলন তাঁহার অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ছিল না। বৌদ্ধধর্মের জীবন্ত রূপ তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কেননা, রবীন্দ্রনাথের মতে—

ধর্মকে চিনিতে গেলে তাহাকে জীবনের মধ্যে দেখিতে হয়। পুরাতত্ত্ব আলোচনার দ্বারা তাহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না।...বস্তুত শাস্ত্রবচন খুঁটিয়া লইয়া, টুকরা জোড়া দিয়া, ধর্মকে চেনা যায় না। তাহার একটি সমগ্র ভাব আছে।—ঐ. পৃ. ২৯ ৩০

অপিচ—

পুঁথিপড়া বিদেশী পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের শুষ্কপত্র হইতে আমরা এই ধর্মের পরিচয় গ্রহণ করি। এই ধর্মের রসধারায় এই পণ্ডিতদের চিত্ত স্তরে স্তরে অভিষিক্ত নহে। এক প্রদীপের শিখা হইতে আর এক প্রদীপ যেমন করিয়া শিখা গ্রহণ করে তেমন করিয়া

তাঁহারা এই ধর্মকে সমগ্রভাবে লাভ করেন নাই। এমন অবস্থায় তাঁহাদের কাছ হইতে আমরা যাহা পাই তাহা নিতান্ত মোটা জিনিস; তাহা আলোকহীন, চক্ষুহীন, স্পর্শগত অনুভবমাত্র। এইজন্য এইরূপ শাস্ত্র-গড়া বৌদ্ধধর্ম হইতে আমরা এমন জিনিস পাই না যাহা আমাদের অন্তঃকরণের গভীর ক্ষুধার খাদ্য যোগাইতে পারে। একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি অনেককাল পালি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন। ... আভাসে একদিন বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি এই আলোচনায়রস পান নাই, তাঁহার সময় মিথ্যা কাটিয়াছে। —বুদ্ধদেব পৃ. ৩১

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও সাহিত্য— দুইই অত্যন্ত নিপুণতার সহিত অনুশীলন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অধীত বিষয়গুলি শুধুই বুদ্ধির কোঠায় গিয়া স্তূপীকৃত নীরস বস্তুপুঞ্জে পর্যবসিত হয় নাই। তিনি অন্তরের অন্তরে ছিলেন কবি, পাণ্ডিত্যের উপাদান তাঁহার প্রতিভায় যতই থাকুক না কেন। সেইজন্য তিনি যাহাই অধ্যয়ন করিতেন সে-সবই তাঁহার হৃদয়ের অনুভূতির স্পর্শে সজীব হইয়া উঠিত। বৌদ্ধ শাস্ত্র, সাহিত্য ও ধর্মের চর্চা করিয়া তিনি ভারতের অতীত ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়কে মূর্তরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন এবং সেই অধ্যায়ের যিনি অধিনায়ক পুরুষ, ভগবান্ তথাগত বুদ্ধ, তিনি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে করুণা, প্রজ্ঞা ও মৈত্রীর জীবন্ত বিগ্রহরূপে প্রতীয়মান হইলেন। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বুদ্ধের তপস্যা ততখানি নহে, যতখানি দুঃখার্ত প্রাণিবর্গের দুঃখ লাঘবের জন্য। সেইজন্য মহাযান বৌদ্ধসাহিত্যে বুদ্ধদেব 'বৈদ্যরাজ' রূপে অভিহিত হইয়াছেন—

> চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িতে।
> বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্বব্যাধিপ্রমোচকঃ।

বুদ্ধদেবের এই করুণাঘন বৈদ্যরাট্‌রূপই রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে অভিভূত করিয়াছিল সর্বাধিক পরিমাণে। তাই রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে গিয়া এক জায়গায় বলিয়াছেন—

তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঙর্থক নয়, সদর্থক; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে; যে মুক্তি রাগদ্বেষ বর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়। ঐ, পৃ. ১২

আর একজায়গায় তিনি বলিতেছেন—

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশঃ পরিপূর্ণ ক'রে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশে আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাসনাসংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম 'মেত্তিভাবনা'—মৈত্রীভাবনা।—'ব্রহ্মবিহার': ঐ. পৃ. ১৭-১৮

আবার—

প্রত্যহ শীলসাধনার দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে, আমার শীল অখণ্ড আছে, অচ্ছিদ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে, ক্রমশঃ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতা-লাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি। —ঐ, পৃ. ২৩

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি, তাই মহাযান বৌদ্ধসাহিত্যের হৃদয়বৃত্তিপ্রধান এই মৈত্রীসাধনের পদ্ধতি তাঁহার কবিহৃদয়কে গভীরভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল, এবং এই কারণেই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhist Litrature of Nepal* গ্রন্থের প্রকাশ— যাহাতে সর্বপ্রথম বিস্মৃতপ্রায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের সুবিশাল সাহিত্য বিদ্বৎসমাজের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয়,— তাঁহার কবিপ্রতিভার উন্মেষের ইতিহাসে একটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনার উৎস— এই একটিমাত্র গ্রন্থ; ইহা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে।

৮

'অভিসার' কবিতার আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত মন্তব্যগুলি একেবারেই অবান্তর নহে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে যেমন 'প্রেমের মঙ্গল দিনকর' রূপে কল্পনা করিয়াছেন, সেইরূপ উপগুপ্তও ছিলেন বৌদ্ধসঙ্ঘে বুদ্ধেরই 'প্রতিভূ' স্বরূপ।[১] মহাযান বৌদ্ধসাহিত্যে তিনি 'অলক্ষণকো বুদ্ধঃ' রূপে পরিচিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যেমন বুদ্ধদেবকে মৈত্রী ও করুণার আকররূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশে অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন, সেইরূপ উপগুপ্তের মধ্যেও তিনি সেইসকল অনুরূপ গুণেরই সমাবেশ কল্পনা করিয়াছেন। 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র বা 'দিব্যাবদানে'র উপগুপ্ত চরিত্রে করুণা অপেক্ষা নির্বেদ ও বৈরাগ্যের লক্ষণই বেশী প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাই বিকৃতসর্বাঙ্গী মুমূর্ষু বাসবদত্তাকে জগতের নিঃসারতা ও কামরাগের পরিণামবিরসতা সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়া তাহার চিত্তে বৈরাগ্য উৎপাদন করতঃ মোক্ষপথে পরিচালিত করাই বধ্যভূমিতে উপগুপ্তের আবির্ভাবের একমাত্র কারণ। কিন্তু ইহাতে মহাযানের করুণা ও মৈত্রীর ভাব ততটা প্রকাশ পায় নাই, যতটা প্রকাশ পাইয়াছে হীনযানসম্মত তত্ত্বজ্ঞানের দিক্, বিষয়বৈরাগ্যের দিক্। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহজাত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের মর্মকথা অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাই উপগুপ্তের চরিত্র মহাযান বৌদ্ধমতের আদর্শ অনুসারে পরিবর্তিত করিবার সাহস তাঁহার হইয়াছিল— এবং রবীন্দ্রনাথ-অবলম্বিত পরিসংস্কারই কি বাসবদত্তার শোচনীয় পরিণামের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর সমঞ্জস বলিয়া প্রতিভাত হয় না? তাই উপগুপ্ত বাসবদত্তাকে বৈরাগ্যজনক উপদেশ দিতেছেন না, কিন্তু—

> সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির তুলি নিল নিজ অঙ্কে।
> ঢালি' দিল জল শুষ্ক অধরে,
> মন্ত্র পড়িয়া দিল শির-'পরে
> লেপি দিল দেহ আপনার করে শীত চন্দনপঙ্কে।

ইহা কি ভগবান্ তথাগতেরই করুণাঘন 'বৈন্তরাষ্ট্র' রূপ নহে? এবং মহাযান সম্প্রদায়ের মতে 'অলক্ষণক বুদ্ধ' স্থবির উপগুপ্তের চরিত্রের মৈত্রী ও করুণার ভাব, যাহা রবীন্দ্রনাথের মতে বুদ্ধ-দেশনার মর্মকথা, আর কোনও উপায়েই কি তাহাকে ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হইত? সত্যই, "সন্ন্যাসী-উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায় এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল।"

---

১ দ্র° "The name of Upagupta occurs incidentally in the scriptures and commentaries of the so-called Northern or Mahāyāna Buddhists, as the patronymic of the fourth member of the series of patriarchs of the Buddhist Church, in direct succession from the epoch of Çākhya Muni's death. He is also referred to therein, as being the converter and spiritual adviser of the great emperor Açōka; and it is in this respect, as the alleged inspirer of Açōka's great missionary movement, which led to Buddhism becoming a power in the world, that Upagupta claims our special notice. Of such importance is he considered, that his coming is alleged to have been predicted by both Buddha himself and by his favourite disciple Ānanda. And of him Tārānātha, the Tibetan historian, writes: "Since the death of the Guide (Buddha) no man has been born who has done so much good to living beings as this man.' (Beal's *Si-yu-ki*, I. 182, n. 48)."—L. A. Waddell: *Upagupta, the Fourth Buddhist Patriarch, and High Priest of Açōka.* (*Journal of the Asiatic Society of Bengal,* 1897, Vol.LXVI, No. 1, p. 76).

শব্দ-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ

সমীরকান্ত গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রভাবে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। ভাবসম্পদ এবং রচনারীতিতে তাঁর দান যেমন অতুলনীয়, তেমনি শব্দসৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ প্রায় নেই বললেই চলে। পুরোযায়ী হিসাবে তিনি শুধু নূতন শব্দই সৃষ্টি করেন নি, তিনি সৃষ্টি করেছেন আবার লাগসই শব্দ— তাতে যে মাত্র বৈয়াকরণিক বুদ্ধিই মুগ্ধ হয় এমন নয়, রসিকজনের শ্রুতিও তৃপ্ত হয়। এইখানেই তাঁর সাফল্যের বৈশিষ্ট্য। উদ্ভাবিত শব্দ অভিধানের কক্ষে অস্পষ্ট-পরিচয়ের লেবেল-আঁটা শিলীভূত ফসিলের মতো নয়, তা জীবন্ত— চলমান সাহিত্যের প্রাণের সঙ্গে একাত্ম।

নূতন শব্দ ছাড়া আর-এক ধরনের সামান্য কিছু শব্দ এখানে স্থান পেল— এই শব্দগুলি অভিধানে ছিল, তবে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন বলে এখন তাদের এক নূতন মর্যাদা। বস্তুত অচল বা অল্পচল শব্দকে সচল ও বহুচল করা, শব্দকে একপ্রকার নূতনভাবে সৃষ্টি করাই বলা চলে।

এই শব্দ-সংগ্রহে যে ইংরেজী দেওয়া হল তা প্রধানতঃ সংকলয়িতাকেই স্থির করতে হয়েছে, সুতরাং কোনো ত্রুটির জন্য কবিকে দায়ী করা যাবে না। অবশ্য, যেখানে তিনি বাংলার সঙ্গেসঙ্গে ইংরেজী প্রতিশব্দটিও উল্লেখ করেছেন সেখানে লেখক সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পেরেছেন। শুধু শব্দটি জানা নয়, পাঠক যাতে তাঁর কৌতূহল সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করতে পারেন সেজন্য পাশে পাশে রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ডসংখ্যা এবং পৃষ্ঠা নির্দেশ করা হল।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গদ্যরচনা যথাসম্ভব অনুসন্ধান করে এই সংগ্রহ তৈরি। কোনো গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' কিম্বা 'গ্রন্থপরিচয়' আলোচ্য তালিকার বিচার্য হয় নি।

Abstract অবচ্ছিন্ন ১৪।৫০৯ নির্বস্তুক
Abstraction অবচ্ছিন্ন পদার্থ ১৯।৩৬০
Accent ঝোঁক ২১।৩৯৯
Achievable আয়ত্তিগম্য ১১।৪৭১
Active সকর্মক ৮।২৫১
সকারী ২০।৩০৫
Aesthetics নন্দনতত্ত্ব ২৩।৪২৫
Amiable প্রিয়চারী ১০।৫৭০
Anachronism কালবিরোধ দোষ ৮।৪৫০
Appeased পরিশান্ত ১২।৪৪২
Appetise ক্ষুধাকরতা ১২।৩৪৪
Artist রূপদক্ষ ২৩।৩৮০
Assimilation স্বীকরণ ২৩।৪১৭
Asteroids গ্রহিকা ২৫।৩৯৮
Autobiographical আত্মজৈবনিক ২১।৪২২ :
Autonomous স্বতন্ত্রশাসিত ২০।৩১৮
Background পরিপ্রেক্ষণিকা ২৩।৫২৫
Baptism অপ্-দীক্ষা ২০।৩৯৮ :
Bigamy দ্বৈধব্য ১১।৪৯৩
Bohemian বোহিমীয় ১২।৩৫২
Bourgeoisie পরশ্রমজীবী ২০।২৯৯
Bull's eye lantern বৃষচক্ষু লণ্ঠন ২০।৩০৫
Bureaucracy আপিসিশাসন ১০।৪৪০
Burlesque কৌতুকনাট্য

Capitalist মহাজন ১৭।৩৩৫
Castle of indolence কুঁড়েমির কেল্লা ১।৫৯৩
Centrifugal কেন্দ্রাতিগ ১০।৪৯৯
Centripetal কেন্দ্রানুগ ১৪।৩০৩
Champion (of a cause) ব্রতপতি ১২।৫১৩
Character চরিত্রস্বরূপ (আর্টের -) ১৯।৪৪৩
Civil war ঘরাও যুদ্ধকাণ্ড ১২।৪৮০
Collectivisation ঐকত্রিকতা ১০।২৯২
Colour Scheme বর্ণকল্পনা সংস্থান ২০।৩০৬
Combination সংঘট ২।৫৪৬
Composition সংস্থান (চিত্রবস্তুর -) ২০।৩০৬
Controlled নিয়মিত ১২।৪২২
Corona কিরীটিকা ২৫।৩৬৪
Crooked ত্যাড়া (- বুদ্ধি) ১০।২০২
Dazzle ধাঁধান ১০।২৭৬
Decoration সজ্জীকরণ ২১।৩৬৬
Diarchy দ্বৈরাজ্য ১১।৪১৭
Disconnected অসংসক্ত ৮।৪২৪
অসম্বদ্ধ ১২।৩২২
Dislike অপ্রেম ১০।৩৮৬
Diversity প্রভেদ ৪।৩৮৫
Dogma শাস্ত্রমত ২৪।২৭৪
Door handle দ্বারকর্ণ ১।২৮৯
Dramatic নাট্যীয় ১। কবির মন্তব্য
Durwan দ্বারবান ১২।৪০২
Educationist শিক্ষাতত্ত্ববিৎ ২৪।৩৩২
Electricity বৈদ্যুত ২৫।৩৬২
Elixir of life চিরজীবন রস ১১।৪৭১
Emotion হৃদয়ের বৃত্তি ২।৬০১
Energy বৈপ্রেতি ২।৬০১
Equalise সমীকরণ ২৪।৫০২
Exaggeration অমিতভাষণ ১১।৪১৫
Expanding ব্যাপ্যমান ২।৫৬১
Extremism অতিশয়পন্থা ২৪।২৮৪
Fancy ball ছদ্মবেশী নাচ ১।৫৪৪
Far reaching দূরগামী ১২।৩৮৩
Forced labour অগত্যা-প্রেরিত খাটুনি ৪।৪১১
Foster-son কৃতকপুত্র ৫।৫২৮
Fragrance সৌগন্ধ ২।৬৩৯
Gesture ব্যঞ্জনা ১৩।৩১১
Girls' school স্ত্রীবিদ্যালয় ৬।১৯৯
Goalless গম্যবিহীন ১০।২৭৪
Government রাজ্যতন্ত্র ১০।১৮১
Governor শাসয়িতা ১০।৪৭৭
Granary (Collective) ধর্মগোলা ১০।৫১৪
Gravitation মহাকর্ষ ২৫।৩৮১
ভারাবর্তন ২৫।৩৮২
Greatest good of the largest number
প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখ সাধন ৭।৪৩৫
Guide পরিদর্শয়িতা ২০।১০৬
Have-nots কমিকেরা ২৪।২৭২
Heartless নির্বিবেক ১২।৪৪৮
Humiliated অবমানিত ৬।৬০৬
Humiliatory অবমানজনক ২।৬১৬
Ignition আগ্নেয়তা ১০।২৭৪
Image উপচ্ছায়া ৬।১৩৩
Impersonal অব্যক্তিক ৪।৪০৯
নির্বক্তিক ৯।২১২
Inanimate অপ্রাণী ৮।৩৯৩
বিপ. Animate প্রাণী ৮।৩৯৩
Indelible অপরিমোচনীয় ১১।৪১৫
Indigo অতিনীল ২৫।৩৫৮
Infra-red light লাল-উজানি আলো ২৫।৩৫৮
Insult অসম্মাননা ৬।৬৩৬
Intelligible প্রতীতিগম্য
Interesting কৌতুকবহ ৯।৪৯৯

বর্তমান প্রসঙ্গে পূর্বপ্রকাশিত দুইটি রচনাও সংকলিত হইল।

সমালোচনার পরিভাষা

বুদ্ধদেব বসু

'কবিতা'র আশ্বিন ১৩৫৫ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত যে-সব পরিভাষা সংকলন করেছিলাম, তার তালিকা নিচে দিচ্ছি। এই কথাগুলোর মধ্যে কোনটা কোথায় পেয়েছিলাম এখন আর মনে পড়ছে না— 'রূঢ়িক' শব্দ বিষয়ে আমার স্মৃতি একেবারেই নিরুত্তর। কোনো-কোনোটাকে হয়তো ঠিক পরিভাষা বলা যায় না— 'সাহিত্যবৃত্তি' বা 'সাহিত্যব্যবসা' যে-কেউ লিখতে পারতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগে কেউ লিখেছিলেন কিনা জানি না। Daemon—জীবনদেবতা: তার মানে এই যে জীবনদেবতার যে-ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ নিজে দিয়েছেন তা য়োরোপীয় daemonএর ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। 'চয়নিকা' ও 'জীবনস্মৃতি' যদিও বইয়ের নাম, চলতি বাংলার সাধারণ শব্দভাণ্ডারে ও-দুটি গৃহীত হয়েছে। 'আত্মজীবনী' ও 'জীবনস্মৃতি', 'autobiography' ও 'memoirs'-এর মতোই, প্রায় সমার্থক। এই তালিকায় সম্পূর্ণতার দাবি নেই তা বলা বাহুল্য; হয়তো এটি একেবারে নির্ভুলও নয়।

Abstract নির্বস্তুক
Active সকারী
(Passive) অকারী
Actual প্রাকৃত
Aesthetics নন্দনতত্ত্ব
Anarchy নৈরাজ্য
Anthology চয়নিকা
Artificer রূপকার
Autobiography জীবনস্মৃতি
Autobiographical আত্মজৈবনিক
Complex বহুলাঙ্গ
Compulsory আবশ্যিক
Daemon জীবনদেবতা
Destructive বৈনাশিক
Elementary রূঢ়িক
Harmony স্বরসংগতি
Humanity মানবিকতা
Impersonal নৈর্ব্যক্তিক
Interest ঔৎসুক্য -ing -কর
Journalistic খবুরে কাগুজে

Life force প্রাণনশক্তি
(The) Literary profession সাহিত্যবৃত্তি, সাহিত্যব্যবসা
Mystic মরমী
National স্বাজাতিক
Negative নঙর্থক
(Positive) সদর্থক
Originality অপূর্বতা
Personality ব্যক্তিস্বরূপ
Perspective পরিপ্রেক্ষণিকা
Posterity মহাকাল
Practical কারয়িত্রী
(Theoretical ভাবয়িত্রী)
Realism বাস্তবিকতা, বস্তুতন্ত্র
Prose rhythm গদ্যছন্দ
Self-contradictory স্বতোবিরোধী
Sentimental ভাববিলাসী
Simple স্বল্পাঙ্গ
Slang অপভাষা
The times চলতিকাল

শব্দচয়ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা ভাষায় গদ্য লিখতে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিদিনই ঘটে। অনেক দিন ধরে অনেক রকম লেখা লিখে এসেছি। সেই উপলক্ষে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হল। কিন্তু প্রায়ই মনের ভিতরে খটকা থেকে যায়। সুবিধা এই যে, বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দবিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে ওঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে। তৎসত্ত্বে সাহিত্যের হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয় যা ভাষাকে যেন চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে। যেমন 'সহানুভূতি'। এটা sympathy শব্দের তর্জমা। 'সিম্প্যাথি'র গোড়াকার অর্থ ছিল 'দরদ'। ওটা ভাবের আমলের কথা, বুদ্ধির আমলের নয়। কিন্তু ব্যবহারকালে ইংরেজিতে 'সিম্প্যাথি'র মূল অর্থ আপন ধাতুগত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই কোনো একটা প্রস্তাব সম্বন্ধেও সিম্প্যাথির কথা শোনা যায়। বাংলাতেও আমরা বলতে আরম্ভ করেছি, 'এই প্রস্তাবে আমার সহানুভূতি আছে'। বলা উচিত 'সম্মতি আছে', বা 'আমি এর সমর্থন করি'। যাই হোক, সহানুভূতি কথাটা যে বানানো কথা এবং ওটা এখনো মানানসই হয় নি তা বেশ বোঝা যায়, যখন ও শব্দটাকে বিশেষণ করবার চেষ্টা করি। 'সিম্প্যাথেটিক'এর কী তর্জমা হতে পারে— 'সহানুভৌতিক', বা 'সহানুভূতিশীল', বা 'সহানুভূতিমান' ? ভাষায় যেন খাপ খায় না— সেই জন্যেই আজ পর্যন্ত বাঙালি লেখক এর প্রয়োজনটাকেই এড়িয়ে গেছে। দরদের বেলা 'দরদী' ব্যবহার করি, কিন্তু সহানুভূতির বেলায় লজ্জায় চুপ করে যাই। অথচ সংস্কৃত ভাষায় এমন একটি শব্দ আছে, যেটা একেবারেই তথার্থক। সে হচ্ছে 'অনুকম্পা'। ধ্বনিবিজ্ঞানে ধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্রের তারের মধ্যে সিম্প্যাথি'র কথা শোনা যায়— যে সুরে বিশেষ কোনো তার বাঁধা সেই সুর শব্দিত হলে সেই তারটি অনুকম্পিত ও অনুধ্বনিত হয়। এই তো 'অনুকম্পন'। অন্যের বেদনায় যখন আমার চিত্ত ব্যথিত হয় তখন সেই তো ঠিক 'অনুকম্পা'। 'অনুকম্পায়ী' কথাটা সংস্কৃতে আছে। 'অনুকম্পাপ্রবণ' শব্দটাও মন্দ শোনায় না। 'অনুকম্পালু' বোধ করি ভালোই চলে। মুশকিল এই যে, দখলের দলিলটাই ভাষায় স্বত্বের দলিল হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র এই কারণেই 'কান' 'সোনা' 'চুন' 'পান' শব্দগুলোতে মূর্ধন্য ণ'এর অনধিকার নিরোধ করা এত দুঃসাধ্য হয়েছে। ছাপাখানার অক্ষর-যোজকেরা সংশোধন মানে না। তাদের প্রশ্ন করা যেতে পারত যে, কানের এক 'সোনা'য় যদি মূর্ধন্য ণ লাগল, তবে অন্য 'শোনা'য় কেন দন্ত্য ন লাগে। 'শ্রবণ' শব্দের র-ফলা লোপ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্ধন্য ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ মতেই দন্ত্য ন হয়েছে। অথচ স্বর্ণ শব্দ যখন রেফ্ বর্জন করে 'সোনা' হল, তখন মূর্ধন্য ণ'এর বিধান কোন্ মতে হয়? হাল আমলের নতুন সংস্কৃত-পোড়োরা 'সোনা'কে শোধন করে নিয়েছেন, তাঁদের স্বকল্পিত ব্যাকরণবিধির দ্বারা— এখন দখল প্রমাণ ছাড়া স্বত্বের অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য হয়ে গেল। 'শ্রবণ' শব্দের অপভ্রংশ শোনা শব্দ যখন বাংলা ভাষায় বানান-দেহ ধারণ করেছিল তখন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিধানকর্তা ছিলেন— সেদিনকার বানানে কান সোনা প্রভৃতিরও মূর্ধন্যত্বপ্রাপ্তি হয় নি। কৃষ্ণ শব্দজাত কানাই শব্দে আজও দন্ত্য ন চলছে, বর্ণ (বর্ণযোজন) শব্দজাত বানান শব্দে আজও মূর্ধন্য ণ'এর প্রবেশ ঘটে নি তাতে কি পাণ্ডিত্যের খর্বতা ঘটেছে?

কিছুকাল পূর্বে যখন ভারতশাসনকর্তারা 'ইণ্টার্‌ন্‌' শুরু করলেন তখন খবরের কাগজে তাড়াতাড়ি একটা শব্দ সৃষ্টি হয়ে গেল— 'অন্তরীণ'। শব্দসাদৃশ্য ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো যুক্তি নেই। বিশেষণে ওটা কী হতে পারে, তাও কেউ ভাবলেন না। externmentকে কি বলতে হবে 'বহিরীণ'? অথচ 'অন্তরায়ণ, অন্তরায়িত, বহিরায়ণ, বহিরায়িত' ব্যবহার করলে আপত্তির কারণ থাকে না, সকল দিকে সুবিধাও ঘটে।

নূতন সংঘটিত শব্দের মধ্যে কদর্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা'। প্রথমতঃ শিক্ষার মূলের দিকে বাধ্যতা নয়, ওটা শিক্ষার পিঠের দিকে। বিদ্যাদান বা বিদ্যালাভই হচ্ছে শিক্ষার মূলে— তার প্রণালীতেই 'কম্পাল্‌শন্‌'। অথচ 'অবশ্য-শিক্ষা' শব্দটা বলবামাত্র বোঝা যায় জিনিসটা কী। 'দেশে অবশ্য-শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত'— কানেও শোনায় ভালো, মনেও প্রবেশ করে সহজে। 'কম্পাল্‌সারি এডুকেশন'এর বাংলা যদি হয় 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা', 'কম্পাল্‌সারি সাব্‌জেক্ট' কি হবে 'বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয়'? তার চেয়ে 'অবশ্য-পাঠ্য বিষয়' কি সঙ্গত ও সহজ শোনায় না? 'ঐচ্ছিক' (optional) শব্দটা সংস্কৃতে পেয়েছি, তারি বিপরীতে 'আবশ্যিক' শব্দ ব্যবহার চলে কি না, পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি। ইংরেজিতে যে শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্যপ্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। সেটা অনেক সময় বেখাপ হয়ে দাঁড়ায়; অনেক সময় মূল ভাবটা ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয়তো তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়। একদিন 'রিপোর্ট্‌' কথাটার বাংলা করবার প্রয়োজন হয়েছিল। সেটাকে বানাবার চেষ্টা করা গেল, কোনোটাই মনে লাগল না। হঠাৎ মনে পড়ল কাদম্বরীতে আছে 'প্রতিবেদন'— আর ভাবনা রইল না। প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক— যেমন করেই ব্যবহার কর, কানে বা মনে কোথাও বাধে না। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি— 'ওভার্‌পপুলেশন'— বিষয়টা আজকাল খবরের কাগজের একটা নিত্য-আলোচ্য; কোমর বেঁধে ওর একটা বাংলা শব্দ বানাতে গেলে হাঁপিয়ে উঠতে হয়— সংস্কৃত শব্দকোষে তৈরি পাওয়া যায় 'অতিপ্রজন'। বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্বন্ধে 'রেসিডেণ্ট' 'নন্‌রেসিডেণ্ট' বিভাগ করা দরকার— বাংলায় নাম দেব কী? সংস্কৃত ভাষায় সন্ধান করলে পাওয়া যায় 'আবাসিক' 'অনাবাসিক'। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে আমি কিছুদিন সন্ধানের কাজ করেছিলাম। যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমারের প্ররোচনায় প্রকাশ করবার জন্য তাঁর হাতে অর্পণ করলুম। অন্তত এর অনেকগুলি শব্দ বাংলা লেখকদের কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

অকর্মান্বিত unemployed
অক্ষিভিষক oculist
অঘটমান incongruous, incoherent
অঙ্কুয়ৎ moving tortuously অঙ্কুয়ন্তী নদী
অঙ্গারিত charred
অতিকথিত, অতিকৃত exaggerated
অতিজীবন survival
অতিদিষ্ট overruled
অতিনেমিষ চক্ষু staring eyes
অতিপরোক্ষ far out of sight
অতিপ্রজন over-population
অতিভৃত well filled
অতিষ্ঠা precedence
অতিষ্ঠাবান্‌ superior in standing
অতিসর্গ act of parting with
অতিসর্গ দান করা to bid any one farewell

অতিসর্পণ to glide or creep over
অতিসারিত made to pass through
অতিস্রুত that which has been flowing over
অত্যন্তগত completely pertinent, always applicable
অত্যন্তীন going far
অত্যূর্মি bubbling over
অর্থপদবী path of advantage
অধঃখাত undermined
অধিকর্মা superintendent
অধিজানু on the knees
অধিবক্তা advocate
অধিষ্ঠায়কবর্গ governing body
অনপক্ষেপ্য not to be rejected
অনপেক্ষিত unexpected
অনাত্ম্য impersonal
অনার্তব unseasonable
অনাপ্ত unattained
অনাপ্য unattainable
অনাবাসিক non-resident
অনাবেদিত not notified
অনায়ক having no leader
অনায়তন groundless
অনায়ুষ্য fatal to long life
অনারত without interruption
অনালম্ব unsupported
অনাস্থান having no basis or fulcrum
অনিকামতঃ involuntarily
অনিজক not one's own
অনিন feeble, inane
অনির্বিণ্ণ undesponding
অনিভৃত not private, public
অনিষ্ঠা unsteadiness
অনীহা apathy
অনুকম্পায়ী condoling
অনুকল্প alternative
অনুকাঙ্ক্ষা longing
অনুকাল opportune
অনুকীর্ণ crammed
অনুকীর্তন proclaiming, publishing
অনুক্রকচ serrated
অনুগামুক habitually following
অনুজ্ঞা permission
অনুজ্ঞাত allowed
অনুত্তুন্ন muffled (sound)
অনুদত্ত remitted
অনুদেশ reference to something prior
অনুপর্বত promontory
অনুপার্শ্ব lateral
অনুযাত্র retinue
অনুরথ্যা side-road
অনুলাপ repetition
অনুষঙ্গ association
অন্তশ্ছেদ intercept
অন্তর্জাত inborn
অন্তঃপাতিত inserted
অন্তর্ভৌম subterranean
অন্তম intimate
অন্তথ্য interior
অন্তরায়ণ internment
অন্তরীয় under-garment
অপক্ষেপ reject
অপচেতা spendthrift
অপণ্য not for sale, unsalable
অপপাঠ wrong reading

অপম the most distant
অপলিখন to scrape off
অপশব্দ vulgar speech
অপহাস a mocking laugh
অপাটব awkwardness
অপ্রতিষ্ঠ unstable
অপ্রভ obcscure
অপ্সুদীক্ষা baptism
অবঘোষণা announcement
অবশ্চ্যুত trickled down
অবর্জনীয় inevitable
অবধূলন scattering over
অবমতি contempt
অবমন্তব্য contemptible
অবরপুরুষ descendant
অবরার্ধ the least part
অবস্থাপন exposing goods for sale
অবিতর্কিত unforeseen
অবুদ্ধিপূর্ব not preceded by intelligence
অবেক্ষা observation
অভয়দক্ষিণা promise of protection from danger
অভয়পত্র a safe conduct
অভিজ্ঞানপত্র certificate
অভিসমবায় association
অভ্যাঘাত interruption
অর্ম ruins, rubbish
অরক্ত apathetic
অল্পোন slightily deficient
অশ্রি angle, sharp side of anything
অসাংপ্রতিক not according to the moment
অস্তব্যস্ত scattered, confused
আকরিক, আখনিক miner
আকল্প design
আকৃত shaped
আগামিক incoming
(নির্গামিক outgoing)
আঙ্গিক technique আঙ্গিক ভাব
আচয় collection
আচিত collected
আত্মকীয়, আত্মনীয়, আত্মনীন one's own, original
আত্মতা essence
আত্মবিবৃদ্ধি self aggrandisement
আত্যয়িক urgent
আনৈপুণ্য clumsiness
আপতিক accidental
আপাতমাত্র being only momentary
আবাসিক resident
(নির্বাসিক non-resident)
উক্তপ্রত্যুক্ত discourse
উচ্চয় অপচয় rise and fall
উচ্চণ্ড very passionate
উচ্ছ্রায়, উচ্ছ্রিতি elevation
উচ্ছিষ্ট কল্পনা stale invention
উদ্‌গর্জিত bursting out, roaring
উদ্‌ঘোষ loud-sounding
উত্তত stretching oneself upwards
উত্তম্ভিত upheld, uplifted
উত্কর্ষ courage to undertake anything
উদ্যোগসমর্থ capable of exertion
উৎপারণ to transport over
উদ্বাসিত deported
উন্মিতি measure of altitude
উপস্কর apparatus
উন্মুখর loud-sounding

উন্মুদ্র unsealed
উন্মৃষ্ট rubbed off
উপজ্ঞা untaught or primitive knowledge
উপধূপন fumigation
উপনদ্ধ inlaid
উপনিপাত national calamities
উপপাত accident
উপপুর suburb
উল্বণ নাদ shrill sound
ঊনতা deficiency
ঊর্মিমান, ঊর্মিল undulating
একতৎপর solely intent on
একায়ন footpath
ঐকাঙ্গ body guard
ঐকাত্ম্য identity
ঐচ্ছিক optional
ঐতিহ্য tradition, traditional
কণাকার granular
কম্র loving, beautiful
কম্বুরেখা spiral
করণতা instrumentality
কাব্যগোষ্ঠী a conversation on poetry
কাম্যব্রত voluntary vow (with special aim)
কারু, কারুক artisan
কালকরণ appointing time
কালসম্পন্ন bearing a date
কালাতিক্রমণ lapse of time
কালান্তর intermediate time
কির্বির, কির্মীর, কির্মীরিত variegated colour
কুটিল রেখা curved line
কুলব্রত family tradition
কুশলতা cleverness
কুঞ্চিত contracted
কৃতাভ্যাস trained
কৃশিত emaciated
কেলিসচিব minister of the sports
কেবলকর্মী performing mere works without intelligence
ক্রমভঙ্গ interruption of order
ক্রয়লেখ্য deed of sale
ক্ষয়িষ্ণু perishable
ক্ষিপ্রনিশ্চয় one who decides quickly
গর্গর whirlpool, eddy
গণক-মহামাত্র finance minister
গীতক্রম arrangement of a song
গুম্ফন grouping
গৃহব্রত devoted to home
গেহেশূর carpet-knight
গোত্রপট genealogical table
গোপ্রতার ox-ford (যেখানে গোরু পার করে)
গ্রন্থকুটী library
গ্রামকূট congestion of villages
গ্লান tired, emaciated
চক্রচর world-trotter
চটুলালস desirous of flattery
চরিষ্ণু movable
জড়াত্মক inanimate, unintelligent
জড়াত্মা stupid
জনপ্রিয় popular
জনসংসদ assembly of men
জনাচার popular usage
জরিষ্ণু decaying
জ্ঞানসন্ততি continuity of knowledge
তনিকা string, বীণার তার
তনুবাত rarified atmosphere
তরঙ্গরেখা curved line

তন্ত্রী string, বীণার তার
তরস্বতী, তরস্বিনী, তরস্বী quick moving
তরস্থান landing place
তরুণিমা juvenility
তাৎকালিক simultaneous
তাৎকাল্য simultaneousness
তীর্ণপ্রতিজ্ঞ one who has fulfilled his promise
দিবাতন diurnal
দুর্গতকর্ম relief work, employment offered to the famine-stricken
দুর্মর dying hard (die-hard)
দুরভিসম্ভব difficult to be performed
দৃপ্ত arrogant
দ্রপ্স a drop
দ্রপ্সী falling in drops
দ্রব্যত্ব substance, substantiality
দ্রাংক্ষণ discordant sound
দ্রাঘিত lengthened
দ্রোহবুদ্ধি maliciously minded
দ্বয়বাদী double-tongued
দ্বারকপাট leaf of a door
ধূম্রিমা obscurity
নঙর্থক negative
নভস misty, vapoury
নাব্য navigable
নিষিক্ত attached to
নির্গামিক outgoing
নির্নিক্ত polished
নির্বাসিক non-resident
নিষ্কাসিত expelled
নীরঙ্ক colourless, faded
পণ্যসিদ্ধি prosperity in trade
পতিম্বরা a woman who chooses her husband
পর্ণরীণ vein of a leaf
পর্যায়চ্যুত superceded, supplanted
পরাচিত nourished by another, parasite
পরিলিখন outline or sketch
পরিস্রাবণ filtering
পরুত্তন belonging to the last year
পাদাবর্ত a wheel worked by feet for raising of water
পারণীয় capable of being completed
পিচ্চট pressed flat, চ্যাপ্টা
পুটক pocket
পুনর্বাদ tautology
পুরস্ত্রী matron
পূর্বরঙ্গ prelude or prologue of a drama
পৃচ্ছনা, পৃচ্ছা spirit of enquiry
পৃথগাত্মা individual
পৃথগাত্মিকতা individuality
প্রচয় collection
প্রচয়ন collecting
প্রচয়িকা collection
প্রচিত collected
প্রণোদন driving
প্রতিক্রম reversed or inverted order
প্রতিচারিত circulated
প্রতিজ্ঞাপত্র promissory note
প্রতিপণ barter
প্রতিপ্রতি a counterpart
প্রতিবাচিক answer
প্রতিভা—কারয়িত্রী genious for action
প্রতিভা—ভাবয়িত্রী genious for ideas, or imagination

প্রতিমান a model, pattern
প্রতিলিপি a copy, transcript
প্রতীপগমন retrograde movement
প্রত্যক্ষবাদী one who admits of no other evidence than perception by the senses
প্রত্যক্ষসিদ্ধ determined by the evidence of the senses
প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যভিজ্ঞান recognition
প্রত্যভিনন্দন, প্রত্যর্চন returning a salutation
প্রত্যরণ্য near or in a forest
প্রত্যুজ্জীবন returning to life
প্রথম কল্প a primary rule
প্রপাঠ chapter of a book
প্রবাচন proclamation
প্রলীন dissolved
প্রসাধিত ornamental
প্রাগ্রসর foremost, progressive
প্রাণবৃত্তি vital function
প্রাণাহ cement used in building
প্রাতস্তন matutinal
প্রাতিভজ্ঞান intuitive knowledge
প্রেক্ষার্থ for show
প্রেক্ষণিকা exhibition
প্রেঙ্খোল moving to and fro
প্রৌঢ় যৌবন prime of youth
বর্তিষ্ণু stationary
বস্তুমাত্রা mere outline of any subject
বাগ্‌জীবন buffoon
বাগ্‌ডম্বর grandiloquence
বাগ্‌ভাবক promoting speech, with a taste for words
বাতপ্রাবর্তিক irrigation by wind-power
বিচিতি collection
বিষয়ীকৃত realised
বৃত elected
বশঙ্গম influenced
ভঙ্গীবিকার distortion of features
ভবিষ্ণু progressing
ভিন্নক্রম out of order
ভূমিকা—বাড়ির তলা, যথা চতুর্ভূমিক four storied
ভেষজালয় dispensary
ভ্রাতৃব্য cousin
মণ্ডলকবি a poet for the crowd
মনোহত disappointed
মায়াত্মক illusory
মুদ্রালিপি lithograph
মুমূর্ষা desire of death
মৃদুজাতীয় somewhat soft, weak
মৌল aboriginal
যথাকথিত as already mentioned
যথাচিন্তিত as previously considered
যথাতথ accurate
যথানুপূর্ব according to a regular series.
যথাপ্রবেশ according as each one entered (সভাপ্রবেশ সম্বন্ধে)
যথাবিত্ত according to one's means
যথামাত্র according to a particular measure
যন্ত্রকর্মকার mechinist
যন্ত্রগৃহ manufactory
যন্ত্রপেষণী grinding mill (জাঁতা)
যমল গান duet song
রলরোল wailing
রোচিষ্ণু elegant
লঘু খট্টিকা easy chair
লোককান্ত popular

লোকগাথা folk verses
লোকবিরুদ্ধ opposed to public opinion
শক্তিকুণ্ঠন deadening of a faculty
শঙ্কাশীল diffident, hesitating
শয়নবাস sleeping garment
শিঞ্জা, শিঞ্জান tinkling sound
শিথির flexible, pliant
শিথির loose
শিল্পজীবী artisan
শিল্পবিধি rules of art
শিল্পালয় art institute
শ্মীল winking, blinking
শ্লক্ষ্ণ slippery, polished
শ্লথোদ্যম relaxed effort
সংকেতমিলিত met by appointment
সংকেতস্থান place of assignation
সংক্রমণকা a gallery
সংরাগ vehemence
সংলাপ conversation
সৎকলা a fine art
সত্তস্ক, সত্তস্তন belonging to the present day
সময়চ্যুতি neglect of the right time
সমাহর্তা collector general
সমূহকার্য business of a community
সম্প্রতিবিদ্‌ knowing only the present, not what is beyond
সহজপ্রণেয় easily led
সহধুরী colleague
সাত্ত্বিক ভাবক promoting the quality of purity
সাংকথ্য conversation

সীতাধ্যক্ষ the head of the agricultural department
সীমাসন্ধি meeting of two boundaries
স্রস্ত slipped
স্রগ্ন lithesome, supple
সুশ্লক্ষ্ণ delicate
সৌচিক tailor
স্ত্রীদ্বেষী misogynist
স্ত্রীময় effeminate
স্ফায়িত expanding
স্ফির tremulous
স্বগোচর one's own range or sphere
স্বচর self-moving
স্বপ্রভুতা arbitrary power
স্ববহিত self-impelled
স্ববিধি one's own rule or method
স্বমনীষা own judgment or opinion
স্বয়ম্বশ independent
স্বয়ম্বহ self-moving
স্বয়ম্ভৃত, স্বয়ম্ভর self-supporting
স্বয়মুক্তি voluntary testimony
স্বসম্বেদ্য intelligible to one's self
স্বসিদ্ধ spontaneously effected
স্বাবমাননা self-contempt
স্বৈরবর্তী following one's own inclination
স্রস্তর, স্রস্তরা couch, sofa
স্রোতোযন্ত্রপ্রাবর্তিম water-power motion irrigation
হস্তপ্রাবর্তিম hand-power motion irrigation
হৃদয়ভাবক promoting the feelings and sensations moved by sentiments

---

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা। চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৩৬। বাংলা শব্দতত্ত্ব। অগ্রহায়ণ ১৩৩২

অনুরূপা দেবী

গত ৬ই বৈশাখ বিখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবী পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যু তাঁর পরিণত বয়সেই হয়েছে। নিজের আদর্শ অনুযায়ী সাহিত্যজগতের কাজ বা সংসারযাত্রার কোনো কর্তব্যই তিনি অসমাপ্ত রেখে যান নি।

তাঁর সাহিত্যসম্ভারও কম নয়। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে তিনি যা লিখেছেন, তার সম্যক আলোচনার সময় এখন নয়। তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচয় নেই এমন বাঙালী স্বদেশে বা প্রবাসে বিরল বলা যায়। এও বলতে পারি, যে প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রাপ্য ছিল, জীবিতকালেই তিনি তা পেয়েছেন।

মেয়েদের লেখা কথাসাহিত্যের ইতিহাস আমাদের দেশে মাত্র এক শ বছরের বলা যায়। এ যুগে প্রথম সার্থক উপন্যাস অন্যান্য বিষয়ের সাহিত্য পাই স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখায়। এঁর নাম ও পরিচয়ও কারও অজানা নেই। এঁর আগে হয়তো দু-একজন মহিলা কবি ও লেখিকার দেখা পাওয়া গেছে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবীই প্রথম মহিলা উপন্যাস-রচয়িত্রী, যিনি আধুনিক ধরণে সামাজিক উপন্যাস ও ছোট ছোট গল্প ও আরো কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাসও রচনা করেন। যাঁর লেখা এই অসংখ্য নারী সাহিত্যিকদের রচনার পাশে আজও সমুজ্জ্বল মনে হয়।

এঁর পরে বহুদিন আর চোখে পড়বার মতো মেয়েদের লেখা মনে পড়ে না যেন। হয়ত দু-একজন ছিলেন। কিন্তু বাংলা ১৩১৮-১৯ সালে হঠাৎ দেখা পাওয়া গেল দুজনের— অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর। আর প্রথম রচনাতেই এঁরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিলেন।

এবং স্বর্ণকুমারী দেবীরই সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার পাতায় দুজনেই নিজেদের 'ভারতী' সেবার অর্চনার নৈবেদ্যের থালা নিয়ে এলেন। অনুরূপা দেবীর কাছেই শুনেছি 'ভারতী'-সম্পাদিকা কত স্নেহে সমাদরে সে যুগের এই নতুন ও অন্তঃপুরিকা লেখিকাদের গ্রহণ করেছিলেন তাঁর 'ভারতী'র পূজার ঘরে। ভারতী-সম্পাদিকার উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। নিরুপমা দেবীও তাঁর বন্ধু ও সখী ছিলেন। 'গঙ্গাজল' পাতানো ছিল।

১৩১৯ সালে অনুরূপা দেবীর প্রথম উপন্যাস 'পোষ্যপুত্র' ভারতীতে বেরল ধারাবাহিক ভাবে। তখন মেয়েদের লজ্জা-সংকোচের যুগ। নাম প্রচারে বড় ভয়। আনন্দের চেয়ে সংকোচই বেশি। 'পাছে লোকে কিছু বলে'।

বাংলার বাইরে সুদূর রাজস্থানে প্রবাসে বসে আমরাও অজানা অনামা লেখকের লেখা এই 'পোষ্যপুত্র' পড়লাম। তখনো লেখিকার নাম বেরয় নি। স্বনামধন্য হতে সংকোচ ছিল বোধহয়। কিন্তু নাই-বা দিলেন নাম। ধন্যনামাকে লোকে খুঁজে বার করে নেয় যেমন করেই হোক। এবং নামও বেরল কয়েক সংখ্যার লেখার পর।

স্বর্ণকুমারী দেবীকে আমরা যেমন পাই আদি ব্রাহ্মসমাজের ও ঠাকুরবাড়ির শিক্ষা দীক্ষা নানা রকম সংস্কারের পরিবেশে, তাঁর লেখায় তেমনি নানা সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গীও দেখা যাবে।

অনুরূপা দেবীকে কিন্তু তার একেবারে বিপরীতমুখী সমাজের পারিপার্শ্বিকে দেখা গেল। বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের প্রাচীন রক্ষণশীল আবেষ্টনের তখনকার ধরণের আদর্শবাদী স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী ছিলেন তিনি। যিনি জ্ঞানে শিক্ষায় আধুনিকতাকে গ্রহণ করেছিলেন, আদর্শবাদে প্রাচীন-পন্থী, একসঙ্গে উদার ও রক্ষণশীল, হিন্দু কলেজের সংঘাতময় যুগের ছাত্রমণ্ডলী এবং শ্রীমধুসূদনের বন্ধু সহপাঠী ও সমসাময়িক তবু পরম নিষ্ঠাবান— সেই ব্রাহ্মণ ভূদেববাবুর ঘরের মেয়ে তিনি।

অনুরূপা দেবী সেই আদর্শের পরিবেশেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর রচনায় ঐ আদর্শবাদী পরিবারের মনের দেখা পাওয়া যায়। নিছক সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য বা আর্টের জন্য আর্ট সৃষ্টি অথবা 'শুধু গল্প বলা' মনে হয় তাঁর আদর্শ ছিল না। যেন এ যুগের ব্যক্তি মানুষের চেয়ে ব্যক্তিত্ববাদের চেয়ে যুগধর্মের স্বাভাবিক গতির চেয়ে তিনি নিজের কল্পনামত একধরণের উন্নত আদর্শের কথাই বেশি ভেবেছেন। যা থেকে তিনি কোনোদিন বিচলিত বা বিচ্যুত হন নি।

কিন্তু সব সত্ত্বেও বলব, তাঁর প্রথম দিকের রচনাবলী 'পোষ্যপুত্র' 'মা' 'মন্ত্রশক্তি' 'বাগ্দত্তা' 'মহানিশা' প্রমুখ বইগুলিতে তাঁর এই আদর্শবাদটা অনেকটাই চমৎকার মিষ্টি গল্পের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ছিল; এবং এই গল্প বা উপন্যাসগুলিই যে তাঁকে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সাধারণ নরনারীর সমাজ-জীবনের সুখ দুঃখ ক্ষোভ, আশা দুরাশা নিরাশা, দ্বন্দ্ব-দ্বিধাময় কামনা-বাসনাময় জীবনযাত্রা ও প্রেম নিয়েই সে সময়ের লেখা— মধুর ও সুন্দর। প্রথম উপন্যাস পোষ্যপুত্রে শান্তিকে দেখতে পাই নীরদ রায়ের প্রশংসামুগ্ধ কিশোরী মেয়ে রূপে। তার ভীরু মনের শ্রদ্ধা ও মোহের আড়ালে একটু ভালোবাসার আভাসও যেন পাওয়া যায়। বাগদত্তার কমলার চিত্তবিক্ষোভ অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনাময় কাহিনী বিবাহিত জীবনের আদর্শ ও প্রথম প্রেমের সংঘাতও লেখিকা লুকিয়ে রাখেন নি। প্রতাপ শৈবলিনীর কথা মনে পড়ে যায়, শেষ দিকে কমলার মনীশকে দেখে আতঙ্কময় অনুভূতিকে দেখে।

'মন্ত্রশক্তি'র উগ্র মেয়ে বাণীর পাশে তার জননীর স্নেহমধুর ধৈর্যশীলা শান্ত মাতৃমূর্তি আর লঘুচরিত্র মৃগাঙ্ক ও অজ্ঞার সহজ সুন্দর চিত্রও তাঁর শেষজীবনের সৃষ্টির চেয়ে মিষ্টি হয়েছিল। 'মা' বইখানিতেও ঈর্ষা প্রেম দ্বন্দ্বময় এক বন্ধ্যা নারীর বেদনাময় মর্মকথা চমৎকার ফুটেছিল।

এবং আগেই বলেছি এই সময়ের বইগুলিই তাঁকে স্বনামধন্য করেছিল। শেষজীবন অবধি তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মূল তাঁর প্রথমজীবনের রচনাগুলিই। যদিও তিনি আজীবন সাহিত্যসাধনা করে গেছেন, কিন্তু শেষজীবনে হয়তো আদর্শ প্রচারের কথাই বেশি ভেবেছেন রচনার মধ্যে, যার জন্য তাঁর লেখা সাহিত্যকে অনেকেরই প্রচারধর্মী সাহিত্য মনে হয়েছে। অনেকটা সত্যও সে কথা। কিন্তু প্রচারধর্মী সাহিত্য হলেই তা সাহিত্য হল না, বা মহৎ সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ল না, তাও তো সব সময়ে বলা চলে না। আজও আমরা মহৎ চরিত্রের মানুষ দেখলে মুগ্ধ হই। কারও লেখার মধ্যে মহৎ চরিত্র সৃষ্টিও আজও আমাদের ভালো লাগে। আর জেনে না-জেনে লেখা 'প্রচারধর্মী' সাহিত্যের অভাব নেই কোনো দেশেই। গোড়ায় কথা হল পাঠকের জানতে না পারা 'আদর্শ প্রচার' হচ্ছে, এবং না জেনেই ভালো লাগা। এই ভালো লাগা তো অনুরূপা দেবী পেয়েছেন। কেননা তাঁর ভক্ত পাঠকপাঠিকার অপ্রতুল নেই।

তাঁকে মানুষ হিসাবে যে দু-চার দিন দেখেছি, তাতে দেখেছিলাম, পূর্বসূরীদের উপর যেমন তাঁর শ্রদ্ধা ছিল, উত্তরকালিনী কনিষ্ঠ লেখিকাদের উপরও তাঁর ব্যবহার তেমনি সহৃদয় ও স্নেহমধুর ছিল। সমাজের

সংস্কারের ব্যাপারে যাদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল না জানতেন, (যেমন 'হিন্দু কোড বিল' -সমর্থক দলেরা) তাদের তিনি 'অবান্ধবী' মনে করেন নি। যদিও নিজের মতামত তাঁর দৃঢ় ও অনমনীয়ই ছিল। উত্তরকালের সংস্কারের যুগকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি বটে, কিন্তু ক্রমে মনে হয়েছিল তিনি নির্লিপ্ত উদার মনে তাকে সহ্য করে নিচ্ছেন।

কথা শেষ করি এবার আর-একটি কথা বলে। একদিন কি কথার পরে বলেছি, 'আপনার পরে কি আর এই রকম চিন্তাশীলা প্রতিভাশালিনী মেয়ে আমরা পাব ?'

কিছু না ভেবেই যেন তক্ষনি মধুর নিরহংকার হাসিতে মুখ ভরে জবাব দিলেন, 'সে কি কথা ? বিধাতার রাজ্যে কোনো একজনের পর, আর তেমন ধারা কি আরো বড় জন্মাবে না, তাঁর সৃষ্টি এত কৃপণ হবে, এমন অহংকার কি করে করব।'

এত ভালো লেগেছিল কথাটা। যেন তাঁর চরিত্রের আরো একটি মহৎ ও উদার দিক দেখতে পেলাম।

জ্যোতির্ময়ী দেবী

সংসদ্ বাঙলা অভিধান। শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক সঙ্কলিত ও ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সংশোধিত। সাহিত্য সংসদ্, কলিকাতা ৯। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

বাঙলা ভাষার অভিধানরচনার ইতিহাসে চারটি যুগ— কিংবা বলা যেতে পারে, চারটি ধারা— দেখা যায়।

অভিধান-শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শব্দার্থপ্রতিপাদক গ্রন্থ বা শব্দকোষ। অর্থটা যে বাঙলাতেই লিখতে হবে, এতে এমন কথা বোঝায় না। সে হিসেবে বাঙলা অভিধান রচনায় প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন ইওরোপীয়রা। তাঁদের বাঙলা অভিধান রচনার উদ্দেশ্য এ ছিল না যে, তা থেকে বাঙলা শব্দের বাঙলা অর্থ শেখা যাবে। তাঁদের আর বাঙালীদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের পথ সুগম করাই ছিল আদিযুগের বাঙলা অভিধানগুলির লক্ষ্য।

এ বিষয়ে প্রথম চেষ্টা করেন পোর্তুগীজ পাদরি মানুএল দা আস্‌সুম্প্‌সাওঁ। তিনি ছিলেন খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। তাঁর বাঙলা-পোর্তুগীজ আর পোর্তুগীজ-বাঙলা অভিধান ছাপা হয়েছিল রোমান অক্ষরে, বোধ হয় লিসবনে। সে এ দেশে ছাপাখানা হবার অনেক আগেকার কথা।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশে প্রথম ছাপাখানা হল। তার পর ১৭৯৯ সালে বাঙলা দেশে বাঙলা অক্ষরে ছাপা প্রথম অভিধান বের হয়। অভিধানখানা লিখেছিলেন একজন ইংরেজ, হেনরি পিট্‌স্ ফর্‌স্টর (Forster)। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে ফর্‌স্টর সাহেবের এই অভিধানখানাকেই বাঙলা ভাষার প্রথম অভিধান বলেছেন। বইখানাতে ৪৪২ পৃষ্ঠায় প্রায় ষোল হাজার শব্দ সংকলন করা হয়েছিল।

এই অভিধানের নামপত্রে দেখা যায় যে, বইখানা হচ্ছে *A Vocabulary in Two Parts, Bengali and English and vice versa,* অর্থাৎ যাকে আমরা বলি ওঅর্ড-বুক। তবে, একেবারে "গাড ঈশ্বর, লার্ড ঈশ্বর, প্লোম্যান চাষা। বৃঞ্জেল বার্তাকু আর কোকোম্বর শশা" বলে ইংরেজী শেখাবার চেষ্টা যাতে করা হত, তাতে এবং এতে পার্থক্য আছে।

ফর্‌স্টরের অভিধানের পর আরও কয়েকখানা এই ধরনের সংকলন ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Careyর বাঙলা-ইংরাজী অভিধান *A Dictionary of the Bengali Lauguage* (১৮২৫ খ্রী:), Mortonএর 'দ্বিভাষার্থক অভিধান' (১৮২৮), Haughtonএর বাঙলা-ইংরাজী অভিধান *Glossary-Bengali English* (১৮৩৩), আর রামকমল সেনের ইংরাজী-বাঙলা অভিধান *A Dictionary in English and Bengalee* (১৮৩০)। এর মধ্যে Careyর অভিধানই সবচেয়ে বড়— তাতে ৮০,০০০ শব্দ ছিল। এর প্রথম ভাগ বেরোয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। তার পর শেষ ভাগটি দু খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮২৫ সনে। ১৮২৭ সনে এর একটি লঘু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

ক্রমে বাঙলা শব্দের অর্থ বাঙলায় বলে দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়, এবং বাঙলা-থেকে-বাঙলা অভিধান লেখা আরম্ভ হয়। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, সেটা ছিল পণ্ডিতী বাঙলার যুগ। অ-তৎসম বাঙলা শব্দকে তখন অপাংক্তেয় বলে গণ্য করা হত। তাই দেশজ, তদ্ভব, বিদেশী ইত্যাদি শ্রেণীর যেসব শব্দ

বাঙলা ভাষার অঙ্গীভূত— যা আগেকার দিনের ভারতচন্দ্র বা কবিকঙ্কণ বা বৈষ্ণব কবিরা ব্যবহার করে গিয়েছেন— সেসব শব্দকে যথাসম্ভব পরিহার করে অভিধান সংকলিত হতে লাগল এই দ্বিতীয় যুগে। ফলে এগুলি আসলে হয়ে দাঁড়াত সংস্কৃত-বাঙলা অভিধান। সংস্কৃত অভিধান থেকে শব্দচয়ন করে, সংস্কৃত অভিধানে তার যা যা অর্থ দেওয়া হয়েছে তা যথাসম্ভব সংস্কৃত-ঘেঁষা বাঙলায় দিয়ে (সেসব অর্থ বাঙলায় চলে কি না তা অবশ্য দেখা হত না) রচিত হত এইসব অভিধান।

এই ধরনের অভিধানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে হলধর ন্যায়রত্নের 'বঙ্গাভিধান' (১৮৩৮); 'শব্দার্থপ্রকাশাভিধান' (১৮৪৩-৪৪); 'শব্দাম্বুধি' (১৮৫৩) 'মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, এবং অন্যান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহায্যে সংবাদপূর্ণ চন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক সংগৃহীত'; বেণীমাধব দাসের 'শব্দার্থমুক্তাবলী' (১৮৫৬); রামকমল বিদ্যালংকারের 'প্রকৃতিবাদ' (১৮৬৬); 'নূতন শব্দার্থ-প্রকাশিকা' (১৮৭৪); শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বাঙলা অভিধান (১৮৯০); বলরাম পালের 'প্রকৃতিবিবেক অভিধান' (২ খণ্ড, ১৮৯২)।

J. Sykes-এর *English and Bengali Dictionary*র এক সংশোধিত সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।

সংস্কৃত-বাঙলা অভিধানের মধ্যে রামকমল বিদ্যালংকারের প্রকৃতিবাদ অভিধানের আদরই হয়েছিল বোধ হয় সব চাইতে বেশি। বাঙলা ১৩৪৭ সনে এর সপ্তম সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রধানতঃ এর অনুসরণ করে লেখা সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' (১৯০৬) বইখানাও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

তার পর আর তিনখানা অভিধানের নাম করা যেতে পারে— সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *An up-to-date Bengali to Bengali Dictionary* (২য় সংস্করণ, ১৯০৮), হরিচরণ দে-র 'নূতন বাঙলা অভিধান,' আর আশুতোষ ধরের 'আশুতোষ অভিধান' (১৯১৩)।

এর কিছু আগে থেকেই দুটো বিষয়ে প্রচলিত রীতির অন্যথা করতে আরম্ভ করেছিলেন বাঙলা-ভাষার অভিধানকারেরা। প্রথম হচ্ছে, শুধু শব্দার্থ আর ব্যুৎপত্তি দিয়েই কর্তব্য সমাধা না করে, অভিধানের পরিশিষ্ট হিসেবে আরও কতকগুলি বিষয় যোগ করা। যথা, প্রকৃতিবাদ অভিধানে তিনটি পরিশিষ্টে দ্রব্যগুণ, পৌরাণিক জীবনচরিত, আর ঐতিহাসিক জীবনবৃত্তান্ত অ-কারাদিক্রমে দেওয়া হল। আর, সুবল মিত্রের অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯০৯) বের করা হল সাত ভাগে, আর ছ'টি পরিশিষ্ট জুড়ে। প্রথম ভাগে শব্দার্থ, জীবনচরিত প্রভৃতি; দ্বিতীয়ে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ; তৃতীয়ে, বাঙ্গালা উপন্যাস নাটকাদির চরিতাবলী; চতুর্থে, বৈষ্ণবগ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দাবলী; পঞ্চমে, আদালতে, মহাজনী ও জমিদারী সেরেস্তায় ব্যবহৃত শব্দাবলী; ষষ্ঠে ও সপ্তমে যথাক্রমে সংস্কৃত ও বাঙলা প্রবাদ। তার পর, প্রথম পরিশিষ্টে ভাষাবিচার; দ্বিতীয়ে, অর্থভেদে শব্দবিভাগ; তৃতীয়ে, সচরাচর ব্যবহৃত অশুদ্ধ পদের তালিকা; চতুর্থে, হিন্দুসঙ্গীত; পঞ্চমে, ভিন্ন ভিন্ন টাইপের নাম আকৃতির পরিচয়; আর ষষ্ঠে, প্রুফসংশোধনপ্রণালী। এর দ্বিতীয় আর তৃতীয় ভাগকে বাঙলা (আর কতক পরিমাণে, সংস্কৃত) সাহিত্যের অভিধান বলা যেতে পারে। যাঁদের ঘরে এ বই ছিল, তাঁদের অনেকেরই মনে পড়বে যে, সেকালের বাঙলা সাহিত্যের গভীর না হলেও ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক পরিচয় তাঁরা এই অভিধান থেকেই পেয়েছিলেন।

লক্ষণীয় আর-একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, সুবল মিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণে, বিশেষতঃ চতুর্থ আর পঞ্চম ভাগে,

কিছু অ-তৎসম শব্দকে কুণ্ঠিত একটি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পূর্বে যে-দুটি অন্যথাচারের কথা বলেছি, এটি তার দ্বিতীয়টি। শুধু সুবল মিত্র নন, অনেক অভিধানকারই আস্তে আস্তে মেনে নিচ্ছিলেন যে, বাঙলা অভিধান থেকে অ-সংস্কৃত শব্দ একেবারে বাদ দেওয়াটা ঠিক নয়। তাই, সংস্কৃত-বাঙলা কোষগ্রন্থগুলির নতুন নতুন সংস্করণে কিছু কিছু 'দেশজ' আর 'যাবনিক' শব্দও স্থান পেতে লাগল। বাঙলা অভিধানের 'শুচিতা' বজায় রাখবার চেষ্টায় এই যে ফাট ধরল, এর গুরুত্ব বড় কম নয়।

বাঙলা ভাষার উপর যাঁদের দরদ ছিল, এমন কয়েকজন মনীষীর চেষ্টাতেই এটা সম্ভব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম করা যেতে পারে। বাঙলা ১৩০৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর লিখলেন :

"আধুনিক ও প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাঙ্গলা যত শব্দের ব্যবহার আছে, সকলই বাঙ্গলা। সম্পূর্ণ কোষগ্রন্থ সঙ্কলনকালে ইহাদের কাহারও প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন চলিবে না।

"কেহ হয়ত বলিবেন, কোষগ্রন্থের উদ্দেশ্য ত অর্থ বুঝান। দুর্বোধ্য শব্দই অভিধানে স্থান পাইবে। সুবোধ্য শব্দ, সকলেই যাহার অর্থ বুঝে, অর্থাৎ অধিকাংশ খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ, অভিধানে প্রবেশ করাইয়া অভিধানের কলেবর অকারণে ফাঁপাইবার প্রয়োজন কি ?

"[অর্থ বুঝান ছাড়া] অভিধানের আরও একটা মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। ভাষার সর্বাঙ্গ বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ না করিলে ভাষার প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে তথ্যনির্ণয় অসম্ভব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শব্দরাশির সঙ্কলন আবশ্যক। লোকসংখ্যাকর্ম্মে বা সেনসাস ব্যাপারে যেরূপ রাজাধিরাজ হইতে ভিক্ষুক পর্যন্ত মানুষ মাত্রেরই এক মূল্য… এখানেও সেইরূপ। বৈজ্ঞানিক হিসাবে সকল শব্দেরই সমান আদর।

"কাজেই বাঙ্গলা সাহিত্য নামে পরিচিত সমস্ত সাহিত্যে খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাঙ্গলা যত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই সঙ্কলন আবশ্যক ; সকলই বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গীভূত। অর্থবিচার ও ব্যুৎপত্তি বিচারকালে অপক্ষপাতে সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সম্পূর্ণ তালিকা সঙ্কলন অসাধ্য ব্যাপার ; তবে, যথাসাধ্য সম্পূর্ণতার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কোন শব্দকেই বর্জ্জন করিলে চলিবে না। সকলেরই আদর সমান।"

রামেন্দ্রসুন্দর নিজে কোনও অভিধান লেখেন নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ বহু বাঙলা শব্দ সংগ্রহ করে তাদের ব্যুৎপত্তি আর পরিচয় নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন। তার পর রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ এক নতুন ব্যাপার করলেন। তিনি সংস্কৃত শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অ-তৎসম বাঙলা শব্দ নিয়ে এক বাঙলা অভিধান বের করলেন (১৯০৭), তার নাম 'বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু'। সেই কাজকেই আরও অনেক দূর টেনে নিয়ে গেলেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। বাঙলা ১৩২০ (১৯১৩) সনে তাঁর অ-তৎসম বাঙলা শব্দের অভিধান 'বাঙ্গলাশব্দ-কোষ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। পরবর্তী অভিধানকার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এঁদের সম্বন্ধে লিখেছেন :

"সাহিত্যে টেকচাঁদ ঠাকুর যেমন অসীম সাহসে আলালী ভাষার প্রবর্তন করিয়া যুগান্তর আনিয়াছিলেন, বঙ্গীয় শব্দসিন্ধুকার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পর, পাণ্ডিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় তেমনি অসীম সাহসে তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন ও বাঙ্গালা শব্দকোষ সঙ্কলন করিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধানের ইতিহাসে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। কিন্তু

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিধানকারগণ যেমন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য হইতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দগুলি বাছিয়া বাছিয়া অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, বিদ্যানিধি মহাশয় তদ্রূপ একটা মূল উদ্দেশ্য ধরিয়াই তাঁহার অভিধান হইতে সেইগুলিকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন।"

এই যে যুগান্তর, একে আমরা বাঙলা অভিধান রচনার ইতিহাসের তৃতীয় যুগ বলতে পারি। এর লক্ষণ হল, অভিধান থেকে সংস্কৃত শব্দ বাদ দেওয়া, আর তাতে শুধু বাঙলা শব্দ সঙ্কলন করা। কিন্তু অভিধান রচনার এই ধারা আর কেউ অনুসরণ করেন নি। কেননা, শুধু সংস্কৃত শব্দ নিয়ে যেমন বাঙলা অভিধান পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, ঠিক তেমনি শুধু খাঁটি বাঙলা শব্দ নিয়েও যথার্থ একখানা বাঙলা ভাষার অভিধান রচিত হতে পারে না, একথা না মেনে উপায় নেই।

প্রকৃত বাঙলা অভিধান সঙ্কলন করবার যে মূলসূত্রটি রামেন্দ্রসুন্দর নির্দিষ্ট করে দিলেন, সেই নতুন রীতিতে শব্দ সঙ্কলন করে অভিধান লেখবার কাজে হাত দিলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। কত বৎসরের চেষ্টায়, তা জানি না— তিনি বাঙলা সাহিত্য থেকে ৭৫,০০০ শব্দ আহরণ করে বাঙলা ১৩২৪ (১৯১৭) সনে তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' প্রথম প্রকাশ করেন। তৎসম-তদ্‌ভব-দেশজ-বিদেশী-মিশ্রশব্দ-নির্বিশেষে সমস্ত বাঙলা শব্দেরই যে সমান আদর, অভিধানে তা স্বীকৃতি পেল। বাঙলা অভিধানের ইতিহাসের চতুর্থ যুগের শুরু হল বলা যেতে পারে। এর একুশ বছর বাদে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দুই খণ্ডে এই মহাকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেন, তাতে শব্দ এবং শব্দসমষ্টির মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১,১৫,০০০।

বাঙলা অভিধানে শব্দসঙ্কলনের এই যে নতুন রীতি প্রবর্তিত হল, আজও তা অক্ষুণ্ণ আছে।

অভিধানকারের একটা মুশকিলের কথা এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে। কে কোথায় কোন শব্দ বাঙলা সাহিত্যে ব্যবহার করে গিয়েছেন, অভিধানকার তা জানবেন কী করে? Oxford English Dictionary লেখবার জন্যে ইংরেজী ভাষায় লেখা প্রায় সব কিছু ঘেঁটে প্রায় ৫০ লক্ষ উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে তা থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ শব্দ সঙ্কলন করা হয়েছিল। এদেশে তো সে-জাতের চেষ্টা হয় নি বললেই হয়। অতএব, বাঙলা ভাষায় কী আছে, তার সবটা না জেনেই অভিধানকারকে শব্দচয়ন করতে হয়।

ব্যাপকভাবে চেষ্টা হয় নি বটে, কিন্তু আংশিকভাবে যাঁরা সে-চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রথম হচ্ছেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন। তাঁর পর শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০৫ সালে তিনি তাঁর অভিধান 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সঙ্কলন করতে আরম্ভ করেন, সাতাশ বছর বাদে ১৯৩২ সালে সেখানা সুবৃহৎ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

বলা বাহুল্য, জ্ঞানেন্দ্রমোহন কিংবা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলন করতে পারেন নি, তা করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। "বঙ্গভাষা-ও-সাহিত্য-মহাসাগর মন্থন করিয়া বা সাগরজোড়া একখানি টানা জাল ফেলিয়া যাবতীয় রত্ন নিঃশেষে ছাঁকিয়া তুলিবার"[১] কাজ একজন কেন, দশজনের পক্ষেও সম্ভব নয়। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রকাশিত হবার পর সে-চেষ্টা আর কেউ করেন নি।

অভিধানকারদের চেষ্টা ইতিমধ্যে একটি নতুন পথ খুঁজে পেল। শব্দসঙ্কলন ব্যাপারে তাঁদের অসুবিধের কথা আগে বলেছি। তার ফলে, বোধ হয় ঝামেলা এড়াবার জন্যে, তাঁরা বরং কিছু বেশি করে শব্দ চয়ন

---

১ জ্ঞানেন্দ্র, ২য় সং ভূমিকা, পৃ ১২

করতেন। তাতে বই হত মোটা— দেখতে বেশ, কিন্তু তাক থেকে পেড়ে নিয়ে আসা শ্রমসাধ্য। এই দোষটা দূর করবার দিকে এবার মন দিলেন অভিধানকারেরা।

বাঙলা অভিধানের ক্ষেত্রে একাধারে সাহিত্যিকের আর বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা নিয়ে দেখা দিলেন রাজশেখর বসু। ১৯২৯ সালে তাঁর 'চলন্তিকা' অভিধান প্রথম প্রকাশিত হয়। তাতে সংগ্রহের চেয়ে নির্বাচনের দিকে, সব মানে দেবার চাইতে শুধু চলতি মানে দেবার দিকে, জোর দেওয়া হল। ফলে "যাহা সহজে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় অথচ যাহাতে মোটামুটি কাজ চলে", বাঙলা ভাষায় এমন একটি সুবহ অভিধানের আবির্ভাব হল। খুব ওজন করে, বাছাই করে, শব্দসঙ্কলনের রীতি প্রবর্তিত হল।

বেশি বাছাই করবার অবশ্য একটি বিপদ্ আছে। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বলেছিলেন: "সকল শব্দের সমাবেশই নিরাপৎ; সঙ্কলনকর্তার বিবেচনার উপর ভার দিলে অনেক শব্দ এড়াইয়া যাইতে পারে।" এ আশঙ্কা যে কতদূর সত্য, চলন্তিকা তার প্রমাণ। চলন্তিকার অল্পায়তন তার একটি মহৎ গুণ, অথচ সেটি তার একটি বড় দোষও।

তাই, জ্ঞানতঃ হোক কিংবা অজ্ঞানতঃ হোক, আধুনিক অভিধানের অধিকাংশেরই প্রধান চেষ্টা হল চলন্তিকার সুবহতার আদর্শ বজায় রেখে তার এই ত্রুটিটি যথাসম্ভব পূরণ করা। 'অধিকাংশ' বলতে হল, কারণ আশুতোষ দেব বা এ. টি. দেবের নামে প্রচলিত অভিধানগুলি (আশুবোধ, ছাত্রবোধ, প্রকৃতিবোধ, শব্দবোধ, সরল এবং নূতন বাঙ্গালা অভিধান) এর মধ্যে পড়ে না। এ ছাড়া আর যে-সব অভিধান বেরিয়েছে, তাদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে সহজে নাড়াচাড়া করা যায় এমন আকারের মধ্যে কত বেশি শব্দ ভরে দেওয়া যায়। কাজী আবদুল ওদুদের 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' (১৯৫৩), আর ঋষি দাসের 'আধুনিকী' (১৯৫৪) তার দৃষ্টান্ত।

এই ধারায় সবচেয়ে সাম্প্রতিক অভিধান হচ্ছে আমাদের আলোচ্য 'সংসদ্ বাঙলা অভিধান' (অগ্রহায়ণ ১৩৬২)। প্রকাশক তাঁর নিবেদনে বলেছেন: "বৃহৎকায় অভিধানগুলিতে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু থাকিলেও মূল্যাধিক্যের জন্য ও গুরুভার হওয়ায় সেগুলি সর্বদা ব্যবহার করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার, ক্ষুদ্রকলেবর কোনও কোনও অভিধান অত্যন্ত সুসম্পাদিত হইলেও তাহাতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় পাওয়া যায় না।… সেই অভাব দূর করিবার জন্য আমরা এই অভিধানখানি প্রকাশিত করিলাম।"

চলন্তিকার প্রথম সংস্করণে শব্দ ছিল ২৬০০০-এর কিছু বেশি, অষ্টম সংস্করণে ৩০০০০-এর কাছাকাছি। সংসদ্ অভিধানের শব্দসংখ্যা ৪০০০০, আর idioms-এর সংখ্যা ১৬০০ বলে লেখা হয়েছে এর নামপত্রে। অথচ, শব্দসংকোচ করে সন্নিবেশ করবার নানা কৌশলে, এবং পাতলা কাগজের ওপর লাইনোটাইপে ছাপবার ফলে, এই ৯০০ পৃষ্ঠার বইখানা, ৭০০ পৃষ্ঠার চলন্তিকার চাইতেও আকারে ছোট হয়েছে। প্রাণতোষ ঘটকের নিতান্ত সংক্ষিপ্ত পর্যায়শব্দাভিধান 'রত্নমালা'-র কথা বাদ দিলে সংসদ্ অভিধানই আকারে ক্ষুদ্রতম। যাঁদের অভিধান নাড়াচাড়া করতে হয়, আর যাঁরা নাড়াচাড়া করবার ভয়ে অভিধান দেখা এড়িয়ে চলেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন যে এটা একটা মস্ত কথা।

যেখানে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ১,১৫,০০০ শব্দ এবং শব্দসমষ্টি সঙ্কলন করে বলেছেন যে, "বঙ্গভাষা-ও-সাহিত্য-মহোদধির শব্দরত্নভাণ্ডার অর্দ্ধেক নিঃশেষিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ," সেক্ষেত্রে আলোচ্য অভিধানে যে সব বাঙলা শব্দ পাওয়া যাবে না, সে-কথা বলাই বাহুল্য। তবু, শব্দ-নির্বাচনের গুণে এ-বইয়ে অধিকাংশ শব্দই

সেগুলির বিভিন্ন বানানে পাওয়া যাবে বলে মনে হল। তবে "ইহাতে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে ব্যবহৃত সমস্ত তৎসম, তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে" বলে ভূমিকায় যে-আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, সেটি একটু অত্যুক্তি। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ 'অন্তঃশীলা, গর্জমান, চিরায়মানা, পাত্তি (=ঠিকানা), বিবাগী' শব্দ ব্যবহার করেছেন; শরৎচন্দ্র 'রেত' (=স্রোতোবেগ) লিখেছেন; অচিন্ত্যকুমার 'আটকোল, মাড় (=মণ্ডপ), প্রত্যগাত্মা' শব্দ প্রয়োগ করেছেন; এসব শব্দ সংসদ্ অভিধানে নেই। নজরুল, জসীমউদ্দীন, মুজতবা-আলী প্রমুখ আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখায় যে-সব আরবী, ফারসী, উর্দু আর হিন্দী শব্দ নতুন এনেছেন, তার অধিকাংশ এতে নেই। তারাশঙ্কর, বনফুল বা বিভূতিভূষণ যে-সব প্রাদেশিক বা গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেছেন, সে-সবের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি।

সব কথা না থাকাটা খুব দোষের কথা নয়, কেননা থাকবে বলে আশা করা যায় না। তবু মনে হল যে 'অবিনাশ, কণ্টকারি, কনকানটে, করতব, কড়াকিয়া, কড়িমধ্যম, কথাকলি, কাজরী, কৌমার্য, চিরায়ত, জীবনবেদ, জীবনায়ন' শব্দগুলি থাকলে ভাল হত। পয়সা দিয়ে অভিধান কিনে যে-শব্দটি খুঁজছি, তা না পেলে কী পর্যন্ত হতে পারে, তার একটি মজার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন Concise Oxford Dictionary-র সঙ্কলয়িতা Fowler সাহেব: "The first letter we received after C. O. D. appeared was a demand for repayment of the book's cost, on the ground that it failed to give *gal(l)iot*, to settle the spelling of which it had been bought." কিন্তু উপায় কী?

ইংরেজী অভিধানকাররা প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করা কর্তব্য বলে মনে করেন। বাঙলা অভিধানে সে নিয়ম নেই বললেই চলে। সংসদ্ অভিধানেও উচ্চারণ দেখানো হয় নি। উচ্চারণ দেখিয়েছেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন আর শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধীরানন্দ ঠাকুর একখানা 'উচ্চারণ-কোষ' লিখেছেন, কিন্তু তাতে শুধু উচ্চারণ আছে, শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি দেওয়া হয় নি।

এত অভিধান লেখা হয়ে গেল, তবু এখনও বর্ণানুক্রমই ঠিক হল না। মুশকিল হয়েছে চন্দ্রবিন্দু, অ্যা আর ব-ফলা নিয়ে। আগে ব-কার নিয়েও গোলমাল ছিল, ব-কারান্ত শব্দ খুঁজতে হলে একবার ফ-এর পর, আর সেখানে না পেলে আবার ল-এর পর, দেখতে হত। এখন আর সে বালাই নেই— সব অভিধানেই এখন এক ব কবুল, ব-বর্ণ সব সময় ফ আর ভ-এর মাঝখানে থাকবে।

কিন্তু ব-ফলা থাকলে কোথায় বসবে, তা নিয়ে মতভেদ আছে এখনও। কোনও কোনও অভিধানে (যেমন, আশুতোষ দেবের অভিধানগুলিতে) ব-ফলাকেও সর্বদা বর্গীয় ব বলেই ধরা হয়েছে, তাই তাদের অশ্ব এসেছে অশ্ম-শব্দের আগে। অন্য সব অভিধানে— সংসদ্ অভিধানেও— ব-ফলা যেখানে উচ্চারিত হয় না, সেক্ষেত্রে তার স্থান হয়েছে ল-ফলার পর (যেমন, অশ্ব-শব্দ অশ্মের আগে না এসে, অশ্লেষার পর এসেছে); আর, উচ্চারিত হলে তাকে দেওয়া হয়েছে বর্গীয়-ব-এর স্থান (যেমন, উদ্বেগ আর তদ্বির বসেছে উদ্ভব আর তদ্ভব শব্দের আগে)। সব অভিধানে এক নিয়ম হওয়া দরকার।

অ্যা-সম্বন্ধে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বানান সম্পর্কিত নিয়মাবলী'তে (৩য় সংস্করণ, ১৯৩৬) বলা হয়েছিল যে: "[অ্যাসিড, হ্যাট] এইরূপ বানানে য্য-কে য-ফলা+আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে।" কিন্তু বর্ণমালায় এর স্থান কোথায় হবে, তা নির্দিষ্ট হয়

নি। অভিধানে ব্যঞ্জনবর্ণে-যুক্ত ্যা-কে য-ফলা+আ-কার ধরে নিয়ে কাজ চলছে, কিন্তু আদ্য অ্যা বসবে কোথায়, তা নিয়ে গোলযোগ বেধেছে। চলন্তিকায় অ-বর্ণের শেষের দিকে অহোরাত্র শব্দের পর অ্যাঁ এসেছে—কেন? অহোরাত্রের অ যদি অ হয়, আর অ্যাঁ-র অ্যা যদি অ+য্+আ হয়, তবে তো অ্যাঁ অহোরাত্রের আগে যাবার কথা। কিন্তু অ+য্+আ তো অ্যা হবে না, হবে অয়া। তবে কি অহোরাত্রের অ = অ্+অ, আর অ্যাঁ-র অ্যা = অ্+য্+আ? তা যদি হয়, তবে অ্যাঁ অহোরাত্রের পরে যাবে বটে, কিন্তু আর একটা মুশকিল হয়: অ্ বলে বর্ণ কোথায়?

তবে উপায়? উপায় ঠিক করতে না পেরে কিনা বলতে পারি না, সংসদ্-কার অ্যাঁ-শব্দটিকে একবার ২য় পৃষ্ঠায় অংস-শব্দের পর, আবার ৫৯ পৃষ্ঠায় অহ্ন-শব্দের পর, বসিয়ে দিয়েছেন— অধিকন্তু ন দোষায়! আর আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গলা অভিধানে অ্যা-কে একেবারে আলাদা একটি বর্ণ বলে মেনে নিয়ে তাকে দ্বিতীয় স্বরবর্ণের পদ দিয়ে আ-বর্ণের আগে আলাদা করে বসানো হয়েছে। (সেখানে আবার অ্যাঁ এসেছে অ্যাসিড-এর পর— কেন, তা বলা শক্ত)। এ গণ্ডগোলের একটা ফয়সলা হওয়া দরকার।

এইবার চন্দ্রবিন্দুর কথা। এক সময় বর্ণমালার শেষে হ ক্ষ ং ঃ ঁ ৎ থাকত। অভিধানে ং ঃ ঁ উঠে এসে বসেছে স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের মাঝখানে, অর্থাৎ ঔ আর ক-এর মধ্যে (অথচ চন্দ্রবিন্দুকে একটি বর্ণ বলে কোনও ব্যাকরণে স্বীকার করা হয়েছে বলে জানি না)। কিন্তু শব্দের বানানে চন্দ্রবিন্দুর স্থান কোথায়? কাঁ = ক্+আ+ ঁ, না, ক্+ ঁ+আ? বর্ণপরিচয়ের ছাত্ররা বলে ক-এ চন্দ্রবিন্দু, তাতে আ-কার, কিন্তু অভিধানকারেরা ধরেন ক-এ আকার, তাতে চন্দ্রবিন্দু।

অভিধানে চন্দ্রবিন্দুঘটিত ঝঞ্ঝাট এখানে নয়, আর একটু এগিয়ে। 'কাই, কাঁইবীচি, কাঁটা, কাটা', এই চারটি শব্দ খুঁজলে বেশির ভাগ অভিধানে পরপর শব্দ সাজানো দেখা যাবে এইরকম: 'কাই কাউকে কাওয়াজ কাংস্য কাঁইবীচি কাঁক কাঁজি কাঁটা।' তার পর, কাঁ দিয়ে আরম্ভ, এমন সব শব্দ শেষ হলে আসবে ক্রমান্বয়ে 'কাক, কাগ, কাচ, কাছ, কাজ, কাটা'। সংসদেও এই ব্যবস্থা।

সাধারণ পাঠকের এতে অসুবিধে হয়। একে তো চন্দ্রবিন্দুর যে-স্থান কোষকাররা স্থির করেছেন, তা-ই সবসময় খেয়ালে রাখা মুশকিল; তার উপর, চন্দ্রবিন্দুর আকারটি এত সূক্ষ্ম যে, কাটা আর কাঁটা-র চেহারার তফাতটা খুব স্পষ্ট নয়, তাই, তারা যে অভিধানে অনেক তফাতে থাকবে, এ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা শক্ত।

চলন্তিকায় এই অসুবিধে দূর করেছেন রাজশেখর বাবু। তাঁকে এ বিষয়ে অনুসরণ করেছেন একমাত্র ঋষি দাস। এঁরা কাই-এর পরেই বসিয়েছেন কাঁইবীচি, কাক-এর পরেই কাঁক, তার পর কাজ কাঁজি কাটা কাঁটা— এইভাবে। চন্দ্রবিন্দুযুক্ত স্বরবর্ণকে সেই স্বরবর্ণের অব্যবহিত পরেই স্থান দিয়ে অভিধান দেখবার সুবিধে করে দিয়েছেন চলন্তিকা-কার। সংসদে এ-সুবিধের অভাব।

তবে, এর শব্দবিন্যাসের প্রশংসা করতে হয় আর এক কারণে। একই শব্দের নানারকম বানান দেখানো, এবং কোনও শব্দ একজায়গায় দেখিয়ে আবার তার যথাস্থানে তাকে দেখানো— এই দুই কাজে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়েছে। যেমন, 'সি'-এর মধ্যে 'সিঝা (-জা), -ন (-নো)' দেখিয়ে আবার যথাস্থানে 'সেঝা (সি-), সেজা (সি-)' দেখানো হয়েছে। এতে সুবিধে এই যে, যে বানানই খুঁজি না কেন, জায়গা-মতো তাকে পাওয়া যাবে।

এমন একখানা সুমুদ্রিত বইয়ে ছাপার ভুল আর একটু কম থাকবে বলে আশা করেছিলাম। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ছাপার ভুলের :

প্রথম পৃষ্ঠাতেই 'অ-স্থানে অন হয়' আছে, 'অন্ হয়' হবে ; লেলিহান-এর ব্যুৎপত্তিতে প্রত্যয় আছে 'অন', হবে 'আন' ; নবরত্ন-শব্দে 'ধন্বন্তরী' আছে, 'ধন্বন্তরি' হবে (প্রমাণ : ৩৯৭ পৃষ্ঠা) ; আহ্নিক-এর ব্যুৎপত্তিতে 'ইক্' নয়, 'ইক' হবে ; সুহৃদ্-শব্দে 'সংসমাধা' হবে 'সং. সমাধা' ; মধুকর-এর অর্থে ভ্রমর আর মৌমাছি-র মধ্যে সেমিকোলন না থেকে কমা থাকায় মনে হতে পারে যে, ভ্রমরও যা মৌমাছিও তা ; কংসবণিক্ আর কংসহা শব্দদুটির পর যথাক্রমে (-জ্) আর (-হন্) বাদ পড়ে গিয়েছে ; কড়কচ-এর অর্থে 'কবকচ' হবে 'করকচ'। কপরদালাল-এর ব্যুৎপত্তিতে 'দলিল' আছে, হবে 'দলাল', কতুত্তর-এর অর্থে আছে 'চোপড়া', হবে 'চোপরা' (প্রমাণ : ২১০ পৃঃ) ; করগ্রাহ শব্দের অর্থ পাণিগ্রহণকরী নয়, -কারী হবে ; পরিচায়ক (পৃঃ ৮৫৪), আকারক (পৃঃ ৮৯২), খিলোদ্ধার (পৃঃ ৮৯৯) যথাক্রমে হবে পরিচায়ক, আকারিক আর খিলোদ্ধার ; আর বইয়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে পরিভাষার তালিকায় asceptic, difinition, morain, parabolla আর zoorastry আছে, তাদের শুদ্ধরূপ যথাক্রমে aseptic, definition, moraine, parabola আর zoorasty হবে। 'মর্তূ্যকাম'-এ য-ফলাটি ভুল।

অভিধানখানায় দুটি পরিশিষ্ট আছে, তার মধ্যে এই পরিভাষা-সঙ্কলন একটি (অপরটি বাঙলা বানান সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী)। বিশ্ববিদ্যালয় বহু ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দের, আর বাঙলা সরকার কতগুলি সরকারী কাজে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দের, বাঙলা প্রতিশব্দ তৈরী কিংবা স্থির করে দিয়েছিলেন। তা থেকে সঙ্কলন করে বহু শব্দ চলন্তিকায় এক পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। সংসদ্ অভিধানেও হয়েছে। তবে, এর বিশেষত্ব এই যে, সঙ্কলিত শব্দগুলিকে সব একসঙ্গে বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে বলে প্রয়োজনীয় শব্দটি খুঁজে পাওয়া সহজ হয়েছে। চলন্তিকায় সাজানো হয়েছিল বিষয়-অনুসারে ; তাতে অসুবিধে এই যে, যে-শব্দটি খুঁজছি, সেটি কোন বিষয়ে বা শিরোনামায় পাওয়া যাবে, তা না জানলে খুঁজে মরতে হয়।

তবে, দেখছি যে চলন্তিকায় আর সংসদ্ অভিধানে পরিভাষার তালিকায় প্রথমে ইংরেজী শব্দটি, তার পর তার বাঙলা পরিভাষাটি দেওয়া হয়েছে। তাতে এক শ্রেণীর অনুসন্ধিৎসুর প্রয়োজন মিটবে, সে কথা ঠিক। কিন্তু বাঙলা অভিধানের পক্ষে এটা ঠিক কি ? বাঙলা অভিধানকারের কাজ তো বাঙলা শব্দ নিয়ে— তার প্রতিশব্দ কী, তা বলে দেওয়া। 'মহাগাণনিক' যে accountant-general, আর 'উদগ্রহ' যে deliquescence, তা-ই দেখাতে হবে বাঙলা অভিধানে। যাঁরা ইংরেজী accountant-general শব্দের পরিভাষা জানতে চান, তাঁদের চেয়ে, যাঁরা 'মহাগাণনিক' কাকে বলে এ কথা জানতে চান, বাঙলা অভিধানের উপর তাঁদের দাবিই বেশি নয় কি ? আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধানে সে দাবি মেটাবার একটা নিতান্তই আংশিক চেষ্টা আছে। আর কেউ সে-চেষ্টা করেন নি। করলে একটা কাজ হয়।

তৎসম শব্দের মধ্যে যেগুলির ব্যুৎপত্তি কষ্টকল্পিত, বাঙলা অভিধানে সেগুলির ব্যুৎপত্তি না দিয়ে শুধু [সং.], অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ, বলে দেবার নীতি জ্ঞানেন্দ্রমোহন গ্রহণ করেছিলেন। সংসদ্ অভিধানেও তাই করা হয়েছে। তবে, জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মতো 'সার্থকতা'-র অভাবের জন্যে নয়, স্থানের অভাবের জন্যে।

তার আর চারা নেই। কিন্তু পারতপক্ষে ওটি করা উচিত নয়। কষ্টকল্পিত হলেও ব্যুৎপত্তিটি দেখিয়ে দেওয়া অভিধানকারের কর্তব্য।

কিন্তু সংসদ্-অভিধানকার যে ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করতে গিয়ে কোথাও 'অল্ ঘঞ্ খচ্ ড' ইত্যাদি না বলে তার বদলে সর্বত্র এক 'অ' বলে কাজ সেরেছেন, এ রীতি জ্ঞানেন্দ্রমোহন-কর্তৃক অনুসৃত হলেও সমর্থনযোগ্য নয়। এতে একে তো প্রত্যয়ের নামটা ভুল বলা হল; তা ছাড়া, এতে সাধারণ পাঠকের মনে একটা ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, অ বলে সংস্কৃতে একটি প্রত্যয় আছে যার কাজ অনির্দেশ্য এবং খামখেয়ালী। একই অ-প্রত্যয়যোগে কৃ ধাতু কর হচ্ছে, কার হচ্ছে, কর হচ্ছে— এ দেখলে তার ধাঁধা লাগবার কথা। সংসদ্‌কার অবশ্য সংস্কৃত অভিধান দেখে সে-ধাঁধা ঘুচিয়ে নিতে বলেছেন, কিন্তু সংস্কৃত অভিধান ক'জনের আছে? সংস্কৃত প্রত্যয়গুলির আসল পুরোপুরি চেহারাটা দেখিয়ে দিলেই ভালো হত। তাতে বইয়ের আয়তন বাড়ত না।

দেশজ বা দেশী শব্দের মধ্যে কোনটা আবার প্রাদেশিক, কিংবা কথ্য, কিংবা গ্রাম্য, কোনও কোনও অভিধানে তা দেখানো হয়েছে। সংসদ্-অভিধানেও তা থাকলে ভালো হত।

ব্যুৎপত্তি-নির্দেশ সম্বন্ধে আর একটি নিবেদন আছে। Concise Oxford Dictionaryতে ব্যুৎপত্তি দেখাবার রীতি কী, তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: Calabash [from French calebasse, from Spanish calabaca, Sicilian caravazza, perhaps from Persian kharbuz, melon]— একেবারে immediate root থেকে ultimate root পর্যন্ত দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক বাঙলা অভিধানে তা নেই, সংসদ্-অভিধানে অনেক জায়গাতেই আছে বলে মনে হল। জায়গার অকুলান না থাকলে এই নিয়মটা সর্বত্র পুরোপুরি মেনে চলা উচিত। যেমন, জোলাপ শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে যদি সুনীতিবাবুর মত (Origin & Development of the Bengali Language, Vol. I, p. 623) মেনে নিতে হয়, তবে লিখতে হবে: জোলাপ<পোর্তুগীজ (বা স্প্যানিশ) jalapa<মেকসিক্যান xalapa<আজটেক xalapan (xalli = sand + atl = water + pan = upon).

সংসদ্-অভিধানকার 'কার্ত্তিক' বানানে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর মতে, যেহেতু কৃত্তিকা থেকে কার্ত্তিক শব্দ উৎপন্ন, তাতে ত-এর যে দ্বিত্ব, তা রেফ-এর জন্যে নয়, আগে থেকেই ছিল, অতএব তা থাকবে। তা হলে, সেরকমের অন্য শব্দেও তো সে-নিয়মই অনুসরণ করা তাঁর উচিত ছিল। বৃদ্ধ থেকে উৎপন্ন শব্দ বার্দ্ধক্য, তার বানান তবে বার্ধক্য বলে তিনি মেনে নিলেন কেন?

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে 'সুবর্ণবণিক্ সমাচার' পত্রিকায় যা লিখেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য: "পাণিনি সূত্র করিয়াছেন 'ঝরো ঝরি সবর্ণে' (পা. ৮. ৪. ৬৫)। ব্যঞ্জনবর্ণের পর যদি হ-কার, য র ল ব ঙ ঞ ণ ন ম ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, এবং তাহার পর আবার যদি অনুরূপ (সমান) বর্ণ থাকে, তাহা হইলে মধ্যস্থ বর্ণটির বিকল্পে লোপ হয়— যেমন, কৃষ্ণ+ঋদ্ধি = কৃষ্ণর্ধি।... এইরূপ কৃত্তিকা হইতে কার্তিক, কার্ত্তিক এবং কার্ৎত্তিক, বৃত্তি হইতে বার্তিক, বার্ত্তিক এবং বার্ৎত্তিক, বৃদ্ধ হইতে বার্ধক্য, বার্দ্ধক্য এবং বার্দ্দ্ধক্য পদ নিষ্পন্ন হইবে।" অতএব দ্বিত্বহীন কার্তিক বানান ভুল নয়, তার সপক্ষেও যুক্তি আছে দেখা যাচ্ছে।

ন'শো পৃষ্ঠার বইয়ে কতকগুলো ভুল থাকা কিছু বিচিত্র নয়। কয়েকটা চোখে পড়েছে। ছাপার ভুল

কিছু কিছু আগেই দেখিয়েছি, এবার অন্যরকম ভুলের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এই অভিধানখানা সঙ্কলয়িতার যে কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার পরিচয় বহন করছে, সেকথা অস্বীকার করবার জন্যে এই তালিকা দিচ্ছি না— আমার উদ্দেশ্য বইখানাকে আরো ভালো করে তুলতে তাঁকে সাহায্য করা।

অবিমৃষ্য কি ঠিক, না অবিমৃশ্য? আলেকুম-এর অর্থ যা দেওয়া হয়েছে, তা যে ঠিক নয়, ব্যবহারিক-শব্দকোষ দেখলে তা বোঝা যাবে। কন্দ মানে 'ফলাকার উদ্ভিদ্ মূল' নয়, কেননা আলু আর কচু মূল নয়, কচুও ফলাকার নয়। কঙ্ক মানে হাড়গিলা জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলেছেন বটে, কিন্তু কঙ্ক তো heron-জাতীয় পাখী, আর হাড়গিলা হল adjutant bird। কালপুরুষ মৃগশিরা নয়, কেননা মৃগশিরা হচ্ছে কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত একটি নক্ষত্র মাত্র। ক্রান্তিবৃত্ত ecliptic বটে, কিন্তু তা 'পৃথিবীর বার্ষিক পরিক্রমণ-পথ', না, সূর্যের আপাত-গতির পথ? ফরমা বলতে ছাপাখানার ভাষায় যা বোঝায়, তার মূল শব্দ format, না, forme? নবরত্নের একটি মাণিক্য এবং আর একটি পদ্মরাগ হওয়া সম্ভব নয় (সংস্কৃত অভিধানে থাকলেও নয়), কেননা পদ্মরাগ যা, মাণিক্যও তা। মহকুমা 'মুনসেফের এলাকা' নয়। পশ্বাধম শব্দটিকে অশুদ্ধ বলা উচিত, কেননা পশু+অধম=পশ্বাধম হয় না। জুম্মা-শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক আছে মনে করে 'জুম্মা মসজিদ' বলা ভুল, 'জমা, জামা বা জামী মসজিদ' বলা উচিত; তার অর্থ, 'বড় মসজিদ'। সিদ্ধি-র ভাং অর্থের আগে '(বাং)' বসালে ভাল হত। জারি-র মূলনির্দেশে 'ফা. যারী' লেখা হয়েছে, কিন্তু z-উচ্চারণ বোঝাবার জন্যেই যে 'য' লেখা হয়েছে, সে-সঙ্কেত কোথাও নেই। দ্বারবান্ 'দ্বারবৎ' বলে কোনও সংস্কৃত শব্দ থেকে নয় (চলন্তিকায়ও এ ভুল আছে), ফারসী দরবান-শব্দজ। দেশী-ও সংস্কৃত দেশিন্-শব্দ নয়, তার মানে আলাদা; দেশ+বাং ঈ=দেশী। করমচা আর তালিকা শব্দ দুটির মূল করঞ্জ আর তালিকহ্ লিখলে ভাল হত। ভুল বলতে পারি না, কিন্তু কয়েক জায়গায় দু'একটা অর্থ বাদ পড়ে গিয়েছে; যেমন, অনুবাদ-এর অর্থ বিতর্ক ('বাদানুবাদ'), বিমান-এর অর্থ (বাং) আকাশ, এবং মন্দিরের গর্ভগৃহ বাদ পড়েছে। আর, শুধু 'ঘন-সরে চিনি মিশাইয়া' রাবড়ি হয়, এ কথাটা কি ঠিক?

আরও আছে, কিন্তু এতেই হবে।

সংসদ্-অভিধান সম্বন্ধে যা বলা হল, তা মোটের উপর এই যে, বইখানা উত্তম, তবে নিখুঁত নয়। দুনিয়ার আর সব কিছুরই মতো এ-অভিধানখানাও "ভালো হতো আরও ভালো হলে"। নিখুঁত অভিধান অবশ্য হতে পারে না। বাঙলা ব্যাকরণ-রচনার কথায় রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছিলেন:

"কার্য্য অতি বৃহৎ। দশজনের বা দশবৎসরের চেষ্টায় ইহা সম্পন্ন হইবে না। কোনও দেশে হয় নাই, কোনও কালে হয় নাই। বিজ্ঞানের গতি কেবল পূর্ণতার অভিমুখে।"

অভিধানের বেলায়ও তাই।

শ্রীঅমলেন্দু সেন

গীতিগুঞ্জ। অতুলপ্রসাদ সেন। পাঁচ টাকা।

কাকলি। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় খণ্ড। অতুলপ্রসাদ সেন। প্রতি খণ্ড দুই টাকা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা ৬।

অনুভূতি আবেগ এবং আকূতি এই তিনটি প্রেরণাই সংগীতকে মর্মস্পর্শী করে। এই প্রেরণাগুলি বিভিন্ন রচয়িতাকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। অতুলপ্রসাদের গানে এদের অবস্থিতি সমাহিত নিয়ন্ত্রিত এবং শান্ত। এই সুগভীর স্নিগ্ধ প্রশান্তি শুধু তাঁর কাব্যেই নয় সুরেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই মাধুর্যেই শ্রোতা বা শিল্পী আবিষ্ট এবং নিমগ্ন হয়ে যান।

অতুলপ্রসাদের গানে কথার আড়ম্বর নেই, বাহুল্যও কিছুমাত্র নেই; কিন্তু তা পাঠক শিল্পী এবং শ্রোতাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় তাঁদের কল্পলোকে— যেখানে একটা মধুর মায়াময় পরিবেশ রচিত হয়, বিচিত্র ছবি ফুটে ওঠে।

বলো সখী, মোরে বলো বলো,
কেন গো নয়ন ছলছল?
এমন প্রাতে ধরি দু হাতে
চেয়েছে কি কেহ ঢলঢল?
কাহারো বাঁশি মোহনভাষী,
ডেকেছে কি— 'বধূ, চলো চলো?

এই যে একটি ঢলঢল চাহনিতে আর-একটি চোখের ছলছল ভাব, দুর্বার আকর্ষণ— একটা উদাস প্রকৃতি— এ সমস্তই যেন মনের মধ্যে ছবির মত ভাসতে থাকে।

চাঁদনী রাতে কে গো আসিলে?
উজল নয়নে কে গো হাসিলে?
মোহন সুরে
ধীরে মধুরে
পরান-বীণায় কে গো বাজিলে?
হেম-যমুনায়
প্রেম-তরী বায়,
কে ডাকে আমায়— 'আয় গো আয়'?
প্রভাতবেলায়
সোনার ভেলায়
কেমনে চলে যাবে হায়!
তব সে কূলে
যাবে কি ভুলে
যে ভালবাসা বাসিলে।

চাঁদিনী রাতের একটা মায়াময় পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে। সেই আবছা রাতের মোহকুহকে দেখা সোনার

যমুনা— প্রেমতরণী থেকে হাতছানি— সে আবার ভোরের আলোয় মিলিয়ে যাবে, গানের সুরে এই স্বপ্নটি অপরূপভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে।

কে গো গাহিলে পথে 'এসো পথে' বলিয়া ?
দুয়ার খুলিনু যবে কেন গেলে চলিয়া ?
বিজন বরষা-রাত
এ কি ছলনা নাথ,
আঁধারে মিলালে তুমি বারেক উজলিয়া!
ঝড়ের বাতাসে আর
রুধিতে পারে না দ্বার;
পথে ঝড়, ঘরে ডর, হাতে প্রেমফুলহার।
শ্রবণে মিলাল গান
হৃদয়ে রহিল তান,
তোমার লাগিয়া আঁখি উঠিছে উথলিয়া।

'পথে ঝড়, ঘরে ডর, হাতে প্রেমফুলহার'— এই পংক্তিটি গাইবার সঙ্গেসঙ্গে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ বিজনরজনীর একটি শঙ্কামধুর চিত্র ফুটে ওঠে।

বড় ব্যথা তোমায় পাওয়া
আরো ব্যথা ভুলে যাওয়া
যদি ব্যথী না আসিবে
এত ব্যথা কেন পাওয়াও ?

সুরের ভিতর দিয়ে ব্যথার এই সুনিবিড় ব্যাপ্তি কেবল অনুভব করা যায়— বলে বোঝানো যায় না।

আজি নিখিল কুঞ্জবনে
মিলব পরম বধুর সনে
বড়ো সাধ মনে বধূ
এ মোহন রাতে আমার সাথে
বিশ্ব দোলায় দোল লো বধূ
বিশ্ব দোলায় দোল।

গানের সুরে সুরে চিত্তে দোলা লাগে— গভীর আবেশে মন বিভোর হয়ে যায়।

কথায় এই যে অনুভূতি, সুরে তাকে আরো গভীর করে তোলা এবং পরিশেষে সুর এবং কথার সীমা ছাড়িয়ে মনকে এক অধরা বস্তুর মায়াময় পরিবেশে আচ্ছন্ন রাখা— এই খানেই অতুলপ্রসাদের কল্পনার বৈশিষ্ট্য।

অতুলপ্রসাদ খুব বেশি গান রচনা করেন নি, কিন্তু আমাদের সংগীতকলার বিবিধ বৈচিত্র্য তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। এই প্রয়াসে তিনি রাগসংগীত কাব্যসংগীত এবং লোকসংগীতের বিস্তৃত পথে পরিভ্রমণ করেছেন। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের যথেষ্ট মিল আছে এবং অতুলপ্রসাদের অনেক গানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও অসামান্য।

রবীন্দ্রনাথের মত অতুলপ্রসাদের উপরেও সে যুগে প্রচলিত বাংলা গানের একটা প্রভাব সামগ্রিকভাবেই পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদের মত শিল্পীকে বিচার করতে গেলে এক-একটি যুগের সংগীতকলা এসে পড়ে, কেননা তাঁরা বহু এবং বিচিত্র দর্শী। বহু বস্তুকে আত্মসাৎ করে তাঁরা নিজেকে ব্যক্ত করেন। তাঁদের মধ্যে অতীতযুগের কীর্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে এবং ভাবী কালের উপর প্রভাব বিস্তার করবার মত স্বকীয় সৃষ্টিও অফুরন্ত।

অতুলপ্রসাদের গানে পুরাতন বাংলা টপ্পার প্রভাব বড় কম নয়। বাংলার কালাংড়া খাম্বাজ কীর্তনাঙ্গ এবং বাউল ধরনের যেসব গান পূর্বে প্রচলিত ছিল অতুলপ্রসাদের গানে তাদেরও ছায়াপাত ঘটেছে। "কে যেন আমারে বারে বারে চায়" "তবু তোমারে ডাকি বারে বারে" "মিনতি করি তব পায়" "ওহে জগতকারণ" "কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা" প্রভৃতি টপ্পাভঙ্গিম গানে পুরাতন বাংলা গানের আদর্শই অনুভব করা যায়। অথচ, এসব গানে তাঁর নিজস্ব দানও কত বেশি। পুরাতন বাংলা গানের আর-একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার "ওগো আমার নবীন সাথী" "কে আবার বাজায় বাঁশি" "আয় আয় আমার সাথে ভাসবি কে আয়" "তোর কাছে আসব মাগো" "কে তুমি বসি নদীকূলে" "বঁধু ধরো ধরো মালা"—প্রভৃতি গানে। যাঁরা বাংলার উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের গানের খবর রাখেন তাঁরা জানেন এইসব চালের কত গান এক সময় বাংলায় প্রচলিত ছিল এবং এসব ঢঙকে অতুলপ্রসাদ যে কত মার্জিত এবং উন্নত করেছেন তাও তাঁরা বিশেষ ভাবে অনুভব করতে পারবেন। আমার তো মনে হয়, অতুলপ্রসাদ হিন্দী গানের চেয়ে অধিকতর প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বাংলা গানের বিভিন্নরূপে, কেননা তাঁর নানা ঢঙের গানেই বারে বারে বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য জানান দিয়ে যায়। "জানি জানি তোমারে হে রঙ্গরানী" গানটি অনেককে রবীন্দ্রনাথের 'মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ' গানটির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। প্রথম দিকে গানটি ধ্রুপদের গতিতে চলেছে—কিন্তু, সঞ্চারীতে এসে সহসা গানটি কীর্তনাঙ্গে পরিণত হল এবং আভোগে আবার আগের ধারার সঙ্গে মিলে গেল। বাংলা গানের একটা বৈশিষ্ট্যকে এইরকম বিচিত্রভাবে পরিবেশনের উদাহরণ খুব অল্পই মেলে।

বাংলা গানের বৈচিত্র্যকে তিনি যেমন নানা উপায়ে বিকশিত করেছেন তেমনি হিন্দী গানের বৈশিষ্ট্যকেও আপনার মত করে প্রয়োগ করেছেন। "আমার বাগানে এত ফুল" "বাদল ঝুমু ঝুমু বোলে" "ঝুমুক ঝুমুক ঝুমঝুম্" "শ্রাবণ ঝুলাতে বাদলরাতে" "কেন এলে মোর ঘরে" "চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে" "জল বলে চল" "ঝরিছে ঝর ঝর" "সে ডাকে আমারে" "ডাকে কোয়েলা বারে বারে" —প্রভৃতি গান এই কৃতিত্বের নিদর্শন। অতুলপ্রসাদ খেয়াল এবং ঠুংরি জাতীয় গানে অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিশেষ করে ঠুংরির কোমল এবং করুণ গতিভঙ্গী তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। হিন্দী গানের এইসব লালিত্য তিনি তাঁর গানে অতি নিপুণভাবে সঞ্চারিত করেছেন। কয়েকটি গানকে হিন্দীভাঙা বললে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু রূপান্তরটি অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক। আজকাল রাগপ্রধান নামক হিন্দী গানের যে অনুকরণ দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে অতুলপ্রসাদের এইসব রচনার কত তফাত।

মিশ্রণের অনুপাত তিনি চমৎকার বুঝতেন। সামান্য বৈচিত্র্যের স্পর্শে তাঁর গান মনোহর হয়ে উঠেছে। "মুরলী কাঁদে" "এ মধুর রাতে" "আমার পরান কোথা যায়" "বঁধুয়া নিদ্ নাহি আঁখিপাতে" "বাবনা বাবনা বাবনা ঘরে" "এসো দুজনে খেলি হোলি"— প্রভৃতি গানে অনেক ছোট ছোট বিচিত্রমধুর সুর ও

নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন-কি বাউল ধরনের গানেও তিনি স্থকৌশলে রাগমিশ্রণ করেছেন; "প্রকৃতির ঘোমটাখানি খোল"— এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অবশ্য, শিল্পীকেও এবিষয়ে কৌশলী হতে হবে। অতুলপ্রসাদের গান যিনি গাইবেন তাঁর যথেষ্ট প্রস্তুতি এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আজকাল বেতারে বা বিভিন্ন আসরে যখন অতুলপ্রসাদের গান শুনি তখন এইসব প্রয়োগের বিকৃতি বা অপটু পরিবেশন নিতান্ত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। অনেকে আবার অতুলপ্রসাদের প্রয়োগটুকুতেই সন্তুষ্ট নন তাকে নিজের মত করে বিস্তারিত করতে চান। সবাইকার পক্ষে এ প্রয়াস না করাই ভালো এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রতিভাসম্পন্ন গায়ক গায়িকার পক্ষে এই দুরাশা যে নিতান্ত ক্ষতিকর তা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন না করলে অতুলপ্রসাদের গানের মাধুর্যহানি ঘটতে থাকবে এবং কোনো কোনো বিকৃতরূপ স্থায়ী হয়ে দাঁড়াবার সম্ভাবনাও রয়েছে।

অতুলপ্রসাদের গান সম্যকভাবে আলোচনা করলে আমাদের সংগীতের প্রায় সব ধারার সঙ্গেই পরিচিত হওয়া যায়। এই পরিচয় শুধু আকৃতিগত নয়, তাদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় এবং এই পরিচয়ের ফলে আমাদের দৃষ্টি নতুন পথের সন্ধানে পুলকিত হয়, আমরা বাংলা গানকে আরো নিবিড়ভাবে ভালোবাসতে শিখি।

'গীতিগুঞ্জ' অতুলপ্রসাদের যাবতীয় গীতের সংকলন। গানগুলি পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত— দেবতা প্রকৃতি স্বদেশ মানব এবং বিবিধ। গ্রন্থটি প্রথমে কবির জীবিতকালে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৬ সালে ব্রাহ্মসমাজ থেকে যখন গ্রন্থটি আবার ছাপা হয় তখন কবির ভ্রাতা কয়েকটি অপ্রকাশিত গান যোজনা করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে কবির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রদত্ত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণটি পূর্ণাঙ্গ এবং সংশোধিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

গীতিগুঞ্জে প্রকাশিত গানগুলির স্বরলিপি 'কাকলি' তিনটি খণ্ডে এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে কাকলির দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু বহুকাল পূর্বেই নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আবার গ্রন্থটি প্রকাশ করে সংগীতজগতের মস্ত অভাব দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

অতুলপ্রসাদের গান স্বরলিপি করে রক্ষা করবার জন্য অগ্রণী হয়েছিলেন সরলা দেবী, শ্রীমতী সাহানা দেবী এবং শ্রীদিলীপকুমার রায়। বস্তুত, তাঁদের প্রচেষ্টা ব্যতীত অতুলপ্রসাদের কয়েকটি মূল্যবান সংগীত হয়তো আজ আর পাওয়া যেত না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে অতুলপ্রসাদের বহু গানের সুর আজ হারিয়ে গিয়েছে। একসময় যাঁরা এসব গান জানতেন তাঁরা স্বরলিপি করে রাখবার কথা চিন্তা করেন নি। আজকাল অতুলপ্রসাদের গানের বহু রেকর্ড দুষ্প্রাপ্য। সেসব গান জানেন এমন লোকের সংখ্যাও ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে। কাকলি গ্রন্থমালার অন্যতম সম্পাদক শ্রীনীহারবিন্দু সেন এইসব দুষ্প্রাপ্য গানের স্বরলিপিও যথাসম্ভব সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। বলা বাহুল্য, কাজটি পরিশ্রমসাধ্য। এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বাংলার সংগীত-জগৎকে একটি বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছেন।

অতুলপ্রসাদের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রণয়ন করাও বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সংগীতজ্ঞ শিল্পীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর জীবনচরিতে এমন অনেক বস্তু পাওয়া যেতে পারে যা আমাদের সংগীত এবং সাহিত্যের ব্যাপারে কাজে লাগবে। তাছাড়া অতুলপ্রসাদের গান বুঝতে গেলে মানুষটির পরিচয় পাওয়াও নিতান্ত প্রয়োজন।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

মুরলী কাঁদে রাধে রাধে ব'লে,
শ্যামসুন্দর, হায়, ভাসে নয়নজলে।
দেখ যমুনা-জলে শূন্য তরী দোলে।
শূন্য ঝোলে ঝুলা নীপতরুতলে—
রাধে রাধে ব'লে।
কুঞ্জে নীরব পাখি, পুচ্ছ মেলে না শিখী,
পবন থাকি থাকি দীরঘ নিশাস ফেলে।
এসো গো মানিনী, মাধো-বিমোহিনী,
এসো বিরহিণী, এসো বঁধু-গলে—
শ্যাম শ্যাম ব'লে।

কথা ও সুর : অতুলপ্রসাদ সেন

স্বরলিপি : শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

II মা -রমা -া পা । পা -া -পর্সা -ণর্সা । ণা -া -ধণা -ধণা । দা -পা -া -া I
মু ০০ ০ র লী ০ ০০ ০০ কাঁ ০ ০০ ০০ দে ০ ০ ০

{ রা -মা রমা -পণা । -দা -পমা মা -পা । জ্ঞা -া -রজ্ঞা -রজ্ঞা । -া রা সা -া } I
রা ০ ধে০ ০০ ০ ০০ রা ০ ধে ০ ০০ ০০ ০ ব লে ০

-া মা -া পা । ণদা -ণদা -া ণা । র্সা -া র্স-না প-নর্সা । -া সা -া -া I
০ শ্যা ০ ম সু০ ০০ ন্ দ র ০ ০ ০০ ০ হা ০ য়্

মা -া পা পা । -া -পর্সা -ণর্সা ণা । ধণা -ধণা -া দা । পা -া -া -া I
ভা ০ সে ন ০ ০০ ০০ য় ন০ ০০ ০ জ লে ০ ০ ০

রা -মা রমা -পণা । -দা -পমা মা -পা । জ্ঞা -া -রজ্ঞা -রজ্ঞা । -া রা সা -া II
রা ০ ধে০ ০০ ০ ০০ রা ০ ধে ০ ০০ ০০ ০ ব লে ০

II {মা পা ম-পণা -দা । -া দণা ণা র্সা । -া র্স-না প-না -া । -র্সা র্সা র্সা -া I
দে খ ০০ ০ ০ য০ মু না ০ ০ ০ ০ ০ জ লে ০

পা -র্সা না -র্সা । -নর্সা -নর্সর্রা র্সনা -র্সা । ণা -া -ধণা -ধা । -ণা দা পা -া } I
শূ ন্ ন ০ ০০ ০০০ ত০ ০ রী ০ ০০ ০ ০ দো লে ০

মপা -র্ণর্সা -র্রজ্ঞা -া । -র্সা র্সর্রা -র্জ্ঞা -র্রজ্ঞা । -র্সা র্সা নর্সা -নর্সা । -না দা পা -া I

শূ৹ ৹৹ ৹৹ ৹ ন্ ন৹ ৹ ৹৹ ৹ ঝো লে৹ ৹৹ ৹ ঝুঁ লা ৹

সা -রা -মা -া । -া পা পা -া । -পর্সা -র্ণর্সা ণা -ধণা । -ধণা দা পা -া I

নী ৹ ৹ ৹ ৹ প ত ৹ ৹৹ ৹৹ ক্ল ৹৹ ৹৹ ত লে ৹

রা -মা রমা -পণা । -দা -পমা মা -পা । জ্ঞা -া -রজ্ঞা -রজ্ঞা । -া রা সা -া II

রা ৹ ধে৹ ৹৹ ৹ ৹৹ রা ৹ ধে ৹ ৹৹ ৹৹ ৹ ব লে ৹

II মমা -া মা মা । মা পা -া পা । রমা -পণা -দপা -মপা । -া -মা -জ্ঞা -া I

কু ন্ জে নী র ব ৹ পা খি৹ ৹৹ ৹৹ ৹৹ ৹ ৹ ৹ ৹

জ্ঞা -মা জ্ঞমা -ণা । -দা -া দণা ণা । র্সা -া র্স-না দ-না । -র্সা র্সা র্সা -া I

পু চ্ ছ৹ ৹ ৹ ৹ মে৹ লে না ৹ ৹ ৹ ৹ শি খী ৹

-া পা র্সা -া । না -র্সা -নর্সা -নর্সর্রা । র্সনা -র্সা ণা -ধণা । -ধণা দা পা -া I

৹ প ব ৹ ন ৹ ৹৹ ৹৹৹ থা৹ ৹ কি ৹৹ ৹৹ থা কি ৹

-া মা মা পা । -ণা -া ণা ধা । ণধা -র্সণা -ধণা -পা । -ণা দা পা -া I

৹ দী র ঘ ৹ ৹ নি শা স৹ ৹৹ ৹৹ ৹ ৹ ফে লে ৹

II {মা পা ম-পণা -দা । -া না র্সা -া । র্স-না দ-না -র্সা র্সা । র্সা -া -া -া I

এ সো ৹৹ ৹ ৹ গো মা ৹ ৹ ৹ ৹ নি নী ৹ ৹ ৹

(র্সা -া না -র্সা । নর্সা -র্রা র্সা -না । -র্সা -ণা -ধা -ণা । দা পা -া -া)} I

মা ৹ ধো ৹ বি৹ ৹ মো ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ হি নী ৹ ৹

র্সা -া র্সা -া । র্সা -া -নর্সা -নর্সর্রা । র্সা -র্ণর্সা -র্ণর্সর্রা -র্সনর্সা । -ণধণা দা পা -া I

মা ৹ ধো ৹ বি ৹ ৹৹ ৹৹৹ মো ৹৹ ৹৹৹ ৹৹৹ ৹৹৹ হি নী ৹

মপা -র্ণর্সা -র্রজ্ঞা -া । -র্সা র্সর্রা -র্জ্ঞা -র্রজ্ঞা । -র্সা র্সা নর্সা -নর্সা । -না দা পা -া I

এ৹ ৹৹ ৹৹ ৹ ৹ সো৹ ৹ ৹৹ ৹ বি র৹ ৹৹ ৹ হি ণী ৹

সা -রা -মা -া । -া পা পা -া । -পর্সা -র্ণর্সা ণা -ধণা । -ধণা দা পা -া I

এ ৹ ৹ ৹ ৹ সো বঁ ৹ ৹৹ ৹৹ ধু ৹৹ ৹৹ গ লে ৹

রা -মা রমা -পণা । -দা -পমা মা -পা । জ্ঞা -া -রজ্ঞা -রজ্ঞা । -া রা সা -া II II

শ্যা ৹ ম৹ ৹৹ ৹ ৹৹ শ্যা ৹ ম ৹ ৹৹ ৹৹ ৹ ব লে ৹

শ্রীমতী নীলা সেন কর্তৃক রেকর্ডে গীত সুর অনুযায়ী।